উত্তরাধিকার

সমরেশ মজুমদার

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

আমার

দাছ, পিসীমা, বাবা এবং মাকে

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

দৌড়

বন্দী নিবাস

লক্ষ্মীর পাঁচালী

বড় পাপ হে

উজান গঙ্গা

কালবেলা

বাসভূমি

আহরণ

সওয়ার

যেহেতু এই উপন্যাসের পটভূমিকা জলপাইগুড়ি শহর এবং ডুয়ার্সের চাবাগান তাই দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশের সময় কেউ কেউ এর চরিত্র ও ঘটনার মধ্যে পরিচিত চেহারা খুঁজে পেয়েছেন। যদিও দুর্ঘটনারা দল বেঁধে আসে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা দুর্ঘটনাই। আমি একটি বিশেষ সময় নিয়ে উপন্যাস লিখতে চেয়েছি, ফটোগ্রাফারের এলেম আমার নেই।

আঘাত কি আমি জানি, তাই সেটা কাউকে দিতে একদম ইচ্ছে করে না।

লেখক

উত্তরাধিকার

॥ ১ ॥

শেষ বিকেলটা অন্ধকারে ভরে আসছিল। যেন কাছাকাছি কোথাও বৃষ্টি হয়ে গেছে, বাতাসে একটা ঠাণ্ডা আমেজ টের পাওয়া যাচ্ছিল। অবশ্য ক'দিন থেকেই আকাশের চেহারাটা দেখবার মত ছিল। চাপ-চাপ কুয়াশার দঙ্গল বাদশাহী মেজাজে গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছিল সবুজ গালচের মত বিছানো চা-গাছের ওপর দিয়ে খুঁটিমারীর জঙ্গলের দিকে। বিচ্ছিরি, মন খারাপ করে দেওয়া দুপুরগুলো গোটানো সুতোর মত টেনে টেনে নিয়ে আসছিল স্যাঁতসেঁতে বিকেল —ঘষা সেলেটের মত হয়েছিল সারাদিনের আকাশ। বৃষ্টির আশঙ্কায় প্রত্যেকটা দিন যেন সূচের ডগায় বসে থাকত এই পাহাড়ী জায়গাটায়, কেবল বৃষ্টিটাই যা হচ্ছিল না।

কিন্তু কাছাকাছি কোথাও বৃষ্টি হয়েছে। হয়তো ভুটানের পাহাড়ে বৃষ্টি নেমেছে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। পুরো হাতওয়ালা হলুদ পুলওভার পরে অনি দেখল দিনটা ফুরিয়ে যাচ্ছে। বাড়ির সামনে পাতাবাহারের গাছগুলোর ওপর নেতিয়ে পড়া হলুদ রোদটা কোথায় হারিয়ে গেল টুক করে। আরো দূরে, আঙরাভাসা নদী জড়িয়ে বিরাট খুঁটিমারীর জঙ্গলের মাথায় লাল বলের মত যে সূর্যটা হঠাৎ উঁকি দিয়েছিল একবার, যাকে সকাল থেকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে রাখতে চেয়েছিল ও, কেমন করে ব্যাডমিন্টনের ককের মত ঝুলে পড়ল ওপাশে, একরাশ ছায়া ছড়িয়ে দিল চারধারে। অনির খুব কান্না পাচ্ছিল।

খালি পায়ে বাড়ির পেছনে চলে এল অনি। ঘাসগুলো কেমন ঠাণ্ডা, নেতানো। পায়ের তলায় সিরসির করে। চটি না পরে বেরুলে মা রাগ করবেন, কিন্তু অনি জানে এখন ওদের কাউকে পাওয়া যাবে না। এই বিরাট কোয়ার্টার-টার ঠিক মধ্যিখানের ঘরে এখন সবাই বসে গোছগাছ করছে। এদিকে নজর দেবার সময় নেই কারো।

এই বাড়িটার চারপাশে শুধু গাছপালা। দাদু এখানে এসেছিলেন প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে। সব কটা গাছের আলাদা আলাদা গল্প আছে, মন ভালো থাকলে দাদু সেগুলো বলেন। এই যে বিরাট ঝাঁকড়া কাঁঠালগাছ ওদের উঠোনের ওপর সারাদিন ছায়া ফেলে রাখে, যার গোড়া অবধি রসালো মিষ্টি

কাঁঠাল থোকা থোকা হয়ে ঝুলে থাকে, সেটা বড় ঠাকুমা লাগিয়েছিলেন। প্রায় চল্লিশ বছর বয়স হয়ে গেছে গাছটার। প্রথমদিকে নাকি মাটির নিচে কাঁঠাল হতো, পেকে গেলে ওপরের মাটি ফেটে যেত—গন্ধে চারদিক ম-ম করতো তখন। রাত্তিরবেলায় শেয়াল আসতো দল বেঁধে সেই কাঁঠাল খেতে। বড় ঠাকুরমা শুয়ে শুয়ে চিৎকার করতেন তখন। শেষ পর্যন্ত দাদু কাঁঠাল গাছের ওপরে একটা টিনের ছোট ড্রাম বেঁধে দিয়েছিলেন। সেই ড্রামের মধ্যে একটা ঘণ্টা দড়িতে বাঁধা থাকতো। দড়িটা টিনের ছাদের নিচ দিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে খাটের সঙ্গে বাঁধা ছিল। ভালো থাকলে দাদু হেসে বলেন, 'রাতদুপুরে ঘুম ভেঙে গেলে দেখতাম তোমার ঠাকুমা শুয়ে সেই দড়ি টানছেন আর বাইরে প্রচণ্ড শব্দ করে ড্রামটা বাজছে। শেয়ালের সাধ্য কি এর পরে আসে!'

উঠোনের শেষে গোয়ালঘরে যাবার খিড়কি দরজার গায়ে যে তালগাছটা, যার ফল কোনদিন পাকে না, ছোট ঠাকুমা লাগিয়েছিলেন। মেজপিসিকে তিন দিনের রেখে বড় ঠাকুমা মারা যান। ছোট ঠাকুমা বড় ঠাকুমার বোন। এই তালগাছটা কোন কর্মের নয়। পিসীমা বলেন, 'ব্যাটাছেলে গাছ। বাবা কাটতে দেন না ছোটমা লাগিয়েছিল বলে, ছায়া-ফায়া সব বাজে কথা। ছোট মাকে তো বাবা খুব ভালবাসতেন।' গাছটাকে অনেকবার কেটে ফেলার কথা হয়েছিল। বাবুই পাখিরা সারা গাছে বাসা করে আছে। সারাদিন রঙিন পাখির কিচিরমিচির, দেখতেও ভাল লাগে। তা ছাড়া ছায়া হয় উঠোনে—এই সব বলে দাদু কাটতে দেননি। তাই পিসীমা বলেন, ছায়া-ফায়া সব বাজে কথা। সত্যি বাবুই পাখি বাসা করে বটে। এক-একদিন সকালে সারারাত ঝড়ের পরে অনি দেখেছে মাটিতে পড়া বাসাগুলো হাতে নিয়ে, কি নরম! অথচ পাখিগুলোর ভ্রূক্ষেপ নেই, আবার বাসা করতে লেগে গেছে। ঝাড়িকাকু একদিন ওকে বলেছিল, 'কত্তামশাই-এর দুই বউ, কাঁঠালগাছ আর তালগাছ।' বেশ মজা লেগেছিল অনির।

খিড়কি দরজা দিয়ে বেরুতেই ও কালী গাই-এর হাম্বা ডাক শুনতে পেল। এমন মানুষের মত ডাকে গরুটা, বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে। কালী দাঁড়িয়ে আছে গোয়ালঘরের সামনে। ওর ছেলেমেয়েরা কোথায়? বেশী গরু বাড়তে দেন না মা। চারটের বেশী হয়ে গেলে লাইন থেকে পাতরাস আসে, হাটে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেয়। সে টাকা মায়ের কাছে জমা থাকে—গরুগুলো সব মায়ের। কালীকে বিক্রি করা হবে না কথনো। দুধ দিক বা না দিক, ও এখন বাড়ির লোক হয়ে গিয়েছে। অনি দেখল কালী বড় বড় চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ওর চোখ দুটো আজ এত গম্ভীর কেন? বুকের মধ্যে কেমন

করে উঠল অনির। ও কি কিছু বুঝতে পেরেছে? গরুরা কি টের পায়? হাত বাড়ালো অনি, সঙ্গে সঙ্গে মুখটা ওপরে তুলে ধরল কালী। গলার কম্বলে হাত বোলালো অনি অনেকক্ষণ। নাক দিয়ে শব্দ করছে কালী। রোজ যে রকম আদর খাবার মুখ করে ও, সে রকমটা ঠিক না। যেন ও সত্যিই বুঝতে পারছে অনি চলে যাবে এখান থেকে। আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আবার হাঁটতে লাগল অনি। বড় বড় মাথাসমান আকন্দ গাছগুলো গোয়ালঘরের চারপাশে বেড়া দিয়ে লাগানো হয়েছে। অনি সেগুলো পেরিয়ে আসতে আসতে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, কালী ঘুরে দাঁড়িয়ে ওকে একদৃষ্টে দেখছে। অনি দৌড় লাগালো।

গোয়ালঘরের পেছন দিকে কোন বাড়িঘর নেই। বড় বড় জঙ্গুলে গাছের সঙ্গে আম কুল ছড়িয়ে আছে। এখন আলো প্রায় নেই বললেই চলে। দৌড়ে আসতে আসতে অনি সেই ডাহুকটার গলা শুনতে পেল। রোজকার মত কেমন নিঃসঙ্গ গলায় ঝাঁকড়া কুলগাছটার তলায় বসে একটানা ডেকে যাচ্ছে। ডাহুকটার গলার কাছটা সাদা থালার মত। অনেক দিন দেখেছে অনি। ঝাড়িকাকু বলে ডাহুকের মাংস খেতে নাকি খুব ভাল। গুলতি দিয়ে মারার চেষ্টা করেও পারেনি ঝাড়িকাকু। ভীষণ চালাক ডাহুকটা। এখন প্রায় সন্ধ্যে হওয়া সময়টায় ডাহুকটার গলার শব্দে কেমন বিষণ্ণ লাগছিল চারপাশ। অনি আঙরা-ভাসা নদীর গায়ে রাখা কাপড়-কাচার পাথরটার ওপরে এসে দাঁড়াল। চকচকে ঢেউগুলো যেন ওদের স্কুলে নতুন আসা গম্ভীর-দিদিমণির মত দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে কোনদিকে না তাকিয়ে। ঝুঁকে পড়ে নিজের ছায়া দেখল ও আঙরাভাসার কালো জলে। মাকে লুকিয়ে ওরা প্রায়ই এই নদীতে স্নান করে। ছোট ছোট নুড়ি-বিছানো হাঁটুজলের নদী। এর কোথায় কি পাথর আছে বা না আছে অনি জানে। সেই হলদে রঙের বড় বড় পাথরগুলোর নিচে লাল লাল চিংড়িগুলো গুঁড়ি মেরে পড়ে থাকে, হাত বাড়ালেই হল, রোজকার মত অনি আর ধরতে পারবে না। যাবার বাকি দিনগুলো কেমন দ্রুত, মুখের ভিতর নরম চকোলেটের মত দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে। অনির ভীষণ খারাপ লাগছে, ভীষণ।

এখন এখানে কেউ নেই। আঙরাভাসার দুধারে বড় বড় আমগাছগুলোতে ফিরে আসা পাখিরা জোরালো গলায় চেঁচামেচি করে নিচ্ছে শেষবার। অদ্ভুত একটা আঁষটে গন্ধ উঠছে নদীর গা থেকে। চওড়ায় পনেরো ফুট, তীব্র স্রোতের এই নদী চলে গেছে নিচে চা-ফ্যাক্টরীর ভিতর দিয়ে। ফ্যাক্টরীর বিরাট হুইলটা চলছে এর স্রোতে। বলতে গেলে স্বর্গছেঁড়ার হৃদ্‌স্পন্দনের মত এই নদীর ঢেউগুলো। অথচ ওরা পায়ের তলায় নড়বড়ে পাথর রেখে কতবার পার হয়ে

যায়। ওপাশের লাইনের মদেসিয়া মেয়ের দল যখন নদী পেরিয়ে এপারে আসে তখন ওদের হাঁটু অবধি নামা কালো কাপড়ের ঘেরটা পদ্মপাতার মত স্রোতে ভাসে। কাপড়টাকে ওরা বলে আঙরা। নদীর নাম তাই আঙরাভাসা। এতো স্রোত আর জল কম তাই বড় মাছেরা এদিকে আসে না। তবু একটা জলজ আঁষটে গন্ধ বেরোয় নদীর গা থেকে। চোখ বন্ধ করলে জলের শব্দ খঞ্জনীর মত বেজে যায়।

পুলওভার গুটিয়ে উবু হয়ে চট করে কাপড়কাচা পাথরটা তুলে ধরল অনি। হালকা চ্যাপ্টা পাথর। সামান্য ঘোলা জল সরে গেলে অনি দেখল একটা বিরাট দাঁড়াওয়ালা কালো কাঁকড়া, গোল গোল চোখ তুলে জলের তলায় বসে ওকে দেখল সেটা। তারপর নাচের মত পা ফেলে ফেলে সরে যেতে লাগলো সেটা নদীর ভিতরে। একগাদা চুনো মাছের বাচ্চা থলবলিয়ে চলে গেল। ছোট্ট সাদা পাথরের ফাঁক দিয়ে লম্বা শুঁড়ওয়ালা একটা লাল চিংড়িকে দেখতে পেল অনি। হঠাৎ মাথার ওপর থেকে পাথরের ছাদটা উঠে যেতে বেচারা বুঝতে পারছিল না কি করবে। বাঁ হাতে পাথরটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে ডান হাতে খপ্ করে ধরে ফেলল ও মাছটাকে। পাথরটাকে নামিয়ে দিয়ে আবার উঠে বসল তার ওপর। হাতের মুঠোয় চিংড়িটা ছট্‌ফট করছে। পেটের তলায় অজস্র পায়ের মত শুঁড়গুলো নাচাচ্ছে এখন। নাকের কাছে নিয়ে এল অনি, চমৎকার জলের গন্ধ। কি ভীষণ কষ্ট হচ্ছে বুকের মধ্যে, এই চিংড়িটাকে আর কোনদিন সে দেখতে পাবে না। হাতের মুঠোটাকে জলের মধ্যে রাখল অনি। আঙুলের ফাঁক গলে জল ঢুকছে। চিংড়িটা মোচড় দিচ্ছে খুব। হাত ওপরে তুলতেই জল বেরিয়ে যেতেই চিংড়িটা লাফ দিল হঠাৎ। আর সেই সময় গলার শব্দ পেল ও। চোখ তুলে তাকাতেই অনি দেখল ওপারে জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে টুকরি কাঁধে দুটো মদেসিয়া মেয়ে ঘাটে আসছে। ফ্যাক্টরী বোধ হয় ছুটি হল। মেয়ে দুটো মা-মেয়েও হতে পারে। তপুপিসীর মত ছোটটার বয়স। টুকরিটা পাড়ে রেখে ওরা চট করে ঠাণ্ডা জলে নেমে পড়ল। জল ছিটিয়ে মুখ ভেজাল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে অনিকে দেখল। ছোট মেয়েটা বড়কে আঙুল দিয়ে অনিকে দেখালো, 'বুড়ো বাবাকে নাতি।'

বড়জন বিরাট খোঁপাসমেত মাথাটা ঘুরিয়ে অনিকে দেখে হাসল, 'কর-লে, ও ছোউয়ার গোঁফ নাই হলেক।' অনি বুঝল, ওর গোঁফ হয়নি এখনও, বাচ্চা ছেলে, বড়টা ছোটকে কিছু করে নিতে বলছে। কথাটা শুনে ছোটটা পেছন ফিরে কাপড়-আঙরা গুটিয়ে জলের মধ্যে প্রায় হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। একটা প্রাকৃতিক শব্দ, যার সঙ্গে এই নির্জন আঙরাভাসা নদীর কোন সম্পর্ক নেই, কানে যেতেই অনি

ঘুরে দাঁড়াল আর তারপর কোনদিকে না তাকিয়ে অন্ধকার নেমে যাওয়া মাঠের মধ্যে দিয়ে প্রাণপণে ছুটতে লাগল বাড়ির দিকে। পেছনে হঠাৎ মেয়ে দুটো হেসে উঠল গলা খুলে, 'সরমাতিস রে—এ ছোউয়া—হি-হি-হি!' ওদের গলার শব্দেই কি না বোঝা গেল না, দৌড়োতে দৌড়োতে অনি শুনল সেই ডেকে যাওয়া নিঃসঙ্গ ডাহুকটা হঠাৎ চুপ মেরে গেল, একদম চুপ।

উঠোনে ঢুকে অনি দেখল হ্যারিকেন জ্বালানো হয়ে গেছে। স্বর্গছেঁড়া চা-বাগানে এখনও ইলেকট্রিক আসেনি। শুধু ফ্যাক্টরীতে ডায়নামো চালিয়ে বাতি জ্বালানো হয়। মহীতোষ বাড়ির পেছনে সম্প্রতি একটা ছোট টিনের চালাঘর করেছেন। বড় শৌখিন মানুষ মহীতোষ, কলকাতা থেকে ডায়নামো আনার ব্যবস্থা করেছেন। এখন যে কোন দিনই সেটা এসে যেতে পারে। অয়ারিং হয়নি, এমনি তার ঝুলিয়ে ঘরে ঘরে বাতি জ্বালাবার ব্যবস্থা পাকা। এই রাত্তিরবেলায় তালগাছের মাথায় জমে থাকা অন্ধকার, কাঁঠাল গাছের ডালে ডালে যে অদ্ভুত রহস্যের ভূতটা দলা পাকিয়ে বসে থাকে—অনির ভীষণ ইচ্ছে করে ইলেকট্রিক জ্বললে সেগুলোকে কেমন দেখাবে। মহীতোষ ডায়নামো বসালে এটাই হবে এই তল্লাটের প্রথম ইলেকট্রিক-জ্বলা বাড়ি। স্বর্গছেঁড়া কেন, আশেপাশের কোন চা-বাগানের বাড়িতেই এখনো ইলেকট্রিক আসেনি। কিন্তু মুশকিল হল, কবে আসবে ডায়নামোটা? ওরা চলে যাবার পর এলে অনির কি লাভ হবে! বাবা কেন কলকাতায় তাগাদা দিয়ে চিঠি লিখছে না, এই তো কিছুদিন আগে ওদের বাড়িতে প্রথম রেডিও এল। ওদের বাড়ি মানে স্বর্গছেঁড়ায় প্রথম রেডিও এল। মহীতোষ নিজে ছুটিতে গিয়েছিলেন কলকাতায় বেড়াতে। ফেরার সময় বড়সড় রেডিও সেটটা কিনে নিয়ে এলেন। শুধু রেডিও সেট নয়, সঙ্গে একটা আলাদা স্পিকার। বাইরের ঘরে রেডিও বাজতো, সেই রেডিও শুনতে ভিড় করে আসতো বাবুরা। মহীতোষ ওর সঙ্গে একটা তার জুড়ে স্পিকারটাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন পঞ্চাশ গজ দূরে—আসাম রোডের কাছে। বড় কৃষ্ণচূড়া গাছের ডালে বেঁধে স্পিকারটা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। আর রাস্তা জুড়ে বসে যত মদেসিয়া কুলিকামিন ভিড় করে শুনতো, 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও, কলকাতা।'

রেডিও আসার পর বাড়িটার চেহারাই যেন বদলে গেল। সরিৎশেখর সকাল বিকেল রেডিওর পাশে বসে থাকেন একগাদা বুড়ো নিয়ে, খবর শুনবেন। ছোট কাকু আধুনিক গান শুনবে চুপিচুপি, কেউ না থাকলে। রাত্তিরবেলা নাটক হলে স্পিকারটা ভিতরবাড়িতে চালান করে দিয়ে মহীতোষ উচ্চগ্রামে রেডিও বাজিয়ে দেন। সেদিন সন্ধ্যের মধ্যে রান্না শেষ করার তাড়া দেখা দেয় মা-পিসীদের মধ্যে।

আটটা বাজলেই সব হাত পা গুটিয়ে বাবু হয়ে ভিতরের বারান্দায় সতরঞ্চি পেতে বসেন নাটক শুনতে। তখন কথা বলা নিষেধ—অনি নাটক শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে এক-একদিন। এখন অবশ্য শুধু এ বাড়ি নয়—নাটক শুনতে আশেপাশের সব কোয়ার্টারের মেয়েরা সন্ধ্যের মধ্যে চলে আসে অনিদের বাড়ি। একটা সতরঞ্চিতে আর কুলোয় না এখন। সঙ্গের বাচ্চাদের একজোট করে মা বলেন, 'অনি, যাও, এদের সঙ্গে খেলা কর।' বিচ্ছিরি লাগে তখন। বরং বাইরের ঘুটঘুটি অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে নাটক শুনতে শুনতে, রেডিও ফাটিয়ে একটা গলা যখন চিৎকার করে কাঁদে—'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' তখন বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে। মাকে আঁচলে চোখ মুছতে দেখে নিজেরই কান্না পেয়ে যায়।

এখন বাইরের ঘরে রেডিও বাজছে না। সরিৎশেখর বা মহীতোষ ফেরেননি এখনও। তুলসীগাছের নিচে প্রদীপ জ্বালা হয়ে গিয়েছে। ভিতরের বারান্দায় উঠতেই মা বললেন, 'হ্যাঁরে—কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?' অনি কোন কথা বলল না। দৌড়ে আসার জন্য ওর ফরসা মুখ লাল-লাল দেখাচ্ছিল। রান্নাঘরে যেতে যেতে মা আবার বললেন, 'খিদে পেয়েছে ?' অনি ঘাড় নাড়লো, তারপর বাইরে চলে এল। বাইরের ঘরে বিরাট হ্যারিকেন জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। সামনে পাতাবাহারের গাছের পাশে যে ক্লাবঘর, তার দরজা খুলে ঝাঁটফাট দিয়ে ঝাড়িকাকু হ্যাজাক জ্বালাচ্ছে উবু হয়ে বসে। ওপাশে অন্ধকারে ডুবে থাকা আসাম রোড দিয়ে হুস হুস করে একটার পর একটা গাড়ি পালিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। অনি দেখল আজ জোনাকি জ্বলেনি। হ্যাজাকটা জ্বেলে তারের আংটায় ঝুলিয়ে দিল ঝাড়িকাকু। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চত্বরটা দিনের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। হ্যাজাকের তলায় ঝাড়িকাকুকে কেমন বেঁটে লাগছে। হাঁটু অবধি ঢোলা হাফ প্যাণ্ট আর ফতুয়া গায়ে দিয়ে মুখ উঁচু করে ঝাড়িকাকু হ্যাজাকটা দেখছে।

ঠিক এই সময় অনি সাইকেলের ঘন্টিগুলো শুনতে পেল। চা-বাগানের ভিতর দিয়ে সাদা নুড়ি বিছানো যে রাস্তাটা ফ্যাক্টরীর মুখে গিয়ে পড়েছে, সাইকেলগুলো সেই রাস্তা দিয়ে আসছিল। অন্ধকার হয়ে যাওয়া চরাচরে এখন সবে জ্বলে ওঠা তারার আলো একটা আবছা ফিকে ভাব এনেছে, যার জন্য এতদূরে ওদের বারান্দায় দাঁড়িয়েও অনি চা-গাছগুলোর মধ্যে মধ্যে বসানো শেড্‌ট্রিগুলোকে বুঝতে পারল। দশ-বারোটা সাইকেল পর পর আসছে ঘন্টি বাজাতে বাজাতে। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে রাস্তা দেখে নিচ্ছে ওরা। প্রায় দেড় মাইল লম্বা এই রাস্তার দুধারে ঘন চা-গাছ আর শেড্‌ট্রি। সন্ধ্যের পর একা বড় একটা কেউ যায় না।

ছ'টার ভোঁ বেজে গেলে বাবুরা দল বেঁধে সাইকেলে চেপে বাড়ি ফেরেন। এখন একটু একটু হাওয়া দিচ্ছে। সামনের মাঠে একা দাঁড়িয়ে থাকা লম্বাটে কাঁঠালিচাঁপা গাছে একদল ঝিঁঝি করাত চালানোর মত শব্দ করে যাচ্ছে। সাইকেলের ঘন্টিগুলো আরো জোর হল। তারপর একসময় ওরা মোড় ঘুরে চা-বাগানের গেট পেরোতেই অনি ওদের দেখতে পেল। পর পর সাজানো কোয়ার্টারের সামনে পড়ে থাকা বিরাট মাঠের মধ্যে ঢুকে সাইকেলগুলো এবার আলাদা হয়ে যাচ্ছে। এক-একটা টর্চের আলো ধারালো তলোয়ারের মত লম্বা হয়ে এক-একটা কোয়ার্টারের দিকে চলে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বাবাকে দেখতে পেলো অনি। আবছা আবছা বাবার জামা প্যাণ্ট দেখা যাচ্ছে। সাইকেলের গতি কমিয়ে টর্চের আলো নিবিয়ে দিলেন মহীতোষ। তারপর বাড়ির সামনে লম্বা বেঞ্চিতে সাইকেলটাকে খাড়া করে বারান্দায় উঠে এলেন। বছর বত্রিশের যুবক মহীতোষ প্যাণ্ট পরেন, ফুলপ্যাণ্ট। এই চা-বাগানের কেউ তা পরে না। হাঁটু অবধি মোজা গার্টারে বাঁধা, থাকি হাফপ্যাণ্ট আর হাফহাতা বুশশার্ট এই হল এখানকার বাবুদের পোশাক। পাতিবাবু মশাবাবু—যাঁদের কাজ রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে, তাঁরা অবশ্য মাথায় একটা সোলার হ্যাট ঝুলোন। কিন্তু মহীতোষ এই বয়সে হাফপ্যাণ্ট পরতে রাজী নন। ফুলপ্যাণ্টের পায়ের কাছটা ক্লিপ দিয়ে গুটিয়ে রাখেন সাইকেল চড়ার সময়। সারামুখে নিটোল করে দাড়িগোঁফ কামানো মহীতোষের মাথার চুল নিগ্রোদের মতন কোঁকড়া। হাসতে গেলে গজদাঁত দেখা যায়। বারান্দায় উঠে মহীতোষ ছেলেকে দেখে বললেন, 'আজ রাত্রে নদী বন্ধ হবে, বুঝলি।' বলে অনির মাথায় হাত বুলিয়ে ভিতরে চলে গেলেন।

হাঁ করে তাকিয়ে থাকল অনি। নদী বন্ধ হবে মানে আঙরাভাসা আজ বন্ধ করে দেওয়া হবে। এর আগে গত বছর, তখন অনি অনেক ছোট ছিল, আঙরাভাসাকে বন্ধ করা হয়েছিল। সেটা হয়েছিল শেষরাতে। অনিরা সবাই ঘুমিয়ে ছিল। শুধু পরদিন সকালে ঝাড়িকাকু এক ড্রাম ভর্তি চিংড়ি আর কাঁকড়া এনে দেখিয়ে যখন বলল যে নদী বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে ওগুলো ধরা গেছে তখন এক দৌড়ে আঙরাভাসার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ভীষণ আফসোস হয়েছিল অনির। খটখট করছে নদী। কোথাও এক ফোঁটা জল নেই। ভিজে শ্যাওলা আর নুড়ি পাথরের ওপর কয়েকটা কুকুর কি শুঁকছিল। পায়ে পায়ে নদীর ঠিক মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে ছিল অনি। চারদিকে শুকনো পাথর, ছবিতে দেখা কঙ্কালের মত লাগছিল নদীটাকে। এমন সময় পায়ের তলায় কি সুড়সুড় করতে অনি দেখল একটা ছোট্ট লাল কাঁকড়া গর্ত থেকে মুখ বের করছে। অনিকে দেখেই সেটা সুড়ুৎ করে

ভিতরে ঢুকে গেল। এখানে ওখানে কিছু চুনো মাছ, গেঁড়ি শুকিয়ে পড়ে আছে। অনির খুব আফসোস হচ্ছিল তখন, যদি সে দেখতে পেত হঠাৎ জল শেষ হয়ে যাওয়াটা! মাছগুলো তখন কি করছিল? তারপর আবার রাত্তির হলে জল ছাড়া হয়েছিল নদীতে। সেটাও অনি দেখতে পায়নি। পরদিন সকালে গিয়ে দেখল ঠিক আগের মতন যে-কে সেই। কুলকুল করে স্রোত বইছে। শুধু কাপড়কাচার পাথরের নিচে কোন মাছ ছিল না এই যা। বছরে একবার এই রকম হয়। শ্মশানের কালীবাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে আসা আঙরাভাসা নদীটাকে শুয়োরকাটা মাঠের পাশে দু'ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। এক ভাগ গেছে নিচে ধানের জমির গা দিয়ে দু নম্বর কুলি লাইনের পাড় ঘেঁষে ডুডুয়া নদীতে। আর অন্য বাঁকটার মুখে সিমেণ্টের বাঁধ মত করে তার তলা দিয়ে জল আনা হয়েছে ফ্যাক্টরীতে। স্রোতটা এদিকেই বেশী। ফ্যাক্টরীর সেই বিরাট হুইলটায় যখন আবর্জনা জমে জমে পাহাড় হয়ে যায় তখন বাঁধের মুখটা বন্ধ করে দেওয়া হয়। জল তখন ওপাশে চলে যায় —এদিকটা খটখটে। ফ্যাক্টরীতে তখন হুইল পরিষ্কার করার কাজ চলে। আজ আবার নদী বন্ধ হবে। কখন? উত্তেজনায় পায়ের তলা সিরসির করে উঠল অনির। আজ দেখতেই হবে। অনি ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে আর একটা টর্চের আলো দেখতে পেল। মহীতোষ বাড়িতে এসে রেডিও চালিয়ে দিয়েছেন। কি একটা আসর হচ্ছে এখন। অনি দেখল একটা টর্চের আলো লাফাতে লাফাতে এগিয়ে আসছে। এই আলোটাকে অনি চেনে। অন্ধকারে নেমে পড়ল অনি। পায়ের তলায় ভিজে থাকা শিশির আর ঠাণ্ডা বাতাসে ওর শীত করছিল। এগিয়ে আসা টর্চের দিকে ও দৌড়তে লাগল। ক্রমশ অনি অন্ধকার ফুঁড়ে এগিয়ে আসা একটা বিরাট লম্বাচওড়া শরীর দেখতে পেল। হাঁটুর নিচ অবধি ধুতি, ঢোলা পাঞ্জাবি, হাতে লাঠি—সরিৎশেখর আসছেন। পেছনে ওঁর ব্যাগ হাতে বকু সর্দার। সরিৎশেখর হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়িয়ে পড়লেন হঠাৎ। তারপর পাঁচ ব্যাটারীর টর্চ জ্বেলে সোজা করে ধরলেন সামনে। লম্বা আঁকশির মত আলোটা ছুটন্ত অনিকে টেনে নিয়ে আসছিল। যেন এক লাফে দূরত্বটা অতিক্রম করে অনি দাদুর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে টর্চ নিবিয়ে অনিকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে সরিৎশেখর বললেন, 'কি হয়েছে, দাদু?'

ফিসফিস গলায় বুকে মুখ রেখে অনি বলল, 'আজ আমি নদী বন্ধ হওয়া দেখব।'

পঁয়তাল্লিশ বছর চাকরি করার পর আর ছ'দিন বাদে সরিৎশেখর অবসর নেবেন। এই তো আজ বিকেলে হে সাহেবের সঙ্গে ওঁর বাংলোয় বসে কথা

একটা ফাইল সই করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন সরিৎশেখর। কাজকর্ম মিটে গেলে হে সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'রিটায়ার করে কি করবে ঠিক করেছো বড়বাবু?' সরিৎশেখর হেসেছিলেন, 'দেখি।' সঙ্গে সঙ্গে ওঁর মনে পড়ে গিয়েছিল বছর পাঁচেক আগেকার কথা। এই চেয়ারে বসে ম্যাকফার্সন সাহেবকে সেদিন এই প্রশ্ন করেছিলেন সরিৎশেখর। প্রায় বাইশ বছর একসঙ্গে কাজ করেছিলেন ওঁরা। ম্যাকফার্সনের ছেলে ডেসমণ্ডকে জন্মাতে দেখেছেন উনি। বিলিতী কোম্পানীর এই চা-বাগানে চিরকাল স্কচ সাহেবরাই ম্যানেজারি করেছে। ম্যাকফার্সনের মত এত বেশী দিন কেউ স্বর্গছেঁড়ায় থাকেননি। সরিৎশেখরের দেখা ম্যানেজারদের মধ্যে ম্যাকফার্সন সব চেয়ে মাই-ডিয়ার লোক। এই তো সেদিন অনি জন্মাতে মিসেস ম্যাকফার্সন একগাদা প্রেজেণ্টেশন নিয়ে ওঁর নাতির মুখ দেখে এলেন। চা-বাগানের ম্যানেজারদের যেসব নিয়মকানুন মানতে হয় সেগুলো প্রায়ই মানতেন না মিসেস ম্যাকফার্সন। বাবুদের সঙ্গে ওঁদের বেশী মেলামেশা বারণ। কেউ তা করলেই তেলিপাড়া ক্লাবে কথা উঠবে। তারপর সেটা চলে যাবে কলকাতার সদর দপ্তরে। নির্দিষ্ট ম্যানেজারের নামের পাশে লাল ঢেঁড়া পড়বে। সরিৎশেখরের প্রশ্ন শুনে ম্যাকফার্সন চটপট বলেছিলেন, 'রিটায়ার মানে একদম বিশ্রাম। কোনও কাজকর্ম করবো না। ডেসমণ্ড অস্ট্রেলিয়া থেকে লিখেছে একটা মাঝারি ফার্ম করেছে ক্যাটলের—ওটাই দুজনে দেখাশোনা করব।' ছেলেকে সেই ছোটবেলায় শালীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সাহেব অস্ট্রেলিয়ায়। মিসেস ম্যাকফার্সন বলেছিলেন, 'চিঠি লিখবো কিন্তু আমি—তুমি উত্তর দেবে বাবু। আই ওয়াণ্ট এভরি ডিটেল।' তা যাবার দু দিন আগেও বউমাকে কি সব সেলাই শিখিয়ে গিয়েছেন মিসেস ম্যাকফার্সন। আর গিয়ে অবধি প্রত্যেক মাসে একটা করে চিঠি লেখেন উনি। সব কিছু লিখতে হয় সরিৎশেখরকে। এমন কি সাহেবের বাংলোর গেটের পাশে যে বাতাবি-লেবুগাছটা—সেটার কথাও। ওদিকে মেমসাহেব এখন একা। ছেলের বিয়ে দিয়েছেন। সাহেব মাছ ধরতে গিয়ে নদীতে ডুবে মারা গেছেন। এইসব ব্যাপার। বছর কুড়ি আগে তোলা মেমসাহেবের যুবতী অবস্থার একটা ছবি আছে সরিৎশেখরের কাছে। ডুডুয়া থেকে একটা বিরাট কালবোস মাছ ধরে উপহার দিয়েছিলেন তিনি সাহেবকে। মেমসাহেব সেই মাছটা দু হাতে সামনে ধরে ছবি তুলিয়ে সরিৎশেখরকে প্রেজেণ্ট করেছিলেন। কি সুন্দর দেখতে ছিলেন মেমসাহেব—পায়ের পাতা অবধি গাউন পরতেন তখন। সেই মাছ ধরতে গিয়েই সাহেব মারা গেলেন।

আজ বিকেলে হে সাহেব আফসোস করলেন, 'তুমি চলে গেলে আমি কি করে

চালাবো জানি না। কোম্পানী আর এক্সটেণ্ড করতে চাইছে না—তোমার বয়স কত হল বাবু?'

'বাষট্টি।' উত্তর দিয়েছিলেন সরিৎশেখর।

'জানি, তোমারও ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে, কি করা যাবে বল! ওয়েল, তোমার জলপাইগুড়ির বাড়ি বানাতে যা যা দরকার তুমি বাগান থেকে নিয়ে যেও।' হে সাহেব বলেছেন।

ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে? হ্যাঁ, তা হচ্ছে বইকি। এমন তো হয়নি যখন বড বউ চলে গেল। ছোট বউ যাবার সময় খুব কষ্ট হয়েছিল এখন মনে পড়ে। শোক জীবনে কম পাননি তো। বড মেয়ে বিধবা হল তেরো বছর বয়সে। এই তিন মাস আগে মেজ মেয়ে মরে গেল দুম করে বাচ্চাকাচ্চা রেখে। বড় ছেলে পরিতোষ বখাটে হয়ে কোথায় চলে গেছে—ওকে শুধরোতে পারলেন না উনি। কিন্তু এই সব দুঃখ পাওয়া কেমন সহ্যের মধ্যে ছিল। অন্য কাউকে টের পেতে দেননি। এমনিতেই সকলে বলে লোকটা পাষাণ। দয়ামায়া নেই একবিন্দু। ঠিক বুঝতে পারেন না নিজেকে উনি। কিন্তু চলে যাবার সময় যত এগিয়ে আসছে বুকের ভিতরটা তত ভার বোধ হচ্ছে কেন?

পঁয়তাল্লিশ বছর আগে উনি যখন স্বর্গছেঁড়া চা-বাগানে ছোটবাবুর চাকুরি নিয়ে এসেছিলেন তখন আসাম রোডে সন্ধ্যে হলেই বাঘ ডাকতো। সাকুল্যে দুজন বাবু ছিল এই চা-বাগানে। চা-বাগান বললে ভুল বলা হবে, তখন তো সবে চা-গাছ লাগানো হচ্ছে। তিনকড়ি মণ্ডল কুলি চালান নিয়ে আসছে রাঁচি থেকে। স্বর্গছেঁড়ার তিন রাস্তার মোড়ে চা-বিড়ি-সিগারেটের কোনও দোকান ছিল না তখন। আর আজ বেশ রমরমে চারধার। তিল তিল করে জায়গাটা শহুরে শহুরে হয়ে গেল। চা-বাগানে বাবুদের সংখ্যা বেড়েছে, তাই ছুটির ভোঁ বাজলেই কেউ আর সিটে থাকতে চায় না। আজ ভীষণ বিরক্ত হয়েছেন নতুন ছোকরাটার ওপর। গ্র্যাজুয়েট ছেলে। হে সাহেব ইণ্টারভিউ নিয়ে চাকরি দিয়েছেন। এমনিতে রোজ সবার পর বেরোন সরিৎশেখর। আজকে দেখেন অফিসারের ঘরে আলো জ্বলছে। কে আছে—কৌতূহল হল দেখার। নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে সরিৎশেখর উঁকি দিলেন। নতুন ছোকরা মনোজ হালদার মাথা ঝুঁকিয়ে ডিক্সনারী দেখছে। ওঁকে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল ছেলেটি।

'কি ব্যাপার? এখনো বাড়ি যাওনি?' সরিৎশেখর জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তো-তো করেছিল মনোজ, 'এই, মানে চিঠিটা শেষ করে—।' হাত বাড়িয়ে বাংলায় লেখা একটা চিঠি তুলে ধরেছিলেন উনি। চিঠিটা পড়ে মাথার ভিতর

দপ্ দপ্ করতে লাগল। আজ দুপুরে উনি ছোকরাকে বলেছিলেন, ফায়ারউড্ সাপ্লাই দেয় যে কণ্ট্রাক্টর, তাকে চিঠি লিখে সাবধান করে দিতে যে ওর লোকজন ঠিকমত সাপ্লাই দিচ্ছে না। মনোজ বাংলায় লিখেছে সেটা।

'বাংলায় কেন?' কোন রকমে বললেন তিনি।

'এই, ইংরেজীতে ট্রানস্লেশন করে নিচ্ছিলাম।' হাসলো মনোজ।

রাগে গা গরম হয়ে গেল সরিৎশেখরের। কি অবস্থা! একটা চিঠি লিখতে এদের কলম ভেঙে যায়, আবার গ্র্যাজুয়েট বলে ঢুকেছে! তিন মিনিটের কাজ তিন ঘণ্টায় হয় না! এই হল ইয়ং ম্যান! অথচ তিনি তো মাত্র ফার্স্ট ক্লাস অবধি পড়া বিস্তে নিয়ে এসেছিলেন। বাবা মারা যেতে পরীক্ষার ফি যোগাড় করতে পারেননি। আজ অবধি তাঁর ইংরেজীর ভুল কোনও সাহেব ম্যানেজার ধরতে পারেননি। মাত্র আট টাকা মাইনেতে ঢুকেছিলেন তিনি। এরা তো ঢুকেই আড়াইশ' টাকা হাতে পায়।

'আলোটা নিবিয়ে বাড়ি চলে যাও।' বলে বেরিয়ে এসেছিলেন তিনি। ইচ্ছে হচ্ছিল সোজা বাংলোয় গিয়ে সাহেবকে বলে সাসপেণ্ড করেন ওকে। কিন্তু অনেক কষ্টে সামলে নিয়েছিলেন নিজেকে। আর তো ক'টা দিন আছেন এখানে, মিছি-মিছি এই ছেলেটার ভবিষ্যৎ নষ্ট করার দায়ভোগ করবেন কেন? অবশ্য ভবিষ্যৎ যা নষ্ট হবার তা তো হয়েই গেছে ওর। শুধু লোকে বলবে, বুড়োটা যাবার আগে চাকরি খেয়ে গেল। বড় বড় ঝোলা সাদা গোঁফে হাত রাখলেন উনি। কোনও কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটলেই উনি আশু মুখুজ্যের মত ঠোঁটের দু পাশে ঝোলা গোঁফে অজান্তেই হাত বোলান।

অফিস থেকে বেরিয়ে আঙরাভাসার ওপর পাতা ছোট্ট পুল পেরিয়ে ফ্যাক্টরীর সামনে এলেন উনি, পেছনে বকু সর্দার। বকু প্রায় তিরিশ বছর আছে ওঁর সঙ্গে। বকুর ছেলে এবার বিনাগুড়ির মিশনারী স্কুল থেকে পরীক্ষা দেবে। কি নেশা হয়েছিল সরিৎশেখরের, জোর করে বকুর ছেলে মাংরাকে স্কুলে ভরতি করিয়ে দিয়েছিলেন। মিশনারীরা নাম রেখেছে জুলিয়েন। মদেসিয়া ছেলের সাহেব নামে বকু সর্দার কিন্তু আপত্তি করেনি। অবশ্য স্বর্গছেঁড়ায় এলে সবাই ওকে মাংরা বলেই ডাকে। তা এই ছেলে পাস করলে বাবুদের চাকরিতে নেবার জন্য বকু ওঁকে সম্প্রতি ধরেছে। ব্যাপারটা অন্য কুলিসর্দাররা কেমন চোখে দেখছে তা জানেন না সরিৎশেখর। এখন অবধি এই বাগানে কোনও লেবার-ট্রাবল হয়নি কখনো—কিন্তু বকু যেভাবে ছেলের ব্যাপারে কথা বলছে—। ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকালেন উনি। মাথায় সাদা কাপড় পাগড়ীর মত বাঁধা, হাঁটুর ওপর গুটিয়ে পরা

খাটো ধুতি, খালি গায়ে বকু একটা মোটা লাঠির ডগায় সরিৎশেখরের ব্যাগটা ঝুলিয়ে কাঁধে নিয়ে হাঁটছে। সাহেবের কানে বকুর ছেলের কথা পৌঁছেছে। ইঙ্গিতে আকারে বোঝা যায়, জুলিয়েনের চাকরি প্রায় হয়ে গেছে বললেই হয়। কেমন অস্বস্তি হতে লাগল তাঁর। ভাগিস উনি ক'দিন পরেই রিটায়ার করে যাচ্ছেন। মহীতোষরা বুঝবে পরে। বাগানের বাবুদের পোস্টে স্থানীয় ছেলে থাকলে বাইরে থেকে লোক নেওয়া চলবে না। মোটামুটি এই প্রস্তাব এতদিনে কার্যকর করেছেন সরিৎশেখর। এতে সুবিধে হল, নতুন যারা ঢোকে তাদের জন্মাতে দেখেছেন উনি, ফলে কোনও দিন মাথা তুলে কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পায়নি। এই প্রস্তাবটাকেই আঁকড়ে ধরেছে অন্যান্য চা-বাগানের কুলিরা। তারাও তাদের ছেলেমেয়েদের আগে সুযোগ দেবার দাবি জানাচ্ছে। লাঠি দিয়ে সামনের পাথরের নুড়ি সরিয়ে সরিৎশেখর হাসলেন, স্বাধীনতা এসে যাচ্ছে। ওঁর রিটায়ার করার দিন পনেরই আগস্ট।

ফ্যাক্টরীর সামনে আসতেই নতুন চায়ের গন্ধ পেলেন উনি। নিজে পঁয়তাল্লিশ বছর এখানে কাজ করে গেলেন কিন্তু চায়ের অভ্যেস কখনো হল না তাঁর। তবে এই ফ্যাক্টরীর সামনে দিয়ে যেতে তাঁর খুব ভাল লাগে। নতুন পাতার রস নিংড়ে যখন চা বাক্সবন্দী হবার চেহারা নিয়ে ফ্যাক্টরীতে স্তূপ হয়ে থাকে তখন হেঁটে যেতে যেতে নাক ভারি হয়ে ওঠে মিষ্টি গন্ধে। প্রচণ্ড একটা টানা আওয়াজ আসছে ফ্যাক্টরী থেকে। আঙরাভাসার জলে ফ্যাক্টরীর হুইলটা ঘুরছে। ডায়নামো ফিট করে ইলেকট্রিক আলো জ্বেলে দেওয়ায় জায়গাটা কেমন ম্যাড়মেড়ে দেখাচ্ছে। ফ্যাক্টরীর সামনে ডিসপেনসারী। হলুদ রঙ করা একতলা বাড়ির সামনে আলো জ্বলছে। ডিসপেনসারীর খোলা দরজা দিয়ে ডাক্তার ঘোষালকে দেখতে পেলেন উনি। একটা বাচ্চা ছেলের হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছেন। মাথা-ভরতি পাকা চুল এই লোকটির ডাক্তারী ডিগ্রী থাকুক বা না থাকুক, ওঁর দিনরাত খেটে যাবার ক্ষমতাকে শ্রদ্ধা করেন সরিৎশেখর।

'বাড়ি যাবে নাকি হে ডাক্তার?' গলাখাঁকরি দিলেন উনি।

চকিতে মুখটা ঘুরিয়ে ডাক্তার ঘোষাল বাইরের দিকে তাকালেন, তারপর দুটো হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন, 'নমস্কার, স্যার।'

'কি হে, উঠবে?'

'এই হয়ে এল, আপনি এগোন, আমি আসছি।' ডাক্তার হাসলেন।

পা বাড়ালেন সরিৎশেখর, কিন্তু এগোনো হলো না তাঁর। ডিসপেনসারীর

পাশের অন্ধকারে ঘাপটি মেয়ে কোথায় বসেছিল, ছিলা-ছাড়া তীরের মত ছিটকে এসে পড়ল সরিৎশেখরের পায়ে। এসে দুহাতে পায়ের পাতা জড়িয়ে ধরে ডুকরে উঠল, 'তুই কিনো চলি যাবি রে-এ-এ।'

হাঁ হাঁ করে উঠলেন সরিৎশেখর, কিন্তু ছাড়াতে পারলেন না। দু হাতে শক্ত করে ওঁর হাঁটু জড়িয়ে ধরেছে, মাথাটা ঠুকছে এক-একবার। লাঠিতে ভর রেখে নিজেকে সামলালেন একবার। তারপর অসহায় চোখে পেছনে দাঁড়ানো বকুর দিকে তাকালেন। হলদে দাঁত বের করে বকু হাসল। তারপর মাথা দোলালো।

'এই ওঠ, ওঠ বলছি!' হেঁকে ওঠেন সরিৎশেখর।

'তু কাঁহা যাহাতিস রে-এ-এ।' মুখ তুললো কামিনটা। একমুখ ভাঙাচোরা রেখা, মাথায় কাঁচাপাকা প্রায় নুড়ি হয়ে আসা চুল, খালি গায়ে কোন রকমে জড়ানো শাড়ি কুচকুচে কালো কামিনটার তেঁতুলের খোসার মত আঙুল সরিৎশেখরের পায়ে চেপে বসেছিল। শেষ পর্যন্ত বকু সর্দার এগিয়ে এসে মেয়েটাকে ছাড়িয়ে নিল। সরিৎশেখর দেখলেন, কোনরকমে উঠে দাঁড়ালো ও, দাঁড়িয়ে টলতে লাগল। চিনতে পারলেন এবার, তিন নম্বর কুলি লাইনের এককালের সাড়া-জাগানো কামিন, সেরা। হাঁড়িয়া টেনেছে খুব। মদেসিয়া মেয়ের নাম সেরা বিশ্বাস করতে পারেননি উনি তিরিশ বছর আগে। হপ্তা নিতে এসেছিল এক শনিবার। টিপসই নিয়ে টাকা দিচ্ছিল ক্যাশিয়ার ব্রজেনবাবু অফিসের বারান্দায় বসে। আগের শনিবার পেমেন্টের একটা গোলমাল হয়েছিল বলে সরিৎশেখর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মাথায় ফুলগোঁজা আঁটোসাটো শরীরের লম্বা এই মেয়েটাকে চোখে পড়েছিল ভিড়ের মধ্যে। ডুরে শাড়ি, লাল ব্লাউজ, আর শাড়ির ওপর হাঁটু অবধি নামা আঙরা জড়ানো শরীরটা নিয়ে রঙঢঙ করছিল মেয়েটা। অন্য সবাই যখন সরিৎশেখরকে দেখে চুপচাপ টাকা নিয়ে যাচ্ছিল, তখন এই মেয়েটা চোখ ঘুরিয়ে তিন-চারবার দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়েছিল ওঁর দিকে তাকিয়ে। ব্রজেনবাবু যখন নাম ডাকলেন তখন বুঝতে পারেননি সরিৎশেখর প্রথমটায়। মেয়েটা যখন নিতম্ব দুলিয়ে শালিক পাখির মত হেঁটে এল, তখন সরিৎশেখর ব্রজেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কি নাম বললেন?'

সঙ্গে সঙ্গে কপট শব্দ করেছিল গলায় মেয়েটা, হাত নেড়ে ব্রজেনবাবুকে নাম বলতে নিষেধ করেছিল। তারপর আচমকা হেসে উঠে বলেছিল, 'সেরা—সেরা ওঁরাও। ফাস্টো কেলাস।'

এখন কি বলবেন এই মাতালপ্রায় বুড়ী হয়ে যাওয়া সেরাকে! দুটো পায়ে শরীরের ভর ঠিক রাখতে পারছে না। টলতে টলতে বাঁ হাত ঘুরিয়ে সেরা কি

বলতে চেষ্টা করল আর একবার। তারপর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে যেন এই প্রথম বকু সর্দারকে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট বেঁকিয়ে মুখ-ভরতি থুতু মাটিতে ছিটকে ছিটকে ফেলল সেরা। সরিৎশেখর বুঝলেন, ও এখন হঠাৎ রেগে গেছে। বোধ হয় এখন সরিৎশেখর ওর মাথায় নেই। রেগে যাওয়ায় সেরার জরাজীর্ণ মুখ-চোখ আরো কদাকার দেখাচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ সেই দৃশ্যটা চোখের মধ্যে চলকে উঠল তাঁর। বকু সর্দারের বউ একসময় নালিশ করেছিল, সেরা নাকি বকু সর্দারকে নষ্ট করছে। তখনও বকু সর্দার হয়নি। অফিসে পিয়নের চাকরি করে বলে অন্য কুলিদের থেকে মর্যাদা বেশী এই যা। সেরা সম্পর্কে তখন অনেক গল্প জেনে গেছেন। দু'একজন অ্যাসিস্টেণ্ট ম্যানেজারের বাংলোয় রাতে ওকে দেখা গেছে। যারা একটু লাজুক তারা সন্ধ্যের পর অন্ধকারে রাস্তায় দাঁড়ানো সেরাকে জিপে তুলে নিযে খুঁটিমারী ফরেস্টে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে আসে। এই সব। কিন্তু মাংরার মা যখন ওঁর কাছে কেঁদে পড়ল বাড়িতে এসে তখন ছোট বউ বলেছিল, 'দূর করে দাও না মেয়েছেলেটাকে। বিশ্বাস নেই কিছু—।'

কি বিশ্বাস নেই সেটা আর জিজ্ঞাসা করেননি তিনি। চা-পাতি তুলতে গিয়ে সারাদিন সেরা গাছের তলায় পা ছড়িয়ে বসে পাতিবাবুর সঙ্গে গল্প করে এ খবর ছোট বউ-এর কানে এসেছিল। ইঙ্গিতটা যে এবার তাঁর দিকে সেটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। বকুকে ধমক দিয়েছিলেন সেদিনই—কিন্তু চুপচাপ মাথা গুঁজে দাঁড়িয়ে ছিল মাংরার বাবা। শেষ পর্যন্ত ব্রজেনবাবুকে এক শনিবার বলে রেখেছিলেন, সেরা টাকা নিতে এলে যেন ওঁর সঙ্গে দেখা করে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় তাঁর অফিস-ঘরে বসে তিনি অবাক হয়ে সেরাকে দেখলেন। কথাটা শুনেই নাকের পাটার পেতলের ফুলটা নেচে উঠল সেরার। কোমরে দু হাত রেখে মুখভরতি থুতু ছড়িয়েছিল অফিস-ঘরের মেঝেতে। চিৎকার করে বলেছিল, বকুর প্রতি ওর কোনও লোভ নেই। কি জন্যে থাকবে—ওটা তো মেড়ুয়া—না আছে টাকাপয়সা, না তাগদ। তা ছাড়া কত বড় বড় রইস আদমী ওর চারপাশে ঘুরঘুর করছে, বকুর মত তেলাপোকার দিকে নজর দেবার সময় কোথায়? এই এখন, সেরার কোমরে হাত রেখে দাঁড়ানো দড়িপাকানো চেহারাটা দেখে চট করে সেই ছবিটা মনে পড়ে গেল ওঁর। মেয়েদের এক-একটা ভঙ্গী আছে, সময় যাকে কেড়ে নিতে পারে না। বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে এবং সম্পূর্ণ নিজের অজান্তে সেগুলো তাদের শরীরে ফিরে আসে আচমকা। প্রত্যেক মেয়ের মধ্যে অভিমান এত দীর্ঘ সময় ধরে একই ভাবে গোপনে গোপনে কি আশ্চর্য সত্তায়

বেঁচে থাকে যা কোনও পুরুষমানুষ লালন করতে পারে না! কবে কোন্ যৌবনে বকুর প্রতি ওর যে অভিমান ঘৃণা বা অহংকারে মিলে-মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল, এখন এতদিন পরে নেশার চূড়ান্ত মুহূর্তে সেগুলো ফিরে পেল সেরা—পেয়ে বোধ হয় আজ সারারাত বুঁদ হয়ে থাকবে। ভরবিকেলে আচমকা ঘুম ভেঙে গেলে মনে হয় না এই সবে সকাল হয়েছে!

নিজের মনে হেসে আবার হাঁটতে লাগলেন সরিৎশেখর। পেছনে বকু সর্দার। সেরা তখনও টলছে। ওরা যে চলে যাচ্ছে সেদিকে তার খেয়াল নেই। সাদা নুড়ি বিছানো বাগানের পথ দিয়ে ওরা হাঁটতে লাগল। ফ্যাক্টরীর আলো ফুরিয়ে যেতেই টর্চ জ্বাললেন উনি। পাঁচ ব্যাটারির জোরালো আলো। ঘুটঘুটে অন্ধকার চমকে চমকে সামনের পথটা পরিষ্কার করে দিচ্ছে। দু পাশে ছোট শুকনো নালার ধারে থরে থরে চা-গাছ। রাস্তাটার বাঁকে দাঁড়িয়ে পেছনে তাকালেন উনি। দূরে ঝিম হয়ে থাকা ফ্যাক্টরীর হলদে-মেরে-যাওয়া আলোয় ডিসপেনসারি বাড়িটা আনাড়ী হাতের তোলা ছবির মত মনে হচ্ছে। আর তার সামনে একটা রোগাটে শাড়ি জড়ানো শরীর একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলছে। সরিৎশেখর লক্ষ্য করলেন, বকু পেছন ফিরে দেখল না। মাথা নীচু করে পেছন পেছন আসছে তাঁর। দু পাশের চা-গাছের মধ্যে দিয়ে চলে যাওয়া অন্ধকার রাস্তায় টর্চ জ্বেলে যেতে যেতে সরিৎশেখর হঠাৎ এক অদ্ভুত ঘ্রাণ পেলেন। ছোট বউ কবে চলে গেছে। তখন তো তাঁর মধ্যযৌবন। এই এতদিন ধরে তিনি কি ভীষণ একা! আর আশ্চর্য, কথাটা এমন করে কই কখনো মনে পড়েনি তাঁর। এই স্বর্গছেঁড়া চা-বাগানে তাঁর শিকড়গুলো কত গভীরে নেমে গেছে—নিজের কথা মনে পড়ার সুযোগই দেয়নি। এখন ছেলেরা বড় হয়ে গিয়েছে। দুটো সরল কথা বলার মত সম্পর্ক নেই আর। বড় মেয়ে বিধবা হয়ে তাঁর কাছেই আছে। ওঁর দেখাশুনা সে-ই করে। কিন্তু তাকেও তো সহজ হয়ে কিছু বলতে পারেন না তিনি। এই বয়সে নিজের চারদিকে এত রকমের দেয়াল নিজেই খাড়া করে রেখেছেন দিন দিন—আজ বড় কষ্ট হল সরিৎশেখরের। ভারি পা টেনে টেনে চা-বাগানের রাস্তা ছেড়ে কোয়ার্টারের সামনের মাঠে এলেন উনি। টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে হঠাৎ থমকে চেয়ে দেখলেন, একটা ছোট্ট শরীর সারাগায়ে তার টর্চের আলো মেখে দুর্গাঠাকুরের পায়ে ছুঁড়ে দেওয়া অঞ্জলির মত ছুটে আসছে। হঠাৎ আলো নিবিয়ে ফেললেন এবার। এই ঘন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তাঁর শরীরে লক্ষ কদম ফুটে উঠল। হিম-মাখা বাতাসে হঠাৎ তাঁর শীত বোধ হল যেন। দু হাত বাড়িয়ে নিজের বিশাল দেহে নরম শরীরটাকে প্রায় লুফে নিয়ে কি গাঢ় মমতায় তিনি জিজ্ঞাসা

করলেন, 'কি হয়েছে দাদু ?'

এখন তাঁর চারপাশে কোনও দেওয়াল নেই। আকাশ হাতের কাছে, বুকের ওপরে।

ক্লাবঘরে মাঝে মাঝে শোরগোল উঠছে। পটাপট তাস ফেলার শব্দ, এর ওর ভুল বুঝিয়ে দেবার চেষ্টায় কান পাতা দায় ওখানে। হ্যাজাকের পূর্ণ আলো দরজা জানলা দিয়ে ঠিকরে পড়েছে বাইরের অন্ধকারে। মহীতোষ ওখানে আছেন। তাস-পাগল লোক। ব্রীজ টুর্নামেন্টে আশেপাশের চা-বাগান থেকে অনেক ট্রফি জিতে এনেছেন মালবাবুকে পার্টনার করে। সরিৎশেখরের যৌবনকালে কোন ক্লাবঘর ছিল না স্বর্গছেঁড়ায়। মহীতোষরা খালি পড়ে থাকা খড়ের ছাদ দেওয়া ঘরটাকে ক্লাবঘর বানিয়ে নিয়েছেন মেরামত করে। অবশ্য স্বর্গছেঁড়া বাজারে এখন বিরাট ক্লাবঘর হয়েছে। টিম্বার মার্চেন্টস্ আর কনট্রাক্টররা এসে জাঁকিয়ে বসেছে চা-বাগানের পাশে স্বর্গছেঁড়া বাজারে। ওটা খাসহলের এলাকা। মাঝে মাঝে মহীতোষরা ঐ ক্লাবে তাস খেলতে যান। শুধু ব্রীজ নয়, পয়সা বাজি রেখে রামি, এমন কি কালীপুজোর রাত্রে তিনতাস খেলাও হয়ে থাকে ওখানে। সরিৎশেখর ব্যাপারটা একদম পছন্দ করেন না। ফলে মাঝে মাঝে ইচ্ছে হলেও রামি বা তিনতাস নিজেদের ক্লাবে খেলেন না মহীতোষরা।

অনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ক্লাবঘরের দিকে একবার তাকাল। বাবার গলা শোনা যাচ্ছে, মালবাবুকে কল ভুল দেবার জন্য বকছেন। এখন যদি অনিকে দেখতে পান, চিৎকার করে উঠবেন, কি চাই এখানে—যাও! অথচ মহীতোষকে বলার দরকার ছিল। সরিৎশেখর অনুমতি দিয়েছেন শুনে মা বলেছেন, 'বেশ যাও, বাবাকে বলে যেও।' আনন্দে লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছে করেছিল কিন্তু বাবাকে বলার ব্যাপারটা ভাল লাগেনি অনির। ক্লাবঘরে যাওয়া নিষেধ ওর। ও আবার ভিতরের ঘরে ফিরে এল। এটা সরিৎশেখরের ঘর। একপাশে খাটে বিছানা সাজানো। লম্বা ইজিচেয়ারে উনি বসে আছেন। বিরাট পেটমোটা হ্যারিকেনটা একটা স্ট্যাণ্ডের ওপর জ্বলছে। সামনে রাখা টিপয়ের ওপর একটা দাবার বোর্ড। কালো গুটি খুব পছন্দ সরিৎশেখরের। বাঁ হাতের তালুতে মুখ রেখে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন বোর্ডের দিকে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে খেলা চলতে চলতে ওঁর প্রতিদ্বন্দ্বী একটু উঠে গেছে। কিন্তু অনি জানে এটা দাদুর অভ্যেস। এই একা একা দাবা খেলা। ছোটবাবু মারা যাবার পর থেকে দাদু একাই দাবা খেলেন। আগে অফিস থেকে ফিরে হাতমুখ ধুয়ে ছোটবাবু চলে আসতেন এখানে। জলখাবার খেতেন দাদুর সঙ্গে। তারপর দাবা খেলার বোর্ড পাতা হতো। প্রায় দাদুর বয়সী মানুষ, মাথা জুড়ে

টাক, সন্ধ্যের পর আর বাঁধানো দাঁত পরতেন না বলে মুখটা বিশ্রী দেখাত। দাদুর সঙ্গে অনেক দিন এই চা-বাগানে কাটিয়েছিলেন উনি। বলতে গেলে দাদুর বন্ধু বলতে উনিই ছিলেন। খেলতে খেলতে কাশি হতো ওঁর, আর চট করে উঠে আসা কফ গিলে ফেলে দাদুর দিকে অপরাধীর ভঙ্গীতে তাকাতেন ছোটবাবু। সঙ্গে সঙ্গে বোর্ড থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে মাথা নাড়তেন সরিৎশেখর, 'নিজেই নিজের মৃত্যু ডাকছো হে, আমার কি, শুধু সন্ধ্যের পর এই খেলাটা বন্ধ হবে এই যা।' যেদিন ছোটবাবু মারা গেলেন অনির মনে পড়েছিল ঐ কফ গেলার কাথাটা। নিশ্চয়ই কফগুলো জমে জমে ছোটবাবুর পেটটা ভরতি হয়ে গিয়েছিল। সেদিন চা-বাগানের লোকজন ছোটবাবুর বাড়িতে ভেঙে পড়েছিল। অনেকদিনের মানুষ। কিন্তু সরিৎশেখর যাননি। অনিদের বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন ছোটবাবুকে কাঁধে করে মহীতোষরা। মা ঘোমটা টেনে এসে বলেছিলেন, উনি তো নেই। তারপর সন্ধ্যে পেরিয়ে গেলে ছোটবাবুকে নিয়ে ওরা অনেকক্ষণ চলে যাবার পর চোরের মত বাড়ি ফিরেছিলেন সরিৎশেখর। এক হাতে অনিকে জড়িয়ে ধরে দাবার বোর্ড পাততে পাততে সেই সবে রাত হওয়া হ্যারিকেনের আলোয় ফিস ফিস করে বলেছিলেন, 'ব্যাটা চলে গেল। বুঝলে।'

'তুমি এলে না কেন?' অনি জিজ্ঞাসা করেছিল।

'মাথা খারাপ! যদি ডাক দেয়, বলে চলো, বিশ্বাস আছে কিছু!' গুটি সাজাতে সাজাতে বললেন সরিৎশেখর। আর হঠাৎ সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল অনির। ঝাড়িকাকু বলেছিল, মানুষ মরে গেলে ভূত হয়।

এখন সরিৎশেখর একা একমনে দাবা খেলছেন। সম্প্রতি দাঁত বাঁধিয়েছেন তিনি। বাঁদিকের টেবিলে একটা পেয়ালার জলে ডুবে ওঁর খোলা দাঁত হাসছে। তোবড়ানো গাল দেখতে দেখতে অনির মনে হল ছোটবাবুর সঙ্গে দাদুর মুখের এখন কি ভীষণ মিল!৲ হঠাৎ কি হল, অনি দৌড়ে ভিতরে চলে এল। আর ঠিক তখন দূরে ফ্যাক্টরিতে আটটার ভোঁ বেজে উঠল। ঝাড়িকাকু খবর এনেছিল আটটায় নদী বন্ধ হবে।

রান্নাঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে মা বললেন, 'অনি হাওয়া দিচ্ছে খুব, চটি পরে গলায় মাফলার জড়িয়ে যাও।'

তর সইছিল না অনির। একটু একটু ঠাণ্ডা বাতাস বইছে বটে তবে তার জন্যে মাফলার পরার দরকার হয় না। মায়ের সবতাতেই বাড়াবাড়ি। অবশ্য ওর টনসিলের ধাত আছে একটু, ডাক্তারবাবু ঠাণ্ডা কিছু খেতে নিষেধ করেছেন। তাই বলে এই হাওয়ায় আর কি হবে! এপাশের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ও মায়ের দিকে

তাকাল। বারান্দার সিলিং থেকে ঝোলানো শিকে রাখা হ্যারিকেনের আলোয় মাকে কেমন দেখাচ্ছে। লাল শাড়ি পরেছে মা। কাপড়টা যেন সব আলো শুষে নিচ্ছে এখন। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অনির বুকের ভিতর কেমন করে উঠল। আস্তে আস্তে ও ভিতরের ঘরে ঢুকে আলনা থেকে মাফলারটা টেনে গলায় জড়িয়ে নিল।

ঝাড়িকাকু একটা খালুই হাতে উঠোনে দাঁড়িয়েছিল। শীত-ফিত বেশী লাগে না ওর। পুজোর পর থেকে একটা আলোয়ান ফতুয়ার ওপর জড়িয়ে নেয়। এখন যে-কে সেই। 'তাড়াতাড়ি চল।' ঝাড়িকাকু ডাকল।

উঠোনে নেমে এল অনি। পিসীমার গলা পেল ও। নিজের ছোট ঘরে বসে এতক্ষণ পুজো করছিলেন, এইবার 'গুরুদেব দয়াকর দীনজনে' বলে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর অনিকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন, 'তাড়াতাড়ি চলে আসিস বাবা, যা পচা শরীর তোর। ঝাড়িটারও খেয়েদেয়ে কাজ নেই, ছেলেটাকে নাচাল।'

ঝাড়িকাকু কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই অনি নেমে গেছে উঠোনে। ঝাড়িকাকু কি বিড়বিড় করে টর্চের আলো জ্বাললো। ছোট্ট টর্চ। প্রায়ই বিগড়োয়। ফ্যাকাশে আলো পড়েছে মাটিতে। আকাশ মেঘলা বলেই অন্ধকার বেশী লাগছে। এমন কি সামনের গোয়ালঘর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। ওরা হাঁটতে লাগল। একটু ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। অনি ঝাড়িকাকুর পিছনে যেতে যেতে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ওর ফতুয়ার কোণটা চেপে ধরল। এরকম অন্ধকারে এর আগে কোনদিন হাঁটেনি ও।

গোয়ালঘরের পেছনে লম্বা গাছগুলোর তলা দিয়ে যেতে যেতে ওরা চিৎকারটা শুনতে পেল। দ্রুত পা চালাচ্ছিল ঝাড়িকাকু। প্রায় ছুটতে ছুটতে ওরা আঙরাভাসার পাড়ে এসে দাঁড়াল। আর দাঁড়াতেই একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল অনির। পুরো নদীটা জুড়ে যতদূর দেখা যায়, সেই ধোপার ঘাট পর্যন্ত, অজস্র হ্যারিকেন আর টর্চের আলো জোনাকির মত নাচছে। আচমকা দেখলে মনে হয় যেন দেওয়ালির রাতটাকে কে উপুড় করে দিয়েছে নদীতে। সমস্ত কুলি লাইন ভেঙে পড়েছে এখানে। আঙরাভাসার দিকে তাকিয়ে কেমন বিশ্রী লাগল অনির। জল এখন পায়ের তলায়। কাপড়কাচা পাথরটা ভেজা নুড়ির ওপরে পড়ে আছে। জল মাঝখানে। তাও কমে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। লাফ দিয়ে নেমে পড়ল ঝাড়িকাকু। একটি বিরাট লম্বা বানমাছ ঠিক সামনেটায় খলবল করছিল। একটা মদেসিয়া মেয়ে মাছটার দিকে এগোবার আগেই ঝাড়িকাকু বাঁ হাতে সেটাকে তুলে খালুইতে ঢুকিয়ে নিল। মেয়েটা চিৎকার করে গাল দিয়ে উঠল। হাত বাড়িয়ে ওকে ডাকল

ঝাড়িকাকু। অনি ভেজা নুড়ির ওপর সাবধানে হেঁটে এল। পায়ের কাছে একটা পাথরঠোকা মাছ জল না পেয়ে লাফাচ্ছে। দুই-তিনবারের চেষ্টায় ওটাকে ধরে অনি ঝাড়িকাকুর খালুইতে ফেলে দিল।

'তোর তো রবারের চটি, জল লাগলে কিছু হবে না, তুই টর্চটা ধর। যেখানে ফেলতে বলবো সোজা করে আলো ফেলবি।' হাত বাড়িয়ে টর্চটা দিল ঝাড়িকাকু। জল এখন নেমে গেছে পুরোপুরি। শ্যাওলা আর ভাঙা ডালপালা নদীর বুকে ছড়িয়ে আছে এখন। মাঝে মাঝে কাদা জমেছে। স্রোতের সময় কাদা দেখা যায় না। অজস্র পোকামাকড় উড়ছে এখন। এরা সব কোথায় ছিল কে জানে। তিনটে মেয়ে দল বেঁধে হাতে কুপি জেলে মাছ খুঁজছে। অনি দেখল ওরা খুব হিহি করে হাসছে। আলো পড়ে ওদের কালো শরীর চকচক করছে। ঝাড়িকাকুকে ক্ষেপাচ্ছে ওরা। একটা গর্তের মুখে টর্চ ফেলতে বলল ঝাড়িকাকু। নদীর কিনারে চ্যাপ্টা পাথরের গা ঘেঁষে গর্তের মুখে। আলো ফেলে অনি দেখল তিন-চারটে মোটা মোটা পা গর্তের মুখে বেরিয়ে আছে। পকেট থেকে একটা শক্ত সুতো বের করে তার ডগায় একটু শ্যাওলা বাঁধালো ঝাড়িকাকু। তারপর টানটান করে সুতো ধরে শ্যাওলাটাকে গর্তের মুখে নাচিয়ে নাচিয়ে ভিতরে ঢোকাবার চেষ্টা করতে লাগল। অনি দেখল চট করে পাগুলো ভিতরে ঢুকে গেল। গর্তের মধ্যে জমা জলে একটু বুদ্বুদ উঠল। আলোটা নিবিয়ে দিল অনি। যাঃ, চলে গেল! কিন্তু ঝাড়িকাকু চাপা গলায় বলল, 'আঃ, নেবালি কেন?' আবার আলো জ্বালালো অনি। চাপা নিঃশ্বাসের শব্দ কানে যেতে অনি দেখল মেয়ে তিনটে পেছনে এসে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী চোখে ব্যাপারটা দেখছে। ঝাড়িকাকুও ওদের দেখেছে, কিন্তু এখন তার মনোযোগ গর্তের দিকে। গর্তের মুখটাতে শ্যাওলাটাকে নাচাচ্ছে এক মনে। হাত টনটন করতে লাগল অনির। মুখ ঘুরিয়ে ও নদীর চারপাশে তাকাল। আজ রাতে আর নদীতে কোন মাছ পড়ে থাকবে না। লণ্ঠন কুপি আর টর্চের আলোয় নদীটা পরিষ্কার। হঠাৎ তিনটে মেয়ে একসঙ্গে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠতেই অনি চট করে মুখ ফেরাল। ঝাড়িকাকু একগাল হেসে হাতটা মাথার ওপরে তুলে ধরেছে। আর সুতোর শেষে মাটি থেকে ওপরে একটা বিরাট কাঁকড়া থলবল করে ঝুলছে। শেষ পর্যন্ত সেটা সুতো ছেড়ে পাথরের নুড়ির ওপর পড়তেই ঝাড়িকাকু খালুইটা ওর ওপর চেপে ধরল। তারপর অতি সন্তর্পণে খালুই-এর তলা দিয়ে বেরিয়ে আসা মোটা দাড়া দুটো ধরে কাঁকড়াটাকে বের করে আনল। টর্চের আলোয় কুচকুচে কালো কাঁকড়াটাকে মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখল অনি। এত বড় কাঁকড়া এর আগে কখনো দেখেনি সে। দুটো গোল গোল চোখ ঘুরিয়ে অনিকে

দেখছে ওটা। থালুই-এর ভিতরে টপ করে ফেলে দিল ঝাড়িকাকু। কাঁকড়াটাকে দিয়ে সেই হাতে পাশে দাঁড়ানো তিনটে মেয়ের একটার চিবুকে টোকা দিয়ে দিল। টর্চের আলোটা সম্মোহিতের মত ঘুরিয়েছিল অনি। ফ্যাকাশে আলোটা মেয়েটির মুখে পড়তেই ও দেখল কেমন থতমত হয়ে গেল মেয়েটি। সঙ্গীরা খিলখিল করে হেসে উঠতেই ও লাজুক লাজুক মুখ করে মাথা নামাল।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই থালুই ভরতি হয়ে গেল। বান, কাঁকড়া, পাথরঠোকা, চিংড়ি আর পেটমোটা পুঁটি এরকম কত মাছ। ঝাড়িকাকু বলল, 'তুই এখানে দাঁড়া, আমি মাছগুলো বাড়িতে রেখে আসি।' হঠাৎ অনির কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল। এই অন্ধকারে যদিও নদীতে প্রচুর মদেসিয়া আলো জ্বেলে ঘুরছে, তবু ওর শরীর সিরসির করতে লাগল। আবছা আলো-অন্ধকারে মানুষগুলোর মুখ স্পষ্ট করে চেনা যাচ্ছে না, কেমন রহস্যময় দেখাচ্ছে চারপাশ। ওরা ওদের ঘাটে কাপড়কাচা পাথরটার ওপর ফিরে এল। অনির পায়ের গোড়ালি অবধি কাদা মাখা, রবারের চটি চপচপ করছে। ঝাড়ি-কাকুর ফতুয়া ধরে ও পাড়ের দিকে তাকাল। ফুলগাছ ডুমুরগাছ আর বুনো ফুলের গাছগুলোর মধ্যে চুপচাপ যে অন্ধকার জমে আছে সেদিকে চেয়ে ওর বুকের মধ্যে তিরতির করে উঠল। হঠাৎ একটা লম্বা মূর্তি সেই অন্ধকারে চলে গেল, পেছন পেছন আর একজন শাড়ি-পরা। মুখ দেখতে পেল না ও। মূর্তি দুটো অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কারা ওরা ? এটা তো ওদের দিকের পাড়। মদেসিয়ারা এখন নিশ্চয়ই এদিকে আসবে না। ফিসফিস করে ও বলল—'ঝাড়িকাকু।' মুখ ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাল ঝাড়িকাকু। কাঁচাপাকা সাত দিন না-কামানো দাড়ি, হাফ প্যাণ্ট আর ফতুয়া পরা বেঁটে-খাটো এই মানুষটাকে অনির এখন খুব আপন মনে হচ্ছিল। এক হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে ঝাড়িকাকু বলল, 'কি হয়েছে ?'

'ওরা কারা ?' ফিসফিস করে বলল অনি। ভাল করে অন্ধকারে চোখ বুলিয়েও কিছু ঠাওর করতে পারল না ঝাড়িকাকু। অনির হাত থেকে টর্চ নিয়ে অন্ধকারে আলো ফেলল ও। ফ্যাকাশে আলো বেশী দূরে গেল না।

'কি দেখেছিস ?' ঝাড়িকাকু জিজ্ঞাসা করল।

'একজন তারপর আর একজন। কারোর মাথা নেই।' অনি প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি।

'ও কিছু না,' ঝাড়িকাকু মাথা নাড়ল, 'রামনাম বল। ওঁরা হলে চলে যাবেন।

মাছ বড় ভালবাসেন তো।' বলতে বলতে খালুইসুদ্ধ হাত জোড়া করে নমস্কার করল। অনি মনে মনে রাম রাম বলতে শুরু করে দিল এবার। এখানে এই নদীতে এত লোক, তবু সাহস হচ্ছে না কেন ?

ঠাণ্ডা বাতাস যা এতক্ষণ বইছিলো এলোমেলো, হঠাৎ গাছের পাতা নাচিয়ে দিল এবার। না ঘুমুতে পারা পাখিগুলো নির্জন নদীতীরে হঠাৎ আসা একদল মানুষের চিৎকারে কিচিরমিচির করছিল এতক্ষণ, ডালপালা নড়ে উঠতেই ডানা ঝাপটাতে লাগল। হিমবাতাস নদীর মধ্যে নেমে একটা সোঁ সোঁ শব্দ তুলে চিরুনির মত গাছপালার ফাঁক গলে কোথায় উধাও হয়ে যাচ্ছিল। পুলওভার থাকা সত্ত্বেও অনির শীতবোধ হল।

ঝাড়িকাকু বলল, 'ডাক্তারবাবুর ছেলে হরিশ বড় মাছ খেতে ভালবাসত।' ঝাড়িকাকুর মুখের দিকে তাকাল অনি। অন্ধকার কালির মত লেপ্টে আছে। ভাল করে বোঝা যাচ্ছে না। ডাক্তারবাবুকে অনি ভাল করেই চেনে। ডাক্তারবাবু আর দিদিমা, ওদের বাড়িতে কোন ছেলেমেয়ে নেই। তাহলে কার কথা বলছে ঝাড়িকাকু! কে হরিশ! এই নামের কাউকে চেনে না তো ও।

'হরিশ কে ? আমি দেখিনি তো!' অনি বলল।

'তুই দেখবি কি করে?' হাসলো ঝাড়িকাকু, 'তুই তো এই সেদিন হলি। তোর বাবার চেয়ে বছর তিনের ছোট ছিল হরিশ। সেই যেবার ডুডুয়া নদীতে যখন খুব জল বেড়ে গেল, রাস্তার ওপর জল উঠে বাস বন্ধ হল, সেবার এই কুলগাছের মাথা থেকে ধুপ করে পড়ে গেল ছোঁড়াটা। খুব ডানপিঠে ছিল তো। আমি তখন এই ঘাটে বসে বাসন মাজছি। কাজ শেষ করে বাসন মাজতে তিনটে চারটে বেজে যেত। ভরদুপুরবেলা বাসন মাজছি বসে, হঠাৎ হরিশ এল। গাছটায় কুল হতো তখন, পাতা দেখা যেত না। তা হরিশ তলার ডালের কুলগুলো শেষ করে দিয়েছিল পাকার আগেই। হরিশ লাফ দিয়ে তরতর করে মগডালে চলে গিয়ে হাত বাড়িয়ে কুল ছিঁড়ে অর্ধেক খেয়ে আমাকে ঢিল মারছিল। ডাক্তার-বাবুর ছেলে, আমি কি বলব বল্! ঐ মগডালে বসে বসে ও আমাকে বলল, ডুডুয়াতে জল কমে গেলে বানমাছ মারতে গেলে কেমন হয় ? বানমাছ ধরার বঁড়শি আমার কাছে ছিল হরিশ জানতো। কর্তাবাবু কত-রকমের সুতো আর বঁড়শি শহর থেকে পোস্ট অফিস দিয়ে আনাতেন। আমি দুটো বঁড়শি চেয়ে নিয়ে-ছিলাম। মুশকিল হতো বানমাছ বড়দি রান্না করতে চাইতো না কিছুতেই। ধরলে খাব কি করে ? হরিশের মা রান্না করে ভাল। বড়দি বলতো, ঢাকার মেয়ে তো, তাই পারে। আমি একদিন খেয়েছিলাম, বড় ঝাল! তা আমি বললাম, 'বড়দি

যদি যেতে দেয় যাবো।' কথাটা বলে ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে অন্ধকারে দাঁড়ানো কুলগাছটার দিকে তাকাল ঝাড়িকাকু।

পিসীমাকে বড়দি বলে ঝাড়িকাকু। বাবা ছোট কাকারাও বড়দি বলে। এই সেদিন আগে পর্যন্ত শুনে শুনে অনিও বলত বড়দিপিসী। তখন কি ছোট ঠাকুমা ছিল না! না সেই কুমড়ো নিয়ে দেশের বাড়িতে গিয়েছিল বলে মরে গিয়েছিল? মা তখন ছিল না এটা বুঝতে পারছে অনি। পিসীমা বলেন, চব্বিশ বছর বয়সে বাবার বিয়ে হয়েছিল। বাবা যখন কুল খেতো তখন নিশ্চয়ই ছোট ছিল। অনি বলল, 'তারপর?'

কথা বলার সময় ঝাড়িকাকুর একটা পিতলে বাঁধানো দাঁত দেখতে পাওয়া যায়। রোজ ছাই দিয়ে দাঁত মাজে বলে চকচক করে। ঝাড়িকাকু বলল, 'বাসন মাজতে মাজতে হঠাৎ শুনতে পেলাম বুকফাটা চিৎকার। চমকে উঠে দাঁড়িয়ে দেখি হরিশ পড়ে যাচ্ছে। অত উঁচু ডাল ভেঙে পড়ে যাচ্ছে হরিশ, আমি চেয়ে চেয়ে দেখলাম। পড়ে গিয়ে কেমন দলা পাকিয়ে গেল ও। আমি চিৎকার করে সবাইকে ডেকে আনলাম। ডাক্তারবাবু দুপুরে খেতে এসেছিলেন। চিৎকার শুনে ছুটে এলেন। সাহেবের গাড়ি করে জলপাইগুড়ি নিয়ে গেল যদি বাঁচানো যায়, পাগলের মত সবাই ছুটলো ওকে নিয়ে। ডুডুয়ার জল বেড়েছে সকাল থেকে, রাস্তার ওপরে জল, এত জল আগে কখনো হয়নি। সন্ধ্যেবেলা মড়া নিয়ে ফিরে এল ওরা, যেতে পারেনি। তা হরিশ চলে যাবার তিন দিন পরই ঘটে গেল ব্যাপারটা। তখন কর্তাবাবু লোক দিয়ে এই ঘাটে খড়ের ছাউনি করে দিয়েছিলেন। বৃষ্টিবাদলায় ভিজতে হবে না বলে। সেদিন রাত্তিরে খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে বাসনগুলো নিয়ে এসেছিলাম মেজে ফেলতে। চাঁদের রাত হলে রাত্রেই বাসন মাজতাম। রাত হয়ে গেলে নদীতে কেউ আসে না। কিন্তু আমার ভয়টয় করতো না। বাসন মাজা হয়ে গেলে উঠে দাঁড়িয়েছি, হঠাৎ শুনি মাথার উপর খড়ের চালে মচমচ শব্দ হচ্ছে। এ ঘাটের ওপর তো কোন গাছপালা নেই, ব্যাপারটা কি দেখবার জন্য মুখ বাড়িয়েছি তো আমার শরীর ঠাণ্ডা। হরিশ বাঁশের চালায় পা ঝুলিয়ে বসে হাসছে। আমায় দেখে বলল, 'কি মাছের কাঁটা ফেললি রে নদীতে, কালবোস? আমায় দিবি?' কেমন খোনা খোনা শব্দ। কিন্তু একদম হরিশ। আমি একছুটে বাড়ি এসে বড়দিকে বললাম। বাসনটাসন সব রইল নদীর পাড়ে। বড়দি তক্ষুনি এক প্লেট ভাজা মাছ আমাকে দিয়ে বলল ঘাটে রেখে আসতে। আমি রাম রাম বলতে বলতে মাছ নিয়ে আবার এসে এখানে রেখে দৌড়ে ফিরে গেলাম। বাসন নেবার কথা মনে নেই। আর চালার দিকেও তাকাইনি। পরদিন সকালে দেখি বাসনগুলো তেমনি আছে,

প্লেটটাও, শুধু মাছগুলো নেই। তারপর থেকে যদ্দিন ডাক্তারবাবু পিণ্ডি দেননি ততদিন ওর মা ওর জন্যে একপ্লেট মাছ নদীর ধারে রেখে যেত। আমি অবশ্য আর সন্ধ্যের পর এখানে আসিনি।' অনিকে জড়িয়ে ধরে টর্চ জেলে হাঁটতে লাগল ঝাড়িকাকু, 'নে চল!'

এতক্ষণ হাওয়া দিচ্ছিল, এখন টুপ টুপ করে কয়েক ফোঁটা পড়ল। 'তাড়াতাড়ি পা চালা।' ঝাড়িকাকু বেশ দ্রুত হাঁটছিল। দু পাশে অন্ধকার রেখে ফ্যাকাশে আলোর বৃত্তে পা ফেলে ওরা এগিয়ে আসছিল। এখন চারপাশে শুধু বাতাসের শব্দ ছাড়া কিছু নেই। অবশ্য ঝাড়িকাকুর হাতের খালুইতে বড় কাঁকড়াটা ভীষণ শব্দ করছে। ওরা গোয়ালঘরের পাশ দিয়ে আসতে হঠাৎ কালীগাই-এর গম্ভীর গলার ডাক শুনতে পেল। যেন পরিচিত কেউ যাচ্ছে বুঝতে পেরেছে ও। জিভ দিয়ে একটা শব্দ করে সাড়া দিল ঝাড়িকাকু। অনির মনে হচ্ছিল, এখন যে কোন মুহূর্তেই হরিশ ওদের সামনে এসে হাত বাড়িয়ে মাছ চাইতে পারে। আর ঠিক তখনি অন্ধকারে একটা আকন্দ গাছের পাশে দুটো মূর্তিকে নড়ে উঠতে দেখে অনি দু হাতে ঝাড়িকাকুকে জড়িয়ে ধরল। ঝাড়িকাকুও দেখতে পেয়েছিল ওদের। খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে মাথা দোলাল একবার। তারপর অনির হাত ধরে সোজা হেঁটে খিড়কিদরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে বলল, 'তোর যা ভয়, ও তো প্রিয়।' চমকে গেল অনি। প্রিয়? মানে কাকু? কাকু এত রাত্রে ঐ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কি করছে? সঙ্গে শাড়ি-পরা মেয়েটা কে? চট করে নদীর পাড়ে দেখা দুটো মূর্তির কথা মনে পড়ে গেল ওর। অন্ধকারে মনে হয়েছিল যাদের মাথা নেই। তাহলে কাকু আর একটা মেয়ে নদীর পাড়ে গিয়েছিল মাছ ধরা দেখতে? মেয়েটা কে জানতে খুব ইচ্ছে হচ্ছিল অনির।

উঠোনে ওদের দেখেই মা আর পিসীমা একসঙ্গে বকাঝকা শুরু করলেন। পিসীমা বকছিলেন ঝাড়িকাকুকে, কেন এতক্ষণ ও অনিকে নিয়ে নদীতে ছিল, আর মা অনিকে। অনি যখন টিউবওয়েলের জলে পা ধুচ্ছে ঠিক তখন নদীর মধ্যে প্রচণ্ড শোরগোল হচ্ছে শুনতে পেল। কারা ভয় পেয়ে উত্তেজনায় চিৎকার করছে। একবার ফিরে তাকিয়ে ঝাড়িকাকু আবার ছুটে গেল অন্ধকারে টর্চ জেলে। কি হয়েছে জানতে ওরা উঠোনে এসে দাঁড়াল। উঠোনের এখানটায় অন্ধকার তেমন নেই। শিকে টাঙানো হ্যারিকেনের আলো অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। ঝাড়িকাকু চলে যেতে ওরা দেখল তিন-চারটে লণ্ঠন গোয়ালঘরের পিছন দিয়ে ছুটে ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টারের দিকে চলে গেল।

এমন সময় প্রিয়তোষ খিড়কিদরজা খুলে ভিতরে এল। পিসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে রে?'

'কি জানি।' প্রিয়তোষ হাঁটতে হাঁটতে বলল।

'তুই কোথায় ছিলি?' পিসীমা আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

চটপট পা চালিয়ে কাকু ততক্ষণে ভিতরে চলে গিয়েছে। অনি দেখল থমথমে মুখে পিসীমা মায়ের দিকে তাকালেন। মা চোখোচোখি হতেই মুখ নামিয়ে নিলেন। পিসীমা মনে মনে বিড়বিড় করে বললেন, 'বড় বেড়ে যাচ্ছে, বাবা শুনলে রক্ষে রাখবে না।'

একটু বাদেই ঝাড়িকাকু ফিরে এল হাঁপাতে হাঁপাতে। ওর কাছে শোনা গেল ব্যাপারটা। মাছ ধরার নেশায় সবাই নেমে পড়েছে নদীতে। তা ঐ লাইনের বংশী, বয়স হয়েছে বলে চোখে ভাল করে দেখে না, পা দিয়ে দিয়ে কাদা সরিয়ে পাঁকাল মাছ খুঁজছিল। কয়েকটা মাছ ধরে নেশাটা বেশ জমে গিয়েছিল ওর। হাঁড়িয়া খেয়েছে আজ সন্ধ্যে থেকে। হঠাৎ একটা লম্বা মোটা জিনিসকে চলতে দেখে মাছ ভেবে কোমরে হাত দিতেই ঘুরে দাঁড়িয়ে সেটা ছোবল মেরেছে হাতে। নেশার ঘোরে ওর কোমর ছাড়েনি বংশী। সাপটা দু'তিনটে ছোবল মারার পর খেয়াল হতেই চিৎকার করে কেঁদে উঠেছে। ততক্ষণে সাপটা অন্ধকারে লুকিয়ে পড়েছে ছাড়া পেয়ে। এখন কেউ বলছে সাপটা নিশ্চয়ই জলঢোঁড়া, বিষফিষ নেই। কেউ বলছে, ছোবল মেরেছে যখন তখন নিশ্চয়ই গোখরো। বংশী বলছে, সাপটার রঙ ছিল কুচকুচে কালো। তা নেশার চোখ বলে কথাটা কেউ ধরছে না। হাতে দু'তিনটে দড়ি বাঁধা হয়ে গেছে। হাঁটতে পারছে না বংশী। ডাক্তার-বাবুকে আনতে লোক গেছে কোয়ার্টারে।

ব্যাপারটা শুনে পিসীমা বললেন, 'জয়গুরু।' বলে অনির চিবুকে হাত দিয়ে চুমু খেয়ে নিলেন, 'তখনই বলেছিলাম নদীতে নিয়ে যাস না ঝাড়ি, যদি এই ছেলের কিছু হতো—তুমি কালই সোয়া পাঁচ আনার পুজো দিয়ে দিও মাধুরী।'

এমন সময় জুতোর আওয়াজ উঠল ভিতরের ঘরে। ঝাড়িকাকু সুড়ুৎ করে রান্নাঘরে চলে গেল। মা হাত বাড়িয়ে মাথার ঘোমটা টেনে দিলেন। সরিৎশেখর এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন। বাড়িতে বিদ্যাসাগরী চটি পরেন, আওয়াজ হয়। অনিকে বললেন, 'হ্যাঁ রে, ভবানী মাস্টার এসেছিল একটু আগে, কাল তোর স্কুলে পরীক্ষা?'

পিসীমা বললেন, 'ও তো আর ওই স্কুলে পড়ছে না, পরীক্ষা দিয়ে কি হবে!'

সরিৎশেখর বললেন, 'তা হোক, কাল পরীক্ষা দিতে যাবে ও।' বলে আর দাঁড়ালেন না।

এই সময় প্রচণ্ড কান্নার রোল উঠল নদীর ধারে। অনিকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে পিসীমা বললেন, 'কালই পাঁচসিকের পুজো দিও মাধুরী।'

শেষ পর্যন্ত রাত্রিবেলায় বৃষ্টি নামল।

খানিক আগেই ওদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গিয়েছে। দাদুর সঙ্গে বসে খাওয়া অনির অভ্যেস। খেতে খেতে দাদু বলেছিলেন, 'আজ ঢালবে, তোমরা তাড়াতাড়ি কাজকর্ম চুকিয়ে নাও।' দাদুর খাওয়ার সময় হাতপাখা নিয়ে পিসীমা সামনে বসে থাকেন। গরমকালে তো বটেই, শীতকালেও এ রকমটা দেখেছে অনি। হাতপাখা ছাড়া দাদুর খাওয়ার সময় পিসীমার বসা মানায় না। কাজ-করা উঁচু চওড়া পিঁড়িতে বসে সরিৎশেখর খান, পাশেই ছোট মাপের পিঁড়িতে অনি। আজ বাইরের হাওয়ার জন্য জানলা-দরজা বন্ধ। কাঁচের জানলা দিয়ে হঠাৎ চমকানো বিদ্যুতের আলো ঘরে এল। মা মাথায় ঘোমটা দিয়ে খাবার দিচ্ছিলেন।

পিসীমা বললেন, 'বংশীটা মরে গেল।'

আমসত্ত দুধে মাখতে মাখতে সরিৎশেখর বললেন, 'দুধটা আজ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে—কতবার বলেছি ঠাণ্ডা দুধ দেবে না।'

মা তাড়াতাড়ি একবাটি গরম দুধ নিয়ে এসে বললেন, 'একটু ঢেলে দেব। বড়দি!'

পিসীমা বললেন, 'দাও।'

সরিৎশেখর বিরাট জামবাটিটা এগিয়ে দিয়ে খানিকটা দুধ নিলেন, নিয়ে বললেন, 'কে বংশী?'

'লাইনের বংশী। আগে জল এনে দিত আমাদের।'

'কি হয়েছিল?'

'মাছ ধরতে গিয়ে লতায় কেটেছে।'

কথাটা শুনে সরিৎশেখর চট করে অনির দিকে তাকালেন, তারপর জানলা দিয়ে বাইরের দিকে। বাইরে তখন ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আলোয় আলোয় ঝলসে যাচ্ছে গাছপালা। সেই দিকে চোখ রেখে সরিৎশেখর বললেন, 'বড় ভাল মাংস কাটতো লোকটা, এক কোপে মাথা নামিয়ে দিত।'

কথাটা শুনে চট করে একটা কথা মনে পড়ে গেল অনির। সরিৎশেখর আজকাল আর মাংস খান না। বাড়িতে মাংস এলে আলাদা রান্না হয়। একদিন পিসীমা দাদুর মাংস খাওয়ার গল্প করছিলেন। যৌবনে তিন সের মাংস একাই

খেতেন উনি। মা বলেছিলেন, 'তিন সের?'

পিসীমা হাত নেড়ে বলেছেন, 'হবে না কেন? নদীর ধারে গাছে ঝুলিয়ে বংশী পাঁঠা কাটতো। তারপর সেই মাংসের অর্ধেক বাড়িতে রেখে বাকিটা অন্য বাবুদের বাড়ি বাবা দিয়ে দিতেন। আমাদের বাড়িতে তো খাওয়ার লোক তেমন ছিল না। মহী ছুটিতে বাড়ি এলে ওকে ধরলে চার-পাঁচজন। বাবাই অর্ধেক খেতেন।'

মা হেসে বললেন, 'একটা অর্ধেক পাঁঠার অর্ধেক মাংস কি করে তিন সের হয় বড়দি?'

অনিও হেসে ফেললো। পিসীমা নাকি হিসেব রাখতে পারে না—দাদু বলেন। 'সেই বাবা মাংস ছেড়ে দিল একদিন', পিসীমা বললেন, 'ভীষণ পাষাণ লোক ছিলেন বাবা। এখন কি দেখছিস, একদিন এমন জোরে বকেছিলেন যে ঝাড়ি প্যান্টে হিসি করে ফেলেছিল। গমগম করতো গলা। তখন শাক-সবজির ক্ষেতে অন্য লোকের গরু-ছাগল ঢুকলে বাবা রেগে কাঁই হয়ে যেতেন। পাঁঠা ঢুকলে বাবা ঝাড়িকে বলতেন সেটাকে ধরতে। ধরা হয়ে গেলে আমার কাছ থেকে সরষে চেয়ে নিয়ে বাবা সেটার কানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতেন। যন্ত্রণায় মরে যেতো জীবটা। তখন যার পাঁঠা তাকে বলা হতো দোষ করেছে তাই শাস্তি দিয়েছি। বাবাকে ভয় পেত সবাই, কিছু বলতো না। বংশী এসে সেই পাঁঠার মাংস কেটে বাড়ি বাড়ি দিয়ে আসতো। যার পাঁঠা তার বাড়িও বাদ যেতো না। শেষ পর্যন্ত আমি আর সরষে দিতাম না, পাপের ভাগী হবে কে? এর মধ্যে হয়েছে কি, বাগানে কে এক সন্ন্যাসী এসেছে, বাবা দেখতে গিয়ে নমস্কার করলেন। সন্ন্যাসী মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'তোর তো বহুদিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে দেখছি।'

বাবা বললেন, 'কেন, কি জন্যে?'

সন্ন্যাসী হাত নেড়ে বলেছিলেন, 'তোর গায়ে খুনীর গন্ধ।'

চুপ করে ফিরে এসেছিলেন বাবা। আর ছাগল ধরতেন না, মাংস খাওয়া ছেড়ে দিলেন শেষ পর্যন্ত। তাও ছাড়া কি—একদিন খেতে বসেছেন, মাংস দেওয়া হয়েছে। একটু মুখে দিয়েই টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। চিৎকার করে বললেন, 'মাংস রেঁধেছে না বোষ্টমী করেছে। না হয়েছে নুন না ঝাল। আর আমাকে মাংস দেবার কষ্ট তোদের করতে হবে না।' আমি তো ভয়ে ভয়ে মহীকে বললাম, 'খেয়ে ছাখ তো।' মহী বলল, 'কই, খারাপ হয়নি তো। আসলে একটা বাহানা দরকার তো, সন্ন্যাসীর কথায় ছেড়ে দিলে লোকে বলবে কি!'

এখন দাদুর শরীরের দিকে তাকালে অনির মনেই হয় না এসব হতে পারে। একমাথা পাকা চুল, ঠোঁটের দুপাশে ঝুলে থাকা সাদা গোঁফ, বিরাট বুকে মেদ কিছুটা ঝুলে পড়েছে, বাঁ হাতে সোনার তাগা আর হাঁটু অবধি ধুতি পরা এই লম্বা-চওড়া মানুষটাকে অনির বড় ভাল লাগে। দাদুর সঙ্গে রোজ শোয় ও। ছেলেবেলা থেকেই। আর শুয়ে শুয়ে যত গল্প। পিসীমা বলেন, 'শুয়ে শুয়ে ও পুটুস পুটুস করে বাবাকে সব লাগায়।' আসলে দাদু যখন রোজ জিজ্ঞাসা করেন, 'আজ কি হলো বল!' তখন কোন্ কথাটা বাদ দেবে বুঝতে না পেরে সব বলে ফেলে অনি।

আজ রাত্রে দাদুর ঘর থেকে নিজের বালিশ নিয়ে এল ও, তারপর সোজা মায়ের বিছানায় শুয়ে পড়ল। মহীতোষ খানিক আগে ক্লাব বন্ধ করে ফিরেছেন। রোজ দশটা অবধি ক্লাব চলে, আজ বৃষ্টির জন্য একটু আগেই ভেঙে গেছে। শুয়ে শুয়ে অনি দাদুর গলা শুনতে পেল, ওকেই ডাকছেন। উঠে এল ও, দরজায় দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'আমি মায়ের কাছে শোব।' বিছানায় বাবু হয়ে বসে সরিৎশেখর ওকে দেখলেন, তারপর হেসে ঘাড় নাড়লেন। আর এই সময় ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমে গেল। বাড়ির টিনের ছাদে যেন অজস্র পাথর পড়ছে, কানে তালা লেগে যাবার যোগাড়। অনি একছুটে মায়ের ঘরে ফিরে এল। বিছানায় শুয়ে বালিশে মুখ চেপে ও বৃষ্টির শব্দ শুনতে লাগল। মাঝে মাঝে শব্দ করে বাজ পডছে। মাথার পাশে কাঁচের জানলা দিয়ে বিদ্যুতের হঠাৎ-জাগা আলোয় পাশের সবজি ক্ষেত সাদা হয়ে যাচ্ছে, সেই এক পলকের আলোয় বৃষ্টির ধারাগুলো কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। সবজি ক্ষেতের মধ্যে বড় পেঁপে গাছটা হিড়িম্বা রাক্ষসীর মত হাত পা নাডছে হাওয়ার ঝাপটে। ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল অনি। তারপর কখন কেমন করে জলের শব্দ শুনতে শুনতে ও ঘুমিয়ে পড়েছিল বুঝতে পারেনি।

মহীতোষের গলা শুনতে পেয়ে ও থতমত খেয়ে গিয়েছিল। মাধুরী ওকে ভাল করে শুইয়ে দিচ্ছিলেন বলে ঘুমটা ভেঙে গেল। ওর মনে পড়ল ও আজ মায়ের ঘরে শুয়ে আছে। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে সমান তালে। চোখ একটু খুলে অনি দেখল ঘরের কোণায় রাখা হ্যারিকেনের আলো কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশে শোয়া মায়ের শরীর থেকে কি মিষ্টি গন্ধ আসছে, অনির খুব ইচ্ছে হচ্ছিল মাকে জড়িয়ে ধরে। ঠিক এমন সময় মহীতোষ হঠাৎ বললেন, 'ও আজ এখানে শুয়েছে যে!'

মাধুরী হাসলেন, কিছু বললেন না।

'কি ব্যাপার?' মহীতোষ আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

'বোধ হয় মন-কেমন করছে।' মাধুরী বললেন।

অনির বুক ভুরুভুরু করতে লাগল। এখন যদি মহীতোষ ওকে তুলে দাদুর ঘরে পাঠিয়ে দেন, তাহলে—? বাবাকে বিচ্ছিরি লোক বলে মনে হতে লাগল অনির। ওর ইচ্ছে হল মাকে আঁকড়ে ধরে।

'ঘুমিয়েছে?' মহীতোষের চাপা গলা শুনতে পেল অনি। সঙ্গে সঙ্গে ও চোখ বন্ধ করে ফেলল। মড়ার মত পড়ে থাকল অনি। ও অনুভব করল বুকের ওপর মায়ের একটা হাত এসে পড়ল। তারপর হাতটা ক্রমশ ওর চিবুক, গাল, চোখের ওপর দিয়ে আলতো করে বুলিয়ে গেল। মা বললেন, 'হুঁ।'

'বড়দি চলে গেলে তোমার অসুবিধে হবে।' মহীতোষ বললেন।

'হুঁ, এতদিনের অভ্যেস। বাড়িটা ফাঁকা হয়ে যাবে। অনি না গেলে কি আর হতো। পরে গেলেও পারত।' একটু বিষণ্ণ গলা মাধুরীর।

'না, এখনই যাক। জলপাইগুড়িতে ভাল স্কুল আছে, নিচু ক্লাস থেকে ভরতি হলে ভিতটা ভাল হবে। আমি ভাবছি, অনি হবার সময় বড়দিই তো সব করেছিল, এবার কি হবে।' একটু চিন্তিত গলা মহীতোষের, 'তুমি কি বড়দিকে বলেছ?'

'দেরি আছে তো। এই শোন, তোমার ছোট ভাই-এর বোধ হয় কিছু গোলমাল হচ্ছে।' মাধুরী বেশ মজা-মজা করে বললেন।

'কি হল আবার?' একটু নিস্পৃহ গলা মহীতোষের।

'তুমি বাবাকে বলবে না তো?'

'ব্যাপারটা কি?'

'বড়দি আজ খুব রেগে গিয়েছিল। ঝাড়িকে জিজ্ঞাসা করেছিল বড়দি। প্রিয় নদীর ঘাটে যায়নি জল বন্ধ হবার পর। অথচ ও অন্ধকারে জঙ্গলে ছিল। ঝাড়ি বলেছে, ওর সঙ্গে একটা শাড়ি-পরা মেয়ে ছিল। বোঝ!'

'শাড়ি-পরা মেয়ে? কি যা-তা বলছ!' মহীতোষ প্রায় উঠে বসলেন।

'আঃ, আস্তে কথা বল। গুদামবাবুর মেয়ে তপু।'

'ও কুচবিহারে চলে যায়নি?'

'না।'

'এইভাবে ছেলেদের মাথা খাবে নাকি?'

'তা তোমার ভাইটি যদি মাথা বাড়িয়ে দেয়, ওর দোষ কি?'

'বাবা শুনলে বাড়ি থেকে দূর করে দেবে ওকে।'

'তুমি কিছু বলো না। যার যা ইচ্ছে করুক, আমাদের কি দরকার? গুদামবাবু শুনছি মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করছে, হলে ভাল।'

'তুমি তো বলে খালাস, বাবা চলে গেলে প্রিয় এখানেই থাকবে, তখন সামলাবে কে? আমার এসব ভাল লাগে না। আসলে মেয়েটাই খারাপ, মালবাবু বলছিল কুচবিহারে ও নাকি কি গোলমাল করেছে একটা ছোঁড়ার সঙ্গে। মালবাবুর বড় শালী কুচবিহারে থাকে তো—সে-ই বলেছে। আমি প্রিয়কে বলবো সাবধান হতে।'

'না, তুমি কিছু বলবে না। যা করার বড়দিই করবে।'

কিছুক্ষণ অনি আর কিছু শুনতে পেল না। ও তপু পিসীর মুখটা মনে করল। খুব সুন্দর দেখতে তপুপিসী, গায়ের রঙ কি ফরসা। আজ নদীর ধারে আকন্দগাছের পাশে তাহলে তপুপিসীই ছিল? ও বুঝতে পারছিল কাকু আর তপুপিসী নিশ্চয়ই খারাপ কিছু করেছে, যেটা মহীতোষ পছন্দ করছেন না, দাদু শুনলে রেগে যাবেন। কি সেটা? কাকুকে ভাল লাগে না ওর। টানতে টানতে ওর কান কাকু লম্বা করে দিয়েছে। বাঁ কানটা। আয়নায় ছোট বড় দেখায় দুটো কান।

'আমি তাহলে ঘুমোলাম।' মহীতোষের গলা পেল অনি।

'হুঁ।' বলে মাধুরী অনির দিকে ফিরে শুলেন। শুয়ে এক হাতে অনির গলা জড়িয়ে ধরলেন। একটু বাদেই মহীতোষের নাক ডাকতে শুরু করল। অনির গলার কাছে মায়ের হাতের বালার মুখটা একটু চেপে বসেছিল। ধার আছে মুখটায়। ওর চিনচিন করছিল গলার কাছটা। কিন্তু তবু সিঁটিয়ে শুয়ে থাকল অনি। চোখ বন্ধ করে ও মাথার ওপর টিনের ছাদে পড়া বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে মায়ের শরীর থেকে আসা মা-মা গন্ধটার মধ্যে সাঁতার কাটতে লাগল চোরের মত। গলার ব্যথাটা কখন হারিয়ে গেল একসময় টের পেল না অনি।

পাতাবাহার গাছগুলো সার দিয়ে রাস্তার দুপাশে লাগানো, রাস্তাটা ওদের বাড়ি থেকে সোজা উঠে এসে আসাম রোডে পড়েছে। অনি দেখল বাপী আর বিশু বইপত্তর হাতে ওর জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। ওদের স্কুলে কোন য়ুনিফর্ম নেই। তবু মহীতোষ ওর জন্য সাদা শার্ট আর কালো প্যান্ট করে দিয়েছেন, অনি তাই পরে স্কুলে যায়। ওর স্কুলের অন্য ছেলেমেয়েরা যে যেমন খুশী পরে আসে। জুতো পরার চল ওদের মধ্যে নেই, অন্তত স্কুলে জুতো পরে কেউ আসে না। অনি চটি পরে যায়। মা আর পিসীমা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। সরিৎশেখর আর মহীতোষ অফিসে চলে গেছেন সকালে। একটু বাদেই জলখাবার খেতে আসার সময়। সরিৎশেখর আসেন না, বকু সর্দার এসে ওঁর খাবার নিয়ে যায়। বাড়ি থেকে বেরুবার আগে পিসীমা ঠাকুরঘরে ওকে নিয়ে গিয়ে প্রণাম করিয়েছেন।

তারপর পুজোর বেলপাতা ওর বুকপকেটে ভাল করে রেখে দিয়েছেন। অনি আজ জীবনের প্রথম পরীক্ষা দেবে। সকালে কাকু পরীক্ষার কথা শুনে বলেছে, 'যত বুজরুকি ভবানী মাস্টারের।'

আজ সকাল থেকেই কেমন পরিষ্কার সোনালি রোদ উঠেছে। গাছের পাতা এমন কি ঘাসগুলো অবধি নতুন নতুন দেখাচ্ছে। ওরা আসাম রোড দিয়ে হাঁটতে লাগল। পি. ডব্লু. ডি.-র পিচের রাস্তার দুধারে লম্বা লম্বা গাছ, যার ডালগুলো এখনও ভেজা, মাথার ওপর বেঁকে আছে। দুপুরবেলায় ছায়ায় ভরে থাকে এই রাস্তা। বাঁদরলাঠি ফল এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে।

চা-বাগানের সীমানা ছাড়ালেই হাট। দু পাশে ফাঁকা মাঠের মধ্যে মাঝে মাঝে চালাঘর করা। বাঁদিকে মাছমাংসের হাট, চালও বসে, ডানদিকে শুয়োর কাটার মাঠ। আজ অবশ্য সব ফাঁকা। রবিবার সকাল থেকে গিজগিজ করতে থাকে লোক। বাজারহাট ধূপগুড়ি থেকে হাট-বাস বোঝাই ব্যাপারীরা এসে হাজির হয় বড় বড় ঝুড়ি নিয়ে। একটু বেলায় আসে খদ্দেররা। তখন চোঙায় করে কলের গান বাজায় অনেকে। কি জমজমাট লাগে চারধার। ফাঁকা হাট দু পাশে রেখে ওরা ছোট্ট পুলের ওপর এল। দু পাশে রেলিং দেওয়া, নিচে প্রচণ্ড শব্দ করে আঙরাভাসা নদী বয়ে যাচ্ছে ফ্যাক্টরীর দিকে। পুলের ওপর দাঁড়িয়েই লকগেটটা দেখতে পাওয়া যায়। ওপাশে পুকুরের মত থৈ-থৈ জল দাঁড়িয়ে। গেটের তলা দিয়ে অজস্র ফেনা তুলে ছিটকে বেরিয়ে আসছে এধারের ধারা। বিশু বলল, 'একদিন স্নান করার সময় এখানে এসে নামবো আর আমাদের ঘাটে গিয়ে উঠবো।'

বাপী বলল, 'যাঃ, মরে যাবি একদম—কি স্রোত!'

বিশু কিছু বলল না, কিন্তু অনি ওর মুখ দেখে বুঝল বিশু নিশ্চয়ই এই রকম একদিন করবে। যা ডানপিঠে ছেলে ও। তালগাছে উঠে বাবুইপাখির বাচ্চা ধরতে চেয়েছিল একদিন। মা ভীষণ রাগ করবে বলে অনি কোনরকমে ওকে বারণ করেছে। আজ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অনির চট করে হরিশের কথা মনে পড়ে গেল। গায়ের মধ্যে সিরসির করে উঠল অনির।

পুল ছাড়ালেই ভরত হাজামের দোকান। ত্রিপলের ছাউনি দেওয়া, নিচে একটা টুল পাতা। ভরত খদ্দেরকে টুলে বসিয়ে চুল ছাঁটে। ওদের বাড়িতে মাসে দুবার যায় ভরত। দাদু দুবারই চুল ছাঁটান। কাঁঠালতলায় পিঁড়ি পেতে এক এক করে বসতে হয় ওদের। একটা কাপড় আছে ভরতের যার রঙ কোনকালে হয়তো সাদা ছিল, দাদু বলেন ওটাতে ছারপোকা আর উকুন গিজগিজ করছে।

খালি গায়ে বসে ওরা। মহীতোষ বলেন, ব্যাটা বাটিছাঁট ছাড়া আর কিছু জানে না। বুড়ো ভরত অনিকে চুল ছাঁটার সময় মজার মজার গল্প বলে। সব সময় মাথা নিচু করে বসে থাকতে পারে না ও। নড়লেই চাঁটি মারে ভরত। সঙ্গে সঙ্গে ছড়াও কাটে, 'নাচ বুড়িয়া নাচ, কান্ধে পর নাচ। হেসে ফেলে অনি। ছেলেবেলায় ছোট কাকাকেও চুল কেটে দিত ভরত। এখন তেমাথার মোড়ে যে নতুন 'মডার্ন আর্ট সেলুন' হয়েছে, ছোট কাকা সেখানে গিয়ে চুল ছাঁটিয়ে আসেন। কিন্তু চোখে কম দেখলেও সরিৎশেখরের ভরতকে ছাড়া চলে না। ছোটঠাকুমার বিয়ের সময় নাকি ভরত হাজাম ছিল।

এখন সেলুনটা ফাঁকা। ভরতের তিনপায়া কুকুরটা টুলের ওপর উঠে বসে আছে। দোকানে ভরত নেই। আর একটু এগোলেই ছোট ছোট কয়েকটা স্টেশনারী দোকান, বিলাসের মিষ্টির দোকানে বিরাট কড়াই-এ দুধ ফুটছে। এর পরেই রাস্তাটা গুলতির বাঁটের মত দু ভাগ হয়ে গিয়েছে। ঠিক মধ্যিখানে একটা বিরাট পাথরে সম্প্রতি লেখা হয়েছে গৌহাটি, নিচে বাঁদিকে একটা তীর, ডানদিকে লেখা নাথুয়া। বাঁদিকের রাস্তাটায় আর একটু গেলে জমজমাট তিনমাথার মোড়। কত রকমের দোকানপাট, রেস্টুরেন্ট, পেট্রল পাম্প, সব সময় লোক গিজগিজ করছে। ডান-দিকের রাস্তাটা ধরে এগোলেই বড় বড় কাঠের গোলা চোখে পড়ে। কাছেই একটা স-মিলে কাজ হচ্ছে। করাতটানার শব্দ হচ্ছে একটানা। ফরেস্ট অফিস এদিক-টাতেই। রেঞ্জার সাহেবের অফিসের সামনে একটা জিপ দাঁড়িয়ে আছে। ডানদিকে মিশনারীদের একটা বাগানওয়ালা বাড়ি। ওখানে মদেসিয়া ছেলেমেয়েদের অক্ষর-পরিচয় হয়। রাস্তাটা বাঁক নিতেই ছোট্ট মাঠ আর মাঠের গায়ে ওদের স্কুল।

ভবানী মাস্টার স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। এক ঘরের স্কুল। বারান্দায় মাঝে মাঝে ক্লাস নেন উনি। ওদের নতুন আসা দিদিমণি ভেতরের ঘরে ক্লাস ওয়ানদের পড়ান, ঘরের আর এক পাশে বা বারান্দায় ক্লাস টু-কে পড়ান ভবানী মাস্টার। নতুন দিদিমণি পি. ডব্লু. ডি. অফিসের বড়বাবুর বোন। কদিন আগে ভবানী মাস্টারের অসুখের সময় হতে উনি এসে স্কুল দেখাশুনা করছেন। ভীষণ গম্ভীর।

স্বর্গছেঁড়ার তালেবর মানুষজন সম্প্রতি নতুন একটা স্কুলবাড়ি তৈরী করছেন হিন্দুপাড়ার মাঠে। বেশ বড়সড় স্কুল। এই কদিন ওদের এই একচালাতেই ক্লাস হচ্ছে। মাইনেপত্তর কোন ছাত্রকে দিতে হয় না। ক্লাব থেকে চাঁদা তুলে ভবানী মাস্টারের মাইনে দেওয়া হয়। নতুন দিদিমণি এখনো মাইনে নেন না।

আসলে এই ঘরটা বারোয়ারী পুজোর জন্য বানানো হয়েছিল। দরজাটা তাই

বেশ বড়। দুর্গাপুজোর খ্যাতি আছে স্বর্গছেঁড়ার। পুজোর একপক্ষ আগে থেকে স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। বুড়ো হারাণ ঘোষ তাঁর দুই ছেলেকে নিয়ে এসে যান ঠাকুর গড়তে। সেই থেকে উৎসব লেগে যায় স্বর্গছেঁড়ায়। ভবানী মাস্টার তখন চলে যান দেশে। বাঙালদেশে। মাঝে মাঝে ওঁর কথা বুঝতে পারে না অনি। কথা না শুনলে চুল ধরে মাথা নামিয়ে পিঠের ওপর শব্দ করে যখন কিল মারেন ভবানী মাস্টার তখন বিড়বিড় করে নিজের ভাষায় কি বলেন কিছুতেই বুঝতে পারে না অনি। তবে অনি কোনদিন মারটার খায়নি। দাদু বলেন উনি ময়মনসিংহ না কি জেলার লোক। ভীষণ রাগী লোক।

ভবানী মাস্টার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওদের দেখলেন। তারপর ওরা কাছে যেতে বিশুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেড়াতে যাও বুঝি, বেশ বেশ, তা এবার ভিতরে গিয়ে আমাকে উদ্ধার করো বাবা সব।' ঘরে ঢুকে অনির মনে হল আজ সবাই কেমন যেন আলাদা, অনেকের কপালে দই-এর টিপ। ভবানী মাস্টার আজ ক্লাস ওয়ান আর টু-দের পাশাপাশি বসতে বললেন। লম্বা লম্বা ডেস্কের সঙ্গে বেঞ্চি। সামনে একটা ব্ল্যাকবোর্ড। ব্ল্যাকবোর্ডে এক দুই করে প্রশ্ন লেখা। বাঁদিকে ক্লাস ওয়ানের জন্য, ডানদিকে ক্লাস টু। আজকে ভবানী মাস্টারের গলা ভীষণ ভারী এবং রাগী লাগছিল। সবাইকে বলে দিলেন যে একটা কথা বলবে তাকে ইঁট মাথায় করে তেমাথা অবধি দৌড়ে ঘুরে আসতে হবে।

এমন সময় নতুন দিদিমণি স্কুলে এলেন। সাদা শাড়ি জামা, নাকের ডগায় তিল থাকায় সব সময় মনে হয় কিছু উড়ে এসে ওখানে বসেছে। দিদিমণি এসে প্রথমে রোলকল করলেন। তারপর ভবানী মাস্টারের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে কি বললেন। ভবানী মাস্টারের মুখটা কেমন মজার-মজার হয়ে গেল। ঘাড় নেড়ে কি যেন বলে ওদের দিকে তাকালেন, 'এখন তোমরা দিদিমণির কাছে গান করবে। একটার পর পরীক্ষা।' বলে বাইরের বারান্দায় চলে গেলেন।

গানের কথা শুনে সবাই গুনগুন করে উঠল। গোপামাসী বসেছিল অনির পাশে। অনেক বড় গোপামাসী। স্কুলে শাড়ি পরে আসতে পারে না বলে ফ্রক পরে। অনিকে গোপামাসী বলল, 'গান গাইতে আমার খুব ভাল লাগে। দেখিস গানের পরীক্ষা নেবে। তুই পারবি?'

ঘাড় নাড়ল অনি, 'না।'

'এমন কি আর, শুধু জোরে জোরে সুর করে বলবি, সে হয়ে যাবে'খন। আমি তো হাটের দিন গান শুনে শুনে শিখে গিয়েছি।' কথা বলতে বলতে চুপ করে গেল গোপামাসী। দিদিমণি ওর দিকে তাকিয়ে আছেন একদৃষ্টে। তারপর একটু

গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন উনি, 'আর কদিন বাদেই, তোমরা হয়তো জানো, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস জানো তো?'

'হ্যাঁ দিদিমণি।' পুরো ঘরটা একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল।

'স্বাধীনতা মানে আমরা আর পরাধীন থাকবো না। ইংরেজদের হুকুম আমাদের মানতে হবে না। আমরাই আমাদের রাজা।' দিদিমণি হাত নেড়ে বললেন, 'এখন সেই দিনটি হল পনেরই আগস্ট। এই পনেরই আগস্ট হবে উৎসবের দিন। আমরা স্কুলের সামনে আমাদের জাতীয় পতাকা তুলবো। শহর থেকে একজন গণ্য-মান্য লোক আসবেন তোমাদের কিছু বলতে। তখন তোমরা সবাই মিলে একটা গান গাইবে। আমাদের হাতে সময় আছে মাত্র পাঁচ দিন। এর মধ্যে তোমরা গানটা মুখস্থ করে নেবে। প্রথমে আমি গাইছি তোমরা শোন।' দিদিমণি এবার সবার দিকে তাকিয়ে নিলেন। একসঙ্গে অনেক কথা বলায় ওঁর নাকের ডগায় তিলের ওপর একটু ঘাম জমতে দেখল অনি। আঁচল দিয়ে সেটা মুছে নিলেন উনি। তারপর একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে হাতের বইটা সামনে খুলে ধরে খুব নরম গলায় গাইতে লাগলেন, ধনধান্য পুষ্পভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা……… ।'

সমস্ত ঘর চুপচাপ, গান গাইছেন গম্ভীর-দিদিমণি। এত সুন্দর যে উনি গাইতে পারেন অনি তা জানতো না। সকলে কেমন মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে, এমন কি গোপামাসীও। এক-একটা লাইন ঘুরেফিরে গাইছেন উনি, কি সুন্দর লাগছে। একসময় অনি গানের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তারপর যেই দিদিমণি কেমন করুণ করে গাইলেন—'ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি', তখন হঠাৎ অনির শরীরটা থরথর করে কেঁপে উঠল ওর হাতের লোমকূপগুলো কাঁটা হয়ে উঠল, এই মুহূর্তে মা কাছে থাকলে অনি তাকে জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ রাখতো।

দিদিমণি তখনও গেয়ে যাচ্ছেন, অনির শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছিল। ও জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। স্কুলের পেছনের রাস্তাটা চলে গেছে খুঁটিমারীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নাথুয়ার দিকে। বেশ চনমনে রোদ উঠেছে। রাস্তাটা তাই ফাঁকা। সামনের বকুলগাছটায় একটা লেজঝোলা পাখি ঘাড় ঘুরিয়ে ডাকছে। তার লেজের হলদে নীল লম্বা পালকে রোদ পড়ে চকচক করছে। পাশেই একটা লম্বা ইউ-ক্যালিপটাস গাছ। ওরা বলে সাহেবগাছ। সাহেবগাছের একদম ওপরডালে মৌচাক বেঁধেছে মৌমাছিরা। গাছের তলায় গেলেই শব্দ শোনা যায়। ওরা কি ফুলের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে? বিশু বলে, মৌচাকের মধ্যে মধু জমা আছে। গুলতি দিয়ে একদিন ভাঙবে ও মৌচাকটাকে। দিনের বেলা বলে ও পারছে না, চাক ভেঙে দিলে মৌমাছিরা নাকি ছেড়ে দেবে না। ভীষণ হুল।

অনির কোন ভাই নেই, গানটায় ভাই-এ ভাই-এ এত স্নেহ বলেছেন দিদিমণি। আচ্ছা ওর ভাই নেই কেন? পিসীমা গল্প করার সময় বলেন, তুই যখন মায়ের পেটে এসেছিলি—তেমনি একটা ভাই তো মায়ের পেটে আসতে পারে! অনি দেখল রেতিয়া সামনের রাস্তাটা দিয়ে যাচ্ছে। ওদের চেয়ে বয়সে বড়, এক নম্বর লাইনের মদেসিয়া ছেলে। ও চোখে দেখতে পায় না। অথচ পা দিয়ে দিয়ে রাস্তা বুঝে রোজ বাজারে চলে আসে। বাজারে গিয়ে মতি সিংয়ের চায়ের দোকানের সামনে পাতা বেঞ্চিতে চুপ করে বসে থাকে। মতি সিং ওকে রোজ চা খাওয়ায়। সারা মুখে বসন্তের দাগ, ছেলেটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে যাচ্ছে। হঠাৎ অনির খুব দুঃখ হল ওর জন্য। দিদিমণি যে এমন মন-কেমন-করা গান গাইছে বেচারা শুনতে পেল না। অথচ ওর খুব বুদ্ধি। এখন যদি অনি ছুটে ওর কাছে যায়, গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, এই বল তো আমি কে, সঙ্গে সঙ্গে রেতিয়া মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাবে, ওর বসন্তের দাগওয়ালা কপালে ভাঁজ পড়বে, দুটো সাদা চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইবে, তারপর হঠাৎ সব সহজ হয়ে গিয়ে ওর হলদে ছাতা লাগা দাঁতগুলোয় শিউলি ফুলের বোঁটার মত হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠবে, ও মুখ নিচু করে বলবে, 'অনি।'

একসময় গান শেষ হয়ে গেল। এত সুন্দর গান এমন কথা অনি শোনেনি আগে। ও দেখল ভবানী মাস্টার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। বোঝাই যাচ্ছে উনি গান শুনছিলেন, তাই ওঁর মুখটা অন্যরকম দেখাচ্ছিল। এর পর দিদিমণি ওদের গানটা শেখাতে আরম্ভ করলেন। গোপামাসীর গলা সবার ওপরে। এমনিতে অনি কোনদিন সবার সামনে গান গায়নি। কিন্তু আস্তে আস্তে ওর গলা খুলতে লাগল। গানের লাইনগুলোর সব মানে বুঝতে পারছিল না, এই যা।

কেমন ঘোরের মধ্যে সময়টা কেটে গেল। এক সময় দিদিমণি থামলেন। এখন টিফিন। অনি টিফিনের সময় কিছু খায় না। কেউই খায় না। দুটোয় ছুটি। বাড়ি ফিরে পিসীমার আলোচালের ভাত সুন্দর নিরামিষ তরকারি দিয়ে একসঙ্গে বসে খায়। এতক্ষণে ওর নজর পড়ল সামনের বোর্ডের দিকে। ভবানী মাস্টার প্রশ্নগুলো লিখে রেখেছেন। ও প্রশ্নগুলো পড়বার চেষ্টা করল। এখন ঘর ফাঁকা। সবাই বাইরের মাঠে রোদ্দুরে হইহই করছে। স-মিলের করাতের শব্দ এখানে আসছে। একটা কাঠঠোকরা পাখি সামনের সাহেবগাছে বসে একটানা শব্দ করে যাচ্ছে।

অনি দেখল গোপামাসী বাইরে থেকে ফিরে এল। এসে ওর পাশে বসল, 'কেমন গাইলাম রে!'

অনি হাসল। সবাই মিলে একসঙ্গে গান করেছে অথচ গোপামাসী এমন ভাব করছে যেন একাই গেয়েছে।

'আমি বড় হলে খুব বড় গায়িকা হব, জানিস, কাননবালা।'

কথাটা বলে চোখ বন্ধ করল গোপামাসী। গোপামাসী তো বড়ই হয়ে গিয়েছে। শুধু শাড়ি পরে না—এই যা।

'তুই নাকি চলে যাবি এখান থেকে?' হঠাৎ গোপামাসী বলল।

'হুঁ।'

'আর আসবি না?'

'আসবো তো। ছুটি হলেই আসবো।'

'আমার সঙ্গে দেখা করবি তো?'

'বাঃ, কেন করবো না!'

ঘাড় নিচু করে গোপামাসী বলল, 'তোরা ছেলেরা কেমন টুকটুক করে চলে যাস। আমি আখ এই এক ক্লাসে সারাজীবন পড়ে থাকলাম। পাস করলেও কি হবে, আমার তো পড়া হবে না আর।'

'নতুন স্কুল হচ্ছে, সেখানে পড়বে।' অনি বলল।

ঠোঁট ওল্টালে গোপামাসী, 'মা পড়তে দেবে না। ছোঁড়া ছোঁড়া মাস্টার আসবে যে সব। অথচ আখ ক্লাস ওয়ানের পরীক্ষা একবারে আমি পাস করে গেছি।' হঠাৎ ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে গোপামাসী বলল, 'দাঁড়া, তোর খাতাটা দে দেখি।'

কিছু বুঝতে না পেরে অনি নতুন খাতাটা এগিয়ে দিল। গোপামাসী বলল, 'আমি তো ফেল করবোই। পাস করলে তো মা বাড়ি থেকে বেরুতে দেবে না। আমি তোর পরীক্ষার উত্তর লিখে দিচ্ছি। তুই চুপ করে বসে থাক।'

অনির খুব মজা লাগল। বোর্ডের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নগুলো দেখে গোপামাসী ওর খাতায় উত্তর লিখছে। এইসব প্রশ্নের উত্তর ও জানে, কিন্তু সেগুলো লেখার হাত থেকে বেঁচে যাচ্ছে বলে ওর আনন্দ হচ্ছিল। গোপামাসী লিখছে—ও জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল আবার। ওভারসিয়ারবাবু সাইকেলে চেপে আসছেন ঠা-ঠা রোদ্দুরে খুঁটিমারীর দিক থেকে। মাথায় সোলার হ্যাট, খাকি হাফপ্যান্টের নিচে ইয়া মোটা মোটা পা। পাছা দু'টো সিটের দু পাশে ঝুলে পড়েছে। দু হাতে সামনের হ্যাণ্ডেলে শরীরের ভর রেখে চোখ বন্ধ করেই বুঝি চালাচ্ছেন। চোখ এত ছোট আর মুখটা এত ফোলা যে বোঝা যায় না তাকিয়ে আছেন না ঘুমুচ্ছেন। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দ হতেই চমকে উঠল অনি। একটা মোটা পা আকাশে

তুলে অন্যটায় নিজেকে কোন রকমে সামলাচ্ছেন ওভারসিয়ারবাবু মাটিতে ভর দিয়ে। পেছনের চাকা চুপসে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে হইহই শব্দ উঠল। মাঠে যারা খেলছিল তারা ব্যাপারটা দেখেছে। ভবানী মাস্টারের গলা শোনা গেল, অবোধ্য ভাষায় গালাগাল দিচ্ছেন বোধ হয়, সবাই হুড়মুড় করে ঘরে ফিরে এল। বিশু ছড়া কাটছিলো, 'ওভারবাবুর চাকা, চলতে গেলেই বেঁকা।'

চোরের মতন খাতাটা দিয়ে দিল গোপামাসী, 'নে, শুধু একটা পারলাম না। যা শক্ত। এতেই পাস করে যাবি।'

খাতাটা খুলে দেখল অনি। খুব সুন্দর হাতের লেখা গোপামাসীর। খাতার ওপরে ওর নাম লিখে দিয়েছে।

পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে গেল। গোপামাসী কি সব লিখছে নিজের খাতায়। লেখার ভঙ্গীতে অনি বুঝল, মন নেই। ভবানী মাস্টার একটা লম্বা বেত হাতে নিয়ে মাঝখানে বসে। সবাই মুখ নিচু করে লিখছে। ভবানী মাস্টার অনিকে দেখলেন, 'কি অনিমেষ, লিখ লিখ।'

পাশ থেকে গোপামাসীর চাপা গলা শুনতে পেল অনি, 'আরে বোকা, ছবি আঁক না পেছন পাতায়। চুপ করে বসে থাকলে ধরা পড়ে যাবি না!'

এতক্ষণে অনির ভয়-ভয় করতে লাগল। ও বুঝতে পারল ব্যাপারটা অন্যায় হয়ে গিয়েছে। আস্তে আস্তে খাতা খুলে ও পেছনের পাতায় চলে এলো। তারপর মাথা ঝুঁকিয়ে পেন্সিলে একটা গোল দাগ আঁকল। তার মধ্যে আরো দুটো গোল, গোলের মধ্যে গোল। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়াতে গোপামাসী যে উত্তরটা শক্ত বলেছিল সেটা চট করে লিখে ফেলল।

একসময় সময়টা শেষ হয়ে গেল। পরীক্ষা শেষ। সকলে এক এক করে খাতা জমা দিয়ে গেল। অনি কাছে দাঁড়াতেই ওর হাত থেকে খাতা নিলেন ভবানী মাস্টার, 'সব উত্তর দিয়েছ?'

ঘাড় নাড়তে গিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো অনি। ওর কেমন সিরসির করতে লাগল। ভবানী মাস্টারের ভাঙাচোরা মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মনে দাদুর মুখটা ভেসে উঠল। ঘাড় নাড়ল ও, 'না।'

'কোনটা পার নাই?'

হঠাৎ অনির ঠোঁট কাঁপতে লাগল। ভবানী মাস্টার একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। ঘর প্রায় ফাঁকা। সবাই চলে যাচ্ছে। দরজায় বিশু আর বাপী দাঁড়িয়ে, ওরা অনির জন্যে অপেক্ষা করছে। গোপামাসী নেই। মাটির দিকে মুখ নামাল অনি। ওর চিবুক থরথর করছিল। দু'হাত মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল

শেষ পর্যন্ত।

'কি হল—আরে কাঁদো কেন?' ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ভবানী মাস্টার।

'আমি লিখিনি—' কান্না-জড়ানো গলায় বলল অনি।

এক হাতে ওকে জড়িয়ে কাছে আনলেন ভবানী মাস্টার, 'কি লিখ নাই?'

'গোপামাসী নিজে থেকে লিখে দিয়েছে। আমি লিখতে বলিনি।' জোরে কেঁদে উঠল ও।

ডান হাতে খাতাটা খুললেন ভবানী মাস্টার। উত্তরগুলো দেখলেন। মুহূর্তে ওঁর কপালের রগ দুটো নাচতে লাগল। তারপর অনির দিকে তাকালেন, 'তুমি এগুলান দেখছ?'

ঘাড় নাড়ল অনি, 'না।'

'বাঃ, ভাল। এখন চোখ থিকা জল মোছ। গোপাটার মাথায় গোবর থাকলে সার হোত, তাও নাই। ও যা ভুল করছে তুমি তা শুদ্ধ করো। বসো।' কথাটা বলে অনির হাত ধরে সামনে বসিয়ে দিলেন উনি। তারপর দরজার দিকে তাকিয়ে বিশুদের দেখতে পেয়ে ধমক দিলেন, 'এই তোরা বাগানে থাকিস না। আয় বস, ঐ কোণায় বস। একসঙ্গে যাবি।'

অনি দেখল বিশু আর বাপী সুড়সুড় করে ভিতরে এসে বসল। ওদের দিকে না তাকিয়ে খাতাটা খুলল অনি। একটু পড়তেই ও দেখল একটা যোগ একদম ভুল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ও সেটা ঠিক করল।

শেষ পর্যন্ত ভুল ঠিক করা হয়ে গেলে ও খাতাটা ভবানী মাস্টারের হাতে দিল। চটপট দেখে নিলেন উনি। দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বাঃ, ফার্স্ট ক্লাস।'

তারপর অনির দিকে ফিরে ওকে দু হাতে জড়িয়ে ধরলেন উনি। অনি বুঝতে পারছিল না ও কি করবে। ওঁর শরীর থেকে আসা ঘামের গন্ধে, নস্যির গন্ধে অনির কষ্ট হচ্ছিল। ভবানী মাস্টার ওর মাথায় হাত বুলিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'একটা কথা মনে রাখবা বাবা, নিজের কাছে সৎ থাকলে জীবনে কোন দুঃখই দুঃখ হয় না। তুমি অনেক বড় হবা একদিন, কিন্তু সৎ থাকবা, আমাকে কথা দাও।'

কথাগুলো শুনতে শুনতে অনি আবার কেঁদে ফেলল। তারপর ঐ নস্যির গন্ধ, ঘামের গন্ধমাখা বুকে মাথা রেখে ও কান্না-জড়ানো গলায় কি বলে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

স্কুলের মাঠে বিকেলে ফুটবল খেলা হয় কিন্তু অনিদের সেখানে যাওয়া হয় না। ওদের কোয়ার্টার থেকে স্কুলের ফুটবল মাঠ অনেক দূর। তাছাড়া গেলেই যে

খেলতে পাবে এমন নয়। একদিন অনিরা গিয়ে দেখেছিল তাদের বয়সী কেউ খেলছে না। হাফ প্যান্ট বা ধুতি গুটিয়ে পরে বড় বড় মানুষ হইহই করে ফুটবল খেলছে ওখানে। তাদের বিশাল বিশাল লোমশ পা দেখে ওরা ভয়ে ফিরে এসেছিল। বাগানের কোয়ার্টারের সামনে অঢেল খোলা জমি। মাঝে মাঝে উঁচু-নিচু অবশ্য, তা ছাড়া দুটো কাঁঠালচাঁপার গাছ শক্ত হয়ে বসে আছে মধ্যিখানে —তাও খেলাটেলা যেত কিন্তু মুশকিল হল ওদের বয়সী ছেলে এই কোয়ার্টার-গুলোতে বেশী নেই। অনিদের বাতাবিলেবু গাছ থেকে গোলগাল একটা লেবু নিয়ে ওরা মাঝে মাঝে খেলে কিন্তু সেটা ঠিক জমে না।

অনিরা বাড়ির সামনের মাঠে গোল হয়ে বসে ধনধান্যে পুষ্পভরা গাইছিল। মোটামুটি কথাগুলো এখন মুখস্থ হয়ে গেছে। গান করে গাইলে যে কোন কবিতা চট করে মুখস্থ হয়ে যায়। হঠাৎ ওরা শুনলো গোঁ গোঁ করে শব্দ উঠছে সামনের রাস্তায়। সাধারণত যেসব লরি বা বাস এই রাস্তায় রোজ চলাচল করে এ শব্দ তার থেকে আলাদা। কি গম্ভীর, যেন সমস্ত পৃথিবী কাঁপিয়ে শব্দটা গড়াতে গড়াতে আসছে। খানিক বাদেই ওরা দেখতে পেল ত্রিপলে মোড়া ভারী ভারী মিলিটারি ট্রাক একের পর এক ছুটে আসছে। মুখ-থ্যাবড়া গাড়িগুলো দেখতে বীভৎস, অনেকটা ক্ষেপে যাওয়া বুলডগের মত। প্রত্যেকটা গাড়ির নাকের ডগায় সরু লোহার সিক লিকলিক করছে। ট্রাকগুলো থেকে বেখাপ্পা মত কিছু বাইরে বেরিয়ে আছে, তবে সেগুলোর ওপর ভাল করে ত্রিপল ঢাকা। তারপরই ওরা দেখতে পেল লরিভর্তি কালো কালো বিকট চেহারার মিলিটারির দল। ট্রাকে বসে হইহই করে চিৎকার করছে। এই ধরনের চেহারার মানুষ ওরা কখনও দেখিনি। এত দূর থেকেও ওদের সাদা দাঁত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ বিশু 'ওরে বাবা গো' বলে চোঁ চোঁ দৌড় দিল নিজের বাড়ির দিকে। ওর দেখাদেখি বাপীও ছুটল। মিলিটারি ট্রাক দেখলে কেউ বাড়ির বাইরে যাবে না—এরকম একটা আদেশ ছোটদের জন্যে দেওয়া আছে। কিন্তু কি করে অনিরা বুঝবে কখন ওরা আসবে! দৌড়তে গিয়ে অনি টের পেল ওর দুটো পা যেন জমে গেছে। পা ঝিনঝিন শুরু হয়ে গেল হঠাৎ। গলার কাছটায়, টনসিলের ব্যথাটাই বোধ হয়, কেমন করে উঠল। ছুটন্ত গাড়িগুলো দেখতে দেখতে ও নিজের অজান্তে ধনধান্যে পুষ্পভরা ফিসফিস করে গাইতে লাগল। আর গাইতে গাইতে ওর শরীরের সিরসিরানিটার কমে যাওয়া টের পেল। অনি অবাক হয়ে দেখল একটা গাড়ি ঠিক ওদের বাড়ির সামনে ব্রেক কষে থেমে গেছে। গাড়িটা থামতেই একটা লোক লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এল। এত লম্বা

লোক অনি কোনদিন দেখেনি, দু নম্বর লাইনের ভেটুয়া সর্দারের চেয়েও লম্বা। আর তেমনি মোটা। এদিক ওদিক মুখ ঘুরিয়ে জায়গাটা দেখে নিল লোকটা, তারপর অনিকে লক্ষ্য করে হন হন করে এগিয়ে আসতে লাগল। অনি দেখল লোকটার পিঠের পেছন থেকে ফাৎনার ডগার মত একটা কালো নল উঁকি মারছে আর একটা কিছু স্ট্র্যাপে লোকটার হাতে দোল খাচ্ছে হাঁটার তালে। ভয়ে সিঁটকে গিয়ে অনি প্রায় কান্নার সুরে ধনধান্য পুষ্পভরা বিড়বিড় করে যেতে লাগল বারংবার।

'ওয়াতার, ওয়াতার, পানি!'

অনি চোখ খুলে দেখল সামনে একটা ওয়াটারবট্‌ল ঝুলছে আর তার পেছনে পাহাড়ের মত উঁচু একটা লোক যার গায়ের রঙ মিশমিশে কালো। লোকটা হাসছে, কি সাদা দাঁতগুলো! লোকটা ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আবার বলল, 'ওয়াতার, প্লিজ।' জল চাইছে লোকটা, অনির পা দুটোয় ক্রমশ সাড ফিরে পেল। ও তাকিয়ে দেখল পেছনের সমস্ত কোয়ার্টারগুলোর জানালা দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু ওদের বাড়ির জানলায় অনেকগুলো মুখ কি ভীষণ ভয় নিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে।

এগিয়ে দেওয়া ওয়াটার বট্‌লটা হাতে নিয়ে অনি নিজের বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে ও টের পেল এখন আর একদম ভয় করছে না, বুকের মধ্যে একটুও সিরসিরানি নেই। বরং নিজেকে খুব কাজের বলে মনে হচ্ছে, বেশ বড় বড় লাগছে নিজেকে।

বারান্দায় উঠতেই দরজা খুলে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো হাত অনিকে জড়িয়ে ধরে ভেতরে টেনে নিল। সবাই মিলে বলতে লাগল, 'কি ছেলে রে বাবা, একটুও ভয় নেই, যদি ধরে নিয়ে যেত, আসুক আজ বাবা, হবে তোমার', ইত্যাদি। বেঁকেচুরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে অনি ঝাড়িকাকুর দিকে ওয়াটার বট্‌লটা এগিয়ে দিয়ে গম্ভীর মুখে বলল, 'জল নিয়ে এস শিগ্‌গীর, লোকটা দাঁড়িয়ে আছে।'

অনির গলার স্বরে এমন একটা কিছু ছিল যে, মাধুরী অবাক হয়ে ছেলের দিকে তাকালেন। অনি যে এই রকম গলায় কথা বলতে পারে মাধুরীর জানা ছিল না। ওয়াটার বট্‌লটা নিজে নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন উনি।

পিসীমা বললেন, 'হ্যাঁরে, তোকে কি বলল রে?'

অনি বলল, 'কি আর বলবে, জল চাইল।'

পিসীমা আবার বললেন, 'তোকে কি ভয় দেখাল?'

বিরক্ত হয়ে অনি বলল, 'ভয় দেখাবে কেন? জল চাইতে হলে কি তুমি ভয় দেখাও?'

এমন সময় মাধুরী ওয়াটার বট্‌লটা নিয়ে ফিরে এলেন। কম্বলে মোড়া বট্‌লটা এখন বেশ ভারী। মাধুরী জলের সঙ্গে একটা প্লেটে বেশ কিছু বাতাসা দিলেন। বাতাসাটা নিয়ে অনি মায়ের দিকে তাকাতে মাধুরী হাসলেন, 'শুধু জল দিতে নেই রে, যা।' এক হাতে জল অন্য হাতে বাতাসা নিয়ে অনি গটগট করে বাইরে বেরিয়ে এল। এই জন্যে মাকে ওর এত ভাল লাগে।

মাঠের মধ্যে গাছের মত লোকটা একা দাঁড়িয়ে ছিল। অনিকে আসতে দেখে একগাল হাসল। হাসি দেখে অনির সাহস আরো বেড়ে গেল। কাছাকাছি হতে লোকটা হাত বাড়িয়ে ওয়াটার বট্‌লটা নিয়ে বলল, 'থ্যাঙ্ক্‌।' কথাটা অনি ঠিক বুঝল না, কিন্তু ভঙ্গীতে বেশ মজা লাগল। ও বাতাসার প্লেটটা এগিয়ে ধরতে লোকটা চোখ কুঁচকে সেটাকে দেখে বলল, 'হোয়াটিজ দ্যাট?' মানেটা ধরতে না পারলেও অনি বুঝতে পারল লোকটা কি বলতে চাইছে। এখনও ওদের স্কুলে ইংরেজী শুরু হয় নি। সরিৎশেখর অবশ্য ওকে মাঝে মাঝে ইংরেজী শব্দ শেখান কিন্তু বাতাসার ইংরেজী কোনদিন শুনেছে বলে মনে করতে পারল না। বরং বাতাসা খেতে মিষ্টি, আর মিষ্টির ইংরেজী সুইট—এটা বলে দিলেই তো হয়। শব্দটা শুনে লোকটা ঠোঁট দুটো গোল কার অবাক হবার ভান করে বলল, 'হোয়াই?' অনির মুখ দেখে হাসল সে, 'নো গুড ইংলিশ? আই টু। ওকে, ওকে।' বলে এক থাবায় বাতাসাগুলো নিয়ে মুখে পুরে চিবোতে লাগল। স্বাদ জিভে যেতে লোকটার মাথা দুলতে লাগলো চিবোনোর তালে তালে। তারপর ঢকঢক করে কয়েকটা ঢোক জল খেয়ে নিতেই পেছন থেকে ট্রাকের লোকগুলো ওকে হইহই করে ডাকতে শুরু করল। অনি দেখল পেছনের লোকগুলোকে ইংরেজী নয়, অন্য কোন ভাষায় জবাব দিয়ে একহাতে অনিকে শূন্যে তুলে নিয়ে ট্রাকের দিকে হাঁটতে লাগল। লোকটার গায়ের ঘেমো বোটকা গন্ধ আর ট্রাকের একদল নিগ্রোর হইহই, পেছনের বারান্দায় বেরিয়ে আসা পিসীমার আর্ত চিৎকারে অনির শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল, ওর হাত থেকে প্লেটটা টুপ করে পড়ে গেল। ওর মনে হল ও ছেলে ধরার কবলে পড়েছে, এখন ঐ ট্রাকে চাপিয়ে পৃথিবীর কোন দূরান্তে ওকে নিয়ে যাবে ওরা। বাবা মা দাদু কাউকে কোনদিন দেখতে পাবে না ও। প্রচণ্ড আক্রোশে লোকটার চোখ দুটো দুই আঙুলে টিপে অন্ধ করে দিতে গিয়ে অনি শুনল ওকে মাথায় তুলে হাঁটতে হাঁটতে লোকটা অদ্ভুত ভাষায় ভীষণ চেনা সুরে গান গাইছে। গাইবার ধরন দেখে বোঝা যায়, খুব মগ্ন হয়ে গাইছে ও। ওর ভাষা বোঝা অসম্ভব কিন্তু সুর শুনে অনির মনে হল পুজো করার সময় পিসীমা এই রকম সুরে গুনগুন করেন। অনির হাত লোকটার স্প্রিং-এর মত চুলের ওপর এসে থেমে গেল। ট্রাকের কাছে এসে

লোকটা কিছু বলতে ট্রাকের ওপর দাঁড়ানো লোকগুলো হইহই করে উঠে হাত বাড়িয়ে অনির দিকে চার-পাঁচটা প্যাকেট এগিয়ে দিল। লোকটার কাঁধের ওপর থাকায় অনি ট্রাকের সবটাই দেখতে পাচ্ছে। একগাদা কম্বল পাতা, বন্দুক, কাচের বোতল ছড়ানো ছিটানো। প্যাকেটগুলো ওর হাতে গছিয়ে দেওয়া হয়ে গেলে লোকটা ওকে মাটিতে নামিয়ে দিল। তারপর বিরাট থাবার মধ্যে ওর মুখটা ধরে কেমন গলায় বলল, 'থাঙ্কু ইউ মাই সন।' বলে লাফ দিয়ে ট্রাকে উঠে গেল। ওয়াটার বটলটা তখন ট্রাকের ভেতর হাতে হাতে ঘুরছে।

ট্রাকটা চলে যেতে রাস্তাটা ফাঁকা হয়ে গেল। বিরাট আসাম রোড চুপচাপ—শব্দ নেই কোথাও। অনি ওর বুকের কাছে ধরা প্যাকেটগুলোর দিকে তাকাল। গন্ধ এবং ছবিতে বোঝা যাচ্ছে, এগুলো বিস্কুট এবং টফির প্যাকেট। ওরা ওকে এগুলো ভালবেসে দিয়ে গেল। অথচ ও কি ভয় পেয়ে গিয়েছিল! লোকগুলোকে ছেলেধরা বলে ভেবেছিল। হঠাৎ অনি অনুভব করল ওর প্যাণ্টের সামনেটা কেমন ভেজা-ভেজা। এক হাতে প্যাকেটগুলো সামলে অন্য হাতে জায়গাটা পরীক্ষা করে ও পাথর হয়ে গেল। ভয়ের চোটে এতক্ষণ টেরই পায়নি। অথচ লোকগুলো কত ভালো! নিজের বাড়ির দিকে তাকিয়ে ও দেখল পিসীমা মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে, পাশে ঝাড়িকাকু, অনেক পেছনে মা। হঠাৎ ওর পিসীমার ওপর রাগ হল, পিসিমাই শুধু শুধু মিলিটারিদের ছেলেধরা বলে ভয় দেখায়। অনি আর দাঁড়াল না। একছুটে মাঠটা পেরিয়ে পিসীমার বাড়ানো হাতের ফাঁক গলে মায়ের শরীর জড়িয়ে ধরল।

মাধুরী বললেন, 'কি হয়েছে?'

মাকে জড়িয়ে ধরতে মুঠো আলগা হওয়ায় অনির হাত থেকে প্যাকেটগুলো টুপটুপ করে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল। সেই অবস্থায় মায়ের বুকে মুখ গুজে অনি বলল, 'লোকটা খুব ভালো, কিন্তু মা, আমি বোকার মত হিসি করে ফেলেছি।'

•

ভরত হাজাম সরিৎশেখরের চুল কাটছিল। কাঁঠালতলার রোদ্দুরে কাঠের পিঁড়ি পেতে উনি বসেছিলেন। চুল কাটার সব সরঞ্জাম বাড়িতে রেখেছেন উনি। বারো ভূতের চুল-কাটা কাঁচি খুরে ওঁর বড় ঘেন্না, কার কি রোগ আছে বলা যায় না। ভরত তাই খালি হাতে এ বাড়িতে আসে। এমন কি কাটা চুল থেকে গা বাঁচানোর জন্যে ত্রিশ বছরের পুরোনো লং ক্লথ যেটা এই মুহূর্তে সরিৎশেখর জড়িয়ে বসে আছেন সেটাও আনতে হয় না।

কিচকিচ শব্দ উঠছিল ভরতের দুই আঙুলের চাপে। বেশীক্ষণ মাথা নিচু

করতে পারেন না বাবু, তাই মাঝে মাঝে হাত সরিয়ে নিচ্ছিল ভরত। আজ ত্রিশ বছর এই বাড়ির চুল কাটছে ও, অনেককেই জন্মাতে দেখেছে, মরতেও। বিয়ে দিয়ে এনেছে কয়েকজনকে। কিন্তু এখন আর তেমন জোর নেই ওর। কেমন করে যে ও পুরোনো হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারে না। এই বাড়ির সেজবাবু ওর কাছে চুল কাটে না। একদিন বলতেই হেসে উঠেছিল, 'কেন বাবা, আমাকে আর দয়া নাই বা করলে, তোমার বাটিছাঁট নেবার পার্টি এ বাড়িতে অনেক আছে। বাবা টু অনি। অল ফাউণ্ড দু টাকা।' মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল ভরতের, হ্যাঁ, দু টাকায় ও সবাইয়ের এমন কি ঝাড়ির চুলটাও কেটে দেয়। প্রথমে ছিল আট আনা, বছর পাঁচেক আগে বেড়ে গিয়ে দু টাকা হল।

সরিৎশেখর মাথা তুলতেই হাত সরিয়ে নিল ভরত হাজাম, 'তোর কাছে এই শেষ চুল কাটা, না?' ভরত কোন উত্তর দিল না। বাবুর চাকরি শেষ, এই বাগান থেকে শহরে বাড়ি করে বাবু চলে যাচ্ছেন। এই মাথার কালো চুলগুলো চোখের সামনে ফুলের মত সাদা হয়ে গেল—আজ ত্রিশ বছর ধরে এই মাথার চুল কেটেছে ও, আর কোনোদিন কাটতে পারবে না। লোকমুখে শুনেছে ও, বাবু নাকি এই বাগানে আর কোনদিন পা দেবেন না। কথাটা ভাবতেই বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল। পানসে চোখে জল আসতে লাগল।

হঠাৎ সরিৎশেখর বললেন, 'ভরত, যাবার সময় এই খুরকাঁচিগুলো নিয়ে যাস। খুব চাইতিস তো এককালে।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড চিৎকার করে কেঁদে উঠল ভরত। দু হাতে মুখ গুঁজে ফোঁপাতে লাগল বাচ্চা ছেলের মত।

কান্নার শব্দ শুনে সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। রান্নাঘরে অনিকে খেতে দিচ্ছিলেন মাধুরী, শব্দ শুনে এঁটো হাতে একছুটে বেরিয়ে এল অনি, পিছনে পিছনে মাধুরী। ঝাড়িকাকু ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে হাসছে। মহীতোষকে দেখে মাথায় ঘোমটা তুলে দিলেন মাধুরী। শশুরমশাই পিছন ফিরে বসে, সামনে ভরত হাজাম মাটিতে বসে কাঁদছে। একটু আগে স্নান হয়ে গেছে মহীতোষের। এই বাড়িতে লুঙ্গী পরা নিষেধ ছিল এককালে। মহীতোষ নিয়ম ভেঙেছেন। শীতকাল নয় তবু ঠাণ্ডা আছে, তাই লুঙ্গির ওপর পুরো হাতের গেঞ্জি চাপানো। অনি দেখল পিসীমা দাদুর কাছে এগিয়ে গেলেন। মহীতোষ বারান্দায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে?' সরিৎশেখর মুখ ঘুরিয়ে সবাইকে দেখলেন। অনি দেখল দাদুর মুখ কেমন অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। কী গম্ভীর! ভরত হাজামকে কি দাদু বকেছে খুব? অমন করে কাঁদছে কেন? চুল কাটার সময় ভরত এমন করে ওর ঘাড় ধরে

থাকে যেন অনিরই কান্না পেয়ে যায়। একটু নড়াচড়া করলে মাথায় গাঁট্টা মারে। আবার মন ভালো থাকলে গানও শোনায় কাঁচি চালাতে চালাতে। একটা গান তো অনিরই মুখস্থ হয়ে গেছে—'বুড্ডা কাঁদে বুড্ডি নাচে, বুড্ডা বোলে ভাগো'। মা অবশ্য খুব বারণ করে দিয়েছে গানটা গাইতে। কিন্তু বাবা দাদু বাড়িতে না থাকলে ছোটকাকু গলা ছেড়ে ঠাট্টা করে গানটা মাঝে মাঝে গায়।

সরিৎশেখর গম্ভীর গলায় বললেন, 'মহী, আমি যখন এখানে থাকবো না তখন যেন ভরতের এ বাড়িতে আসা বন্ধ না হয়।'

মহীতোষ বললেন, 'কি আশ্চর্য, বন্ধ হবে কেন?'

সরিৎশেখর বললেন, 'আর ও তো বুড়ো হয়ে গেছে, যখন চুল কাটা ছেড়ে দেবে তখনও যেন প্রতি মাসে টাকাটা দেওয়া হয়।'

মহীতোষ হাসলেন, 'আচ্ছা।'

পিসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও বাবা, এই জন্যে ভরত কাঁদছে?'

সরিৎশেখর মাথা নাড়লেন, না। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে হেঁকে উঠলেন, 'আয় বাবা ভরত, বাকি চুলটা কেটে দে, আমি সারাদিন বসে থাকতে পারব না।'

বাঁধাছাঁধা শেষ। টুকিটাকি যাবতীয় জিনিসপত্র পিসীমা জড়ো করেছেন। চিরকালের জন্য যেন স্বর্গছেঁড়া ছেড়ে চলে যাওয়া—এই যে মাধুরী মহীতোষরা এখানে থাকছেন এ কথাটা আর মনে নেই। শহরে গিয়ে অসুবিধে হতে পারে বলে পুরো সংসারটা তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন পিসীমা। অনির জামাকাপড় বাক্সে তোলা হয়ে গিয়েছে। সময়টা যত গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে অনির বুকের ভেতর তত কি খারাপ লাগছে! অথচ দাদুর মুখ দেখে মোটেই মনে হচ্ছে না, এখান থেকে যেতে একটুও খারাপ লাগছে। এই চা-বাগান নাকি দাদু নিজের হাতে তৈরি করেছেন। দাদুর তো বেশী মন-কেমন করা উচিত। বরং দাদু চলে যাচ্ছে শুনে এত যে লোকজন দেখা করতে আসছে, তাদের সঙ্গে বেশ হেসে হেসে দাদু কথা বলছেন। মাঝে আর একটা দিন। পনেরই আগস্ট। তার পরদিনই চলে যেতে হবে এখান থেকে। বাগান থেকে দুটো লরি দেবে মালপত্র নিয়ে যেতে—আজ অবধি অনি শহরে যায়নি কথনো।

•

অন্ধকারে অনি চারপাশে চোখ বোলাল। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এখন রাত ক'টা! ভোর পাঁচটার সময় বিশু আর বাপী ওদের বাড়ির সামনে আসবে। রাত্রে শোওয়ার সময় মাধুরী অনির জন্য সাদা শার্ট কালো প্যান্ট ইস্ত্রি করিয়ে রেখে দিয়েছেন। পাঁচটা বাজতে আর কত দেরি! অনির মোটেই ঘুম আসছিল

না। ওর বুকের ওপর মাধুরীর একটা হাত নেতিয়ে পড়ে আছে। ওপাশে মহীতোষের নাক ডাকছে। কান খাড়া করে অনি কিছুক্ষণ শুনতে চেষ্টা করল বৃষ্টির শব্দ হচ্ছে কিনা। যাক্ বাবা, বৃষ্টি হচ্ছে না। কাল সারাটা দিন যদিও রোদের দিন গেছে, তবু সন্ধ্যেনাগাদ মেঘ-মেঘ করছিল। হঠাৎ মাধুরীর হাতটা একটু নড়ে উঠতে অনি চমকে উঠল। মাধুরীর শরীর থেকে অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধটা বেরুচ্ছে। আর এক দিন একটা রাত—মায়ের বুকে মুখ গুঁজে দিতে মাধুরীর ঘুম ভেঙে গেল। জড়ানো গলায় বললেন, 'আঃ, ঠেসছিস কেন?' আর সঙ্গে সঙ্গে অনি শুনতে পেল কে যেন তার নাম ধরে বাইরে ডাকছে। তড়াক করে উঠে পড়ল ও। মাধুরী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হল?' অনি বলল 'ওরা এসে গেছে।' অনি দেখল, ওর গলা শুনে মহীতোষের নাক ডাকা থেমে গেল। বাবার ঘুমটা অদ্ভুত, অনি ঠিক বুঝতে পারে না।

পাটভাঙা জামাপ্যান্ট, বুকে কাগজের গান্ধীর ছবি পিন দিয়ে এঁটে, হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে বীরের মত পা ফেলে অনি বাইরের ঘরে এসে থমকে দাঁড়াল। বাইরের ঘরের জানলা খুলে দেওয়া হয়েছে। দরজাও খোলা। বাইরে এখনও আলো ফোটেনি। অন্ধকারটা ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে। সেই ফ্যাকাশে অন্ধকারটা ঘরময় জুড়ে রয়েছে। ঘরের একপাশে ইজিচেয়ারে সরিৎশেখর চুপচাপ বসে আছেন। অনির পায়ের শব্দে উনি মুখ ফিরিয়ে ওকে দেখলেন। দাদু এভাবে বসে আছেন কেন? দাদু কি কাল রাত্রে ঘুমোননি। দাদুর মুখটা অমন দেখাচ্ছে কেন? হাত বাড়িয়ে সরিৎশেখর অনিকে ডাকলেন, 'কোথায় চললে?'

'স্কুলে। আজ আমাদের স্বাধীনতা দিবস।' অনি বলল।

'স্বাধীনতা মানে জানো?' সরিৎশেখর বললেন।

'হ্যাঁ, আমরা নিজেরাই নিজেদের রাজা এখন।' অনি শোনা কথাটা বলল।

'গুড। গো অ্যাহেড। এগিয়ে যাও।' পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন সরিৎশেখর।

ওকে দেখে বিশু বলল, 'তাড়াতাড়ি চল, আরম্ভ হয়ে গেল বলে।'

বাপী বলল, 'কাল রাত্রে তোদের রেডিওটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, না?'

অনি বলল, 'জানি না তো।'

বাপী বলল, 'কাল বারোটার সময় সবাই রেডিও শুনতে গিয়ে দেখে খারাপ হয়ে গিয়েছে। বাবা বাড়ি ফিরে বলল।' অনি ব্যাপারটা জানে না, ও শুনেছিল রাতে রেডিওতে নাকি কি সব বলবে, কিন্তু ওদের রেডিওটাই খারাপ হয়ে গেল, যাঃ।

দেরি হয়ে গেছে বলে ওরা দৌড় শুরু করল। আসাম রোডের দু পাশে সার দিয়ে দাঁড়ানো পাইন-দেওদার গাছের শরীরে অন্ধকার ঝুপসি হয়ে বসে আছে।

রাস্তাটা এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পুব দিকটায় একটা লালচে আভা এসেছে। ওরা তিনজন পাশাপাশি তিনটে পতাকা সামনে ধরে দৌড়চ্ছিল। হাওয়ায় পতাকা তিনটে পতপত করে উড়ছে; একটু শীতের ভাব থাকলেও বেশ আরাম লাগছে ছুটতে। অনির ভারী ভালো লাগছিল। আজ আমরা নিজের রাজা নিজে। দৌড়তে দৌড়তে বাপী চিৎকার করল, 'পনেরই আগস্ট', ওরা চিৎকার করে জবাব দিল, 'স্বাধীনতা দিবস'। এখন এই রাস্তার চারপাশে কেউ জেগে নেই। নির্জন আসাম রোডের ওপর ছুটে চলা তিনটে বালকের চিৎকার শুনে একরাশ পাখি দুদিকের গাছের মাথায় বসে কলবল করে জানান দিল। ভারতবর্ষের কোন এক কোণে এই নিঝুম প্রান্তরে সাতচল্লিশ সালের পনেরই আগস্টের এই ভোর-হতে-যাওয়া সময়টায় তিনটে বালক কি বিরাট দায়িত্ব নিয়ে পতাকা উঁচু রেখে দৌড়তে দৌড়তে গান ধরল, ওদের একটিমাত্র শেখা গান, 'ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।' দৌড়বার তালে অনভ্যস্ত গলার সুর ভেঙেচুরে যাচ্ছে, তবু দু পাশের প্রকৃতি যেন তা অঞ্জলির মত গ্রহণ করছিল।

স্কুলবাড়ির কাছাকাছি এসে ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল। এখনও আলো ফোটেনি, কিন্তু কষ্ট করে অন্ধকার খুঁজতে হয়। ওরা দেখল একটি মূর্তি খুব সতর্ক পাযে রাস্তার এক পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। বিশু বলল, 'রেতিয়া না রে?'

ওরা তিনজন তিন পাশে গিয়ে দাঁড়াতে রেতিয়া চমকে সোজা হয়ে দাঁড়াল, মুখটা ছুঁচলো করে অন্ধ চোখ দুটো বন্ধ করে কিছু টের পেতে চেষ্টা করল। গলা ভারি করে অনি জিজ্ঞাসা করল, 'কাঁহা যাহাতিস রে!'

চট করে উত্তর এল, 'স্কুল।' ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল, তারপর আবার দৌড় শুরু করল। অনি ঠিক বুঝতে পারছিল না রেতিয়ার কাছে কি করে খবর গেল যে আজ স্বাধীনতা-দিবস। স্বাধীনতা মানে আমি নিজেই নিজের রাজা। রাজার ইংরেজী কিং। বাবারা তাস খেলার সময় কিংকে সাহেব বলে। আমরা আজ থেকে সব সাহেব হয়ে গেলাম। রেতিয়া পর্যন্ত।

স্কুলের মাঠটা এই সাতসকালে প্রায় ভরে গেছে। ওদের বাগান থেকে মাত্র ওরা তিনজন কিন্তু ওপাশের বাজার, হিন্দুপাড়া কলিন পার্ক থেকে ছেলেমেয়ের দল এসে মাঠটা ভরিয়ে দিয়েছে। স্কুলের সামনে একটা লম্বা বাঁশ পোঁতা হয়েছে যার ডগা থেকে এ৲টা দড়ি নিচে নামানো। পাশে টেবিলের ওপর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর ছবি। এই নামটা অনি সবে শিখেছে। এত বড় নাম মনে না থাকলে গান্ধীজী বলা যেতে পারে, নতুন দিদিমণি বলেছেন। ভবানী মাস্টারকে দেখে

অবাক হয়ে গেল ও। খোপভাঙা ধুতি পাঞ্জাবি পরলেও অনেককে ভাল দেখায় না, ভবানী মাস্টারকেও কেমন দেখাচ্ছে! তার ওপর মাথায় সাদা নৌকো টুপি। সুভাষচন্দ্র বসুর ছবিতে দেখেছে ও। নতুন দিদিমণি গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন পাশে। টেবিলের ওপাশে দুটো চেয়ার, একটাতে ব্যানার্জি স-মিলের বড় কর্তা, অন্যটাতে মোটা মতন একটা লোক নৌকো টুপি পরে বসে ঘড়ি দেখছেন মাঝে মাঝে।

অনিরা ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে গেল। স্বর্গছেঁড়ার বেশ বড় বড় কয়েকজন ছেলে যারা স্কুলে পড়ে না তারা ভিড় ম্যানেজ করছিল। পূর্বদিকটা ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। ব্যানার্জি স-মিলের বড়কর্তা ভবানী মাস্টারকে ডেকে ফিসফিস করে কি বলতে ভবানী মাস্টার হাত তুলে সবাইকে শান্ত হতে বললেন। গোলমাল থেমে যেতেই নতুন দিদিমণি চিৎকার করে উঠলেন, বন্দে-এ-এ মাতরম্।' সঙ্গে সঙ্গে কয়েকশ' শিশুর গলায় উল্লাস উঠল, 'বন্দে-এ মাতরম্।' তিনবার এই ধ্বনিটা উচ্চারণ করে অনির মনে হল ওদের চারপাশে অদ্ভুত একটা ফুলের দেওয়াল তৈরি হয়ে গেছে। ভবানী মাস্টার চিৎকার করে উঠলেন, 'তোমরা জান, আজ ইংরেজের দাসত্ব মোচন করে আমরা স্বংধীন হয়েছি। দু'শ' বছর পরাধীনতার পরে আমাদের ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, গান্ধীজীর জন্যে আজ এই দেশে স্বাধীনতা এসেছে।' নতুন দিদিমণি ফিসফিস করে কিছু বলতেই ভবানী মাস্টার বললেন, 'হ্যাঁ, এই সঙ্গে সুভাষ বোসের নাম ভুলে গেলে চলবে না। স্বাধীনতার এই পুণ্যদিনে আমরা সমবেত হয়েছি। তোমরা যারা এখনও নাবালক তারা শোন, এই দেশটাকে ছিঁড়ে শুষে নষ্ট করে দিতে চেয়েছে ইংরেজরা। এই দেশটাকে নিজের মায়ের মত ভেবে নিয়ে তোমাদের নতুন করে গড়তে হবে। বল সবাই বন্দে মাতরম্।' অনিরা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল, 'বন্দে মাতরম্।' অনি দেখল ভবানী মাস্টারের চোখ থেকে জল নেমে এসেছে, তিনি মোছার চেষ্টা করছেন না। সেই অবস্থায় ভবানী মাস্টার বললেন, 'তাকিয়ে ছাখো পূর্ব দিগন্তে সূর্যদেব উঠেছেন। এই মহালগ্নে আমাদের স্বর্গছেঁড়ার আকাশে প্রথম জাতীয় পতাকা উড়বে। শহর থেকে বিশিষ্ট জননেতা শ্রীযুক্ত হরিবিলাস রায় মহাশয় আজ আমাদের এখানে এসেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অবদানের কথা আমরা সবাই জানি। আমি তাঁকে অনুরোধ করছি এই পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণ করতে।' সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে। কোথাও কোন শব্দ নেই। স্বর্গছেঁড়ার মানুষের জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে যার গুরুত্ব সম্পর্কে কেউ হয়তো কোনদিন সচেতন ছিল না। এখন এই মুহূর্তে সবাই উন্মুখ হয়ে দাঁড়িয়ে।

হরবিলাসবাবু দাঁড়ালেন, সামনের জনতার ওপর ওঁর বৃদ্ধ চোখ দুটো রাখলেন খানিক, তারপর খুব পরিচ্ছন্ন গলায় বললেন, 'আজ সেই মুহূর্ত এসেছে যার জন্য আমরা সারাজীবন সংগ্রাম করেছি। গান্ধীজীর অনুগামী আমি, আমাদের সংগ্রাম শান্তির জন্য, ভালবাসার জন্য। কিন্তু আমার তো বয়স হয়েছে। এই পতাকা আমার যৌবনের স্বপ্ন ছিল, একে আমি আমার রক্তের চেয়ে বেশী ভালবাসি। আজ এই পতাকা মাথা উঁচু করে আকাশে উড়বে—এই দৃশ্য দেখার জন্যই আমি বেঁচে আছি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, এই পতাকা আকাশে তোলার যোগ্যতা আমার নেই। এই পতাকা তুলবে আগামীকালের ভারতবর্ষের দায়িত্ব যাদের ওপর তারাই। সাতচল্লিশ সালের পনেরই আগস্টের এই সকাল তাদের সারাজীবন দেশ গড়ার কাজে শক্তি যোগাবে। তাই আমি আগামীকালের নাগরিকদের মধ্যে একজনকে এই পতাকা তোলার জন্য আহ্বান করছি।' সবাই অবাক হয়ে কথাগুলো শুনলো। হরবিলাসবাবু কয়েক পা এগিয়ে এসে সামনের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ ছোট ছোট ছেলেদের মুখের ওপর, কাকে ডাকবেন তিনি ভাবছেন। হঠাৎ অনি দেখল হরবিলাসবাবু তার দিকে তাকিয়ে আছেন। খানিকক্ষণ দেখে তিনি আঙুল তুলে অনিকে কাছে ডাকলেন। অনি প্রথমে বুঝতে পারেনি যে তাকেই ডাকা হচ্ছে। বোঝা মাত্রই ওর বুকের মধ্যে ঢুকঢুক শুরু হয়ে গেল। হাঁটুর তলায় পা দুটোর অস্তিত্ব যেন হঠাৎই নেই। বাপী ফিসফিস করে বলল, 'তোকে ডাকছে, যা।'

হরবিলাসবাবু ডাকলেন, 'তুমি এস ভাই।'

কি করবে ভেবে না পেয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল অনি। স্বর্গছেঁড়ার ছেলেমেয়ের দল অনির দিকে তাকিয়ে আছে। হরবিলাসবাবু এক হাতে অনিকে জড়িয়ে ধরে পতাকার কাছে নিয়ে গেলেন। ভবানী মাস্টার বাঁশের গায়ে জড়ানো দড়িটা খুলে অনিকে ফিসফিস করে বললেন, 'এইদিকের রশিটা টানবা, পুঁটলিটা একদম ডগায় গেলে রশিটা জোরে নাচাবা।'

অনি সম্মোহিতের মত মাথা নাড়ল। হরবিলাসবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম কি ভাই?'

'অনি, অনিমেষ।'

হরবিলাসবাবু সোজা হয়ে সামনের দিকে তাকালেন, 'আপনারা সবাই প্রস্তুত হোন। এখন সেই ব্রাহ্মমুহূর্ত, আমাদের জাতীয় পতাকা স্বাধীন ভারতের আকাশে মাথা উঁচু করে উড়বে। তাকে তুলে ধরছে আগামীকালের ভারতবর্ষের অন্যতম নাগরিক শ্রীমান অনিমেষ।' কথাটা শেষ হতেই ভবানী মাস্টার ইঙ্গিত করে অনিমেষকে দড়িটা টানতে বললেন।

দু হাতে হঠাৎ যেন শক্তি ফিরে পেল অনি, সমস্ত শরীরে কাঁটা দিচ্ছে, মা কোথায়—মা যদি দেখত, অনি দড়িটা ধরে টানতে লাগল। এ পাশের দড়ি বেয়ে একটা রঙিন পুঁটলি উঠে যাচ্ছে, ওদিকে দড়ি নেমে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে হরবিলাসবাবু চিৎকার করে উঠলেন, 'বন্দেমাতরম্।' সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গছেঁড়া কাঁপিয়ে চিৎকার উঠল, 'বন্দেমাতরম্'। চিৎকারটা থামছে না, একের পর এক ডাকের নেশায় সবাই পাগল, সেই সঙ্গে শঙ্খ বাজতে লাগল। নতুন দিদিমণি ব্যাগ থেকে শঙ্খ বের করে গাল ফুলিয়ে সেই ডাকের সঙ্গে মিলিয়ে সেই শঙ্খধ্বনি করতে লাগলেন। অনি তাকিয়ে দেখল পুঁটলিটা ওপরে উঠে গেছে। দড়িটা ধরে ঝাঁকুনি দিতেই চট করে সেটা খুলে গিয়ে ঝুরঝুর করে কি সব আকাশ থেকে অনির মাথার ওপর ঝরে পড়তে লাগল। অনি দেখল একরাশ ফুলের পাপড়ি ওর সমস্ত শরীর ছুঁয়ে নিচে পড়ছে আর সকালের বাতাস মেখে প্রথম সূর্যের আলো বুকে নিয়ে তিনরঙা পতাকা কী দারুণ গর্বে দোল খাচ্ছে। চারধারে হইহই চিৎকার, এ ওকে জড়িয়ে ধরছে আনন্দে, কারো কোন কথা শোনা যাচ্ছে না। ওপরের ঐ গর্বিত পতাকার দিকে তাকিয়ে অনির মনে হল ও এখনও ছোট, পতাকাটা ওর নাগালের অনেক বাইরে।

সরিৎশেখর ফেয়ারওয়েল নিতে রাজী হলেন না। পনেরই আগস্টের দুপুরে হে সাহেব নিজে গাড়ি চালিয়ে সরিৎশেখরের কাছে এলেন। সরিৎশেখর তখন বারান্দায় বেতের চেয়ারে অনিকে নিয়ে বসে ছিলেন। আজ স্বর্গছেঁড়ায় অনি একটা খবর হয়ে গিয়েছে। হরবিলাসবাবু অনিকে দিয়ে প্রথম জাতীয় পতাকা তুলিয়েছেন, এই কথাটা সবার মুখে মুখে ঘুরছে। পতাকা তোলার পর ছবি তোলা হয়েছে অনিকে সামনে রেখে। ভবানী মাস্টার বলেছেন ছবিটা বাঁধিয়ে স্কুলের বারান্দায় টাঙিয়ে রাখবেন। খবরটা শুনে সরিৎশেখর সেই যে অনিকে সঙ্গে রেখেছেন আর ছাড়তেই চাইছেন না।

হে সাহেবের বাড়ি স্কট্‌ল্যাণ্ডে। চা-বাগানের ম্যানেজারি করে গায়ের রঙটা সামান্য নষ্ট হলেও আচার-আচরণে পুরো সাহেব। গাড়ি থেকে নামতেই সরিৎশেখর উঠে দাঁড়ালেন। এই দীর্ঘ বছরগুলো চা-বাগানে কাজ করে তিনি অনেক বিদেশী ম্যানেজারের সংস্পর্শে এসেছেন এবং তাঁদের মধ্যে কেউ তাঁর বিরুদ্ধে অসৌজন্যের অভিযোগ করতে পারেননি। ম্যাকফার্সন সাহেব একসময় অভিযোগ করতেন সরিৎশেখর কংগ্রেসীদের সঙ্গে বেশি মেশামেশি করছেন, হিন্দু-মুসলমান গণনার সময় তিনি কংগ্রেসকে সাহায্য করেছেন, কিন্তু সেটা ছিল তাঁদের অন্তরঙ্গ ব্যাপার। এ নিয়ে ম্যাকফার্সন সাহেব ওপরতলায় কোনদিন রিপোর্ট করেননি।

'হ্যালো বড়বাবু।' হে সাহেব হাসলেন, হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন। সরিৎশেখর করমর্দন করে সাহেবকে চেয়ারে বসালেন। হঠাৎ অনির ভবানী মাস্টারের কথা মনে পড়ে গেল। ইংরেজ সাহেবরা আমাদের দেশটাকে ছিঁড়ে শুষে নিয়ে চলে গেছে। সবাই তো যায়নি, এই হে সাহেব তো এখনও দাদুর সামনের চেয়ারে বসে হাসছেন। দাদু ওঁর সঙ্গে অমন ভালভাবে কথা বলছে কেন? আজ তো আমরা নিজেরাই নিজেদের রাজা। বড খারাপ লাগছিল অনির।

হে সাহেব বললেন, 'আমি খবর পেলাম, তুমি নাকি ফেয়ারওয়েল নিতে রাজী হচ্ছো না!' বাংলা বলেন সাহেব, ভাঙা-ভাঙা, তবে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। কথাটা বলার সময় সাহবের মুখ-চোখ খুব গম্ভীর দেখালো।

সরিৎশেখর হাসলেন, 'আমাকে তোমরা তাডিয়ে দিতে চাইছ?'

সাহেব বললেন, 'সে কি, একথা কেন বলছ? এই টি-এস্টেট তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। ফেয়ারওয়েল মানে কি তাডিয়ে দেওয়া?'

সরিৎশেখর হাসলেন, 'দ্যখো সাহেব, আমি জানি এই বাগানের সবাই আমাকে ভালোবাসে। আজ সবাই আমাকে ভাল ভাল কথা বলে উপহার দেবে এবং আমি সেগুলো নিয়ে চুপচাপ চলে যাব, ব্যাপারটা ভাবতে খুব অস্বস্তি লাগছে।'

সাহেব বললেন, 'কিন্তু এটাই তো প্র্যাকটিস।'

খুব ধীরে ধীরে সরিৎশেখর বললেন, 'আজ আমাদের ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে। দু'শ বছর পর তোমাদের হাত থেকে ক্ষমতা ফিরে পেয়েছি। এমন দিনে আমাকে ফেয়ারওয়েল দিও না, নিজেকে বড় অক্ষম মনে হবে। আমাকে তো বেঁচে থাকতে হবে!'

হে সাহেব সরিৎশেখরের দিকে কিছুক্ষণ স্থির চোখে তাকালেন, তারপর মাথা নিচু করলেন, 'আই আণ্ডারস্টাণ্ড। তবে আমরা তো কমন পিপল, ওয়েল, তোমার ফেয়ারওয়েলে যদি আমি না থাকি তাহালে তোমার আপত্তি আছে?'

চট করে উঠে দাঁড়ালেন সরিৎশেখর, উঠে এসে হে সাহেবের হাত জড়িয়ে ধরলেন, 'কি বলছ সাহেব! আমি তোমাকে হেয় করতে চাইনি। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কের মধ্যে আমি বিশ্বাস করি কোন তিক্ততা নেই। তোমার পূর্বপুরুষ আমার পূর্বপুরুষের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল, তার জন্যে তুমি দায়ী হবে কেন? তুমি তো জান আমি অ্যাকটিভ পলিটিক্স কোনকালে করিনি। আর আমি জানি এখন ভারতবর্ষের যাঁরা নেতা হবেন তাঁদের সঙ্গে আমাদের মত সাধারণ মানুষের কোন যোগাযোগ থাকবে না। তবু আজ আমাদের স্বাধীনতা দিবস - এটা একটা আলাদা ফিলিংস—আমার মনে হচ্ছে আমি যৌবনে ফিরে গিয়েছি—

তুমি ফেয়ারওয়েল দিয়ে আমাকে বুড়ো করে দিও না।'

হে সাহেব উঠে দাদুর একটা হাত ধরে গাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলেন, পেছনে অনি। হে সাহেব বললেন, 'বাবু, এবার বোধ হয় আমাকে দেশে ফিরে যেতে হবে। কোম্পানী ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়ায় হয়তো বিজনেস করতে চাইবে না। সো, আমাদের হয়তো আর কোনদিন দেখা হবে না। বাট, আমি চিরকাল এই দিনগুলো মনে রাখবো, আমি জানি তুমিও ভুলবে না।'

দাদু কিছু বললেন না। সাহেব গাড়িতে উঠে অনির দিকে তাকালেন, তারপর হাত নেড়ে বললেন, 'কনগ্রাচুলেশন, আওয়ার ইয়ং হিরো।'

গাড়িটা চলে যেতে অনি দাদুর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। দাদুর পাশে দাঁড়ালে ওর নিজেকে ভীষণ ছোট লাগে। সরিৎশেখর নাতির কাঁধে হাত রেখে হাঁটতে লাগলেন হঠাৎ। পায়চারি করে বেড়াবার মত ওঁরা আসাম রোডে এসে পড়লেন। অনি দেখছিল, দাদু কোন কথা বলছেন না, মুখটা গম্ভীর। বাড়ির সবাই ওঁকে খুব ভয় করে কিন্তু অনির সঙ্গে উনি এরকম মুখ করে থাকেন না। অনেকক্ষণ থেকে সাহেব সম্পর্কে একগাদা জিজ্ঞাসা অনির মনে ছটফট করছিল। হাঁটতে হাঁটতে সে বলল, 'দাদু, সাহেবকে তুমি কিছু বললে না কেন?'

সরিৎশেখর আনমনে বললেন, 'কেন, কি বলব?'

অনি অবাক হল, 'কেন? ওরা আমাদের দেশটাকে ছিঁড়ে শুষে নষ্ট করে দেয়নি?'

সরিৎশেখর চমকে নাতির দিকে তাকালেন, 'ও বাবা, তুমি এসব কথা কোত্থেকে শিখলে! নিশ্চয়ই ভবানী মাস্টার বলেছে?'

ঘাড় নাড়ল অনি, 'হ্যাঁ, বল না মিথ্যে কথা না সত্যি কথা?'

দু দিকে মাথা দোলালেন সরিৎশেখর, 'মিথ্যে নয় আবার সবটা সত্যি নয়। শোন ভাই, কেউ কাউকে নষ্ট করতে পারে না। সাহেবরা যখন এসেছিল আমরা ওদের হাতে দেশটাকে তুলে দিয়েছিলাম; ওরা নিজেদের স্বার্থে দেশটাকে ব্যবহার করবেই। কিন্তু হাতের পাঁচ আঙুল কি সমান? কেউ কেউ তো অত্যাচারী নাও হতে পারে। যেমন ধর এই হে সাহেব, ওরা যে আমাদের প্রভু, আমরা যে পরাধীন তা কোনদিন ওঁর ব্যবহারে টের পাইনি। যেই আমরা স্বাধীন হলাম অমনি সব সাহেব খারাপ হয়ে গেল তা বলি কি করে?'

দু পাশে বড় বড় দেওদার, শাল তাদের ডালপালা দিয়ে আকাশ ঢেকে রেখেছে, ছায়া-ছায়া পথটায় ওঁরা হাঁটছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে সরিৎশেখর বললেন, 'আজ যদি তুমি কলকাতায় থাকতে তা হলে কত কি দেখতে পেতে। কত উৎসব হচ্ছে

সেখানে। আমরা তো এখানে কিছুই বুঝতে পারি না, আজ অবধি এই স্বর্গছেঁড়ায় একদিনও আন্দোলন হয়নি। এখানকার বাগানের কুলিকামিনরা স্বাধীনতা মানেই জানে না। বরং আজ যদি সাহেব চলে যায় ওরা কাঁদবে। কিন্তু কলকাতা হল এই দেশের প্রাণকেন্দ্র, আমাদের ফুসফুসের মত। কত আন্দোলন হয়েছে সেখানে, কত মানুষ মরেছে পুলিসের গুলিতে।'

'কেন, মরেছে কেন? পুলিস কেন গুলি করবে?' অনি বলল।

হাসলেন, সরিৎশেখর, 'তুমি যে জামাটা পরে আছ, কেউ যদি সেটা চায় তুমি দিয়ে দেবে?

'কেন দেব? আমার জামা আমি পরব।'

'কিন্তু ধর জামাটা একদিন তার ছিল, তুমি পেয়ে গেছ বলে পরছ, তা হলে? তুমি ভাবছ এখন এটা তোমার সম্পত্তি কিন্তু সে ওটা ফিরিয়ে নেবে বলে ঝামেলা করছে, ব্যাস, লেগে যাবে লড়াই।'

অনি বলল, 'জামাটা যদি আমার না হয় তাহলে আমি ফিরিয়ে দেব।'

মাথা নাড়লেন সরিৎশেখর, 'সেটাই উচিত, কিন্তু বড়রা এই কথাটা বোঝে না।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ হেঁটে যাওয়ার পর অনি বলল, 'আমাকে কলকাতায় নিয়ে যাবে দাদু?'

নাতির দিকে তাকালেন সরিৎশেখর, 'কলকাতায় তুমি একদিন যাবেই দাদু। তবে যেদিন যাবে নিজে নিজে যাবে, কারোর সঙ্গে যেও না।'

অনি বলল, 'কেন?'

সরিৎশেখর বললেন, 'এখন তো তুমি ছোট, আরো বড় হও তখন বুঝবে। শুধু মনে রেখো, কলকাতায় যখন তুমি যাবে তখন যোগ্যতা নিয়ে যাবে। তোমাকে তার জন্য সাধনা করতে হবে, মন দিয়ে পড়াশুনা করতে হবে। অনেক বড় নেতা হবে তুমি—স্বাধীন দেশের মাথা উঁচু-করা নেতা।'

দাদুর কথাগুলো ঠিক ঠিক বুঝতে পারছিল না অনি। তবে ভেতরে ভেতরে অদ্ভুত একটা শিহরণ বোধ করছিল ও। আজ ভোরবেলায় ছুটে যেতে যেতে বন্দেমাতরম্ বলে চিৎকার করার সময় যে ধরনের গাঁয়ে-কাঁটা-ওঠা কাঁপুনি এসেছিল ওর হঠাৎ সেই রকম হল। এই নির্জন রাস্তায় দাদুর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে অনি মনে মনে চিৎকার করে যেতে লাগল, 'বন্দেমাতরম্'।

কখন যেন ভোর হয়ে গেল, ঝকমকে রোদ উঠল কিন্তু স্বর্গছেঁড়া চা-বাগানের

ফ্যাক্টরীতে আজ ভোঁ বাজল না। কিন্তু একটি ছুটি করে মদেসিয়া ওঁরাও মানুষের দল ঘর ছেড়ে বেরুতে লাগল। সরিৎশেখরের কোয়ার্টারের সামনে যে বিরাট মাঠটা চাঁপা গাছ বুকে নিয়ে রয়েছে তার এক কোণে এসে চুপচাপ বসে থাকল।

কখন যেন ভোর হয়ে গেল, সরিৎশেখর নিজেই টের পাননি। কদিন থেকেই রাতের বেলা এলে তাঁর ঘুম চলে যায়। একা একা এই ঘরে জানলা দিয়ে বাইরের অন্ধকারে চোখ রেখে তিনি অদ্ভুত সব ছবি দেখতে পান। খোলা চোখ কখন দৃষ্টিহীন হয়ে মনের মত করে কিছু চেহারা তৈরী করে দেখতে শুরু করে দেয়। যাবার সময় যত এগিয়ে আসছে তত এটা বাড়ছে, চোখ তত সাদা হয়ে থাকছে। চূড়ান্ত হয়ে গেল আজ রাতটায়। কাল সেই খাওয়া-দাওয়া চুকে গেলে শুয়েছেন বিছানায়, এই রোদ-ওঠা সময় অবধি ঘুমই এল না।

কান্নাকাটির ধাত সরিৎশেখরের কোনকালেই ছিল না। বরং খুব কঠোর বা নিষ্ঠুর বলে একটা কুখ্যাতি ছিল ওঁর সম্বন্ধে। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে স্বর্গছেঁড়া ছেড়ে চলে যাবার সময় এরকম কেন হচ্ছে! সারাটা জীবন এখানে কাটিয়ে নতুন জায়গায় যাবার অস্বস্তিতে? নতুন জায়গায় যেতে তিনি নিজেই চেয়েছিলেন, কর্মহীন হয়ে এই স্বর্গছেঁড়ায় থাকতে কিছুতেই চান না তিনি। তা হলে? কাল রাত্রে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন উনি। উঠোনের লিচু গাছটার মাথায় অন্ধকার জমে গিয়ে ঠিক বড় বউ-এর পেছন ফিরে চুল খুলে দাঁড়াবার মূর্তি হয়ে গিয়েছে। চমকে গিয়েছিলেন তিনি। সে কত বছর আগের কথা। বড় বউ-এর মুখটা এখন আর মনে পড়ে না। চোখ ভাবতে গেলে চিবুকের ভোলটা হারিয়ে যায়, নাকটা খুব টিকোলো ছিল না মনে আছে কিন্তু সব মিলিয়ে পুরো মুখটা যে যে কিছুতেই মনে পড়ে না। অনির মুখের দিকে তাকালে হঠাৎ হঠাৎ বড় বউ-এর মুখটা চলকে ওঠে। মহীতোষ বড় বউ-এর ছেলে, কিন্তু মায়ের কোন ছায়া ওর মধ্যে নেই। আবার মহীতোষের ছেলেকে দেখে সরিৎশেখরের কেন যে বড় বউ-এর কথা মনে আসে কে জানে! তা সেই অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া বড় বউকে কাল রাত্রে অন্ধকারমাখা লিচু গাছটা ঠিক আস্ত ফিরিয়ে এনে দিল। রাত্রে শোবার আগে হ্যারিকেনের দিকে তাকিয়ে চুল আঁচড়াতো বড় বউ। পিছন থেকে সরিৎশেখর তার মুখ দেখতে পেতেন না, চুঁইয়ে আসা আলো খোলা চুলের ধারগুলোয় গুটিসুটি মেরে থাকত। ঠিক সেই রকম হয়েছিল কাল রাতে লিচু গাছটার।

কিন্তু বড় বউকে নিয়ে কিছু ভাবতে গেলেই যা হয় তাই হয়েছিল। হুড়মুড় করে ছোট বউ এসে যায়। ছোট বউ একদম স্পষ্ট। কুড়ি বছর আগের সেই ছটফটে চেহারা বড় বউ-এর ঠাণ্ডা এবং অস্পষ্ট চেহারাকে লহমায় মুছে দেয়। বড়

বউ-এর সময় ছবি তোলা সম্ভব হয়নি। স্বর্গছেঁড়ায় ফটোর দোকান ছিল না। ছোট বউ-এর সময় সরিৎশেখর নিজে বইপত্তর পড়ে ছবি তোলা এবং তার ওয়াশ-প্রিন্টিং শিখে নিয়েছিলেন। এখন এই কোয়ার্টারের দেওয়ালে ছোট বউ-এর মুখ ফ্রেমে বাঁধানো হয়ে অন্তত তিন জায়গায় রয়েছে। ছোট বউ দপদপিয়ে চলাফেরা করত, তাই যখন সে চলে গেল সরিৎশেখরের বুকের গভীরে দগদগে ঘা তৈরী হয়ে গেল। বড় বউ কখন এল কখন গেল, কোন অনুভূতি তৈরী হল না। কিন্তু কাল সারারাত ধরে এই দুটি বিপরীত চরিত্রের মেয়ে বার বার নিজেদের স্বভাব নিয়ে সরিৎশেখরের কাছে ফিরে ফিরে এসেছে। স্বর্গছেঁড়ার এই বাড়ির চৌহদ্দিতে যাদের অস্তিত্ব সীমায়িত তারা সরিৎশেখরকে এই যাবার আগের রাতে শেষবারের জন্য ঘুমোতে দিল না।

কখন যেন ভোর হয়ে গেল, বাতাবীলেবু গাছটায় বসে একটা দাঁড়কাক কেমন করুণ গলায় ডাক শুরু করে দিল, জানলার তার গলে বিছানায় সকালের রোদ আলোছায়ার নকশা কাটা শুরু করে দিল অনি টের পায়নি। কাল রাত্রে মায়ের কাছে শুয়ে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছিল ও। আজ এই সকালে স্বপ্নটা যেন তাকে ছেড়ে যেতে চাইছে না। স্বপ্নটার কথা মনে হতেই ও আর একবার বালিশে মুখ গুঁজে কেঁদে নিল। কাল রাতে মায়ের পাশে শুয়ে সেই মিষ্টি গন্ধটা পেতেই বুকটা কেমন করে উঠেছিল। আজ শেষ রাত, কাল থেকে আর মাকে এমন করে পাব না, এই বোধটা যত বাড়তে লাগল তত চোখ ভারী হয়ে উঠছিল। শেষে ছেলের কান্না শুনে মাধুরী ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কি হল?' অনি অনেকক্ষণ কোন জবাব দেয়নি। মাধুরী অনেক বুঝিয়েছিলেন। অনিকে অনেক বড় হতে হবে, লেখাপড়া শিখতে হবে। এখানে স্বর্গছেঁড়ায় তো ভাল স্কুল নেই। প্রত্যেক ছুটিতে অনি যখন এখানে আসবে তখন নতুন নতুন গল্প শুনবে মাধুরী ওর কাছে। অনি যখন বলল, 'তোমাকে ছেড়ে আমি কি করে থাকব মা', তখন মাধুরীর গলাটা একদম পালটে গেল, 'আমি তো সব সময় তোর সঙ্গে আছি রে বোকা।' অনি হঠাৎ টের পেল ওর বুকের কান্নাটা মায়ের বুকের ভেতর চলে গেছে। আর একটু হলেই মা অনির মত কেঁদে ফেলবে। খুব শক্ত হয়ে গেল অনির শরীর। টানটান করে সিঁটিয়ে শুয়ে রইল। মাকে কষ্ট দিলে মহাপাপ হয়, পিসীমা বলেছে। তারপর সেইভাবে শুয়ে থেকে কখন যে ঘুম এসে গেল ও জানে না। কে যেন তার হাত ধরে হাঁটতে লাগল, তার মুখ সে দেখতে পাচ্ছে না। ক্রমশ তার শরীর বড় হয়ে যেতে লাগল। সে দেখল অনেকেই তার মত হাঁটছে, অজস্র লোক। যে লোকটার সঙ্গে ও যাচ্ছিল সে বলল আগে যেতে হবে, সবার আগে যেতে হবে।

অনির মনে হল সবাই এক কথাই ভাবছে। অনি দৌড়তে লাগল। অনেকে পড়ে যাচ্ছে, আবার উঠছে। হঠাৎ অনি দেখল ওর সামনে কেউ নেই, পেছনে হাজার হাজার লোক। কে যেন ফিসফিসিয়ে বলল, 'গলা খুলে চেঁচাও।' ও দেখল ভবানী মাস্টার ওর পেছনে। অনি সমস্ত শরীর নেড়ে ডাক দিল, 'বন্দেমাতরম্'। কানের পর্দা ফেটে যাবার উপক্রম হল সেই ডাকের সাড়ায়। এইভাবে এগোতে এগোতে অনি থমকে দাঁড়াল। সামনেই একটা খাদ, তার তলা দেখা যাচ্ছে না। খাদের কাছে ঝুঁকে অনি বলল, 'বন্দেমাতরম্।' সঙ্গে সঙ্গে নিচ থেকে একটা গমগমে গলা বলে উঠল, 'মানে কি ?' অনি মানেটা খুঁজতে গিয়ে শুনল নিচ থেকে কে যেন বলছে, 'বোকা ছেলে, আমার কাছে আয়।' অনি অবাক হয়ে দেখল অনেক নিচে মায়ের মুখ, ওর দিকে তাকিয়ে হাসছেন। অনির ঘুম ভেঙে গেল।

এখন এই সকালে ওর মনে পড়ে গেল ভবানী মাস্টার বলে দিয়েছিলেন বন্দেমাতরম্ শব্দের মানে কি। এখন এই মুহূর্তে দাদুর সঙ্গে শহরে যেতে ওর একদম ইচ্ছে করছে না। স্বর্গছেঁড়ার এই বাড়ি, মায়ের গায়ের গন্ধ, সামনের মাঠের চাঁপা গাছ আর পেছনের ঝিরঝিরে নদীটা ছেড়ে না গেলে যদি বড় না হওয়া যায় তাতে ওর বিন্দুমাত্র এসে যায় না।

তিন-তিনটে লরিতে মালপত্র বোঝাই হচ্ছে। পিসীমা সমস্ত বাড়ি ঘুরে এসে ঠাকুরঘরে ঢুকেছেন। মহীতোষ দাঁড়িয়ে থেকে দেখছেন কুলিরা লরিতে মালপত্র ঠিকঠাক রাখছে কিনা। প্রিয়তোষ দাঁড়িয়ে ছিল বারান্দায়, তাকে লরির ওপর উঠে তদারকি করতে বলে মহীতোষ ঘরে এলেন। সরিৎশেখরের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গিয়েছিল আগেই, এখন যাবার জন্য জামাকাপড় পরে একদম প্রস্তুত। সকাল থেকে অনেকবার তাগাদা দিয়েছেন সবাইকে, বিকেল হয়ে গেলে তিস্তা পেরুতে জোড়া নৌকো পাওয়া যাবে না। সেই সাতসকালে খেয়েদেয়ে বসে আছেন। ঘরভর্তি এখন লোক। স্বর্গছেঁড়া চা-বাগানের বাবুরা তো আছেনই, আশেপাশের বয়স্ক টিম্বার-মার্চেন্টরাও এসেছেন। ঘরে ঢোকার আগে মহীতোষ দেখে এসেছেন সামনের মাঠটা মানুষের মাথায় ভরে গেছে। চা-বাগানের সমস্ত মদেসিয়া-মুণ্ডা-ওঁরাও শ্রমিকরা একদৃষ্টে এই বাড়ির দিকে চেয়ে আছে। ফুটবল মাঠেও এত ভিড় হয় না।

সরিৎশেখর ছেলেকে দেখে বললেন, 'হয়ে গেছে সব ?'

মহীতোষ বললেন, 'একটু বাকী আছে।'

সরিৎশেখর বললেন, 'কি যে কর তোমরা, বারোটা পঞ্চাশের পর যাওয়া যাবে না, বারবেলা পড়ে যাবে। তাড়াতাড়ি করতে বল সবাইকে।'

মহীতোষ ভেতরে এসে দেখলেন মাধুরী একটা ছোট স্যুটকেসে অনির জামা-কাপড় ভরে সেটাকে দরজার পাশে রাখছেন। মহীতোষ বললেন, 'অনি কোথায়?'

মাধুরী বললেন, 'এই তো এখানেই ছিল। মোটেই যেতে চাইছে না।'

'যাবার জন্য লাফাচ্ছিল এতদিন, এখন যেতে চাইছে না বললে হবে!' মহীতোষ কেমন বিষণ্ণ গলায় বললেন।

'দ্যাখো, যা ভাল বোঝ কর।' বলে মাধুরী ভেতরে চলে গেলেন।

মহীতোষ বাড়ির ভেতরে ছেলেকে পেলেন না। বাগানের দিকে উঁকি মেরে দেখলেন সেখানে কেউ নেই। যাবার সময় হয়ে গেল অথচ ছেলেটা গেল কোথায়। গোয়ালঘরের পেছনে এসে মহীতোষ থমকে দাঁড়ালেন। অনিকে দেখা যাচ্ছে। মাটিতে উবু হয়ে বসে আছে। ডাকতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত না ডেকে নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। এখান থেকে অনির মুখ দেখা যাচ্ছে না বটে কিন্তু ফোঁপানির শব্দটা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। এইভাবে নির্জনে বসে ছেলেটাকে কাঁদতে দেখে মহীতোষ কেমন হয়ে গেলেন। সাধারণ ছেলেমেয়ের মত ও চটপটে নয়, কিন্তু ঐ বয়সের ছেলেদের চেয়ে ওর বুদ্ধিটা অনেক বড, বেশী রকম বড়। কথা যখন বলে তখন ওর বয়সের ছেলের মত বলে না। সরিৎশেখর ওকে বেশী স্নেহ করেন, বোধ হয় পৃথিবীতে একমাত্র অনিই সরিৎশেখরের মন নরম করতে পারে। এখন ছেলেকে কাঁদতে দেখে মহীতোষের বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। এই একান্নবর্তী পরিবারে ছেলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আলাদা করে নয়। বলতে গেলে ঝাড়ির সঙ্গে যতটুকু কথা হয় অনির সঙ্গে সেইটুকুই হয়। অনি শহরে চলে যাবে বাবার সঙ্গে, লেখাপড়া শিখবে—এরকম কথা ছিল। কিন্তু এইমাত্র মহীতোষের মনে হল তাঁর ছেলে এখন থেকে তাঁর সঙ্গে থাকছে না।

দু হাত বাড়িয়ে অনিকে কোলে তুলে নিতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন মহীতোষ। উবু হয়ে বসে ফোঁপাতে ফোঁপাতে অনি মুঠোয় করে মাটি তুলছে। ওর সামনে একটা রুমাল পাতা। রুমালটার অনেকটা সেই মাটিতে ভর্তি। ব্যাপারটা কি, ও রুমালে মাটি রাখছে কেন! শেষ পর্যন্ত অনি যখন রুমাল বাঁধতে শুরু করল মহীতোষে নিঃশব্দে পিছু ফিরলেন। ছেলের এই গোপন সংগ্রহ দেখে ফেলেছেন—এটা ওকে বুঝতে দেওয়া কোনমতেই চলবে না। গোয়ালঘর পেরিয়ে এসে উঁকি মেরে দেখলেন অনি উঠে দাঁড়িয়েছে। এক হাতে চোখ মুছছে, অন্য হাতে রুমালের পুঁটলিটা ধরা। আড়াল থেকে মহীতোষ হাঁক দিলেন, 'অনি, অনি!' ছেলের সাড়া না পেয়ে আবার ডাকলেন। এবার খুব আস্তে, ক্ষীণ গলায় অনি সাড়া দিতে মহীতোষ উঁচু গলায় বললেন, 'ওখানে কি করছ! দাদু যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন,

তাড়াতাড়ি চলে এস।' কথাটা বলে আর এক মুহূর্তে দাঁড়ালেন না মহীতোষ।

ঘর থেকে সবাই বারান্দায় নেমে দাঁড়িয়েছে। বাড়ির সামনে দাঁড়ানো লরিগুলোর গা ঘেঁষে মানুষের জটলা। মালপত্র বাঁধা শেষ, প্রিয়তোষ ঘরে ঢুকে সরিৎশেখরকে বলল, 'আর দেরি করবেন না, বেলা হল।'

কথাটা শোনার জন্যই বসেছিলেন সরিৎশেখর, তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে বললেন, 'চলি তাহলে।'

ডাক্তার ঘোষাল বললেন, 'একদম ভুলে যাবেন না আমাদের।'

সরিৎশেখর বললেন, 'সে কি! তোমাকে ভুলব কি করে হে, তুমি যে আমার—' কথাটা বলতে গিয়ে থমকে গেলেন উনি।

এখন এই পরিবেশে ওঁদের সেই চিরকেলে ঠাট্টাটা একদম মানায় না। সরিৎশেখর থেমে গেলেও ডাক্তার ঘোষাল বাকীটুকু মনে মনে জুড়ে নিলেন, 'বউটাকে মেরেছ!'

কথাটা তো নেহাৎ ইয়ার্কি করে বলা, সবাই জানে। ডাক্তার ঘোষালের হাত চট করে সরিৎশেখর জড়িয়ে ধরলেন, 'কিছু মনে করো না ডাক্তার।' ডাক্তার মাথা নাড়লেন।

এবার মহীতোষকে সরিৎশেখর বললেন, 'তোমার দিদি কোথায়?'

মহীতোষ বললেন, 'সবাই রেডি।'

সরিৎশেখর ডাকলনে, 'অনি।'

গম্ভীর গলার ডাকটা ভেতরে যেতেই অনির বুকটা কেঁপে উঠল। ভিতরের ঘরে খাটের ওপর মা এবং পিসীমার মধ্যে অনি বসে ছিল। বাগানের অন্য বাবুদের স্ত্রী ও মেয়েরা ভিড় করেছে সেখানে। পিসীমা চলে যাচ্ছে বলে সবাই দেখতে এসেছে। খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে বিশু, বাপী। ওদের দিকে তাকাচ্ছে না অনি। ওর চোখ জলে অন্ধ। দ্বিতীয়বার ডাকটা আসতে মাধুরী আঁচল দিয়ে ছেলের চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললেন, 'যা।'

কাঁপতে কাঁপতে অনি বাইরের ঘরে এসে দাঁড়াতে সরিৎশেখর নাতিকে আপাদ-মস্তক দেখলেন; দেখে হাসলেন, 'কি হয়েছে তোমার?'

ডাক্তার ঘোষাল বললেন, 'বোধ হয় মন খারাপ।'

সরিৎশেখর কি ভাবলেন খানিক, 'তাহলে ও থাক।'

কথাটা শুনেই অনির সমস্ত শরীরে হইচই পড়ে গেল। দাদুর দিকে তাকাতে গিয়ে বাবার গলা শুনল ও, 'না, এখন যাওয়াই ভাল। এখানে তো পড়াশুনা

হবে না।'

মুহূর্তে বেলুনটা ফুটো হয়ে সব হাওয়া হুস করে বেরিয়ে গেল যেন। সরিৎশেখর ডাকলেন, 'হেম!'

অনি অবাক হয়ে দেখল পিসীমা ঠাকুরের মূর্তিটা পুঁটলিতে নিয়ে দরজায় এসে দাঁড়ালেন। পিসীমাকে এখন অদ্ভুত দেখাচ্ছে। মাথায় ঘোমটা, গরদের কাপড়ের ওপর সাদা চাদর। মহীতোষও দিদিকে দেখছিলেন। দিদির ভাল নাম যে হেমলতা তা যেন খেয়ালই ছিল না। সরিৎশেখর অনেকদিন পর দিদির নাম ধরে ডাকলেন। এই স্বর্গছেঁড়ায় সবার কাছে উনি দিদি বা বড়দি। হেম বলে ডাকার লোক খুব বেশী নেই।

সরিৎশেখর বললেন, হেম, 'এই ছেলেটিকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি, আজ থেকে এর সব ভার তোমার ওপর, যদ্দিন ও কলেজে না ওঠে। মনে থাকবে তো।'

পিসীমাকে ঘোমটার মধ্যে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে দেখল অনি, 'আপনি যা বলবেন।'

সরিৎশেখর এবার মাধুরীকে ডাকলেন। ঘরে আর কেউ কোন কথা বলছে না। মাধুরী এসে হেমলতার পাশে দাঁড়াতে সরিৎশেখর বললেন, 'বউমা, আমি চললাম। এখানে আর আমার পিছুটান নেই। তোমাকে আমি পছন্দ করে আমাদের সংসারের এনেছিলাম, এই সংসারের ভার তোমার ওপর দিয়ে যাচ্ছি। আর মা, তোমার পুত্রটিকে আমার হাতে দিতে তোমার আপত্তি নেই তো?'

মাধুরী ঘাড় নাড়লেন। সরিৎশেখর বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি দেখো, এই কাঁচা সোনাকে কিভাবে পাকা সোনা করে ফিরিয়ে দিই।' কথাটা বলে অনিকে দু হাতে জড়িয়ে ধরলেন সরিৎশেখর। অনি দেখল মা এক হাতে ঘোমটা ঠিক করতে গিয়ে শাড়ির পাড় চোখের তলায় চেপে রাখল।

হে সাহেব চেয়েছিলেন যে, সরিৎশেখর প্রাইভেট কারে শহরে যান। কিন্তু সরিৎশেখর রাজী হননি। লরির সামনে ড্রাইভারের পাশে তো অনেক জায়গা আছে, আলাদা করে গাড়ির দরকার নেই। মহীতোষ বারান্দায় এসে দেখলেন কুলি-সর্দাররা সব সামনে দাঁড়িয়ে, পেছনে অনেক অনেক মুখ।

মহীতোষের পেছনে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে সরিৎশেখর এসে দাঁড়াতেই একটা গুঞ্জন উঠল। সরিৎশেখর কিছুটা বিব্রত হয়ে সামনে তাকালেন। একজন সর্দার এগিয়ে এল, এসে সরিৎশেখরের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে চিৎকার করে উঠল, 'কাঁহা যাত্তিস রে মো সব ছোড়কে?'

সরিৎশেখর বললেন, 'কেন?'

লোকটা তেমনি চিৎকার করে বলল, 'কিনো? এখানে থাক, আমাদের বাবা হয়ে থাক, তোকে আমরা যেতে দেব না।' সঙ্গে সঙ্গে আর একজন সর্দার চিৎকার করে উঠলেন, 'বাবা যাবেক নাই।' আর সেই একটা গলার সঙ্গে সমস্ত মাঠ গলা মেলাল। সরিৎশেখর দেখলেন বকু সর্দার ওদের মধ্যে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আছে সেরাও। এদের প্রায়প্রত্যেককে কয়েকটা ছেলেছোকরা বাদে তিনি চেনেন। চিৎকার সমানে বাড়ছিল। মহীতোষ সরিৎশেখরকে বললেন, 'কি ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না, কি করবেন?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'আমি দেখছি।' তারপর সামনে এগিয়ে তিনি হাত উঁচু করে সবাইকে থামতে বললে চিৎকারটা কমে এল। ডাক্তারবাবু বললেন, 'তোরা বাবাকে যেতে দিবি না বলছিস কিন্তু বাবার যে চাকরি নেই—তা জানিস না?'

একজন সর্দার বলল, 'এই চা-বাগান বাবা তৈরী করেছে, বাবা যতদিন জীবিত থাকবে তাকে চাকরি করতে দিতে হবে।' সঙ্গে সঙ্গে তার সমর্থনে আওয়াজ উঠল।

এবার সরিৎশেখর বারান্দা থেকে নেমে সর্দারদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে সবাই তাঁকে ঘিরে ধরল। সরিৎশেখর সামনের কালো কালো বিচলিত মুখগুলোর দিকে তাকালেন, 'আমাকে তোরা যেতে দে। সারাজীবন তো চাকরি করলাম, এবার একটু বিশ্রাম চাই রে।'

একজন সর্দার বলল, 'আমাদের কে দেখবে? কার কাছে যাব?'

সরিৎশেখর বললেন, 'আরে বোকা, এখন তোরা স্বাধীন, এখন ভয় কি? তোদের চার-পাঁচজন মিলে একটা দল কর। সবাই সেই দলকে সুবিধে-অসুবিধে জানাবে। ঐ দলই সাহেবের সঙ্গে কথা বলে দাবি আদায় করবে, ব্যাস।'

সর্দাররা সবাই মুখ-চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। হঠাৎ বকু সর্দার এগিয়ে এসে সরিৎশেখরের পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোন কথা নয়, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সেটা সংক্রামক রোগের মত ছড়িয়ে পড়ল অন্য মুখগুলোতে। সরিৎশেখর এই সব সরল মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করলেন যে তাঁর নিজের চোখের আগল কখন খুলে গেছে, বয়স্ক শুকনো গালের চামড়ার ওপর ফোঁটা ফোঁটা জলবিন্দু পড়ায় অদ্ভুত শান্তি লাগছে। অথচ কোন শোক তাঁকে কাঁদাতে পারেনি এতদিন।

হয়তো কান্নার জন্যেই প্রতিরোধ নরম হয়ে সরে গেল। অনি দেখল পিসীমা মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। ঝাড়িকাকু এবং প্রিয়তোষ লরির ওপর উঠল। মহীতোষ প্রথমে লরির সামনে ড্রাইভারের পাশে অনিকে তুলে দিলে হেমলতা তার পাশে উঠে বসলেন। সরিৎশেখর ঐ সব বোবা মুখের দিকে তাকিয়ে

লরিতে উঠতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। ভিড় কাটিয়ে বিলাস ছুটে আসছে। সরিৎশেখরের হাতে একটা বিরাট মিষ্টির হাঁড়ি ধরিয়ে দিয়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল সে। সরিৎশেখর হাঁড়িটা অনির হাতে দিতেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়ে গেল। দুজন সর্দার ফিসফিস করে কি বলে মাথার পাগড়ী সরিৎশেখরের পায়ের সামনে টানটান করে ধরে থাকল। আর কয়েকশ' মানুষ এগিয়ে এসে এক আনা, দুই আনা, লাল পয়সা, ফুটো পয়সা ফেলতে লাগল তাতে। ডাক্তার ঘোষাল, মালবাবু, মনোজ হালদাররা সব দাঁড়িয়ে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখছে। ক্রমশ কাপড়টার মাঝখানে পয়সা উঁচু হচ্ছিল।

সরিৎশেখর অদ্ভুত গলায় বললেন, 'ডাক্তার, তোমরা ফেয়ারওয়েলের কথা বলেছিলে না, পৃথিবীতে কেউ এর চেয়ে বড় ফেয়ারওয়েল পেয়েছে?'

মহীতোষ সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মাধুরী একা থাকবে বলে সরিৎশেখর নিষেধ করেছেন। সঙ্গে তো প্রিয়তোষ যাচ্ছেই, কোন অসুবিধে হবে না। তাছাড়া দুদিন আগে লোক পাঠিয়ে জলপাইগুড়ির বাড়ি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করিয়ে নিয়েছেন। ঘড়ি দেখলেন তিনি, আর একদম সময় নেই। ড্রাইভার উঠে বসল, তার পাশে অনি। অনির পাশে হেমলতা, তাঁর গায়ে দরজার ধারে সরিৎশেখর কোলে খুচরো পয়সার পুঁটলিটা নিয়ে বসে আছেন। ড্রাইভারকে স্টার্ট নেবার ইঙ্গিত করতে যেতেই সরিৎশেখর টের পেলেন গাড়িটা দুলছে। তারপর গাড়িটা একটু একটু করে চলতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার উঠল, 'বাবা যায়—ধেউসি রে, আউর থোড়া—ধেউসি রে।' ড্রাইভার অসহায়ের মত বসে রইল স্টিয়ারিং ধরে, গাড়ি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। দুজন সর্দার পাদানির ওপর লাফিয়ে উঠে অন্যান্যকে নির্দেশ দিতে লাগল ঠেলার জন্য। ক্রমশ মাঠ পেরিয়ে লরি আসাম রোডে পড়ল। পিছনের গাড়িটাকে কেউ ঠেলছে না, কিন্তু সেটাও স্পীড নিতে পারছে না এই লরির জন্য।

অনি দেখছিল সামনের কাঁচের ওপর একটা হনুমানের ছবি, এক হাতে পাহাড় বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, বুকে রাম সীতার ছবি। কাঁচের ওপাশে আকাশ। ভাল করে দেখার জন্য উঠে দাঁড়াতেই ওর নজরে পড়ল ওদের লরির সঙ্গে বাগানের কুলিরা হেঁটে যাচ্ছে রাস্তা জুড়ে। সামনের দিক থেকে আসা গাড়িগুলো রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে গেছে পর পর। সবাই হর্ন দিচ্ছে, কিন্তু কেউ তাতে কান দিচ্ছে না। হঠাৎ অনির নজরে পড়ল রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেই বিরাট বটগাছের তলায় মুখ উঁচু করে রেতিয়া দাঁড়িয়ে আছে। কাছাকাছি হতে অনি চিৎকার করে

উঠল 'রেতিয়া!' সঙ্গে সঙ্গে সরিৎশেখর আর হেমলতা ওর দিকে অবাক হয়ে তাকালেন। কিন্তু অনির সেদিকে নজর নেই। ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে রেতিয়ার অন্ধ চোখ দুটোর পাতা যেন কেঁপে উঠল। ঠোঁট দুটো গোল হয়ে যেন কিছু বলল। কি বলল সেটা সম্মিলিত চিৎকারে শোনা গেল না। ক্রমশ সামনের কাঁচের মধ্যে থেকে রেতিয়ার মুখ মুছে গেলে অনির বুকের মধ্যে অনেকক্ষণের জমা কান্নাটা ছিটকে বেরিয়ে এল। হেমলতা এক হাতে ঠাকুরের পুঁটুলি সামলে অন্য হাতে অনিকে বুকে টেনে নিলেন।

সরিৎশেখর ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছিলেন। এভাবে লরি ঠেলে ওরা কদ্দূর যাবে? যেভাবে ওরা যাচ্ছে তাতে উৎসাহে ভাঁটা পড়ার কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। পাশের পাদানিতে দাঁড়ানো সর্দারকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কদ্দূর যাবি তোরা?' খুব যেন উৎসাহ হচ্ছে এই রকম মেজাজে সে জবাব দিল, 'তোর ঘর তক্।'

বলে কি! জলপাইগুড়ি অবধি পায়ে হেঁটে ওরা হয়ত যেতে পারে কিন্তু তাতে তো মাঝরাত হয়ে যাবে। সরিৎশেখর ড্রাইভারকে স্টার্ট নিতে ইঙ্গিত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভট ভট করে ইঞ্জিনটা হুঙ্কার ছাড়ল। সরিৎশেখর দেখলেন শব্দ শুনে সামনের লোকজন লাফ দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল। সেই সুযোগে ড্রাইভার স্পীড্ বাড়িয়ে দিল চটপট, মুহূর্তে জনতা চিৎকার করে উঠল, কিন্তু ততক্ষণে ওঁরা অনেক দূরে চলে এসেছেন। পিছনের গাড়িটাও বোধ হয় এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, সরিৎশেখর দেখলেন সেটাও পিছন পিছন আসছে। ডুডুয়া নদীর পুলের কাছে এসে সরিৎশেখরের খেয়াল হল সর্দার দুজন এখনও পাদানিতে দাঁড়িয়ে আছে। আর আশ্চর্য, এই যে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে ওদের নিয়ে—এতে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই যেন; হাসি হাসি মুখ করে ছুটন্ত গাড়ির হাওয়া মুখচোখে মাখছে দু'জন।

গাড়ি থামাতে বললেন সরিৎশেখর। তারপর নিচে নেমে সর্দার দুটোকে ডাকলেন। ওরা মাথা নিচু করে কাছে আসতে বললেন, 'এবার তোরা যা, আর এই টাকাগুলো রাখ। লাইনের লোকজনকে আজ রাত্রে আচ্ছাসে ভোজ দিবি।' পকেট থেকে কয়েকটা দশ টাকার নোট বের করে ওদের হাতে গুঁজে দিলেন তিনি। সর্দার দুটো চকচকে নতুন নোট হাতে নিয়ে কি করবে বুঝতে পারছিল না। সরিৎশেখর আর সুযোগ দিলেন না ওদের, গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

তাঁর সারাজীবনের স্মৃতি বুকে নিয়ে স্বর্গছেঁড়া ক্রমশ পেছনে চলে যেতে লাগল।

॥ ২ ॥

অবসর-জীবন কিভাবে কাটাবেন সরিৎশেখর কোনদিন চিন্তা করেননি। সেই কোন্ ছেলেবেলায় চা-বাগানে ঢুকে পড়ার পর এতটা কাল হু-হু করে কেটে গেল, নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাননি। চাকুরির মেয়াদ ফুরিয়ে আসার মুখে ভেবেছিলেন কর্মহীন অবস্থায় এই তল্লাটে আর থাকবেনই না। আজ ডুয়ার্সের সব লোক তাঁকে একডাকে চেনে যেজন্যে সেটা ক্ষয়ে যাবে বেকার ক্ষমতাহীন হয়ে বসে থাকলে। তার চেয়ে কলকাতার কাছে গঙ্গার ধারে বাড়ি নিলে বেশ হয়, এরকমটা ভাবতে শুরু করেছিলেন। হেমলতা বলেছিলেন, 'যদি এ দেশ ছেড়ে যেতেই হয় তো দেশে চলুন।' দেশ বলতে সরিৎশেখর অবাক হয়েছিলেন। আজ প্রায় কুড়ি বছর তিনি নদীয়ার সেই গণ্ডগ্রামে পা বাড়াননি, পিতা ষষ্ঠীচরণ দেহ রাখার পর সে ভিটেতে খুড়তুতো ভাইরা ধুঁকছে। নিজের একটা দেশ আছে এই বোধটা কবেই চলে গেছে। বোধ হয় বড় বউ চলে যাবার পর থেকেই দেশ সম্পর্কে মায়া-মমতা তাঁর নেই। তাছাড়া এতটা কাল সাহেব-সুবোদের সঙ্গে কাটিয়ে এখন ঐ গ্রামের জীবন তাঁর পোষাবে না। দেশ শব্দটা তাই তাঁর মনেই পড়ে না। অথচ হেমলতা কি সহজে দেশ বলল আবেগ-আবেগ গলায়। বেচারা তো কখনো সে গ্রাম চোখেই ছাখেনি। বাবার ইচ্ছের কথা শুনে মহীতোষ বেঁকে বসল, 'আমাদের ছেড়ে আপনি অতো দূরে চলে যাবেন—এ হয় না। আপনি যখন রিটায়ার করে আমার সঙ্গে থাকবেনই না, তাহলে অন্তত কাছাকাছি থাকুন। সাপ্লায়ারদের বললে জলপাইগুড়িতে একটা জমির ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বিপদেআপদে আমরা যেতে পারবো। কিন্তু কোলকাতায় আপনি তিষ্ঠোতে পারবেন না, আর কিছু একটা হয়ে গেলে আমরা আফসোসে মরে যাব।' কথাগুলোকে খুব একটা পাত্তা দিচ্ছিলেন না সরিৎশেখর। শেষ পর্যন্ত বউমা বললেন, 'বাবা, আপনি চলে গেলে অনির কি হবে? ও কার কাছে পড়াশুনা করবে?'

ব্যাস হয়ে গেল। সরিৎশেখর জলপাইগুড়ি শহরে জমি কিনলেন। মাত্র দু-হাজার টাকায় শহরের ওপরে জমিসমেত দুটো কাঁঠাল গাছ, একটা আম আর অজস্র সুপুরি। এছাড়া একটা টিনের চালওয়ালা দু-ঘরের মাথা গোঁজার আস্তানা, যেটায় দিব্যি থাকা যায় কিছুদিন।

জমিটা রেজিস্ট্রী হয়ে গেলেই তিনি বড ছেলে পরিতোষকে পাঠিয়ে দিলেন। এই ছেলে তাঁর রাতের ঘুম দিনের স্বস্তি কেড়ে নিতে যথেষ্ট। অনেক ঘাট ঘুরে সরিৎশেখরের অনেক পয়সা আজেবাজে ব্যবসায় নষ্ট করে একজন কাঠের কণ্ট্রাক্টরের কাছে পড়েছিল। সরিৎশেখর তাকে কাজে লাগাতে চাইলেন। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে প্ল্যান মঞ্জুর হয়ে গিয়েছিল বাড়ির। দোতলার ভিত হবে, পাঁচটা শোবার ঘর, একটা হল, বসার ঘর, কিচেন, দুটো বাথরুম, একটু ডাইনিং স্পেস, মেয়েদের গল্প করার জন্য বেশ বড ঠাকুরঘর। ম্যাকফার্সন সাহেবের সঙ্গে বসে বাড়ির প্ল্যান করা হল। ঘুপচি ঘর নয়, দক্ষিণের বাতাস যেন চিরুনির মত সমস্ত বাড়িটার মধ্যে দিয়ে বয়ে যেতে পারে এরকমভাবে জানলা দরজা বানানো হবে। পরিতোষ শহরে এসে বাড়ির তদারকি করবে দাঁড়িয়ে থেকে। কণ্ট্রাক্টরকে বিশ্বাস নেই সরিৎশেখরের। ওদের কাজকর্ম তো বাগানের বিভিন্ন ব্যাপারে অষ্টপ্রহর দেখছেন। কাজ যদি সঠিক হতো তাহলে পুজো বা ক্রীসমাসে এত ভেট দিতে হতো না। সরিৎশেখর নিজের বাড়ি তৈরী করতে দিয়ে কণ্ট্রাক্টরের ভেট চান না।

বাড়ি করার আগে সরিৎশেখর পরিতোষকে নিয়ে এক সকালে শহরে এলেন। পরিতোষের ইচ্ছা সে নিজেই মিস্ত্রী যোগাড় করে প্ল্যানমাফিক বাড়ি বানাবে—সরিৎশেখর একেবারে গৃহপ্রবেশ করবেন। কিন্তু ছেলের কথায় তাঁর আজকাল খুব ভরসা নেই। শহরে সরিৎশেখরের দেশের গাঁয়ের একজন আছেন যাঁকে তিনি বন্ধুর মত বিশ্বাস করেন—সেই সাধুচরণ হালদারের বাড়িতে পরিতোষ প্রথমটা আসতে চায়নি। কিন্তু সরিৎশেখর যখন সেখানে যাবেনই পরিতোষকে বাধ্য হয়ে সঙ্গী হতে হল।

রায়কতপাড়ায় ঢুকতেই সাধুচরণের কাঠ-সিমেন্ট-মেশানো দোতলা বাড়ি। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় নদীয়া জেলার যেসব মানুষ পাকাপাকি বাস করছেন তাঁদের নাড়ীনক্ষত্র সাধুচরণের জানা। দেশের খবরাখবর এবং ছেলেমেয়েদের বিয়ের সম্বন্ধের জন্য তাঁরা সাধুচরণের শরণাপন্ন হন। কদমতলায় ওঁর বিরাট স্টেশনারি দোকান এককালে রমরম করত। স্যার আশুতোষের মত গোঁফ তখনো কুচকুচে কালো, সরিৎশেখর শহরে এলেই দোকানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে যেতেন। তা এখন বয়স হয়েছে সাধুচরণের, দুই ছেলে দোকানে বসে। বাড়ি বসে বন্ধকী কারবার করেন তিনি। সরিৎশেখর জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলেন; কিছু একটা নিয়ে থাকতে হবে তো!

পরিতোষের এ বাড়িতে আসতে না চাওয়ার পেছনে যে কারণটা সেটা সরিৎশেখর জানেন। সাধুচরণের স্ত্রী এবং কন্যা উন্মাদ। স্ত্রী যতটা কন্যা তার

দ্বিগুণ। বিবস্ত্র হয়ে যাতে না থাকে সেজন্যে পা অবধি ঝুল এবং তলায় বোতাম আঁটা এক ধরনের অর্ডারী সেমিজ মেয়েকে পরিয়ে রাখেন সাধুচরণ। মেয়েটি চিৎকার চেঁচামেচি করে না, কামড়ায় না। শুধু অঙ্গভঙ্গী করে এবং শব্দ না করে হাসে। পরিতোষ এর আগে দেখেছে সাধুচরণ মেয়েটাকে বারান্দার এক কোণে চেয়ারে বসিয়ে তার খানিক তফাতে নিজে বসে অতিথির সঙ্গে কথা বলেন। সাধুকাকার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার চোখ মেয়েটার দিকে যেতে সে শিউরে উঠেছিল। অত কুৎসিত করে কোন মেয়ে নিঃশব্দে হাসতে পারে সে জানতো না। আর তার ঐ প্রতিক্রিয়া দেখে সাধুচরণ খুব মজা পাচ্ছেন—যেটা পরিতোষ বেশ টের পাচ্ছিল। বোধ হয় মেয়েকে সামনে বসিয়ে অতিথিদের নার্ভের ওপর একটা প্রেসার সৃষ্টি করে ভদ্রলোক তাকে নিয়ে খেলা করেন। সেদিন সাধুচরণের স্ত্রী এসে তাকে চা দিয়েছিল। নিশ্চিত, ভদ্রমহিলা সেদিন কিছুটা সুস্থ ছিলেন। তবে তাঁর চোখ মুখ অসম্ভব লাল দেখাচ্ছিল। পরিতোষ শুনেছে ভদ্রমহিলা মাঝে মাঝে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যান, তখন তাঁকে ঘরবন্দী করে রাখা হয়—আবার টপ করে সুস্থও হয়ে যান। পরিতোষ এও শুনেছে এক জ্যোতিষী হাত দেখে বলেছে বিয়ে দিলে মেয়ের এই পাগলামি সেরে যাবে। কিন্তু সাধুচরণ নদীয়া জেলায় সে ধরনের পাত্রের সন্ধান পাচ্ছে না।

তবু সরিৎশেখরের সঙ্গে পরিতোষকে আসতেই হল। রিক্শায় চড়া সরিৎশেখর একদম পছন্দ করেন না। লাঠি হাতে লম্বা শরীরটা নিয়ে যখন হন হন করে হেঁটে যান, তখন তাঁর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া মুশকিল। তাছাড়া বাবার সঙ্গে হাঁটতে পরিতোষ ভীষণ অস্বস্তি হয়—ইচ্ছে করে পিছিয়ে পড়ে এমনভাবে সে হাঁটে যেন সরিৎশেখর তার কেউ না।

সাধুচরণ হালদার বাড়িতেই ছিলেন। সরিৎশেখরের গলা শুনে হাত জোড করে হাসতে হাসতে অভ্যর্থনা জানালেন। চেয়ারে বসতে বসতে সরিৎশেখরের প্রথম কথা হল, 'বসো হে সাধু, তোমার সঙ্গে কথা আছে। আর হ্যাঁ, মেয়েটাকে আজ বাইরে আনার দরকার নেই।'

সাধুচরণ ঘাড় নাড়লেন, 'না না, আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে বসুন, তাকে বাইরে আনার দরকার হবে না।'

পরিতোষ বারান্দার একপাশে দাঁড়িয়ে ভ্রূ কুঁচকালো। সরিৎশেখর খানিক অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন, আনতে হবে না কেন?'

'আজ্ঞে, ডাক্তার বলেছে ও আর বেশী দিন বাঁচবে না। আজন্ম শুনে এলাম পাগলরা দীর্ঘজীবী হয়—কিন্তু এ মেয়ে নাকি বড়জোর মাসখানেক। কথা তো

কোনকালেই বলে না—এখন মুখে গ্যাঁজলা উঠছে, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। যাক বাবা, যত শীঘ্র যায় ততই মঙ্গল। কি বলেন?'

সরিৎশেখর অন্যমনস্ক গলায় বললেন, 'তবু তো তোমার মেয়ে হে।'

মাথা নাড়লেন সাধুচরণ, 'না, না। বাপ তো মেয়েকে সৎপাত্রে দান করতে পারলে বেঁচে যায়—তাই না? তা ওর ক্ষেত্রে মৃত্যু হল সৎপাত্র। এ ব্যাপারে আপনি বিন্দুমাত্র চিন্তিত হবেন না। এখন বলুন আগমনের উদ্দেশ্যটা কি?'

সরিৎশেখর বাড়ি বানাবার কথা বললেন। যেহেতু তিনি শহরে থাকতে পারছেন না তাই সাধুবাবুর সাহায্য নিতে চান। ভাল রাজমিস্ত্রী যোগাড় করে দেওয়া তো সাধুবাবুর কাছে কোন সমস্যা নয়। ইঁট-ভাটায় খবর দিলে গরুর গাড়ি করে ইঁট আসবে—সিমেণ্টের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আর ঐ এলাহী কাজকর্ম ঠিক হচ্ছে কিনা দেখার জন্য পরিতোষ থাকল। সাধুবাবুকে দেখতে হবে পরিতোষ ঠিকমত কাজকর্ম দেখাশোনা করছে কিনা। সরিৎশেখর মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবেন।

সাধুচরণ চুপচাপ শুনলেন, তারপর বললেন, 'আপনি শহরে এসে আমাদের সঙ্গে থাকবেন, দুবেলা দেখা পাব—এ তো আমাদের সৌভাগ্য। সব ব্যবস্থা করে দেব। রহমৎ মিয়া আছে—খুব গুণী মিস্ত্রী—ওর ওপর ভার দিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকতে পারেন। সে সব কিছুতেই আটকাবে না। আমি ভাবছি আপনার পুত্র অ হারাদি করবে কোথায়?'

পরিতোষ চমকে উঠে কিছু বলতে চাইলে সরিৎশেখর হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিলেন, 'কোন হোটেলের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে নিলেই হবে। কিং সাহেবের ঘাটে এখন তো অনেক পাইস-হোটেল হয়েছে।'

সাধুচরণ বললেন, 'দুদিনেই পেটের বারোটা বেজে যাবে। তার চেয়ে ও আমার এখানেই থাকা-খাওয়া করে কাজকর্ম দেখতে পারে। আমার সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ হবে।'

কিন্তু পরিতোষ বাইরে বেরিয়ে এসে প্রায় বিদ্রোহ করে বলল। সাধুচরণের বাড়িতে সে মরে গেলেও থাকবে না। দু-দুটো পাগলকে দিনরাত দেখার মত নার্ভ তার নাকি নেই। সাধুচরণের বউকে যদিও সহ্য করা যায়, কিন্তু মেয়েকে অসম্ভব। তার চেয়ে সে নিজে হাত পুড়িয়ে ভাতে ভাত রেঁধে খাবে। বাবার দিক থেকে উল্টোমুখো হয়ে সে বলল, 'আপনি এ ব্যাপারে একদম চিন্তা করবেন না বাবা।'

সরিৎশেখরেরও সাধুচরণের কথাটা ভাল লাগেনি। হয়তো সে খোলা মনেই বলেছে। তবু একটা সোমত্থ মেয়ে রয়েছে বাড়িতে, হোক না পাগল, সোমত্থ তো, সেখানে পরিতোষের মত দুর্নামযুক্ত একটা ছেলেকে বাড়িতে রাখার প্রস্তাব—কেন

যেন মনে সন্দেহ এনে দেয়। ঠিক হল, পরিতোষ নিজেই খাবার ব্যবস্থা করবে, টিনের ঘরটাকে বসবাসের উপযুক্ত করে দিয়ে গেলেন সরিৎশেখর। রহমৎ মিঞা কাজ করবে লোকজন নিয়ে—সরিৎশেখর সপ্তাহে একদিন এসে টাকা-পয়সা দিয়ে যাবেন পুত্রকে। কোন সমস্যা দেখা দিলে পরিতোষ সাধুচরণের পরামর্শ নেবে। খুব ঠেকায় না পড়লে যেন টাকা-পয়সা না নেয়।

ভিত খোঁড়া হল। প্ল্যানমাফিক কাজ এগোতে লাগল। ভিত-পুজোটুজোর ব্যাপার করলেন না সরিৎশেখর। প্রথম দিকে তরতর করে কাজ চলতে লাগল। সরিৎশেখর সন্তুষ্ট, ছেলের পরিবর্তন হয়েছে দেখে খুশী হলেন। সাধুচরণও পরিতোষের প্রশংসা করেন। সারাদিন রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে থেকে মজুরদের কাজ করায়। ক্রমশ সরিৎশেখর ছেলেকে বিশ্বাস করতে লাগলেন। লোক মারফৎ টাকা পাঠান, চা-বাগানের কাজ ফাঁকি দিয়ে ঘন ঘন শহরে আসা সম্ভবও হয় না। যেভাবে কাজ চলছে পুরো বাড়ি শেষ হতে মাস দুয়েক লাগার কথা নয়। এখনও রিটায়ার করতে দেরি আছে। তবে সরিৎশেখর ঠিক করলেন ভাড়াটাড়া দেবেন না।

এমন সময় সাধুচরণের একটা চিঠি পেলেন সরিৎশেখর। শনিবার সন্ধ্যেনাগাদ চলে আসুন, দিনমানে অবশ্যই নয়। আমার গৃহে তো থাকবেন না তাই রুবি বোর্ডিং-এ আপনার ব্যবস্থা করতে পারি। আসা আপনার প্রয়োজন কারণ আপনার পুত্রের সঙ্গে আপনার ভবিষ্যৎ এক্ষেত্রে জড়িত হয়ে পড়েছে।

মাথায় রক্ত উঠে গেল সরিৎশেখরের। অতীতের অনেক অপকর্মের নায়ক নিজের ছেলেকে তিনি জানেন। শনিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন না। বিকেলের ডাকেচিঠি পেয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাহেবকে বলে একটা গাড়ি যোগাড় করে শহরে রওনা হলেন। যাবার সময় মহীতোষকেও কিছু বললেন না। শহরে এসে প্রথমে ভাবলেন সাধুচরণের কাছে যাবেন কিনা! তারপর ঠিক করলেন নিজেই ব্যাপারটা দেখবেন আগে। সাধুচরণের চিঠির ভাষা খুবই সন্দেহজনক—সরিৎশেখর একটা বিশ্রী গন্ধ পাচ্ছেন তাতে—আর তাই সাক্ষী রাখা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল অনেকক্ষণ। তিস্তা নদীর গায়ে যে মাটির রাস্তা সেনপাড়ার দিকে চলে গিয়েছে, সেখানে গাড়ি রেখে ড্রাইভারকে চুপচাপ বসে থাকতে বললেন। গাড়ি থেকে নেমে ওঁর খেয়াল হল উত্তেজনায় আসবার সময় কাশ্মীরী লাঠিটা সঙ্গে আনতে ভুলে গেছেন। সামনে অনেকটা খোলা মাঠ অন্ধকারে ঢাকা—অনেক দূরে টিনের ঘরের সামনে হ্যারিকেন জ্বলছে মিটমিট করে। কি মনে করে সরিৎশেখর গাড়ির হ্যাণ্ডেলটা লাঠির মত বাগিয়ে মাঠ ভাঙতে লাগলেন।

জাল তারের বেড়া দিয়ে সমস্ত জমিটা ঘিরে রাখা হয়েছিল। এদিকটা দিয়ে

বাড়ির মালমশলা আনবার জন্য একটা ছোট টিনের গেট করা আছে। সরিৎশেখর গেট খুলে ভেতরে ঢুকলেন।

ঢুকতেই তিনি বড় ছেলের গলা শুনতে পেলেন। এলোমেলো গলায় সায়গলের গান গাইছে। গানের গলাটা তো বেশ ভাল! ছেলের গান কোনদিন শোনেননি তিনি। হঠাৎ মনে হল ওকে যদি গান শেখানো যেত, তাহলে নাম করতে পারতো। কিন্তু গলাটা স্থির থাকছে না কেন! কয়েক পা এগোতেই নতুন বাঁধাই কুয়োটার পাশে এসে দাঁড়ালেন। ভিত খোঁড়ার পর এই কুয়োটা হয়েছে। খাবার জল নয়—বাড়ির কাজে জল দরকার বলে এটা খোঁড়া। অগভীর। অন্ধকার হালকা করে অনেক তারা উঠে এল আকাশটায়। সরিৎশেখর কুয়োর দিকে তাকাতে অবাক হলেন। বেশ কিছুটা নিচে অন্ধকারেও যেন কিছু চিক-চিক করছে। জল নয় অবশ্যই। হাতের লোহার হ্যাণ্ডেলটা নিচে নামিয়ে দিতেই ঠক্ করে শব্দ হল। জোরে চাপ দিতে মচ্ করে ভেঙে গেল। সরিৎশেখর বুঝলেন ওটা কাঁচ। এত কাঁচে কুয়ো ভর্তি হবে কেন? নাকি এ কুয়োয় জল পায় না বলে ওরা অন্য কুয়ো খুঁড়ছে? বোধ হয় এটাতে আবর্জনা ফেলে আজকাল। কিন্তু এগুলো কিসের বোতল?

কিছুক্ষণ বাদেই গান শেষ হল। আর সঙ্গে সঙ্গে আড়ষ্ট হয়ে সরিৎশেখর শুনলেন দুটি স্ত্রী-কণ্ঠে প্রবল উল্লাসের ঝড় উঠল। একটি কণ্ঠ মাতাল গলায়, 'তুমি মাইরি নাগর ভালই গাও, এসো তোমার গলায় একটা চুমু খাই।' বলে খিলখিল করে উঠল।

সরিৎশেখর আর স্থির থাকতে পারলেন না। দ্রুতপায়ে নিচু বারান্দায় উঠে এসে লোহার হ্যাণ্ডেলটা দিয়ে দরজায় ঠেলা দিলেন। ভেজানো ছিল দরজাটা, হাট করে খুলে গেল। দুটো ঘরের মধ্যে এটাই একটু বড়। ঘরের মধ্যিখানে একটা জল-চৌকির ওপর দুটো বড় মোটা মোমবাতি জ্বলছে। দরজাটা খুলল বলে মোমবাতির শিখা দুটো থর থর করে কাঁপছে এখন। সরিৎশেখর দেখলেন পরিতোষ একটা বালিশ পেটের নিচে নিয়ে একটি কদাকার মেয়ের কোলে মুখ রেখে শুয়ে আছে। মেয়েটি হাতের গেলাস থেকে মাঝে মাঝে নিজে নিচ্ছে আবার পরিতোষকে মদ খাওয়াচ্ছে। আর একটা বয়স্কা মোটা মেয়েছেলে পরিতোষের পায়ের কাছে বসে ওর গোড়ালি টিপছে।

দরজাটা খুলে যেতেই বয়স্কা মেয়েছেলেটি প্রথম ওঁকে দেখতে পেল, তারপর গলা দুলিয়ে বলল, 'কে এলে গো, নতুন নাগর?'

সরিৎশেখর প্রথমে উত্তেজনায় কথা বলতে পারছিলেন না। থর থর করে ওঁর

দেহ কাঁপছিল। কোনরকমে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গর্জে উঠলেন, 'পরিতোষ!' বাবার গলা শুনে নেশাগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও পরিতোষ তড়াক করে উঠে বসল। অন্ধকারে মোমবাতির আলোয় পুরোটা দেখা যায় না, তাই দরজায় দাঁড়ানো সরিৎশেখরকে মোমবাতির মাথা ডিঙিয়ে অস্পষ্ট ছায়া-ছায়া দেখল সে।

সরিৎশেখর তখন এক-পা এগিয়েছেন, 'হারামজাদা, বদমাস, কুলাঙ্গার'—কথা বলতে বলতে হাতের হ্যাণ্ডেলটা শূন্যে আস্ফালন করে সজোরে পুত্রের দিকে ঘোরালেন তিনি। পলকে মোমবাতি ছুটো শূন্যে উঠে নিবে গেল। পরিতোষ যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল। মেয়ে ছুটো তাদের বাবু বিপদে পড়েছে দেখে হাউমাউ করে কেঁদে প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় এসে সরিৎশেখরের ছুই পা জড়িয়ে ধরল। সরিৎশেখর একটাকে লাথি মেরে সরিয়ে দিলেও মোটা মেয়েছেলেটিকে পারলেন না। সে সমানে ককিয়ে যাচ্ছে, 'বাবুসাহেব আর আসব না, মাইরি বলছি, টাকা দিলেও রাজী হব না ভদ্দরপাড়ায় আসতে। আমাদের বেগুনটুলিই ভাল ছিল গো—ও—ও।'

আর এই সুযোগে এক হাতে মাথার একটা পাশ ধরে তীরের মত দরজা দিয়ে পরিতোষ ছুটে বেরিয়ে গেল। পা আটক থাকায় সরিৎশেখর পুত্রকে আর একবার বেদম প্রহার করার চেষ্টা করেও বিফল হলেন।

মেয়েছেলে ছুটোকে দূর করে দেবার সময় আবার ঝামেলায় পড়তে হল। টাকা ছাড়া তারা যাবে না। জানতে পারলেন পরিতোষ প্রায়ই তাদের নিয়ে আসে, ফুর্তি করে, যাবার সময় টাকা দেয়। চিৎকার চেঁচামেচি করে ওরা সরিৎশেখরের কাছ থেকে টাকা আদায় করল। ভাগ্যিস এখনও এদিকে তেমন লোকবসতি হয়নি এবং সময়টা সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে তাই কেউ জানল না। সরিৎশেখর সব কটা দরজায় তালা লাগিয়ে পেছনে আসতে হাঁ হয়ে গেলেন। এতদিনে তাঁর বাড়ির অর্ধেকটা কাজ হয়ে যাবার কথা। জানলা দরজার ফ্রেম লেগে যাবে শুনেছিলেন। কিন্তু এই অস্পষ্ট অন্ধকারে উনি দেখতে পেলেন ভিত-এর গাঁথুনির পর আর এক ইঞ্চি দেয়ালও ওঠেনি।

নিজের সারাজীবনের সঞ্চয়ের একটা অংশের এই পরিণতি দেখতে দেখতে সরিৎশেখর শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর মাথা উঁচু করে অন্ধকারের মাঠ ভেঙে গাড়িতে ফিরে এলেন। একবার ভাবলেন এখনি রায়কতপাড়ায় গিয়ে সাধুচরণের সঙ্গে দেখা করবেন। কেন তাঁকে এতদিন পর তিনি জানালেন পুত্রের কথা? কেন সময় থাকতে সাবধান করে খবর দেননি? বন্ধু হিসেবে সরিৎশেখর তো সাধুচরণের ওপর নির্ভর করতে চেয়েছিলেন। হঠাৎ তাঁর একটা কথা মনে পড়ে গেল। সাধু-

চরণ অনেকদিন আগে তাঁকে একবার বলেছিলেন, আপনার এই পুত্রটিকে নিয়ে দুশ্চিন্তার দেখছি অবধি নেই। আমাদের জাতের কেউ জেনেশুনে ওকে কন্যা দেবে না। আমারও কন্যাটিকে নিয়ে ভাবনার শেষ হয় না। এই দুটিকে একসঙ্গে জুটিয়ে দিলে কেমন হয়?'

সরিৎশেখর অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'কি যা-তা বলছ?'

সাধুচরণ বলেছিলেন, 'তা অবশ্য। আপনার পুত্র আগে খুব আসতো, এখন আসতে চায় না।'

গাড়ি আর ঘোরালেন না তিনি। সোজা কিং সাহেবের ঘাটে চলে এলেন। তিস্তার এই ঘাটটা এখন জমজমাট। অজস্র খড়ের চালের দোকান হয়েছে চা-খাবারের। সন্ধ্যের পর ঘাট বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, অনেক কষ্টে বেশী বকশিশের লোভ দেখিয়ে সরিৎশেখর একটা জোড়া-নৌকো যোগাড় করে গাড়ি তুললেন তাতে।

সেদিন গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরে তিনি কিছুক্ষণ নিজের খাটের ওপর গুম হয়ে বসে রইলেন। সবাই আন্দাজ করছে কিছু একটা হয়েছে, কিন্তু কেউ আগবাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করতে সাহস পাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত নিজেই ডাকলেন তিনি হেম, মহীতোষ আর প্রিয়তোষকে। ওঁরা শুনলেন ওঁদের বাবা ওঁদের বড়দাদাকে আজ থেকে ত্যজ্যপুত্র বলে ঘোষণা করলেন। খাটের একপাশে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকা অনিমেষ কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পেল। দাদু আসার পরই ওর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, কিন্তু ও বুঝতে পেরেছিল সেটা টের পেতে দেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কিন্তু ত্যজ্যপুত্র শব্দটার মানে কি?

রহমৎ মিঞার হাতে বাড়ি তরতর করে উঠতে লাগল। ছাতি মাথায় সরিৎ-শেখর সারাদিন মিস্ত্রীদের পেছনে লেগে রইলেন। ট্রাকে করে ইঁট-বালি আসছে। ভারা বেঁধে মিস্ত্রীরা কাজ করছে। বাউণ্ডারির মধ্যে একচালা করে মজুররা সেখানে আস্তানা করে নিয়েছে। সন্ধ্যের সময় ইটের উনুন জ্বালিয়ে রুটি সেঁকতে সেঁকতে রাম-লীলা গায় ওরা তারস্বরে। অনি ঘুরে ঘুরে দেখে সারাদিন। সরিৎশেখর ঠিক করেছেন সামনের বছর ওকে জিলা স্কুলে ভর্তি করে দেবেন। যেহেতু এটা প্রায় বছরের শেষ, ভর্তি হওয়া চলবে না। ফলে অনির আর বই নিয়ে বসতে হয় না। ওদের বাড়ির কাছে বড় রাস্তা নেই। দাদুর সঙ্গে বাজারে যাবার সময় ও দেখতে পায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা লাইন করে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে। জিলা স্কুলে ভর্তি হতে অনিকে যে আরো কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হবে! সরিৎশেখর ওকে খবরের কাগজপড়া শেখাচ্ছেন। রোজ বিকেলে যখন কাগজওয়ালা

কাগজ দিয়ে যায়, তখন প্রথম পাতা জুড়ে মহাত্মা গান্ধী আর জহরলাল নেহরুর ছবি দেখতে পায় অনি।

এখানে শোওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে এই রকম—বড় ঘরটায় সরিৎশেখরের বিরাট খাটটা পাতা আছে। দামী মেহগনি কাঠের খাট। খাটের গায়ে চীনে-লণ্ঠন রাখার একটা স্ট্যাণ্ড। অনি দাদুর সঙ্গে ঐ খাটে শোয়। সারাদিন মিস্ত্রীদের পিছনে খেটে সরিৎশেখর সন্ধ্যে পেরুলেই খাওয়া-দাওয়া সেরে অনিকে নিয়ে শুয়ে পড়েন। অন্ধকার ঘরে দাদুর নাক ডাকা শুনতে শুনতে অনির কিছুতেই ঘুম আসে না। রাত হয়ে গেলে মজুররা আর গান গায় না, শুধু একলা একটা ঢোলক তালে তালে বেজে যায়। সেই বাজনা শুনতে শুনতে অনির মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। আর তখনি বুক কেমন করে ওর কান্না আসে। এখানে ওর একটাও বন্ধু নেই, সমবয়সী কোন ছেলের সঙ্গে ওর আলাপ নেই। পাশের ঘরে শোন হেমলতা। ঘরের এক কোণে রান্নার জিনিসপত্র, অন্য কোণে ঠাকুরের আসন। এইভাবে থাকা ওঁর কোনদিন অভ্যেস নেই। প্রথম দিন ব্যবস্থা দেখে বলেছিলেন, 'ওমা, এইরকম ভাবে থাকব কি করে?' সরিৎশেখর কোন জবাব দেননি। তবে বাড়ি তৈরী না হওয়া অবধি কষ্ট করতে হবেই—উপায় কি—এই রকম একটা ভঙ্গী তাঁর আচরণে ছিল। কিন্তু হেমলতা চমৎকার মানিয়ে নিলেন। এখানকার সংসার, তা যত কষ্টকর হোক তাঁর নিজের। চিরকাল ভাই ভাই-বউদের সঙ্গে থেকে এরকম একটা মজা তিনি পাননি কোনদিন। নিজের সংসার তো কোনকালে করা হল না, বাবা আর ভাই-পোকে নিয়ে নতুন সংসারে অদ্ভুতভাবে মজে গেলেন হেমলতা।

খুব ভোরে সরিৎশেখর অনিকে ঘুম থেকে তোলেন। এই সময় প্রায়ই ভোরের দিকে বৃষ্টি হয়। সরিৎশেখর তা গ্রাহ্য করেন না। বৃষ্টি হলে গামবুট আর ছাতি নিয়ে দাদুর সঙ্গে অনিকে বেরুতে হয়। দাদুরও একই পোশাক। ঘুমে চোখের পাতা এঁটে থাকে, জল ছিটিয়ে চোখ ধুয়ে বেরুতে হয়। বেরুবার সময় সরিৎশেখর হেমলতার ঘুম ভাঙিয়ে যান নইলে দরজা খোলা থাকবে যে। মাঠ পেরিয়ে নাতির হাত ধরে হনহন করে তিনি তিস্তার পারে চলে আসেন। এখন তিস্তা পোয়াতি মেয়ের লাবণ্যে টলটলে। বৃষ্টি না হলে অন্ধকার পাতলা সরের মত পৃথিবীময় জুড়ে থাকে। টুপটাপ তারাগুলো নিভছে। কখনো সাদা হাড়ের মত চাঁদ আকাশের এক কোণে ঝুলে থাকে। সারারাত বিশ্রাম পেয়ে পৃথিবীর বুকের ভিতর থেকে উঠে আসা নিঃশ্বাসের মত একরাশ ঠাণ্ডা বাতাস নদীর জলে খেলা করতে করতে অনিদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যায় মণ্ডলঘাটের দিকে। নদীর বুকে অদ্ভুত এক অন্ধকার লুকোচুরি খেলা করে জলের সঙ্গে। হাঁটতে শুরু করেন সরিৎশেখর কাঁচা রাস্তা ধরে। এক

পাশে নদী, অন্য পাশে ঘুমন্ত শহর। দাদুর দ্রুত পদক্ষেপের সঙ্গে তাল রাখতে অনিকে হাঁপাতে হয়। চলার সময় কোন কথা বলেন না সরিৎশেখর। কিং সাহেবের ঘাট ছাড়াবার পর হঠাৎই পুবের আকাশটা রং বদলায়। অনি দেখেছে, যে মুহূর্তে ওরা কিং সাহেবের ঘাট পেরিয়ে পিলখানার রাস্তায় পা বাড়ায়, ঠিক তখনি অন্ধকার মাটি থেকে হুস করে উঠে গিয়ে গাছের মাথায় মাথায় জমে। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চরাচর ঠাকুরঘরের মত পবিত্র হয়ে যায়। এমন কি মাটির ওপর ধুলোগুলো কেমন শান্ত হয়ে এলিয়ে থাকে শিশির মেখে। অনি দ্যাখে নদীর গায়ে কোথাও অন্ধকার নেই। অদ্ভুত সারল্য নিয়ে জলেরা বয়ে যায়। দু-একটা তারা ডুবে যাবার আগে, যেন কেউ তাদের কথা দিয়ে নিয়ে যায়নি এইরকম আফসোস-মুখে চেয়ে থাকে তখনো। পুবের আকাশটায় হোলি খেলা শুরু হয়ে যায় হঠাৎ। তখনি দাদু দাঁড়িয়ে পড়েন সেদিকে হাত জোড় করে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় খোলা গলায় সূর্য প্রণাম—ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্। কবিতার সুরে সুরে অদ্ভুত এক মায়াময় জগৎ তৈরী হয়ে যায় তখন, প্রতিটি শব্দ যেন সামনের আকাশে অঞ্জলির মত রঙ হয়ে জড়িয়ে যায়। এক সময় দিগন্তরেখায় যেখানে তিস্তার বুকে অসম্ভব লালচে রঙের আকাশ মুখ ডুবিয়েছে সেখানটা কাঁপতে থাকে থর থর করে। সেই কাঁপুনি গায়ে মেখে টুক করে সূর্যটা উঠে পড়ে জল থেকে আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আকাশে একটা আলোড়ন শুরু হয়ে যায়। এক সময় যখন সুন্দর সোনার টিপটা থেকে ঝলক ঝলক আগুন বেরোতে থাকে তখন সরিৎশেখর বাড়ির পথ ধরেন। অনির তখন মনটা কেমন করে ওঠে। যে কোন ভাল জিনিস দেখলেই মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। এই মুহূর্তে ওর দাদুকে খুব ভাল লাগে—ঘুম ভাঙিয়ে তোলার জন্য কোন আফসোস থাকে না।

বাড়ি ফিরে জল খেয়ে বাড়ির কাজে লেগে যান সরিৎশেখর। সারাদিনের প্রতিটি মুহূর্তে মিস্ত্রীদের চিৎকার আর বিভিন্ন রকমের শব্দে বাড়িটা ভরে থাকে। হেমলতা নিজের মনে সংসারের কাজ করে যান। এখানে এসে প্রথমে চাকরবাকর পাওয়া যায়নি। এখন চাকর রাখলেই যেন হেমলতার অসুবিধে হবে বেশী। কোন কাজ নিজের হাতে না করলে তাঁর স্বস্তি হয় না। বাবার খাওয়া-দাওয়ার দিকে তাঁর কড়া নজর। ঠিক সময়ে সরবৎ পাঠিয়ে দেন অনির হাত দিয়ে পাথরের গ্লাসে করে। একদিন অন্তর সকালে বাজারে যান সরিৎশেখর। অনি তখন সঙ্গী হয়। দাদুর সঙ্গে যেতে যেতে রাস্তায় কত রকমের লোকের সঙ্গে দেখা হয়, তাদের বেশীর ভাগই দাদুকে নমস্কার করে কথা বলে, নানা রকম সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে।

অনি বুঝতে পারে ইংরেজরা চলে যাওয়ায় আমাদের অনেক দায়িত্ব বেড়ে গেছে। দাদুর বন্ধুদের কেউ বলেন, যারা ইংরেজদের চাকর ছিল সেই অফিসাররা কি করে দেশ শাসন করবে? আবার একজন বুড়ো বললেন, জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে, এর চেয়ে ইংরেজ-আমল বরং ভাল ছিল। লোকটা কথা বলার সময় চারপাশে চোরের মত তাকাচ্ছিল। অনির ওকে ভাল লাগছিল না। এ-সব কথাবার্তার সবটা অনি বুঝতে পারছিল না। কিন্তু ওর মনে হতে লাগল ও বড় হচ্ছে, একটু একটু করে বড় হচ্ছে।

বাড়ির একদিকে চুড়ো করে বালি রাখা ছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর অনি একা একা সেখানটায় সুড়ঙ্গ তৈরির খেলা খেলত। অনেকটা দূর ওপরের বালি না ভেঙে গর্ত করে চুপচাপ ভেতরে ঢুকে বসে থাকা যায়। এদিকটায় নতুন তৈরী বাড়ির ছায়া পড়ে থাকায় বেশ ঠাণ্ডা। দরজা-জানলার ফ্রেম বসে গেছে। কয়েক-দিন আগেই ঢালাই শেষ হয়ে গিয়েছে। ছাদ পেটানোর কাজ চলছে। রহমৎ মিঞা কম পয়সায় বেশী কাজ পাওয়া যায় বলে একগাদা কামিন নিয়ে এসেছে। তারা সকালে দল বেঁধে আসে, সন্ধ্যের সময় দল বেঁধে চলে যায়। সরিৎশেখর মজুরদের দিয়ে বাড়ির ভিতরের খোলা জায়গায় অজস্র গাছপালা লাগিয়ে নিয়েছেন। তারা শিকড়ে জোর পেয়ে গেছে। অনি ভালবাসে বলে তিনটে পেয়ারা এবং বাউণ্ডারীর ধার ঘেঁষে সার দিয়ে কলাগাছ লাগানো হয়েছে।

সেদিন দুপুরে অনি বালির পাহাড়ের তলায় সুড়ঙ্গ করে একদম ওপাশে প্রায় চলে এল। সারা গায়ে বালি মেখে অনি বেরুতে যাচ্ছে হঠাৎ চাপা গলা শুনতে পেল। ওর মনে হল কোন কারণে দাদু আজ এদিকটায় চলে এসেছেন। আজ এই বালিমাখা অবস্থায় তিনি যদি অনিকে ছাখেন, তাহলে নির্ঘাৎ শাস্তি পেতে হবে। এর আগে বালি নষ্ট করার জন্যে ওকে ধমক খেতে হয়েছে। চোরের মত উল্টোদিকে হামাগুড়ি দিয়ে ফিরতে যেতে অনি আবার গলাটা শুনতে পেল। না, এ গলা তো দাদুর নয়। হিন্দীতে কথা বলছে। ছেলেটা কি যেন বলছে খুব চাপা গলায় আর মেয়েটা না না বলছে সমানে। অনি ফিরল না আর। ওরা কারা দেখার কৌতূহলে ও এগিয়ে গেল হামাগুড়ি দিয়ে। একদম শেষ প্রান্তে গুহার মুখটা বড় হয়নি, একটা বড় ছিদ্র হয়ে রয়েছে, অনি সেখানে চোখ রাখল। ও দেখতে পেল একটা মাঝবয়সী মজুর, যার দাড়ি আছে অনেকটা আর [illegible] [illegible] গায়ে, নতুন আসা একটা লম্বা কামিনের হাত ধরে কথা বলছে। কামিনটা বার বার ঘাড় নাড়ছে আর ভয়-ভয় চোখে চারপাশে তাকিয়ে দেখছে কেউ দেখে ফেলল কি না। কিন্তু মজুরটা যেন কোন কথা শুনতে রাজী নয়। হঠাৎ সে দু-হাতে

কামিনটাকে জড়িয়ে ধরে নিজের বুকে চাপতে লাগল। কামিনটা প্রাণপণে নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করে দুমদুম করে মজুরটার বুকে ঘুষি মারতে লাগল। মজুরটা ভীষণ অন্যায় করছে এটা বুঝতে পারছিল অনি। ওর মনে হল কামিনটাকে বাঁচানো দরকার। চিৎকার করবে কিনা অনি যখন ভাবছে, ঠিক তখনি মজুরটা কামিনটাকে টপ করে চুমু খেয়ে ফেলল। অনি অবাক হয়ে দেখল চুমু খেতেই কামিনটা কেমন হয়ে গেল। হাত পা ছুঁড়ছে না, প্রতিবাদ করছে না, বরং দু-হাতে মজুরটাকে জড়িয়ে ধরেছে ও। আর মজুরটা ওর সমস্ত শরীরে আদর করার মত করে হাত বোলাতে লাগল। এখন চিৎকার করার কোন মানে হয় না, কারণ মেয়েটা তো সাহায্য চাইছে না—এটুকু অনি বুঝতে পারল। এক সময় লোকটা কামিনের ওপরের কালো জামাটা খুলে ফেলল। অনি কামিনটার পিঠ দেখতে পাচ্ছে। কালো শরীরের ওপর একটা ফ্যাকাশে সাদা দাগ। অনেকদিন চাপা পড়ে থাকা ঘাসের মত রঙ। মজুরটার এখন সব আগ্রহ কামিনের বুকের ওপর—যেটা অনির দিক থেকে আড়াল করা। হঠাৎ কার গলা ভেসে এল। কে যেন কাউকে ডাকছে। সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে সরে এল কামিনটা এদিকে আর মজুরটা সাড়া দিতে দিতে দৌড়ে চলে গেল কামিনটাকে কি যেন বলে। মাটিতে পড়ে থাকা জামাটা দ্রুত তুলে নিয়ে এপাশে ফিরে হাঁটু গেড়ে বসে সে পরতে লাগল। অনি দেখল মেয়েটির তামাটে রঙের বড় বড় বুকের ওপর লালচে লালচে দাঁতের দাগ। এভাবে কোনদিন এইরকম বুক ছাখেনি অনি। মেয়েটি জামা পরতে পরতে কি মমতায় একবার দাগগুলোর ওপর হাত বুলিয়ে নিল। তারপর অনির পাশে বালির ওপর পিচ করে থুতু ফেলে হেলতে দুলতে চলে গেল।

মেয়েটি চলে যাবার পর অসাড় হয়ে অনি শুয়ে থাকল বালির ভেতর। ওর মাথা ঘুরছিল এবং বুঝতে পারছিল ওরা খুব খারাপ কিছু করছিল যেটা সবার সামনে করা যায় না। মেয়েটা তাহলে প্রথমে অত ছটফট করছিল কেন? কেন লোকটাকে ঘুষি মারছিল? আবার পরে লোকটা যখন ওর বুকে অমন করে দাঁত বসিয়ে দিল তখন ও কেন যন্ত্রণা পায়নি? কেন তখনো ও মজুরটাকে আদর করছিল? হঠাৎ ওর মালবাবুর ছোট মেয়ে সীতার কথা মনে পড়ে গেল। সীতা ওর চেয়ে এক বছরের ছোট। বাড়ি থেকে খুব কম বের হয়। কিন্তু ওর হাত একটু শক্ত করে ধরলে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে। সীতাও কি বুকে ওরকম করে কামড়ে দিলে কাঁদবে না? সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে পড়ল সীতার বুক তো ওদের মতই একদম সমান। তাহলে বড় হলে সীতার বুক নিশ্চয়ই এই কামিনটার মত হয়ে যাবে। আর বুক বড় হলে মেয়েদের নিশ্চয়ই ব্যথা লাগে না। সমস্যাটার

এই রকম একটা সমাধান করতে পেরে অনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়তেই চাপ লেগে বালির দেওয়াল ধসে পড়ল। অনি দেখল ওপরের বালি হুড়মুড়িয়ে তাকে চাপা দিতে আসছে। কোন রকমে টেনেহিঁচড়ে ও বাইরের খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে এল।

বাড়ি শেষ হয়ে গেলে হেমলতার চাপে সরিৎশেখর ঘটা করে গৃহপ্রবেশের ব্যবস্থা করলেন। ঝকঝকে তকতকে বাড়ির দিকে তাকালে তাঁর চোখ জুড়িয়ে যায়। নতুন রঙ আর সিমেন্টের গন্ধ নাক ভরে নেন তিনি। সাধুচরণের সঙ্গে এখানকার কালীবাড়ির পুরোহিতের খুব ভাব আছে। তিনি সরিৎশেখরকে কোলকাতার কাছে হালিশহরে এক তান্ত্রিকের খবর দিলেন, যিনি নাকি সিদ্ধ-পুরুষ। অনেক চেষ্টাচরিত্র করে তাঁকে আনানোর ব্যবস্থা হল। স্বর্গছেঁড়া থেকে সবাই এসে হাজির। এখানে আসার পর অনি একদিনও স্বর্গছেঁড়ায় যায়নি। সরিৎশেখর পাঠাতে চেয়েছিলেন কিন্তু মহীতোষ জানিয়েছিলেন এত ঘন ঘন এলে শহরে মন বসবে না। মাধুরী আসার পর হেমলতা বললেন, 'গ্যাখ, তোর ছেলে কত রোগা হয়ে গেছে!'

মাধুরী ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, 'রোগা কোথায়, ও দেখছি বেশ লম্বা হয়েছে।'

হেমলতা বললেন, 'হবে না কেন? এ বংশের ধারাই তো লম্বাটে।'

এক সময় একটু একলা পেয়ে মাধুরী ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁ রে, আমার জন্যে তোর মন-কেমন করে না?' আর সঙ্গে সঙ্গে অনি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল।

সেই কান্না শুনে বাড়ির সবাই ছুটে এসে দেখল অনি মাধুরীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। মাধুরী ছেলেকে যত থামাতে চান কান্না তত বেড়ে যেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত হেমলতা বললেন, 'না ভাই, এতদিন পর দেখা হল আর তুমি ওকে বকাবকি করছ—এটা উচিত হয়নি।'

এমন কি সরিৎশেখর অবধি যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে বললেন, 'না, বৌমা, তুমি বড্ড ছেলেকে শাসন করো।' মাধুরী লজ্জায় মরে যান। ছেলে যে এভাবে কেঁদে উঠবে বুঝতে পারেননি তিনি।

তোড়জোড় চলতে লাগল গৃহপ্রবেশের। কাল মঙ্গলবার, সব মিলিয়ে দিন ভাল। আত্মীয়স্বজন তো আছেনই, সরিৎশেখর শহরের সমস্ত বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছেন। কিন্তু আজ সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা, টিপটিপিয়ে বৃষ্টি পড়ছে।

কে যেন এসে বলে গেল তিস্তায় জল বেড়েছে। ভোরে বেড়াতে যাবার সময় সরিৎশেখর তেমন কিছু লক্ষ্য করেননি। উঠোনে ভিয়েন বসেছে। কাল দুপুরে খাওয়া-দাওয়া হলেও আজ থেকে মেয়েদের রান্নাঘরে যেতে হচ্ছে না। সন্ধ্যের ট্রেনে হালিশহরের সিদ্ধপুরুষ একজন শিষ্যসমেত এসে গেলেন। সরিৎশেখর মহীতোষকে নিয়ে স্টেশনে গিয়েছিলেন তাঁকে আনতে। কিন্তু তিনি সোজা গিয়ে কালীবাড়িতে উঠলেন। ঠিক হল পরদিন ভোরে পুরোহিতমশাই-এর সঙ্গে উনি চলে আসবেন। খাওয়া-দাওয়া সারতে রাত হয়ে গেল। ঠিক হল টিনের চালায় মেয়েরা বাচ্চাদের নিয়ে শোবেন। যেহেতু গৃহপ্রবেশ এখনো হয়নি তাই ঘরে নয়, নতুন বাড়ির ঢাকা বারান্দায় শতরঞ্চি বিছিয়ে ছেলেদের শোওয়ার ব্যবস্থা হল। শোওয়ার আগে ক্যাম্প খাট পেতে সরিৎশেখর একবার অনির খোঁজ করতে হেমলতা বললেন, 'ও মায়ের সঙ্গে শোবে।'

বড় ঘর থেকে খাটটা সরানো গেল না। তাই মেয়েরা মাটিতে ঢালাও বিছানা পেতে শুলেন। খাটের ওপর মাধুরী আর অনি। মাধুরী নীচেই শুতে চেয়েছিলেন, হেমলতা বকাবকি করাতে রাজী হতে হল।

মায়ের কাছে এতদিন বাদে শুয়ে অনির কিছুতেই ঘুম আসছিল না। মায়ের গায়ের গন্ধ মায়ের নরম হাত ওকে কেমন আবিষ্ট করে রেখেছিল। মাধুরী এক সময় চাপা গলায় বললেন, 'তুই সকালে অমন বোকার মত কাঁদলি কেন? সবাই আমাকে বকলো।'

অন্ধকার ঘরে মায়ের বুকের কাছে মুখ রেখে অনি বলল, 'তুমি আমাকে বললে কেন? তুমি জান না বুঝি।' মাধুরী ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মায়ের বুকের ওপর গাল রাখতে গিয়ে অনির চট করে সেই কামিনটার কথা মনে পড়ে গেল। ও বলল, 'মা, তোমার বুকে যদি আমি কামড়ে দাগ করে দিই তাহলে তোমার লাগবে না?'

চাপা গলায় ছেলের প্রশ্নটা শুনে মাধুরী হকচকিয়ে গেলেন। অনি যে এ ধরনের প্রশ্ন করবে ভাবতেই পারেননি। কোনরকমে বললেন, 'মানে?'

অনি বলল, 'জানো, এখানে না একটা কামিনের বুকে একটা কুলি অনেক দাঁত বসিয়ে দিয়েছিল কিন্তু কামিনটা একদম কাঁদেনি! বড় বুকে কামড়ালে লাগে না, না?'

উত্তেজনায় মাধুরী উঠে বসতে যাচ্ছিলেন, কোনরকমে কৌতূহল চেপে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই কি করে জানলি?'

তখন অনি পুটুরপুটুর করে মাকে সব কথা বলল, এমন কি সীতার কথাটাও।

মাধুরী কি করবেন প্রথমটা বুঝতে পারছিলেন না। ব্যাপারটা খারাপ বললে ছেলেদের যদি কৌতূহল বেড়ে যায়! শেষ পর্যন্ত মাধুরী বললেন, 'ওরা ভীষণ অন্যায় করেছে তাই লুকিয়েছিল। তুমি ওসব আর দেখো না। ওসব দেখলেও পাপ হয়, ভগবান রাগ করেন।'

অনি বলল, 'আমার তাহলে পাপ হয়েছে?'

মাধুরী ছেলের মাথায় হাত রাখলেন, 'না, মায়ের কাছে সব কথা খুলে বললে কোন পাপ আর থাকে না। তুমি চিরকাল আমাকে সব কথা খুলে বলো অনি।'

মাধুরীর খেয়াল হল তার পেটে আর একটি সন্তান এসে গেছে। এই অবস্থায় টানটান হয়ে শোওয়া উচিত নয়। মাধুরী হাঁটু দুটো পেটের কাছে নিয়ে এসে পাশ ফিরে শুলেন।

সিদ্ধপুরুষ তান্ত্রিকের নাম শনিবাবা। বিশাল তাঁর চেহারা, যেমন ভুঁড়ি তেমনি লম্বা। লাল কাপড় পরে খড়ম পায়ে রিকশা থেকে যখন নামলেন তখন অনির ভয়ে চোখ বন্ধ হবার যোগাড়। পিসীমা আগে গল্প করেছিলেন, তান্ত্রিকেরা নাকি ইচ্ছে করলে যা খুশি করতে পারে। শনিবাবাকে দেখলেই বুক হিম হয়ে যায়, সামনে যাবে কি!

পুজোয় বসার আগে শনিবাবা একবার নতুন বাড়ির চারপাশে পাক দিয়ে এলেন। যে ঘরটা ঠাকুরঘর হবে বলে হেমলতা ঠিক করেছিলেন সেখানেই পুজোর আসন পাতা হয়েছে। আসনে বসে অনেকক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে থাকলেন শনিবাবা। ওঁর সামনে কোন মূর্তি নেই। শুধু চারটে মোটা চন্দনকাঠের টুকরো ছড়ানো বালির ওপর সাজানো রয়েছে। শনিবাবার অনেকটা পিছনে ঘরের মধ্যে সরিৎশেখর হাঁটু গেড়ে বসে, তাঁর পেছনে পুরোহিত মশাই, মহীতোষ এবং সাধুচরণ বসে আছেন। প্রিয়তোষ রান্নাবান্নার দিকটা তদারক করছে। মেয়েরা ভিড় করে দরজায় দাঁড়িয়ে। ভেতরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না কেউ। ওঁদের আড়ালে দাঁড়িয়ে সামান্য ফাঁক দিয়ে অনি শনিবাবার পিঠটা দেখতে পাচ্ছে। হেমলতা মাধুরীকে বলেছেন অনিকে যেন শনিবাবার সামনে খুব একটা যেতে না দেওয়া হয়। কারণ তান্ত্রিক-মানুষকে বিশ্বাস নেই, ছোট ছেলেমেয়েদের প্রতি ওঁদের নাকি আগ্রহ থাকে। শোনার পর থেকে মাধুরী ছেলেকে আগলে আগলে রাখছেন।

হঠাৎ শনিবাবা টানটান হয়ে বসলেন। তারপর চোখ খুলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। ঘরের সবাই অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকাতেই বাজখাঁই গলায় তিনি ডাকলেন, 'সরিৎশেখর!'

সরিৎশেখর চমকে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

শনিবাবা বললেন, 'এত অমঙ্গলের ছায়া কেন? এত শত্রু কেন তোমার?'

উত্তরে সরিৎশেখর কোন রকমে বললেন, 'সে কি!'

শনিবাবা বললেন, 'এর মধ্যেই ওরা কাজ সুরু করে দিয়েছে। এভাবে চললে খুব শীঘ্র তোমার অঙ্গহানি হবে। আমি বাড়িতে ঢুকতেই অনুভব করেছিলাম কেউ একজন খুশী হল না।'

সরিৎশেখর হাত জোড় করে বললেন, 'আমি তো জেনেশুনে কোন অন্যায় করিনি, বাবা—আপনি দেখুন।'

শনিবাবা বললেন, 'এই বাড়ি বাঁধতে হবে। তোমরা একটা কুলোয় চারটে প্রদীপ, চার পাত্র দুধ, চারটে ফল আর চারটে জবাফুল তুলসীপাতার ব্যবস্থা কর এক্ষুনি!' কথা শেষ হওয়া মাত্র সরিৎশেখর দরজায় দাঁড়ানো মেয়েদের দিকে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে মেয়েরা ছুটলো জিনিসগুলোর ব্যবস্থা করতে। মোটামুটি সবই পুজোর ব্যাপারে আনা ছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে সরিৎশেখর কুলোটাকে শনিবাবার সামনে ধরলেন। সেদিকে একবার চোখ বুলিয়ে শনিবাবা মাটিতে রাখা তাঁর লাল ঝুলিটা থেকে একটা কাঠের বাক্স বের করলেন। কাঠের বাক্সের ডালাটা সন্তর্পণে খুলতে সরিৎশেখর দেখতে পেলেন তার মধ্যে দু'ইঞ্চিটাক লম্বা চারটে ফণাতোলা গোখরো সাপ রয়েছে। কুচকুচে কালো ইস্পাতের তৈরী সাপগুলোর ফণার ডগা খুব ছুঁচলো। চট করে জ্যান্ত বলে ভুল হয়। শনিবাবা সেগুলোকে বের করে কুলোর উপর রাখলেন। তারপর বললেন, 'এঁরা তোমার বাড়ি রক্ষা করবে। এই কুলোটাকে মাথায় ওপর নিয়ে তুমি বাইরে চল। এদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে।'

সম্মোহিতের মত সরিৎশেখর কুলো মাথায় তুলে নিলেন। মেয়েরা সঙ্গে সঙ্গে দরজা ছেড়ে দিল। মাধুরী ছেলেকে আড়াল করে সরে দাঁড়ালেন। প্রথমে শনিবাবা, তাঁর পেছনে কুলো মাথায় সরিৎশেখর, পুরোহিত মশাই, মহীতোষ, সাধুচরণ লাইন দিয়ে ঘর থেকে বেরুলেন। যেতে যেতে শনিবাবা বললেন, 'একটা কোদাল আনতে বল কাউকে।' কথাটা শুনে দূরে দাঁড়ানো প্রিয়তোষ একছুটে কোদাল নিয়ে এল।

শনিবাবা প্রথমে গেলেন বাড়িটার পূর্ব-দক্ষিণ কোণে। তারপর কি ভেবে বাগান পেরিয়ে একদম বাউণ্ডারীর কোণায় চলে এসে ইঙ্গিতে প্রিয়তোষকে মাটি খুঁড়তে বললেন। প্রিয়তোষ যখন অনেকটা গর্ত করে ফেলেছে তখন তিনি গম্ভীর গলায় 'মা' 'মা' বলে ডেকে উঠে সরিৎশেখরের কুলো থেকে প্রথমে একটা সাপকে সযত্নে

গর্তের ভেতর বসিয়ে দিলেন। তারপর নৈবেদ্যর মত প্রদীপ, ফল, ফুল একটা করে তার সামনে সাজিয়ে নিজের হাতে মাটি চাপা দিতে লাগলেন। মাটি সমান হয়ে গেলে বললেন, 'সাত দিন যেন কেউ এখানে পা না দেয়। যে দেবে তার মৃত্যু অনিবার্য।'

একে একে বাড়ির আর তিনটে কোণে সাপ প্রতিষ্ঠা করা হয়ে গেলহঠাৎ হাওয়া উঠল বেশ। গাছের ডালপালাগুলো শব্দ করে দুলতে লাগল। শনিবাবা একবার আকাশের দিকে মুখ করে কিছু দেখলেন, তারপর সরিৎশেখরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেঁচে গেলি।'

পুজো শুরু হতে নিমন্ত্রিতদের আসা শুরু হয়ে গেল। সরিৎশেখরের নির্দেশ পুজো শেষ না হলে খাওয়া-দাওয়া হবে না। বৃষ্টি আসতে পারে যে-কোন মুহূর্তে, তাই ঢাকা লম্বা বারান্দায় খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। পুজো করতে করতে শনিবাবা অদ্ভুত রহস্যময় হয়ে উঠেছেন। মাঝে মাঝে অদৃশ্য কাউকে ধমক দিচ্ছেন, হাসছেন, আবার ছেলেমানুষের মত অভিমান করছেন। শেষে চন্দনকাঠে আগুন জ্বালালেন তিনি। পুড়ছে কাঠ, অদ্ভুত সুগন্ধযুক্ত ধোঁয়া বেরুচ্ছে তা থেকে। হঠাৎ ঝুলি থেকে কিছু একটা বের করে তাতে ছুঁড়লেন শনিবাবা। সঙ্গে সঙ্গে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। শনিবাবা সরিৎশেখরকে বললেন, 'এবার অগ্নি আমায় আকর্ষণ করবে। তোমরা আমাকে ধরে রাখবে।' কথাটা বলে শনিবাবা উঠে দাঁড়িয়ে সেই বস্তুটি আরো ঐ আগুনে ছড়িয়ে দিয়ে 'মা' 'মা' বলে ডাকতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে আগুনের শিখা বাড়তে লাগল। ক্রমশ তা বিশাল আকার ধারণ করে শনিবাবার মাথা ছাড়িয়ে উঠে গেল। আর তখনি শনিবাবার সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল। খুব আলতো করে সরিৎশেখর শনিবাবাকে স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন, হঠাৎ মনে হল শনিবাবাকে কে যেন সামনের দিকে টানছে প্রচণ্ড জোরে। এক সময় তিনি নিজে যেন আর শনিবাবাকে ধরে রাখতে পারবেন না বলে মনে হল। ওঁর অবস্থা দেখে পুরোহিত মশাই উঠে এসে হাত লাগালেন। শনিবাবা তখন অনর্গল সংস্কৃত শব্দ সহযোগে মাকে ডেকে যাচ্ছেন। ওঁর শরীরের উত্তাপে যেন সরিৎশেখরের হাত পুড়ে যেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত কেউ যেন পলতে কমানোর মত আগুনটাকে কমিয়ে দিতে শনিবাবার কাঁপুনিটা থেমে গেল। শনিবাবার কাঁপুনিটা যে ইচ্ছাকৃত নয় এটুকু বুঝতে পারছিলেন সরিৎশেখর। কোন মানুষকে ধরে রাখলে সেটা বোঝা যায়।

পুজো শেষ হয়ে গেলে অনেকক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন সরিৎশেখর। অঙ্গহানি কেন হচ্ছিল তাঁর? অঙ্গহানি বলতে উনি কি বোঝালেন? শারীরিক কোন আঘাত,

দেখতে দেখতে ওর বেশ মজা লাগছিল এখন। সরিৎশেখর বললেন, 'ওকে এনেছি।'

শনিবাবা চোখ খুললেন, 'এনেছ! তোমার প্রিয়জন তাহলে এই! কে হয় তোমার?'

সরিৎশেখর বললেন, 'আমার নাতি।'

শনিবাবা বললেন, 'আর নাতি আছে?'

সরিৎশেখর উত্তর দিলেন, 'না। এ আমার দ্বিতীয় পুত্রের একমাত্র সন্তান। প্রথম পুত্র বিবাহ করে নি এবং আমার সঙ্গে সম্পর্ক নেই।'

শুয়ে শুয়ে শনিবাবা হাত নেড়ে অনিকে ডাকলেন, 'এদিকে এস।'

ডাকের মধ্যে এমন একটা সহজ ভাব ছিল যে অনির একটুও ভয় লাগল না। ও স্বচ্ছন্দে উঠে এসে কাছে দাঁড়াতেই পিছন থেকে দাদু ওকে প্রণাম করতে বললেন। হাত নেড়ে নিষেধ করলেন শনিবাবা, 'না, তুমি আমার সামনে বস। কেউ শুয়ে থাকলে কক্ষনো তাকে প্রণাম করবে না। নাম কি?'

বসতে বসতে অনি উত্তর দিল, 'অনিমেষ।'

এক গাল হাসলেন শনিবাবা, 'বীর, মানুষ আমরা নহি তো মেষ। অনিমেষ মানে জান?'

ঘাড় নাড়ল অনি, 'স্থির, শান্ত।'

শনিবাবা বললেন, 'যার নিমেষ নেই, দেবতা। আবার মাছকেও অনিমেষ বলা হয়, জান? তোমার বয়স কত?'

পেছন থেকে সরিৎশেখর বললেন, 'সাত।'

শনিবাবা বললেন, 'আমার দিকে তাকাও।'

অনি শনিবাবার মুখের দিকে তাকাতেই চোখোচোখি হয়ে গেল। অনি হঠাৎ টের পেল ওর শরীর কেমন হয়ে যাচ্ছে, ও যেন নড়তে-চড়তে পারছে না অথচ সব কিছু বুঝতে দেখতে পারছে। শনিবাবার চোখের মধ্যে ওগুলো কি? নিজের চোখ বন্ধ করতে গিয়েও পারল না অনি।

শনিবাবা বললেন, 'সরিৎশেখর! তোমার এই নাতি বংশছাড়া, যৌবন এলে একে আর তোমাদের মধ্যে পাবে না। এর জন্যে মায়া আর বাড়িও না। এই ছেলে যতটা নরম হৃদয়ের ততটাই নির্দয়। তবে হ্যাঁ, এ যদি তোমার সব চেয়ে প্রিয়জন হয় তবে তোমার আর অঙ্গহানির সম্ভাবনা নেই। জন্ম থেকে এ প্রতিরোধ শক্তি নিয়ে এসেছে।'

সরিৎশেখর ফিসফিস করে বললেন, 'ভবিষ্যৎ?'

'কেউ বলতে পারে না সরিৎশেখর, কারণ সেটা প্রতি মুহূর্তের আবর্তনে পাল্টে

যেতে পারে। অতীত স্থির থাকে চিরকাল তাই সেটা বলা যায়। তবে মনে হয়, ও বিদ্বান হবে কিন্তু আঠারো বছর বয়সে রাজনৈতিক কারণে ওকে জেলে যেতে হতে পারে। যদি তাই যায় তাহলে আমি আর কিছু বলতে পারব না। কিন্তু একটা জিনিস বলছি, এর জীবনে বহু নারী আসবে, নারীদের কাছে ও চরম দুঃখ পাবে, নারীদের জন্য কর্মভ্রষ্ট হবে আবার কোন কোন নারীর জন্য ও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে। সরিৎশেখর, একে তুমি কোন কাজে বাধা দিও না কখনো।' কথাগুলো একটানা বলে চোখ বন্ধ করলেন শনিবাবা। তারপর স্থির হয়ে গেলেন। পুরোহিত মশাই-এর ইঙ্গিতে সরিৎশেখর উঠে এস অনিকে বাইরে নিয়ে এলেন। অনির মনে হল, অনেকক্ষণ বাদে একটা অন্ধকার ঘর থেকে সে আলোয় এল।

কাজকর্ম সারতে বিকেল হয়ে এল। সকাল থেকে টুপটাপ হালকা চালে যে বৃষ্টিটা খেলা করে যাচ্ছিল, দুপুরের পর সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ব্যাণ্ডেজ জড়ানোর মত আকাশটা মেঘে মেঘে ঢাকা রইল। এখনও এখানে শীত পড়েনি। মাত্র ত্রিশ মাইলের ফারাকে স্বর্গছেঁড়া আর জলপাইগুড়ির মধ্যে প্রকৃতিদেবী দু রকম চেহারা নিয়ে বিরাজ করেন। ভোরের দিকে একটু হিমহিম হয়। কাল রাত্রে মেঝেতে যারা বিছানা করে শুয়েছিল শেষরাত্রে তারা তাই তড়িঘড়ি উঠে পড়েছে। এবার পুজো কার্তিকের কিছুটা পেরিয়ে। মনে হচ্ছে কালীপুজোর অনেক আগেই শীত পড়ে যাবে। কাল রাত্রে আকাশে মেঘ ছিল, আজ হিমেল হাওয়া দিচ্ছে। মাধুরী অনিকে সোয়েটার পরিয়ে দিয়েছেন। আকাশ দেখে কে বলবে এটা শরৎকাল, কদিন বাদেই পুজো!

শনিবাবা বিকেলের ট্রেনে শিষ্য সমেত ফিরে গেলেন। জলো হাওয়া লাগলে টনসিল ফুলবে বলে অনিমেষকে স্টেশনে নিয়ে যাননি সরিৎশেখর। ওঁরা ফিরতে ফিরতে মেঘে মেঘে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেল। অনি আজ সারাদিন মায়ের কাছাকাছি। শনিবাবা ওর সম্বন্ধে যা ভবিষ্যৎ-বাণী করেছেন তা এখন সবাই জেনে ফেলেছে। হেমলতা ঠাট্টা করে বলেছেন, 'বাবার তো দুটো বিয়ে ছিল, এ ছোঁড়াকে যদি মেয়েমানুষ ধরে কটা বিয়ে করে কে জানে।' মাধুরী চাপা গলায় বলেছিলেন, 'ঐটুকুনি ছেলের সামনে এসব কথা কেন যে ওঁরা বললেন!'

হেমলতা বলেছিলেন, 'ভীমরতি গো, ভীমরতি। নাতি নাতি করে বাবা হেদিয়ে গেলেন। তুমি জান না এই কটা মাস আমাকে সব সময় পিটপিট করেছেন যেন অনির কোন কষ্ট না হয়! তুমি হাসছ যে!'

মাধুরী বলেছিলেন, 'আপনার ভাই বলে, আপনিই নাকি ওকে বেশী প্রশ্রয় দেন।'

হেমলতা কিছু বললেন না প্রথমটা, তারপর আস্তে আস্তে বলেছিলেন, 'কিন্তু জেলে যাবার কথাটা শুনে অবধি কিছু ভাল লাগছে না আমার। হ্যাগো, লোকটা সত্যিই সিদ্ধপুরুষ নাকি ?'

কথাটা এক ফাঁকে মহীতোষকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন মাধুরী। সিগারেট খেতে ছাদে গিয়েছিলেন মহীতোষ। এখনও ছাদের কাজ অনেক বাকী। চিলেকোঠার ঘরে প্লাস্টার হয়নি। ইঁটগুলো সিমেন্টের ভাঁজ গায়ে জড়িয়ে রয়েছে। ছাদ থেকে তিস্তা নদীর দিকে চোখ পড়তেই অবাক হয়ে গেলেন মহীতোষ। এত জল বেড়েছে যে ওপার দেখা যাচ্ছে না। জলের রঙ এই এত দূর থেকে কেমন কালচে কালচে লাগছে। এমন সময় অনিকে নিয়ে মাধুরী ছাদে এলেন। ন্যাড়া ছাদে ছেলেকে একা ছাড়তে চাননি মাধুরী। এসে স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আর তখনি অনির কথাটা, জেলে যাবার কথাটা বললেন তিনি। মহীতোষ কথাটা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন, 'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, এসব কেউ বিশ্বাস করে! শনি-বাবা বোধ হয় ভুলে গিয়েছেন যে, দেশ স্বাধীন হয়ে গিয়েছে। এখন আর আঠারো বছর বয়সে কাউকে জেলে যেতে হবে না।'

মাধুরী বললেন, 'কিন্তু এতবড় সিদ্ধপুরুষ—'

মহীতোষ হাসলেন, 'কত বড় ?'

মাধুরী ভ্রূকুটি করলেন, 'সবতাতে ঠাট্টা ভাল লাগে না। দুম করে উনি ছেলেটার নামে এ সব বলবেনই বা কেন ?'

মহীতোষ বললেন, 'কারণ উনি বাবাকে কব্জা করতে চান। না হলে বাবার প্রিয়জনকে আনতে বলতেন না। আমাদের চৌদ্দপুরুষ কেউ রাজনীতি করেনি—অনি খামোকা জেলে যেতে যাবে কেন ? যত্ত সব !'

মাধুরী বললেন, 'মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল।'

মাধুরীর মুখটা খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। অনিকে এক হাতে জড়িয়ে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। সেদিকে তাকিয়ে মহীতোষ বললেন, 'তা দেশ যখন উদ্ধার হয়ে গিয়েছে ও নিশ্চয় চুরি ডাকাতি করে বা নারীঘটিত ব্যাপারে জেলে যাবে—শনিবাবা মেয়েদের সঙ্গে ওর সম্পর্কের কথা কি যেন বললেন ?'

মাধুরী ভ্রূকুটি করে সরে দাঁড়াতে গেলেন, 'কি যে সব ছাইপাঁশ বল।' ঘুরে দাঁড়াবার মুহূর্তে ওঁর মাথাটা কেমন করে উঠল। ভিজে ছাদের ওপর পা যেন স্থির থাকছে না। সারাদিন খুব পরিশ্রম গিয়েছে, হেমলতার নিষেধ শোনেননি। খাওয়া-দাওয়ার ঠিক ছিল না আজ, অবেলায় খেয়ে অম্বল হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ চোখে অন্ধকার দেখলেন।

অনি এতক্ষণ হাঁ করে বাবা-মায়ের কথা শুনছিল, এখন ঘাড়ে মায়ের দুই হাতের প্রচণ্ড চাপ পড়তে চিৎকার করে উঠে দেখল মা পা পিছলে পড়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ও মায়ের কোমর জড়িয়ে ধরতে গেল। পেটে চাপ পড়তে মাধুরী চিৎকার করে ছাদের ওপর উপুড় হয়ে পড়লেন। মহীতোষ দৌড়ে এসে স্ত্রীকে আঁকড়ে ধরলেন, 'কি হল, পড়ে গেলে কেন?' চোখের সামনে ওঁকে পড়ে যেতে দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন প্রথমটা। মারাত্মক কিছু ঘটে গেছে একটা এই রকম বোধ হতে মাধুরীর মুখটা তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কষ্ট হচ্ছে?'

মাধুরী ঘাড় নাড়লেন, 'না।' কিন্তু তাঁর মুখ দেখে মহীতোষ চমকে উঠলেন। দরদর করে ঘামছেন মাধুরী। স্ত্রীকে ছাদের ওপর শুইয়ে দিয়ে ছেলেকে বললেন, 'যা, শিগগির পিসীমাকে ডেকে আন।' মাধুরীর চেতনা ছিল, তিনি হাত নেড়ে নিষেধ করতে না করতে অনি এক লাফে ছাদ থেকে চিলেকোঠার সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল।

পাতলা অন্ধকার নেমে এসেছে বাড়িটার ওপর, ছাদে এতক্ষণ বোঝা যায়নি। নিচে নামতেই অনি দেখল পিসীমা ছোটঘরের বারান্দায় লণ্ঠনগুলো জড়ো করছেন। ও চিৎকার করে উঠল, 'পিসীমা তাড়াতাড়ি এসো—মা কেমন করছে!' চিৎকারটা হঠাৎ কান্না হয়ে যেতে হেমলতা চমকে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। লণ্ঠন পড়ে রইল, তিনি হুড়দাড় করে অনির দিকে ছুটে এলেন। সরিৎশেখর সবে স্টেশন থেকে এসে পাঞ্জাবি খুলে হাতপাখার বাতাস খাচ্ছিলেন, অনির চিৎকার শুনে তিনিও হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন।

হেমলতা তাঁর ভারী শরীর নিয়ে অনির কাছে এসে দেখলেন ছেলের মুখ সাদা হয়ে গেছে ভয়ে, 'তোর মা কোথায়, কি হয়েছে?'

অনি কথা বলতে পারছিল না, আঙুল দিয়ে ছাদটা দেখিয়ে দিল। এক পলক ওপরদিকে তাকিয়ে হেমলতা গজগজ করতে করতে ছাদের সিঁড়ির দিকে ছুটলেন. 'আঃ, এই সন্ধ্যেবেলায় আবার ছাদে উঠল কেন! এত করে বললাম পেটের বাচ্চা নড়াচড়া করছে যখন, তখন খাটাখাটনি করো না, তা শুনবে আমার কথা!'

সরিৎশেখর দ্রুত এসে অনিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে দাদু?'

অনি কেঁদে ফেলল, 'মা পড়ে গেছে।'

সরিৎশেখর আর দাঁড়ালেন না। অনি দাদুর পেছনে পেছনে ছাদে ছুটল।

বৃষ্টিটা এতক্ষণ থমকে ছিল, বেশ আবার ছোট ছোট ফোঁটা পড়া শুরু হল। এ এক অদ্ভুত ধরনের বৃষ্টি। মেঘ ডাকছে না, সামান্য হাওয়াও নেই, আকাশ চিরে ঝলকে ওঠা বিদ্যুতের দেখা নেই। তবু বৃষ্টি পড়ছে, থরথরে মেঘগুলো নিঃশব্দে গলে

গলে পড়ছে। মহীতোষ বোকার মত স্ত্রীর পাশে বসেছিলেন, দিদিকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। হেমলতার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে?'

যন্ত্রণায় মাধুরীর চোখ বোজা ছিল, হেমলতার গলা শুনে কিছু বলতে গিয়ে না পেরে মাথা নাড়লেন। মহীতোষ বললেন, 'হঠাৎ মাথা ঘুরে গেছে।' কথাটা শেষ হতে না হতে মাধুরীর শরীরটা কাঁপতে লাগল। তারপর প্রচণ্ড যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্য শরীর মোচড়ানো শুরু হল। সারা শরীর ওর ঘামে ভিজে যাচ্ছে, তার উপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে এখন। বেশীক্ষণ এভাবে থাকলে ভিজে একসা হয়ে যাবে।

হেমলতা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ভাইকে বললেন, 'ওকে নিচে নিয়ে চল।' মহীতোষ একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন। দিদিকে ডাকতে পাঠিয়ে তিনি মাধুরীকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মাধুরীর শরীর এমনিতেই ভারী, এখন যেন আরো ওজন বেড়েছে। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নিয়ে যাওয়া খুব সহজ নয়, ওঁর পক্ষে অসম্ভব।

মহীতোষ বললেন, 'তুমি একটা দিক ধরো, চিলেকোঠার দিকে নিয়ে যাই, বৃষ্টিতে ভিজবে না।' হেমলতা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন মাধুরীকে একা মহীতোষের পক্ষে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না, তাই দুজনে ধরাধরি করে চিলেকোঠার ঘরে নিয়ে এলেন। সিঁড়িটা এখানে চট করে ছাদে উঠে আসেনি। সিঁড়ি শেষ হবার পর খানিকটা সমতল জায়গাকে ঘরের মতো ঢেকে ছাদের শুরু। মাধুরীকে সেখানে রাখা হল। এটুকু আনতেই হেমলতা টের পেলেন যে ওকে নিচে নিয়ে যাওয়া বোকামি হত, সামান্য নড়াচড়ায় ওর কষ্ট যে অনেক গুণ বেড়ে যাচ্ছে এটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না।

যৌবন আসতে না আসতে বিধবা হয়েছিলেন হেমলতা। স্বামী ছিল, তার মুখ চোখ ভাল করে মনে ধরার আগেই এক রাত্রির অসুখে মরে গেল লোকটা। তারপর এতগুলো বছর শুধু পার করে দেওয়া, এক রাত্রির জন্য নারী হওয়া যাঁর ভাগ্যে ঘটেনি, মা হবার কোন প্রশ্নই তো ওঠে না। স্বর্গছেঁড়ার নির্জন চা-বাগানে বসে সরিৎশেখর মেয়ের আবার বিয়ে দেবার কথা ভাবতেন। বিদ্যাসাগর মশাই অত চেষ্টা করলেন, হয়তো কলকাতা শহরে অহরহ বিধবা-বিবাহ হচ্ছে কিন্তু স্বর্গছেঁড়ার লোকজন ব্যাপারটা চিন্তা করতে পারে না। এমন কি হেমলতাও। স্ত্রীকে দিয়ে মেয়েকে বলিয়েছিলেন, শুনে হেমলতা বলেছিলেন, 'ছি!' আর কথা বাড়াননি সরিৎশেখর। বিয়ের সময় ভাল করে কাপড় পরতো না যে, জীবনে আর ভ্রেস করে শাড়ি পরা হল না তাঁর। একেবারে সরুপাড় সাদা

শাড়ি অঙ্গে উঠল। বয়স যত বাড়ছে পাড় তত ছোট হতে হতে নরুনে ঠেকেছে। ছোটমা যখন স্বর্গছেঁড়ায় এল তখন হেমলতার বয়স বড়জোর আট। সেই বয়স থেকে হাত পোড়ানো শুরু হয়েছে। মহীতোষ বা পরিতোষকে নাইয়ে খাইয়ে দেবার জন্য আর কোন লোক ছিল না। সে ছিল এক রকম। ছোটমা আসার পর হেমলতা চট করে অনেক বড় হয়ে গেলেন। বছর ঘোরার আগেই ছোটমা সন্তান-সম্ভবা হলেন। স্বর্গছেঁড়ার চৌহদ্দিতে তখন ভাল ডাক্তার নেই। নতুন ডাক্তারবাবু তখনও আসেননি। একজন কম্পাউণ্ডার কোনরকমে কাজ চালাচ্ছেন। আর তখন লোকজনই বা কত ছিল, এক আঙুল যদি বা ফুরোয়! সরিৎশেখর চেয়েছিলেন বউকে বাপের বাড়ি পাঠাবেন। কিন্তু সেই নদীয়ায় নিয়ে যাওয়া আর হল না। ছোট বউ-এর বাড়ির লোকজন আসব আসব করে শেষ পর্যন্ত এল না। কুলি লাইনের এক বুড়ী যে নাকি মদেসিয়াদের দাই-এর কাজ করে, হেমলতাকে সঙ্গে নিয়ে আঁতুড়ঘরে ঢুকল। সরিৎশেখরের পক্ষে সম্ভব নয় ভেতরে যাওয়া, তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মেয়েকে নির্দেশ দিতে লাগলেন। হেমলতা প্রথম সন্তানজন্ম দেখলেন। একটু ভয় ছিল প্রথমটা, কিন্তু বাড়ি তৈরী করার নিষ্ঠা নিয়ে পর পর কাজগুলো করে গেলেন। ছোটমার প্রথম সন্তান আঁতুড়-ঘরেই মারা গিয়েছিল। ছোটমা যতটা না কেঁদেছেন, হেমলতা বোধ হয় অনেক বেশী। তখনও তাঁর বিয়ে হয়নি। বিয়ের পর প্রিয়তোষ জন্মালো। সেদিন আর বুড়ী ধাই ছিল না। হেমলতা একাই সব দিক সামলেছেন। রান্না করে সবাইকে খাইয়েছেন, কাপড় ছেড়ে আঁতুড়ঘরে গিয়েছেন, সময় এলে নাড়ি কেটেছেন। এমন কি সেদিন অনি যখন হল, তখন তো ডাক্তারবাবু ছিলেন কিন্তু হেমলতাকে ছাড়া চলেনি। অনি হয়েছিল দুপুরে। সরিৎশেখর ঘরের চেয়ারে বসে ঘড়ির ওপর নজর রেখে মাঝে মাঝে উঁচু গলায় জিজ্ঞাসা করছেন। বার বার করে বলেছেন ঠিক জন্মমুহূর্তে যেন হেমলতা তাঁকে জানান। শিশুর মত ছটফট করেছেন সরিৎশেখর। তারপর যখন হেমলতার খুশীর চিৎকার তাঁর কানে এল 'ছেলে হয়েছে', তখন সরিৎশেখরকে দেখে কে। এক হাতে ঘড়ি নিয়ে লাফাচ্ছেন তিনি, 'একটা বেজে পনের মিনিট—পাঁজিতে লিখেছে মাহেন্দ্রক্ষণ—শঙ্খ বাজাও শঙ্খ বাজাও দুর্গা, দুর্গা।'

এখন চিলেকোঠার ঘরে মাধুরীকে শুইয়ে দিয়ে মুখ তুলতেই হেমলতা সরিৎ-শেখরকে দেখতে পেলেন। উদ্বেগ মুখে নিয়ে উঠে আসছেন তড়িঘড়ি। চোখাচোখি হতে হেমলতা খুব সাধারণ গলায় বললেন, 'তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকুন, মাধুর বাচ্চা হবে।'

সরিৎশেখর থমকে দাঁড়ালেন। বউমার বাচ্চা হবে তিনি জানতেন, কিন্তু তার তো সময় হয়নি। কোন গোলমাল হল না তো? বোকার মত বললেন, 'সে কি! তার তো দেরি আছে!'

কোনদিকে না তাকিয়ে হেমলতা বাবাকে বললেন, 'সেসব আপনি বুঝবেন না। তাড়াতাড়ি যান।'

মেয়ের মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে থেকে সরিৎশেখর তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেলেন। মহীতোষ ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়াবে ভাবতে পারেননি। এখনও তো মাস দুয়েক দেরি আছে। হঠাৎ ওঁর খুব ভয় হল। মাধুরীর যদি কিছু হয়ে যায়। কোন কথা না বলে মহীতোষ সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন, দরকার হলে ওকে হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে। হেমলতা দেখলেন মাধুরী ছটফট করছে। কি করবেন বুঝতে না পেরে মুখ তুলতেই দেখলেন অনি সিঁড়ির মুখে গাল চেপে করুণ চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। বোধ হয় ওপরে উঠে আসতে সাহস পাচ্ছে না। হেমলতা হেসে বললেন, 'যা বাবা, তাড়াতাড়ি নিচ থেকে একটা বালিশ আর চাদর নিয়ে আয়।' কাজ করতে পেরে অনি যেন বেঁচে গেল।

কোনমতে বিছানা করে মাধুরীকে শুইয়ে দিয়ে হেমলতা বললেন, 'অনি, তুই মায়ের কাছে বোস আমি গরম জল করি গে।' পিসীমা চলে গেলে অনি খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে এখন বেশ বৃষ্টি পড়ছে। ছোট বাড়ি থেকে চাদর-বালিশ আনতে গিয়ে ও একটু ভিজেছে। অন্য সময় মা নিশ্চয় বকত, এখন কিছু বলছে না। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ওর কান্না পাচ্ছিল। মা যে খুব কষ্ট পাচ্ছে এটা ও বুঝতে পারছিল।

পিসীমা তখন দাদুকে বলল মায়ের বাচ্চা হবে। বাচ্চা হলে এত কষ্ট পেতে হয় কেন? মায়ের মুখটা একদম সাদা হয়ে গিয়েছে। ও মায়ের পাশে এসে সন্তর্পণে বসে পড়ল। এখন কাছে-পিঠে কেউ নেই, কারো গলা শোনা যাচ্ছে না। চিলে-কোঠার দরজাটা আলো আসার জন্যে অথবা ভুলে খোলা রয়েছে। অনি এখান থেকে বৃষ্টি পড়া দেখতে পেল। জলের ছাট ঘরের মধ্যে সামান্যই আসছে। অনির খুব ইচ্ছে হল মায়ের মুখে হাত বোলাতে। ঠিক সেই সময় মাধুরী চোখ খুললেন। অনি দেখল মাধুরীর চোখের কোণে দু ফোঁটা জল টলটল করছে। মাধুরী একবার দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালেন, তারপর মাথা ঘুরিয়ে ঘরটাতে চোখ বোলালেন। মায়ের চোখে জল দেখতে পেয়ে অনি ফুঁপিয়ে উঠল। মাধুরী খুব ধীরে ধীরে একটা হাত তুলে ছেলের কোলের ওপর রাখতেই অনি মায়ের বুকের ওপর ভেঙে পড়ল। অনেকক্ষণ চুপচাপ ছেলেকে বুকের মধ্যে রেখে মাধুরী বললেন, 'হ্যাঁরে খোকা,

কাঁদছিল কেন ?'

ফিসফিসিয়ে অনি বলল, 'তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না ?'

'আমার কষ্ট হলে তোর খারাপ লাগে, না রে !'

অনি ঘাড় নাড়ল। মাধুরী আস্তে আস্তে বললেন, 'আমি যদি না থাকি তুই আমাকে ভুলে যাবি না তো !'

অনি দুই হাতে মাকে আঁকড়ে ধরে কেঁদে উঠল শব্দ করে। মাধুরী কেমন ঘোরের মধ্যে বললেন, 'আমি যদি না থাকি তুই একা একা আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলিস, আমি ঠিক শুনতে পাব। অনি, আমি তোকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না রে।'

অনি কোন কথা বলতে পারছিল না, ওর ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপছিল। মাকে এ রকম করে কথা বলতে ও কোনদিন শোনেনি। মা কেন ওকে ছেড়ে চলে যাবে! বাচ্চা হলে কি কাউকে চলে যেতে হয়! ও দেখল মাধুরী একটানা কথা বলে কেমন নিস্তেজ হয়ে গেছেন, অনেক দূর দৌড়ে এলে যেমন হয় মায়ের বুক তেমনি ওঠানামা করছে। হঠাৎ ও মায়ের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে গেল। মাধুরী যেখানে শুয়ে আছেন তার নিচ দিকটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। এটা কি সত্যি রক্ত! কোত্থেকে এত রক্ত এল ? মায়ের তো কোথাও কেটে যায়নি। এর আগে কতবার তরকারি কুটতে গিয়ে মায়ের হাত বঁটিতে কেটে গিয়ে রক্ত পড়েছে কিন্তু সে তো কয়েক ফোঁটা মাত্র। অনি আস্তে আস্তে উঠে মায়ের পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল। কুঁজো ভেঙে গেলে যেমন জল গড়িয়ে যায় তেমনি একটা মোটা লাল ধারা চলে যাচ্ছে কোণার দিকে। মায়ের পায়ের গোড়ালি সেই স্রোতটা থেকে সরিয়ে দিতে গেল অনি আর তখনি ওর আঙুল চটচটে লাল হয়ে গেল। মাধুরী চোখ খুলে দেখলেন ছেলে চোখের সামনে আঙুল নিয়ে দেখছে। চিৎকার করে উঠলেন, 'ওরে মুছে ফেল, তোর হাত থেকে রক্ত মুছে ফেল।' কিন্তু ক্রমশ কথা বলার শক্তিটা চলে যাচ্ছিল ওঁর। চোখের সামনে সব ঝাপসা হয়ে আসছে। অনি ঝাপসা—মহীতোষ ঝাপসা—দু চোখে এত জল থাকে কেন ?

এই সময় সিঁড়িতে কয়েক জোড়া পায়ের শব্দ পেল অনি। একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে যেন দম আটকে যাচ্ছিল ওর, হঠাৎ মনে হল ডাক্তারবাবু এসে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। হেমলতা একটা বড় লণ্ঠন নিয়ে আগে আগে উঠে এলেন। ছাদের এই ঘরটা এতক্ষণে আবছা হয়ে এসেছে। হেমলতার পিছন পিছন একজন বৃদ্ধ, সরিৎশেখর, মহীতোষকে ব্যাগ হাতে নিয়ে উঠে আসতে দেখল অনি। ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল সবাই, হ্যারিকেনের আলোয় রক্তস্রোত পরিষ্কার

দেখা যাচ্ছে। বৃদ্ধ লোকটি বললেন, 'ব্লিডিং হচ্ছে বলেননি তো!'

হেমলতা বললেন, 'আমি একটু আগে নিচে গেলাম, তখনো দেখিনি।' অনি বুঝতে পারল এই লোকটিই ডাক্তার, কারণ তৎক্ষণাৎ তিনি মাধুরীর পাশে বসে একটা হাত তুলে নিয়ে নাড়ি দেখতে লাগলেন। তারপর খুব গম্ভীর মুখে বললেন, 'আপনারা নিচে চলে যান।' সরিৎশেখর অনিকে এক হাতে আঁকড়ে ধরে নিচে নেমে গেলেন।

মহীতোষ খানিক ইতস্তত করে ব্যাগটা মেঝেতে রাখতে হেমলতা বললেন, 'গরম জলের সসপ্যানটা এনে দে শিগগীর।'

মহীতোষ নিচ থেকে জল ওপরে দিয়ে এসে দেখল সরিৎশেখর অনিকে জড়িয়ে ধরে চুপচাপ সিঁড়ির শেষ ধাপে বসে আছেন। ছেলেকে দেখে সরিৎশেখর বললেন, 'হাসপাতালে রিমুভ করা যাবে?'

ছোট ঘর থেকে আনা লণ্ঠনটা নামিয়ে মহীতোষ ঘাড় নাড়লেন, 'জানি না। করতে হলে এখনি করা দরকার। সেনপাড়ার দিকটায় তিস্তার জল ঢুকে পড়েছে।'

সরিৎশেখর বললেন, 'এ তো প্রতি বছরই হয়।'

মহীতোষ বললেন, 'দেখলেন না মাইকে অ্যানাউন্স করছে। মনে হচ্ছে এবার খুব ভোগাবে।'

কথাটা শেষ করে মহীতোষ দেখলেন প্রিয়তোষ দরজায় দাঁড়িয়ে। এদের দেখেই সে চেঁচিয়ে উঠল, 'ফ্লাড আসছে, সামনের মাঠটা জলে ডুবে গেছে। চট্‌পট মালপত্র ছাদে তোল।'

মহীতোষ তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে শুনলেন ওদের উঠোনে বাগানে জল শব্দ করছে। এতক্ষণ খেয়াল ছিল না, হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাস লাগতে টের পেলেন ওর সমস্ত জামাকাপড় ভিজে চুপসে গেছে, সরিৎশেখরেরও এক অবস্থা। অন্ধকারে এতক্ষণ যেটুকু দেখা যাচ্ছিল আর তাও দেখা যাচ্ছে না। ঝিম ঝিম বৃষ্টি পড়ছে আর হঠাৎ সমস্ত পৃথিবী ধাঁধিয়ে দিয়ে বিদ্যুৎ চমকে উঠতেই মহীতোষ দেখলেন ঘোলাজলের স্রোত উঠোনময় কিলবিল করছে।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে মহীতোষ দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, 'বন্যা এসে গেছে, এখন তো নিয়ে যাওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না।'

প্রিয়তোষ বলল, 'কি হয়েছে?'

মহীতোষ বললেন, 'তোর বউদি পড়ে গিয়ে ব্লিডিং হচ্ছে, অবস্থা সিরিয়াস।'

প্রিয়তোষ বলল, 'সে কি! কখন?'

সরিৎশেখর বিরক্তিচাপা গলায় বললেন, 'বাড়িতে কতক্ষণ থাক যে এসব খবর

রাখবে? যাও জিনিসপত্রগুলো যাতে জলে না ডোবে দেখগে যাও।'

মহীতোষ একবার ওপরের দিকে তাকিয়ে জলের মধ্যে নেমে গেলেন। অন্ধকারে চলতে কষ্ট হচ্ছে, প্রিয়তোষ ওঁর পিছনে। ছোট ঘরে তখন পায়ের পাতার ওপর জল। কি নেওয়া যায় কি নেওয়া যায় ভাবতে না পেরে আবিষ্কার হল অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দ্রুত জল বাড়ছে। হাঁটুর কাছটা যখন ভিজে গেল তখন মহীতোষ টর্চটা খুঁজে পেলেন। খাটের অনেকটা এখন জলের তলায়। লেপ তোশক নিয়ে যাবার কোন মানে হয় না। মেঝেয় রাখা স্যুটকেসগুলোর ওপর জল বয়ে যাচ্ছে। সেগুলোকেই টেনে-টুনে খাটের ওপর রাখা হল। ভিজে গেছে সব। সরিৎশেখরের টাকাপয়সা আলমারিতে আছে, অদ্দূর জল উঠবে না নিশ্চয়ই। ঘরটাকে সামলে কিছু শুকনো কাপডচোপড় আর গায়ের চাদর নিয়ে ওঁরা বেরিয়ে এলেন। আসবার সময় মহীতোষ মাধুরীর স্যুটকেসটা তুলে নিলেন। মহীতোষের টাকা এই স্যুটকেসে আছে। স্যুটকেসটা এর মধ্যে ভিজে ঢোল হয়ে গেছে।

নতুন বাড়ির বারান্দার ইঞ্চি কয়েক নিচে জল। মহীতোষ ছাদের সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াতে দেখলেন সরিৎশেখর ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলছেন। হ্যারিকেনের আলোয় দেওয়ালে ওঁদের ছায়া কাঁপছে। ছেলেকে দেখে সরিৎশেখর কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'আমি কিছু ভাবতে পারছি না মহী, ভগবান এ কি করলে।'

মহীতোষ ডাক্তারবাবুর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, 'হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলে একটা চেষ্টা করা যেত। কিন্তু যা অবস্থা—জল শুনলাম বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে!' মহীতোষ ঘাড় নাড়লেন।

'হয়ে গেল তাহলে।' ডাক্তারবাবু ছট্‌ফট করে উঠলেন, 'ভোরের আগে কোন বার জল কমে না। এইজন্যেই আমি আসতে চাইছিলাম না। এখন আমি বাড়ি যাই কি করে। অন্ধকারে জল ভেঙে যেতে কোথায় পড়ব—ইস।'

মহীতোষ বললেন, 'ডাক্তারবাবু, আপনি চলে গেলে ওকে নিয়ে আমরা—না, আপনার যাওয়া চলবে না। আপনি ওকে দেখুন, আমি আপনার বাড়িতে খবর দিয়ে আসছি।'

কথাটা শেষ হতেই প্রিয়তোষ 'আমি খবর দিয়ে আসি' বলে অন্ধকারে ছুটে বেরিয়ে গেল। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, 'আমি আর দেখে কি করব! চোখের সামনে মেয়েটা চলে যাচ্ছে আমি ফ্যালফ্যাল করে দেখছি। ভগবানকে ডাকুন।'

সরিৎশেখর বললেন, 'মিসক্যারেজ হয়েছে বললেন, বাচ্চাটা—'

'সেটা বেকলে তো বুঝতে পারা যেত। এতগুলো ইঞ্জেকশন দিলাম রক্ত বন্ধ

করা যাচ্ছে না।' বিড়বিড় করে বকতে বকতে ডাক্তারবাবু ওপরে উঠে গেলেন।

এখন এখানে শুধু ঝড়ো বাতাস ছাড়া কোন শব্দ নেই। বাইরে তিস্তার জল নতুন বাড়ির বারান্দার গায়ে ধাক্কা লেগে যে শব্দ তুলছে তাও বাতাসে চাপা পড়ে গেছে। মহীতোষ পাথরের মত দাঁড়িয়ে। সরিৎশেখর নাতিকে দুহাতে জড়িয়ে ওপরের দিকে মুখ করে বসে আছেন সিঁড়িতে। লণ্ঠনের আলোয় দেওয়ালে পড়া তাঁদের ছায়াগুলো নিয়ে বাতাস উদ্ভট ছবি এঁকে এঁকে যাচ্ছে। সময় এখন খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগুচ্ছে। যে-কোন মুহূর্তে ওপর থেকে কোন শব্দ ভেসে আসবে এই রকম একটা আশঙ্কায় দুটো শরীর কাঁটা হয়ে রয়েছে। দাদুর বুকের ওপর মাথা রেখে অনি অনেকক্ষণ ধরে দুপ-দুপ বাজনা শুনছিল। এতক্ষণ যে সব কথাবার্তা এখানে হয়ে গেল তার প্রতিটি শব্দ ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। মা আর থাকবে না! ডাক্তারবাবু ওদের ভগবানকে ডাকার কথা বললেন, কিন্তু কেউ ডাকছে না কেন? অনির মনে পড়ল স্বর্গছেঁড়ায় এক বিকেলবেলায় হেমলতা ওকে বলেছিলেন সব চেয়ে বড় ভগবান হল মা। অনি সমস্ত শরীর দিয়ে মনে মনে মাকে ডাকতে লাগল। চোখ বন্ধ করে নিঃশব্দে 'মা, মা' উচ্চারণ করতে করতে অনি দেখতে পেল মাধুরী ওর কাছে এসে দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরেছেন। মায়ের গায়ের সেই গন্ধটা বুক ভরে নিতে নিতে ও শুনতে পেল পিসীমা সিঁড়ির মুখে এসে বলছেন, 'অনিকে একটু ওপরে নিয়ে আসুন।'

কথাটা শুনে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল অনি। অন্ধকারে সিঁড়িগুলো লাফ দিয়ে পেরিয়ে এসে পিসীমার মুখোমুখি হয়ে গেল ও। অনিকে দেখে হেমলতা দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন। অনি বুঝতে পারল পিসীমা কাঁদছেন। কয়েক পা এগিয়ে হেমলতা আবার থমকে দাঁড়ালেন। অনির মাথাটা ওঁর প্রায় কাঁধ-বরাবর। অনি শুনতে পেল কেমন কান্না-কান্না গলায় পিসীমা ওকে বলছেন, 'অনি বাবা, আমার সোনাছেলে, তোমার মা এখন ভগবানের কাছে চলে যাচ্ছেন, যাওয়ার আগে তোমাকে দেখতে চাইছেন—।' হুহু করে কেঁদে ফেললেন হেমলতা।

অনি বলল, 'মা-ই তো ভগবান। তবে মা কার কাছে যাচ্ছে?'

ফিসফিস করে হেমলতা বললেন, 'আমি জানি না বাবা, তুমি কোন কথা বলো না, বেশী কেঁদো না, তাহলে মা'র যেতে কষ্ট হবে।' পিসীমার বারণ তিনি নিজেই মানছিলেন না।

মা শুয়ে আছেন চুপচাপ। ওঁর শরীর নড়ছে না। ডাক্তারবাবু খাটিতে বাবু হয়ে বসে আছেন। হেমলতা অনিকে এগিয়ে দিলেন সামনে, 'মাধু, অনি এসেছে ভাখ।'

চোখের পাতা নাচল, পুরো খুলল না। অনি দেখল মায়ের চোখের কোল দুটো

জলে ভরে গেছে। অনি মাধুরীর মুখের পাশে মুখ নিয়ে ডাকল, 'মা, মাগো!'

মাধুরী ঘোরের মধ্যে বললেন, 'অনি, বড় কষ্ট হচ্ছে রে।'

ফুঁপিয়ে উঠল অনি, 'মা, মাগো।'

মাধুরী ফিসফিস করে বললেন, 'আমি তোর সঙ্গে থাকব রে, তুই জেলে গেলেও তোর সঙ্গে থাকব।' অনি পাগলের মত মায়ের বুকে মুখ চেপে ধরে ফোঁপাতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে বাইরের বৃষ্টির শব্দ, হাওয়ার শব্দ ছাপিয়ে হেমলতার বুক-ফাটা চিৎকার কানে আসতে অনি মায়ের বুক থেকে মাথা সরিয়ে অবাক হয়ে দেখল পিসীমা আর বাবা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদছে। ওর পাশ দিয়ে ছুটো পা দ্রুত ছাদের দিকে চলে গেল। পিছন থেকে অনি দেখল দাদু এই বৃষ্টির মধ্যে অন্ধকারে ছাদে হেঁটে যাচ্ছেন।

মায়ের দিকে তাকাল অনি। স্বর্গছেঁড়ায় অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে ও মাধুরীকে এমনি ভাবে শুয়ে থাকতে দেখত। ঘুমিয়ে পড়লে মাধুরী সহজে জাগতে চাইতেন না। ভীষণ বাথরুম পেয়ে গেলে অনি মায়ের গায়ে চিমটি কাটতো। তখন মাধুরী ধড়মড় করে উঠে বসতেন। অনি বুঝতে পারছিল আর মা উঠে বসবে না। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনি চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

মাঝরাতেই জল নেমে গিয়েছিল। ভোরের আলো ফুটতে চারধার একটা অদ্ভুত দৃশ্য নিয়ে জেগে উঠল। সমস্ত শহরটার ওপর কয়েক ইঞ্চি পলি পড়ে গেছে। সূর্যের আলো পড়ায় চকচক করছে সেগুলো। ভেসে আসা মৃত গরু-ছাগল আটকে আছে এখানে সেখানে। তিস্তার জল করলার মধ্যে ঢুকে যাওয়ায় নিচু জায়গাগুলো এখনো জলের তলায়। শ্মশানটা শহরের একপ্রান্তে, মাসকলাইবাড়ির কাছে। উঁচু জায়গা বলে সে অবধি জল পৌঁছয়নি। লোকজন যোগাড় করে এই পাঁকের ওপর দিয়ে হেঁটে শ্মশানে আসতে দুপুর হয়ে গেল। ছোট ঘরের অনেক জিনিসপত্র গেলেও খাটটা বেঁচেছে। সরিৎশেখর সেখানে সকাল থেকে শুয়ে রইলেন। কাল রাত্রে বৃষ্টিতে ভিজে সর্দিজ্বর হয়েছে ওঁর। বার বার বলছেন, 'আমার অঙ্গহানি ঠেকাতে পারলো না কেউ।'

মৃতদেহ নিয়ে যাবার লোকের অভাব হয় না। তারা সবাই হরিধ্বনি দিতে দিতে মাধুরীকে নিয়ে যাচ্ছিল। প্রিয়তোষ কাঁধ দিয়েছে। হেমলতা কাল রাত থেকেই সেই যে অনিকে জড়িয়ে ধরে বসেছিলেন মাধুরীর পাশে, একবারও ওঠেননি। কাঁদতে কাঁদতে অনি কখন তাঁর বুকে ঘুমিয়ে পড়েছে, আবার জেগেছে, হেমলতা পাথর। দেহ নিচে নামিয়ে খাটিয়া সাজিয়ে কেউ একজন ডাকল তাঁকে, 'এয়োস্ত্রীকে

যাবার সময় সিঁদুর পরিয়ে দিতে হয়, সিঁদুর নিয়ে আসুন।' ঠিক তখনি হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন হেমলতা, 'আমি চাইনি গো, কাল সকালে জোর করে আমাকে দিয়ে সিঁদুর পরালো ও, আমি যে বিধবা, সেই পাপে মেয়েটা চলে গেল গো—।'

মহীতোষ কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'থাক, সিঁদুর পরাতে হবে না।'

সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলেন সরিৎশেখর। ছোট ঘরের খাটে শুয়ে কান খাড়া করে সব কথা শুনছিলেন, 'খবরদার, আমার বাড়ির বউকে সিঁদুর না পরিয়ে বাইরে নিয়ে যাওয়া চলবে না।'

এখন সিঁদুর মাথায় মাধুরী শ্মশানে পৌঁছে গেলেন। ওদের থেকে খানিক দূরত্বে ছেলের হাত ধরে মহীতোষ হেঁটে এলেন। ধুলি জমা রাস্তায় হাঁটতে ছেলেটার কষ্ট হচ্ছে কিন্তু মুখে কিছু বলছে না। মহীতোষ কাল থেকে ছেলের সঙ্গে কথা বলেননি। এখন আসার সময় ভয় পাচ্ছিলেন অনি হয়তো মাধুরীকে নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঁকে করবে। কিন্তু আশ্চর্য, অনি গম্ভীর মুখে হেঁটে এল। মহীতোষের মনে হল এক রাত্রে ছেলেটা অনেক বড় হয়ে গিয়েছে।

শ্মশানে ওরা যখন চিতা সাজাচ্ছিল তখন ছেলেকে জড়িয়ে ধরে চুপচাপ বসেছিলেন মহীতোষ। ওঁর কাঁদতে ভয় করছিল অনির জন্যে। আজকে এই শ্মশানে আর কোন চিতা জ্বলছে না। একমাত্র যেটি সাজানো হচ্ছে সেটি মাধুরীর জন্য।

হঠাৎ অনি কেমন কাঠ-কাঠ গলায় বলল, 'মাকে ওরা শুইয়ে রেখেছে কেন?' মহীতোষ জবাব দিতে গিয়ে দেখলেন তাঁর গলা আটকে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে বললেন, 'ভগবান কাউকে নিয়ে গেলে তাঁর শরীরটা পুড়িয়ে ফেলতে হয়।'

হঠাৎ একজন এগিয়ে এল ওঁদের দিকে, 'দাদা, আর দেরি করা ঠিক হবে না। মুখাগ্নি তো ওই করবে?' মহীতোষ ঘাড় নাড়লেন। ছেলেটি অনির হাত ধরল, 'এস তুমি।' তারপর অনিকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'মা তো চিরকাল থাকে না, আমারও মা নেই, বুঝলে?'

পর পর সুন্দর করে কাঠ সাজিয়ে মাধুরীকে শোয়ানো হয়েছে। মাধুরীর চুল খুব বড়, চিতার একটা দিক কালো করে রয়েছে। প্রিয়তোষ এসে অনির পাশে দাঁড়াল। অনি দেখল কয়েকজন পাটকাঠিতে আগুন ধরাচ্ছে। মাকে খুব শান্ত দেখাচ্ছে এখন। অনি, আমি তোমার সঙ্গে আছি। মা, মাগো। অনি ডুকরে কেঁদে উঠতে প্রিয়তোষ বলল, 'কাঁদিস না অনি, কাঁদিস না।'

আগের ছেলেটি একগোছা পাটকাঠিতে আগুন জ্বালিয়ে এনে অনির সামনে ধরল, 'নাও, মায়ের মুখে আগুনটা একটু ছুঁইয়ে দাও।'

কথাটা শুনে আঁতকে উঠল ও। সদ্য জ্বালা আগুনের শিখাটা যদিও ছোট কিন্তু লকলক করছে। সেদিকে তাকিয়ে অনি বলে উঠল, 'আগুন দিলে মুখ পুড়ে যাবে না!'

কথাটা মহীতোষের কানে যেতে মহীতোষ ডুকরে কেঁদে উঠলেন। ছেলেটি আর দেরি করল না, অনির একটা হাত টেনে নিয়ে পাটকাঠির ওপর চেপে ধরে নিজেই জোর করে আগুনের শিখাটা মাধুরীর মুখে ছুঁইয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকটা শিখা চিতার আশেপাশে লকলক করে উঠল যেন। প্রিয়তোষ অনিকে সরিয়ে নিয়ে এল চিতার কাছ থেকে। ওকে ধরে উল্টোদিকে হাঁটতে লাগল সে। কয়েক পা হেঁটে অনি শুনতে পেল পেছন থেকে অনেকগুলো গলায় চিৎকার উঠছে, 'বল হরি, হরি বোল।'

হঠাৎ কাকার হাতের বাঁধন থেকে ছিটকে সরে গিয়ে অনি মায়ের চিতার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। দাউ দাউ করে অজস্র শিখা নিয়ে আগুন জ্বলছে। শব্দ হচ্ছে কাঠ পোড়ার। আগুনটা ক্রমশ দলা পাকিয়ে লাল হয়ে নাচতে শুরু করেছে। অনি আগুনের মধ্যে অস্পষ্ট একটা অবয়ব দেখতে পেল, যাকে মা বলে কিছুতেই চেনা যায় না।

যে ছেলেটি ওর হাত ধরে মুখাগ্নি করাল সে অনির দিকে এগিয়ে এল, 'তোমার হাতে কি লেগেছে? শুকিয়ে কালচে হয়ে আছে!'

নিজের হাতটা চোখের সামনে ধরতেই অনির মনে পড়ে গেল একটা লাল স্রোতের কথা, কাল রাত্রে মায়ের শরীর থেকে যেটা বেরিয়ে এসেছিল। কখন সেটা শুকিয়ে কালচে হয়ে গেছে, রক্ত বলে চেনা যায় না। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল সে, কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'মার রক্ত!'

॥ ৩ ॥

তাঁকে প্রশ্ন করা হল, 'যিনি তোমাকে গর্ভে ধরেছেন, স্তন্যদান করে জীবন দিয়েছেন, তোমাকে জ্ঞানের আলো দেখিয়েছেন সেই তিনি আর যিনি মাতৃজঠর থেকে নির্গত হওয়া মাত্র তোমার জন্য জায়গা দিয়েছেন, তাঁর সংস্কৃতি তাঁর সংস্কার রক্তে মিশিয়ে দিয়েছেন এই তিনি—কাকে তুমি আপন বলে গ্রহণ করবে?' তিনি বললেন, 'দুজনকেই। কারণ একজনের সঙ্গে নাড়ির বাঁধন ছিন্ন হওয়া মাত্রই আর একজনের সঙ্গে নাড়ির বাঁধন যুক্ত হয়েছে। কিন্তু ছিন্ন না হলে যে যুক্ত হতো না। তাই দুজনেই আমার আপন।'

তাঁকে বলা হল, 'যদি একজনকে ত্যাগ করতে বলা হয় তবে কাকে ত্যাগ করবে?' তিনি বললেন, 'এই মাটি তো তাঁরও জননী। তাই এর জন্য জীবন দিলে তিনিই ধন্য হবেন। যে ত্যাগ মানে আরো বড় করে পাওয়া সে ত্যাগেই আমার আনন্দ।'

সমস্ত ক্লাস চুপচাপ, নতুন স্যার একটু থামলেন, তারপর উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকা মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সেই মায়ের পায়ে যখন লোহার বেড়ি পরিয়ে দিয়েছিল ইংরেজরা তখন তাঁর এমন কত দামাল ছেলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দুঃখিনী মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে। একবারে না পারলে বলেছিল, একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি। এই মা দেশমাতৃকা। তোমরা নতুন ভারতবর্ষের নাগরিক। আজ আমাদের মায়ের পায়ে বেড়ি নেইকো, অনেক রক্তের বিনিময়ে তিনি আজ মুক্ত কিন্তু এতদিনের শোষণে তিনি আজ রিক্তা, মলিন, শীর্ণা। তোমাদের ওপর দায়িত্ব তাঁর মুখে হাসি ফিরিয়ে আনবার। নাহলে তোমরা যাঁদের উত্তরাধিকারী তাঁদের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না ভাই। ব্যাস, আজ এই পর্যন্ত।' টেবিলের ওপর থেকে ডাস্টার বই তুলে নিয়ে নতুন স্যার ক্লাস-রুম থেকে সোজা মাথায় বেরিয়ে গেলেন। তাঁর খদ্দরের পাঞ্জাবির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনিমেষ বুঝতে পারেনি ওর সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। এইসব কথা এই স্কুলে নতুন স্যার আসার আগে কেউ বলেনি। ব্যাপারটা ভাবলেই কেমন হয়ে যায় মনটা। নতুন স্যার বলেছেন 'শিবাজীও একজন স্বাধীনতা আন্দোলনের যোদ্ধা ছিলেন। শিবাজীর কথা শুনলে মনের মধ্যে কিছু হয় না কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসু যখন বলেন 'গিভ মি ব্লাড' তখন হৃৎপিণ্ড দপদপ করে। এই ব্লাড শব্দটা উচ্চারণ করার সময় নতুন স্যার এমন জোর দিয়ে বলেন অনিমেষ চট করে সেই ছবিটা দেখতে পায়, নিজের আঙুলগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ও। ভীষণ কান্না পেয়ে যায়।

নতুন স্যার থাকেন হোস্টেলে। ওদের স্কুলের সামনে বিরাট মাঠ পেরিয়ে হোস্টেল। ক'দিনের মধ্যে অনিমেষের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল নতুন স্যারের। ওদের স্কুলের অন্যান্য টিচাররা দীর্ঘদিন ধরে পড়াচ্ছেন। ও'রা নতুন স্যারের সঙ্গে ছাত্রদের এই মেলামেশা ঠিক পছন্দ করেন না। একমাত্র ড্রিল স্যার বরেনবাবুর সঙ্গে নতুন স্যারের বন্ধুত্ব আছে। ও'রা দুজন এক ঘরে থাকেন।

অনিমেষের পড়ার চাপ পড়েছে বলে সরিৎশেখর ভোরে আর ওকে বেড়াতে যেতে বলেন না। কিন্তু এইটুকু ছেলের মধ্যে যে চাঞ্চল্য ছটফটানি থাকার কথা অনিমেষের মধ্যে তা নেই। সারাদিন যখনই বাড়িতে থাকে তখনই মুখ গুঁজে বই পড়ে। বই পড়ার এই নেশাটা ওর মধ্যে ঢুকিয়েছিল প্রিয়তোষ। ঢুকিয়ে দিয়ে

হাওয়া হয়ে গিয়েছে সে। সরিৎশেখরের জীবনে আর একটি আঘাত এই ছোট ছেলে। দিন-রাত বাড়ির বাইরে পড়ে থাকত, কখন যেত কখন আসত হেমলতা ছাড়া কেউ টের পেত না। রাগারাগি করতে করতে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন সরিৎশেখর। চাকরিবাকরি করে না, তাঁর কোন সাহায্য হচ্ছে না, এছাড়া এই ছেলের বিরুদ্ধে ওঁর অভিযোগ করার অন্য কারণ নেই। অনি তখন সবে স্কুলে ভর্তি হয়েছে। বাড়ি এলে অনির সঙ্গে আড্ডা হত খুব। স্বর্গছেঁড়ায় ওর যে আকর্ষণের আভাস তিনি হেমলতার কাছে পেয়েছেন সেটা নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা ছিল। কিন্তু ও যে আর স্বর্গছেঁড়ায় যায় না, জোর করেও তাকে স্বর্গছেড়ায় পাঠাতে পারেননি সে কথাও তো সত্যি।

তারপর সেইদিনটা এল। তিন দিন বাড়ি আসেনি প্রিয়তোষ। সরিৎশেখর এখানে সেখানে ওকে খুঁজেছেন। যে ক'জন ওর সমবয়সী ছেলেকে ওর সঙ্গে ঘুরতে দেখেছেন তারাও ওর হদিস দিতে পারেনি। বিরক্ত চিন্তিত সরিৎশেখর ঠিক করেছিলেন প্রিয়তোষ এলে পাকাপাকি কথা বলে নেবেন ভদ্রভাবে সে বাড়িতে থাকতে পারবে কিনা।

তখন ওঁরা নতুন বাড়িতে উঠে এসেছেন। ছোট বাড়িটায় পুরোন জিনিস-পত্রের গুদাম করে রাখা হয়েছে। মাঝখানের বড ঘরটায় সরিৎশেখর একা শোন, লাগোয়া ঘরটায় হেমলতা। বাইরের দিকের ঘরটায় প্রিয়তোষ এবং অনিমেষ থাকত। অনিমেষকে সে বছরই প্রথম স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে, খুব কড়া স্কুল। এ জেলার মধ্যে এই স্কুলের নামডাক সবচেয়ে বেশী। সরিৎশেখর নিজে গিয়ে ওকে ক্লাসে বসিয়ে এসেছেন। ভেবেছিলেন ক্লাসে ঢুকে ছেলেটা নিশ্চয়ই কান্নাকাটি করবে। কিন্তু অনি ওঁর চলে আসার সময় খুব গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল। অদ্ভুত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে ছেলেটার। সেই জন্ম থেকে তিনি ওকে দেখছেন, ওর নাড়িনক্ষত্র জানা, কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর ছেলেটা রাতারাতি পাল্টে যাচ্ছে। বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে চুপচাপ ছাদে গিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। প্রিয়তোষ ওর দিদিকে বলেছে রাতদুপুরে অনি নাকি জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজের মনে কথা বলে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন সরিৎশেখর। কিন্তু অন্য সময় ও ভুলেও মায়ের কথা বলে না। হেমলতাকে নিষেধ করে দিয়েছিলেন অনির কাছে মাধুরীর গল্প বলতে। অনি একা একা নিজের মত করে বড় হোক—সরিৎশেখর এটাই চাইছিলেন।

মাধুরী বেঁচে থাকতে কাকার সঙ্গে অনির খুব একটা ভাব ছিল না। বরং কারণে অকারণে প্রিয়তোষ ওর ওপর অত্যাচার করত। অনির কান দুটো

প্রিয়তোষের আঙুলের বাইরে থাকার জন্য তখন প্রাণপণ চেষ্টা করত। মা মরে যাবার পর প্রিয়তোষের ব্যবহার একদম পাল্টে গেল।

নতুন স্যার তখন সদ্য স্কুলে এসেছেন। ওঁর কথাবার্তা, হাসি অনিমেষের খুব ভাল লাগছে। মাঝে মাঝে যখন খুব শক্ত কথা বলেন তখন অনিমেষরা বুঝতে পারে না। কিন্তু যখন দেশের গল্প করেন তখন অনিমেষের খুব ভাল লাগে। একদিন ক্লাসের সব ছেলের বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করতে করতে নতুন স্যার জানতে পারলেন অনির মা নেই। অনি দেখল, ক্লাসের সমস্ত মুখগুলো ওর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছে। যেন মা নেই ব্যাপারটা কেউ ভাবতে পারছে না। নতুন স্যার ওকে কাছে ডেকে আদর করে বললেন, 'মা নেই বলো না। আমাদের তো দুটো মা, একজন চলে গেছেন ঈশ্বরের কাছে কিন্তু আর এক মা তো রয়েছেন। তুমি তাঁর কথা ভাববে, দেখবে আর খারাপ লাগবে না। বঙ্কিমচন্দ্র বলে একজন বিরাট সাহিত্যিক ছিলেন, তিনি এই দেশকে মা বলেছিলেন, বলেছিলেন বন্দেমাতরম্।'

প্রিয়তোষ সেই রাত্রে বাড়িতে ছিল। অনেক রাত জেগে কাকাকে বইপত্র পড়তে দেখত অনিমেষ। নিজের খাটে শুয়ে শুয়ে প্রিয়তোষকে নতুন স্যারের কথা বলল অনিমেষ। ভবানীমাস্টার, নতুন দিদিমণি যখন বন্দেমাতরম্ শব্দটা ওদের উচ্চারণ করিয়েছিলেন তখন শব্দটার মানেটা ও ধরতে পারেনি। নতুন স্যার ওকে সে রহস্য থেকে মুক্ত করেছেন। সব শুনে প্রিয়তোষ বলল, 'শালা কংগ্রেসী।'

এই প্রথম অনিমেষ কাকাকে গালাগাল দিতে শুনল। স্বর্গছেঁড়ায় বাজারের রাস্তায় অনেক মদেসিয়া মাতালকে এই শব্দটা ব্যবহার করতে শুনেছে ও। মাধুরীর শ্রাদ্ধের সময় নদীয়া থেকে অনির মামারা এসেছিলেন। হেমলতা বলেছিলেন, ওঁরা হলেন মহীতোষের শালা। রেগে গেলে এই সম্বোধনটাকে কেন লোকে গালাগালি হিসেবে ব্যবহার করে বুঝতে পারে না অনিমেষ। আবার মদেসিয়াদের মুখে শুনতে যতটা না খারাপ লাগত এই মুহূর্তে কাকার মুখে খুব বিচ্ছিরি লাগল। কংগ্রেসী শব্দটা ও খবরের কাগজ থেকে জেনে গিয়েছিল। যেমন মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসী, জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসী। দেশের জন্য যারা কাজ করে তারা কংগ্রেসী, তাদের মাথায় একটা সাদা টুপি থাকে। নতুন স্যারের মাথায় সাদা টুপি নেই, তাহলে তিনি কংগ্রেসী হবেন কি করে? আর যারা দেশের জন্য কাজ করে, দেশ-মায়ের জন্য জীবন দান করে তারা শালা হবে কেন? কিন্তু কাকার সঙ্গে তর্ক করা বা কাকার মুখে মুখে কথা বলতে সাহস পেল না অনিমেষ। কথা বলার সময় কাকার মুখ চোখ দেখেছিল ও, ভীষণ রাগী দেখাচ্ছিল তখন। কিন্তু কাকার কথা

মেনে নিতে পারেনি, নতুন স্যারকে গালাগালি দিয়েছে বলে কাকার ওপর ওর ভীষণ রাগ হচ্ছিল। সেদিন মাঝরাতে অনির ঘুম ভেঙে গেলে দেখল কাকা বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে। একটা বই ওর মাথার তলায় চাপা পড়ে দুমড়ে যাচ্ছে। হ্যারিকেনের আলোটা কমানো হয়নি। অনেক রাত অবধি আলো জেলে রাখলে দাদু রাগ করেন, কেরাসিন তেল নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু অনি উঠে আলো নেবালো না, কাকাকে ডাকল না। দাদু যদি এখন এখানে আসে বেশ হয়। জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল ও। একটা দুটো করে তারা গুনতে গুনতে আস্তে আস্তে সেগুলো মায়ের মুখ হয়ে গেল। অনি স্থির হয়ে অনেকক্ষণ মাকে দেখল, তারপর নিজের মনে বলল, 'মা, যাঁরা দেশকে ভালবাসতে বলে তাঁরা কি খারাপ?'

(না সোনা, কক্ষনো না)

'তাহলে কাকা কেন নতুন স্যারকে গালাগালি দিল?'

(কাকা রেগে গেছে তাই।)

'আমি যদি দেশকে ভালোবাসি তুমি খুশী হবে তো?'

(আমি তো তাই চাই সোনা।)

'মা তোমার জন্য বড় কষ্ট হয় গো' কথাটা বলতেই অনির চোখ উপচে জল বেরিয়ে এল আর সেই জলের আড়াল ভেদ করে অনি আর কিছুই দেখতে পেল না। অনি লক্ষ্য করেছে যখনই সে মায়ের সঙ্গে কথা বলে, কষ্টের কথা বলে, তখনই চোখ জুড়ে জল নেমে আসে আর সেই সুযোগে মা পালিয়ে যায়। চোখ মুছে আর খুঁজে পায় না সে।

ক'দিন কাকা বাড়িতে আসেনি। দাদু অনেক খুঁজেও ছোট কাকার খবর পাচ্ছেন না। জলপাইগুড়িতে হঠাৎ একটা মিছিল বেরিয়েছে। অনি দ্যাখেনি, কিন্তু ক্লাসের বন্ধুদের কাছে শুনেছে সেটা নাকি কংগ্রেসীদের মিছিল নয়, তারা কংগ্রেসীদের গালাগালি দিচ্ছিল। পুলিস নাকি খুব লাঠির বাড়ি মেরেছে। গোলমাল হবার ভয়ে স্কুল ক'দিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। সেই সময় খবরের কাগজ পড়ে সরিৎশেখর খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলেন। বাড়িতে খুব শক্ত ইংরেজী কাগজ রাখতে আরম্ভ করলেন তিনি, ওতে নাকি অনেক বেশী খবর থাকে।

ক'দিন বাদে অনেক রাত্রে দরজায় টকটক শব্দ হতে অনিমেষের ঘুম ভেঙে গেল। কাকা না থাকলেও একা শুতো ও। হেমলতা আপত্তি করতে ও বলেছিল ওর ভয় করবে না। পিসীমার বা দাদুর ঘর থেকে জানলা দিয়ে আকাশ দেখা

যায় না। শব্দ শুনে ও দেখল পাশের জানলায় নীচে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে ও চোখ বন্ধ করতে যাচ্ছিল হঠাৎ চাপা গলায় নিজের নাম শুনতে পেয়ে বুঝল, কাকা এসেছে। চট করে উঠে গিয়ে দরজা খুলতে কাকা মুখে আঙুল দিয়ে ইশারা করে ওকে চুপ করতে বলল, তারপর ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল। অনিমেষ দেখল এই কয়দিনে কাকার চেহারা ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছে। পাজামা আর শার্ট খুব ময়লা, গাল ভর্তি ছোট ছোট দাড়ি গজিয়েছে, স্নানটান হয়নি বোঝা যায়। ঘরে এসে কাকা প্রথমে হ্যারিকেনটা বাড়িয়ে দিল, তারপর ওর খাটের তলা থেকে একটা টিনের স্যুটকেস টেনে বের করল। তালা খুলে ফেলতে দেখল, সামান্য কয়েকটা জামাকাপড় ছাড়া অনেকগুলো বই আর পত্রিকায় সেটা ভর্তি। কাকা ওর সঙ্গে কথা বলছে না, একমনে বইগুলো উল্টেপাল্টে দেখছে। তারপর অনেকক্ষণ দেখেশুনে কতগুলো বই আর পত্রিকা আলাদা করে বেঁধে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। চলে যেতে গিয়ে কি ভেবে আবার অনির কাছে ফিরে এসে অনির খাটের ওপর বসল কাকা। অনি দেখল, কাকার হাতের বাণ্ডিলের ওপরের পত্রিকাটার ওপর বড় বড করে লেখা আছে—'মার্কসবাদী'। কাকা খুব ফিসফিস করে বলল, 'অনি কেউ যদি আমার খোঁজে এখানে আসে তাহলে তাকে কক্ষনো বলবি না যে আমি এসে বইগুলো নিয়ে গেছি। বুঝলি ?'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, তারপর বলল, 'তুমি কেন চলে যাচ্ছ ?'

কাকা বলল, ওদের পুলিস আমাদের ধরে জেলখানায় নিয়ে যেতে চাইছে। আমাদের পার্টিকে ব্যান করে দিয়েছে ওরা। মুখে গণতন্ত্র গণতন্ত্র বলবে অথচ কাউকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেবে না।'

অবাক হয়ে অনি বলল, 'কারা ?'

কাকা থেমে গেল প্রথমটা, তারপর হেসে বলল, 'ঐ বন্দেমাতরম্ পার্টি, কংগ্রেসীরা। তুই এখন বুঝবি না, বড় হলে যখন জানবি তখন আমার কথা বুঝতে পারবি।'

অনিমেষ বলল, 'কিন্তু নতুন স্যার বলেছেন কংগ্রেসীরা দেশসেবক।'

ঘৃণায় মুখটা বেঁকে গেল যেন, কাকা বলল, 'দেশসেবা ? একে দেশসেবা বলে ? ভিক্ষে করার নাম দেশসেবা ! ইংরেজদের পা ধরে ভিক্ষে করে রাত্রের অন্ধকারে চোরের মত হাতে ক্ষমতা নিয়ে দেশসেবা হচ্ছে ! আমরা বলেছি এ আজাদী ঝুটা হ্যায়। আমরা এই রকম স্বাধীনতা চাই না, যে স্বাধীনতা শোষণের হাত শক্ত করে। তাই ওরা আমাদের গলা টিপতে চায়। ওদের হাতে পুলিস আছে, বন্দুক আছে কিন্তু আমাদের শরীরে রক্ত আছে—যাক, এ সব কথা এখন তুই

বুঝবি না।'

আমাদের শরীরে রক্ত আছে। কথাটা শুনেই অনি নিজের আঙুলের দিকে তাকাল, তারপর ওর মনে পড়ল, 'গিভ মি ব্লাড', আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। সুভাষচন্দ্র বসুর দুই রকম ছবি দেখেছে ও। একটা ছবিতে সাদা টুপি মাথায় আর একটা ছবিতে মিলিটারি জামা টুপিতে একটি হাত সামনের দিকে বাড়ানো। সুভাষচন্দ্র বসু কি কংগ্রেসী ছিলেন না? ও কাকার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে ফেলল, 'তোমরা কি সুভাষচন্দ্র বসুর লোক হয়েছ?'

অবাক হয়ে গেল প্রিয়তোষ, তারপর বলল, 'না, আমরা কম্যুনিস্ট। আমরা চাই দেশে গরীব বড়লোক থাকবে না, সবাই সমান, তাহলেই আমরা স্বাধীন হবো। আমি যাচ্ছি অনি, তুই কাউকে বলিস না আমি এসেছিলাম। আর মনে রাখিস এ আজাদী ঝুটা হ্যায়।'

খুব সন্তর্পণে যেমন এসেছিল তেমনি বেরিয়ে গেল প্রিয়তোষ। দরজা বন্ধ করে একা কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনিমেষ। কাকা যে সব কথা বলে গেল তার মানে কি? আমরা কি স্বাধীন হইনি! নতুন স্যারের কথার সঙ্গে কাকার কথার কোথাও মিল নেই কেন? নতুন স্যার বলেছেন, স্বাধীনতা পাওয়ার পর আমরাই আমাদের রাজা। ইংরেজরা যে শোষণ করে দেশকে নিঃস্ব করে গেছে এখন আমাদের তার শ্রী ফিরিয়ে আনতে হবে। আর কাকা বলে গেল এ স্বাধীনতা মিথ্যে, তবে কি আমরা এখনও পরাধীন? কিছুই ঠাওর করতে পারল না অনিমেষ। সব কিছু কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ ও দেখল, কাকা তাড়াতাড়িতে বইপত্র নিয়ে যাবার সময় ভুল করে স্যুটকেস বন্ধ করেনি। পায়ে পায়ে অনিমেষ স্যুটকেসটার কাছে এল। দুটো ধুতি, পাজামা, দুটো সার্ট রয়ে গেছে স্যুটকেসে। জামাকাপড় তুলতেই তলায় একটা পুরনো খবরের কাগজ। অনিমেষ দেখল, কাগজ জুড়ে একটা মানুষের ছবি, যার মাথাটা দেখা যাচ্ছে না। কৌতূহলী হয়ে কাগজটা তুলতে ও দেখল কাগজটা কাটা, ছবির মুখ নেই। একটা নীল কাগজ স্যুটকেসের তলায় সেঁটে থাকতে দেখল সে। কাগজটা বের করে আবার সব কিছু ঠিকঠাক রেখে স্যুটকেসটাকে খাটের তলায় ঢুকিয়ে দিল ও।

নীল কাগজটা খুলতেই সুন্দর করে লেখা কয়েকটা লাইন দেখতে পেল অনিমেষ। গোটা গোটা করে লেখা, কোন সম্বোধন নেই। লেখার শেষে নামটা পড়ে অবাক হয়ে গেল ও। তপুপিসী লিখেছে? কাকে লিখেছে? তাহলে শ্রীচরণেষু বা পূজনীয় নেই কেন? তপুপিসী তো কাকার চেয়ে অনেক ছোট। গুদামবাবুর বাড়িটার কথা মনে পড়ল। তপুপিসী কুচবিহারে পড়ত। চিঠিটা পড়া শুরু করল অনিমেষ।

'পৃথিবীতে চিরকাল মেয়েরাই ঠকবে এটাই নিয়ম, আমার বেলায় তার ব্যতিক্রম হবে কেন ? আমি খুব সাধারণ মেয়ে, আমি সুন্দরী নই। তোমার ওপর জোর করব সে অধিকার আমার কোথায় ? এখানে যখন ছিলে তখন তোমায় কিছুটা বুঝতাম। শহরে যাওয়ার পর তুমি কি দ্রুত পালটে গেলে। তোমার রাজনীতিই এখন সব, আমি কেউ নই। হঠাৎ মনে হল, তুমি তো আমাকে কোনদিন কথা দাওনি, তোমাকে দোষ দিই কি করে ! তুমি তো যৌবনের ধর্ম পালন করেছিলে। কি বোকা আমি। তাই তুমি যত ইচ্ছা রাজনীতি কর, আমি দায় তুলে নিলাম।
—তপু।'

তপুপিসী কেন এই চিঠি লিখেছে বুঝতে পারছিল না অনিমেষ। কিন্তু তপুপিসী খুব দুঃখ পেয়েছে, কাকা রাজনীতি করে বলে তপুপিসীর খুব কষ্ট হয়েছে। রাজনীতি করা মানে কি ? এই যে কাকা বাড়িতে থাকে না আজকাল, উস্কোখুস্কো হয়ে ঘুরে বেড়ায় চোরের মত একে কি রাজনীতি বলে ? এ সব করলে কি আর তপুপিসীর সঙ্গে ভাব রাখা যায় না ? কিন্তু তপুপিসী কেন লিখেছে আমি সুন্দরী নই ? সারা স্বর্গছেঁড়ায় তপুপিসীর চেয়ে সুন্দরী মেয়ে তো কেউ নেই, এক সীতা ছাড়া। কিন্তু সীতা তো ছোট্ট। বড় হলে নাকি চেহারা পাল্টে যায়। বড় হবার পর সীতা তপুপিসীর মত সুন্দরী নাও হতে পারে। এমন সময় অনিমেষ শুনতে পেল একটি গাড়ি খুব জোরে এসে শব্দ করে বাড়ির সামনে থামল। তিন-চারটে গলায় কথাবার্তা জুতোর শব্দ দ্রুত চারধারে ছড়িয়ে পড়তে ও জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। প্রথমে বুঝতে পারেনি, শেষতক লক্ষ্য করল সার দিয়ে কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছে। কি ব্যাপার বুঝতে না বুঝতে দরজায় প্রচণ্ড জোরে আওয়াজ উঠল। আওয়াজটা ওর ঘরের দরজায়, দ্রুত হাতে কে শব্দ করছে, দরজা ভেঙে ফেলার যোগাড়। অনি কি করবে বুঝতে পারছিল না, এমন সময় সরিৎশেখরের গলা শুনতে পেল ও। শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে চিৎকার করছেন, 'কে ? কে ?' শব্দটা থেমে গেল আচমকা, একটা বাজখাঁই গলায় কেউ বলে উঠল, 'দরজা খুলুন, পুলিস।'

পুলিস ! অনিমেষ বুঝতে পারছিল না সে কি করবে ? পুলিস তাদের বাড়িতে আসবে কেন ? ছেলেবেলা থেকে পুলিস দেখলে ওর কেমন ভয় করে। সরিৎশেখরের চেঁচানি বন্ধ হয়ে গেল আচমকা। অনিমেষ শুনল দাদু উঠে তার নাম ধরে ডাকছেন। সে দেখল তার গলা শুকিয়ে গেছে, দাদুর ডাকে সাড়া দিতে পারছে না। বিত্তা-সাগরী চটিতে শব্দ করতে করতে ভেতরের দরজা খুলে দাদু এ ঘরে এলেন। ঘরের মধ্যিখানে আলো জ্বালিয়ে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দাদু খুব অবাক হলেন, 'কি হল, তুমি ঘুমোওনি ?'

ঘাড় নেড়ে অনিমেষ বলল, 'পুলিস।'

সরিৎশেখর বললেন, 'আমি দেখছি, তুমি পিসীমার কাছে যাও।'

কথাটা শুনে অনিমেষ ভেতরের ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল। ঘরটা অন্ধকার, একদিকে পিসীমার ঘরে, অন্যদিকে দাদুর ঘরে যাবার দরজা। অনিমেষ শুনতে পেল পিসীমা বিড়বিড় করে 'জয় গুরু জয় গুরু' বলে যাচ্ছেন। অনিমেষ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখল দাদু দরজা খুলে দিতেই হুড়মুড় করে কয়েকজন পুলিস ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। প্রথমে যে এল তার হাতে রিভলভার। এই প্রথম সামনাসামনি একটা রিভলভার দেখল অনিমেষ। পুলিসরা ঘরে ঢুকে পড়তেই সরিৎশেখর ধমকে উঠলেন, 'কি ব্যাপার, এত রাত্রে আমার বাড়িতে আপনারা কেন এসেছেন, কি চান?'

রিভলভার হাতে পুলিসটা বলল, 'আপনার ছেলে কোথায়?'

সরিৎশেখর অবাক হলেন, 'ছেলে? ও, আমার বড় ছেলের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই!'

পুলিসটা বলল, 'ন্যাকামো করবেন না, আপনার ছোট ছেলে প্রিয়তোষের কথা জিজ্ঞাসা করছি।'

সরিৎশেখর ঘাড় নাড়লেন, 'জানি না।'

চিবিয়ে চিবিয়ে লোকটা বলল, 'জানেন না! এই বাড়ি সার্চ করো।'

কথাটা বলতেই অন্য পুলিসগুলো রিভলভার বের করে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে জিনিসপত্র উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল। সরিৎশেখর দু হাত তুলে তাদের থামাতে গেলেন, 'আরে কি করছেন কি আপনারা? আমি কালই ডি. সি-র সঙ্গে কথা বলব। আমাকে আপনারা অপমান করতে পারেন না। কি করেছে আমার ছেলে?'

প্রথম লোকটি বলল, 'বাপ হয়ে জানেন না ছেলে কম্যুনিস্ট হয়েছে? দেশ উদ্ধার করছেন সব। সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার করছেন। ওর নামে ওয়ারেন্ট আছে। কাজে বাধা দেবেন না, ওর বইপত্র আমরা দেখব। ও বাড়িতে এসেছে এ খবর আমরা পেয়েছি।'

সরিৎশেখর বললেন, 'আজ ক'দিন সে বাড়িতে নেই। আমি বলছি সে বাড়ি নেই। কিন্তু সে কম্যুনিস্ট হল কবে?'

লোকটি বলল, 'এই তো, বাপ হয়েছেন অথচ ছেলের খবর রাখেন না।'

সরিৎশেখর রেগে গিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'মুখ সামলে কথা বলবেন। জানেন সারা জীবন আমি কংগ্রেসকে সাহায্য করেছি। দরকার হলে এই জেলার

মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করবেন। আপনি কি ভাবছেন এখনও ব্রিটিশ আমল রয়েছে যে এই সব কথা বলবেন ?'

পুলিস বলল, 'মশাই, আমল বদলায় আপনাদের কাছে, আমরা হুকুমের চাকর। আমাদের কাছে ব্রিটিশরাও যা এই কংগ্রেসীরাও তা, হুকুম করলেই তামিল করব। সবাই আমাদের সাহেব। যান, বেশী বকাবেন না, আমাদের সার্চ করতে দিন।'

অসহায়ের মত সরিৎশেখর ধপ করে অনিমেষের খাটে বসে পড়লেন। অনিমেষ শুনল, দাদু বিড়বিড় করছেন, 'প্রিয় কম্যুনিস্ট হয়েছে, কম্যুনিস্ট!' ততক্ষণে পুলিসগুলো ঘর তছনছ করে ফেলেছে। অনির বইপত্র ছত্রাকার, কাকার স্যুটকেসটা খালি হয়ে ঢং করে মাটিতে পড়ল। একটা লোক বলল, 'এ ঘরে কিছু নেই স্যার।'

প্রথম পুলিস বলল, 'পালাবে কোথায় ? বাড়ি ঘেরাও করা আছে। অন্য ঘর দেখ।' পুলিসগুলোকে এদিকে আসতে দেখে অনিমেষ দৌড়ে পিসীমার ঘরে চলে এল। হঠাৎ ওর নজরে পড়ল হাতের মুঠোয় তপুপিসীর চিঠিটা রয়ে গেছে। এই চিঠিটা পেলে পুলিসরা নিশ্চয়ই কাকার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে। তপুপিসী তো লিখেছে কাকা রাজনীতি করে। অনিমেষের মনে হল, রাজনীতি করা মানে কম্যুনিস্ট হওয়া। চিঠিটা লুকিয়ে ফেলা দরকার। কি করবে কোথায় রাখবে বুঝতে না পেরে সে চিঠিটাকে পেটের কাছে প্যাণ্টের ভাঁজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে গেঞ্জিটা টেনে দিল। দিতেই সে দেখল হেমলতা তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। ঘরের এককোণে ঠাকুরের ছবির তলায় একটা ডিমবাতি জ্বলছে। হেমলতা নিজের বিছানার ওপর বাবু হয়ে বসে আছেন। চোখাচোখি হতে তিনি ওকে ইসারা করে ডেকে পাশে বসতে বললেন। অনি বসামাত্র একদল পুলিস টর্চ জ্বেলে ঘরে ঢুকে পড়ল। একজন ওদের মুখে টর্চ ফেলতে হেমলতা বললেন, 'চোখে আলো ফেলবেন না, কি চাই আপনাদের ?'

একটা লোক খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে বলল, 'রাতদুপুরে জেগে বসে আছেন যে, প্রিয়তোষ কোথায় ?'

হেমলতা সজোরে উত্তর দিলেন, 'রাতদুপুরে বাড়িতে ডাকাত পড়লে কেউ নাকে তেল দিয়ে ঘুমোয় না। আমার ভাই বাড়িতে নেই।'

লোকগুলো তন্নতন্ন করে ঘরের জিনিসপত্র ঘাঁটছিল। হেমলতা উঠে দাঁড়ালেন, 'খবরদার, আমার ঠাকুরের গায়ে কেউ হাত দেবেন না।'

যে লোকটা সেদিকে এগিয়েছিল সে হেমলতার মূর্তি দেখে থমকে গেল। পেছন থেকে একজন বলল, 'ছেড়ে দে, ঠাকুর-দেবতার সঙ্গে কম্যুনিস্ট পত্রিকা থাকে না।'

হঠাৎ একটা লোক অনিমেষের দিকে এগিয়ে এল গটগট করে, 'ওহে খোকা-

বাবু, তোমার নাম কি ?'

অনিমেষ কোন রকমে বলল, 'অনিমেষ।'

লোকটি ওর চিবুক ধরতে অনিমেষের হাত পেটের কাছে চলে গেল সড়াৎ করে, 'এই যে মিঃ মেষ, প্রিয়বাবু তোমার কে হয় বল তো ?'

'কাকা।' মুখ উঁচু করে ধরে থাকায় অনিমেষের ঘাড়ে লাগছিল।

'কাকা ! গুড। একটু আগে সে এখানে এসেছিল আমরা জানি, তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?'

অনিমেষ কোনদিন মিথ্যে কথা বলেনি। মা বলেছেন, কখনো মিথ্যে কথা বলবে না। অনি এখন কি করবে ? সত্যি কথা বললে কি কাকার খারাপ হবে ? কাকা তো চলে গিয়েছে এখান থেকে, এই বাড়িতে কাকাকে খুঁজে পাবে না ওরা। তাহলে ? সত্যি কথাটা বলে দেবে ? লোকটা তখনও ওর মুখ এমন জোরে উঁচু করে রেখেছে যে ঘাড় টনটন করছে। লোকটা ধমকে উঠল, 'কি হল ?'

অনিমেষ ফিসফিসিয়ে বলল, 'আঃ !'

লোকটা বলল, 'কি ? না ?' বলে অনিমেষের মুখটা ছেড়ে দিল, 'শালা বাড়িসুদ্ধ লোক ট্রেইণ্ড হয়ে রয়েছে। বুঝলে মিত্তির, এই বাচ্চাটা যখন বড় হবে তখন এই প্রিয়তোষদের চেয়ে থাউজেণ্ড টাইমস ফেরোসাস হবে। ওই সব থিওরিটিকাল কম্যুনিস্টগুলো তখন পাত্তাই পাবে না। শালা এইটুকুনি বাচ্চাও কেমন ট্রেইণ্ড লায়ার।' কথাগুলো বলে লোকগুলো অন্য ঘরে চলে গেল।

পাথরের মত বসেছিল অনিমেষ। হঠাৎ ওর খেয়াল হল পুলিসটা ওকে লায়ার বলল। লায়ার মানে মিথ্যুক। কক্ষনো না, ও মিথ্যুক নয়। ও কিছুই বলেনি, পুলিসটা নিজে নিজে মনে করে নিয়েছে। ও দৌড়ে পুলিসটার কাছে যেতে উঠে পড়তেই হেমলতা ওকে চট করে ধরে ফেললেন, 'কোথায় যাচ্ছিস ?'

অনিমেষ ছটফট করছিল, 'ওরা আমাকে লায়ার বলে গালাগালি দিল। আমি কক্ষনো মিথ্যে বলি না। মা তাহলে রাগ করবে। বলো আমি কি মিথ্যুক ?'

দু হাতে ওকে কাছে টেনে নিলেন হেমলতা, 'কাকু কি এসেছিল ?'

ঘাড় নাড়ল অনি, 'হ্যাঁ, এসে বইপত্র নিয়ে গেছে।'

হেমলতা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বই ?' অনি বলল, 'জানি না। তবে একটা বই-এর নাম মার্কসবাদী। আমাকে ছাড়, আমি ওদের সত্যি কথা বলে দিয়ে আসি, আমি লায়ার নই। মা বলে গেছে সত্যি বলতে।'

হেমলতা কেঁদে ফেললেন, 'অনি বাবা, যুধিষ্ঠিরও এক সময় মিথ্যে বলেছিলেন।

কিন্তু তুমি তো বলনি, ওরা তোমার কথা ভুল বুঝেছে। আমার কাছে বসে মনে মনে মাকে ডাকো, দেখবে তিনি একটুও রাগ করেননি।'

সমস্ত বাড়ি তছনছ করে পুলিসের গাড়ি শব্দ করে ফিরে গেল। ওরা চলে গেলে বাড়িটা আচমকা নিস্তব্ধ হয়ে গেল যেন। কোথাও কোন শব্দ নেই, পিসীমার পাশে অনি গা-ঘেঁষে বসে, সরিৎশেখরের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু তিস্তার চরে একগাদা শেয়াল নিজেদের মধ্যে ডাকাডাকি শুরু করে দিল। এই রাত্রে, এখন, জলপাইগুড়ি শহরটা চুপচাপ ঘুমিয়ে। অনিমেষ প্রিয়তোষের কথা ভাবছিল, কাকা নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে নেই। কাকাকে খুঁজতে পুলিসরা চারধারে ছুটে বেড়াচ্ছে। কাকা তো কাউকে হত্যা করেনি কিন্তু পুলিসগুলোর মুখ দেখে মনে হল সেরকমই খারাপ কিছু কাকা করেছে। এখন কাকা কোথায়? কাকা কেন স্বর্গছেঁড়ায় পালিয়ে যাচ্ছে না? স্বর্গছেঁড়ায় কোনদিন পুলিস যায় না, কাকা সেটা ভুলে গেল কি করে!

এমন সময় শব্দ করে বাইরের দরজাটা বন্ধ হল। বিদ্যাসাগরী চটির আওয়াজটা এ ঘরের দরজায় এসে থামল। অনি তাকিয়ে দেখল দাদুর চোখে চশমা নেই, কেমন রোগা লাগছে মুখটা। অদ্ভুত শূন্য গলায় সরিৎশেখর বললেন, 'বুঝলে হেম এই শুরু হল, আমাকে আরো যে কত দেখে যেতে হবে।'

হেমলতা খুব ধীরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে?'

চিৎকার করে উঠলেন সরিৎশেখর, 'তোমার ভাই কম্যুনিস্ট হয়েছে, আমার গুষ্টির পিণ্ডি হয়েছে।'

হেমলতা বললেন, 'কম্যুনিস্ট? সে আবার কি?'

সরিৎশেখর বললেন, 'দেশ উদ্ধার করছেন, আমরা যে এতদিন পর স্বাধীনতা পেলাম তাতে বাবুদের মন উঠছে না, সারা দেশ তাতিয়ে বেড়াচ্ছেন। মেরে হাড় ভেঙে দেবে জওহরলাল। আমি এসব বরদাস্ত করব না, একটা মাতাল লম্পটকে তাড়িয়েছি, এটাও যেন কোনদিন বাড়িতে না ঢোকে। এই ছেলের জন্য এত রাত্রে আমাকে হেনস্তা হতে হল!'

হেমলতা বললেন, 'প্রিয় আবার কবে ওসব দলে ভিড়ল!'

সরিৎশেখর খেঁকিয়ে উঠলেন, 'তোমারই তো দোষ, নিজের ভাই কি করছে খেয়াল রাখতে পার না।'

হেমলতা উত্তেজিত হলেন, 'আমার ভাই কিন্তু আপনার তো ছেলে।'

সরিৎশেখর একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে বলে চললেন, 'তখন যদি গুদামবাবুর মেয়েটার সঙ্গে বিয়ে দিতাম তাহলে আর এই দুর্ভোগ হত না। তুমিই তো তখন খ্যাক খ্যাক করেছিলে।'

হেমলতা কোন জবাব দিলেন না। প্রিয়তোষের ব্যাপারটা তিনি বুঝতে পারছিলেন না ঠিক। কিন্তু গুদামবাবুর মেয়ে তপুকে বাড়ির বউ হিসেবে মাধুরীর পাশে তিনি ভাবতেই পারেন না।

এমন সময় সরিৎশেখর অনিমেষের দিকে তাকালেন, 'তুমি এত রাত্রে জেগে ছিলে কেন?'

অনিমেষ ভয়ে ভয়ে দাদুর দিকে তাকাল। রাগলে দাদুকে ভয়ংকর দেখায়। কি বলবে ভাবতে না ভাবতেই সরিৎশেখর ধমকে উঠলেন, 'কথা জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দাও না কেন?' ভাগ্যিস হেমলতার একটা হাত ওর পিঠের ওপর ছিল নইলে সে কেঁদে ফেলত। সরিৎশেখর এবার সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রিয়তোষ কি এসেছিল?' চট করে ঘাড় নাড়ল অনিমেষ, হ্যাঁ। প্রথম থেকেই এইরকম একটা সন্দেহ করেছিলেন সরিৎশেখর কিন্তু নাতির মুখের দিকে তাকিয়ে এখন হতবাক হয়ে গেলেন। পুলিস অফিসারটা যখন ধমকাচ্ছিল তখন অনিমেষ একথা স্বীকার করেনি তো। ঐটুকু শিশু—! সরিৎশেখর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাকে ডাকনি কেন?'

বিড় বিড় করে অনিমেষ বলল, 'আমাকে শব্দ করতে মানা করেছিল কাকা। আমার মন খারাপ লাগছিল।'

'কেন?'

'কাকার শরীর খুব খারাপ হয়ে গেছে, জামা-কাপড় ময়লা।'

'হুম্। কি করল সে?'

'বইপত্র নিয়ে চলে গেল।'

'কি বই?'

'অনেক বই। একটার নাম মার্কসবাদী।'

'ও! সর্বনাশ তাহলে অনেক ভেতরে গেছে। কি বলল?'

'আমি সব কথা বুঝিনি, শুধু একটা কথা মনে আছে—এ আজাদী ঝুটা হ্যায়।'

'ছাই হ্যায়।' চিৎকার করে উঠলেন সরিৎশেখর, 'সব জেনে বসে আছে, আজাদীর তোরা কি বুঝিস রে! নেতাজীকে গালাগালি দিস, রবীন্দ্রনাথকে গালাগালি দিস, ক্ষুদিরাম বাঘা যতীন—এঁদের কথা ভুলে যাস —ননসেন্স।' হঠাৎ অনির দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'এসব একদম বাজে কথা, তুমি কান দিও না।'

নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে তাঁর মনে পড়ল ঐ বালকটি আঠারো বছর বয়সে জেলে যাবে। বুকের ভিতর দুরমুশ শুরু হয়ে গেল ওঁর—কি জানি—আজ

রাত্রে তার বীজবপন হয়ে গেল কি না। ওর দিকে নজর রাখতে হবে, ওকে নিজের মত করে গড়তে হবে।

ঘাড় ঘুরিয়ে সরিৎশেখর দেখলেন পায়ে পায়ে অনিমেষ তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। ওর হাঁটার ধরন দেখে খুব অবাক হলেন সরিৎশেখর। খুব শান্ত গলায় নাতিকে ডাকলেন তিনি, 'কিছু বলবে ?' ঘাড় নাড়ল অনিমেষ। তারপর সরিৎশেখরের একদম কাছে এসে পেটের ওপর প্যাণ্টের ভাঁজ থেকে সেই নীল চিঠিটা বের করে দাদুকে দিল। অবাক হয়ে চিঠিটা নিয়ে নিজের ঘরে গেলেন সরিৎশেখর, টেবিলের ওপর রাখা চশমাটা তুলে সেটা পড়লেন। অনেকক্ষণ বাদে ডাক এল অনিমেষের, 'তুমি এটা কোথায় পেলে ?'

'কাকার স্যুটকেসে।'

'পড়েছ ?'

মাথা নাড়ল অনিমেষ, 'হ্যাঁ।'

চোখ বন্ধ করলেন সরিৎশেখর, 'কিছু বুঝেছ ?'

ভয়ে ভয়ে অনি ঘাড় নাড়ল, 'না।'

'যাও। শুয়ে পড়। প্রিয়তোষ যদি আসে আমাকে না বলে দরজা খুলবে না।'

চলে যেতে যেতে অনিমেষ দেখল দাদু আলমারীর ভেতরে চিঠিটা রেখে দিয়ে তালা বন্ধ করছেন।

হঠাৎ অনির মনটা তপুপিসীর জন্য কেমন করে উঠল।

স্কুলের প্রথম বছরে অনিমেষের স্বর্গছেঁড়ায় যাওয়া হয়নি। মহীতোষ ওখানে অত বড় কোয়ার্টারে একা আছেন ঝাড়িকে নিয়ে। সেই রান্নাবান্না করে সংসার সামলায়। গরমের ছুটিতে বা পূজোর সময় সরিৎশেখর ভেবেছিলেন নাতিকে পাঠাবেন কিন্তু মহীতোষই আপত্তি করেছেন। ওখানে গেলে মাধুরীর কথা বারংবার মনে হবে অনিমেষের। হেমলতার হয়েছে মুশকিল, হাজার দোষ করলেও ভাইপোকে বকামারা চলবে না, সরিৎশেখরের হুকুম। মহীতোষ দুদিন ছুটি থাকলেই শহরে চলে আসেন কিন্তু ছেলের সঙ্গে ইচ্ছে থাকলেও মিশতে পারেন না ঠিকমত। কোথায় যেন আটকে যায়। এইটুকুনি ছেলে একা একা শোয়, একা একা বাগানে ঘোরে, কি গম্ভীর দেখায়। পড়াশুনায় রেজাল্ট ভালই হচ্ছে। হেডমাস্টারমশাই সরিৎশেখরকে বলেছেন, হি ইজ একসেপশনাল, অত্যন্ত ভাবুক। জলপাইগুড়ি শহরে কম্যুনিস্ট পার্টির ব্যাপারে আর তেমন হইচই হচ্ছে না। কংগ্রেসের মিছিল বেরুচ্ছে ঘন ঘন। প্রিয়তোষের খবর পাওয়া যায়নি আর। মহীতোষের এক ক্লাসমেট

জলপাইগুড়ি থানায় পোস্টেড হয়ে এল, সেও কোন খবর দিতে পারল না। পরিতোষ আসামে এক কাঠের ঠিকাদারের কাছে সামান্য মাইনেতে কাজ করছে এ খবর মহীতোষ পেয়েছেন। যে খবর এনেছে সে পরিতোষের বউকে নাকি দেখেছে। খবরটা বাবাকে জানাতে পারেননি মহীতোষ। বড়দার কথা শুনলেই বাবার মেজাজ চড়ে যায়।

হেমলতা জলপাইগুড়িতে আসার পর হঠাৎ যেন বুড়িয়ে যাচ্ছেন। প্রায়ই অম্বল হচ্ছে আজকাল, কিছু খেলে হজম হয় না ঠিক। সব কাজ শেষ করে খেতে খেতে চারটে বেজে যায়। সেই সময় অনিমেষ আসে। পিসীমার আলোচালের ভাত নিরামিষ তরকারী দিয়ে খেতে ও খুব ভালবাসে। সরিৎশেখরের সন্দেহ অনিমেষের সঙ্গে খাবার জন্যেই হেমলতার চারটের আগে খেতে বসা হয় না। অনেক বকাঝকা করেছেন কোন কাজ হয়নি। নিজের হাতে রান্না সেরে সরিৎশেখরকে খাইয়ে সমস্ত বাড়ি ঝেড়ে মুছে বাসন মেজে তবে নিজের নিরামিষ রান্না শুরু করবেন হেমলতা। একটু পিটপিটে স্বভাব আগেও ছিল, সরিৎশেখর লক্ষ্য করেছেন ইদানীং সেটা আরো বেড়েছে। চব্বিশ ঘণ্টা জল ঘেঁটে ঘেঁটে দু' পায়ের আঙুলের ফাঁকে সাদা হাজা বেরিয়ে গেছে, অনিমেষের মুখে সরিৎশেখর সন্ত সেটা জানতে পারলেন। বিকেলে যখন ওরা মুখোমুখি খেতে বসে সে দৃশ্য বেশ মজার। পিঁড়িতে বাবু হয়ে বসে অনিমেষ, হেমলতা অত বড় ছেলেটাকে ভাত, তরকারী মেখে গোল্লা পাকিয়ে দিয়ে নিজে মাটিতে উবু হয়ে বসে খাওয়া শুরু করেন। প্রায় একই সংলাপ দিয়ে খাওয়া শুরু হয়ে রোজ, সরিৎশেখর চুরি করে শুনেছেন। অনিমেষ বলে, 'মাকে তুমি ফ্রক পরা দেখেছ?'

হেমলতা খেতে খেতে বলেন, 'পনের বছরের মেয়ে ফ্রক পরবে কি! তবে বিয়ের আগের দিনও নাকি রান্নাঘরে ঢোকেনি। তোর দাদু যখন দেখতে গিয়েছিল তখন ওর বাবা খুব ভুজুং দিয়েছিল—এই রাঁধতে পারে সেই রাঁধতে পারে।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি! বিয়ের পর আমি রেঁধে দিতাম আর তোর দাদু জানতো মাধুরী রেঁধেছে। তবে খুব চটপট শিখেছিল।'

'মা দেখতে খুব সুন্দরী ছিল, না?'

'মুখটা খুব মিষ্টি ছিল তবে ভীষণ মোটা। হাত-টাতগুলো কি, এক হাতে ধরা যায় না। মাথায় চুল ছিল বটে, হাঁটুর নীচ অবধি নেমে আসতো। দু'হাতে চুল বাঁধতে হিমসিম খেতে হত। একদিন রাগ করে অনেকটা কেটে দিলাম।'

'মা মোটা ছিল?' অনিমেষের গলায় বিস্ময়।

'হুঁ। বাবার তো ঐরকম পছন্দ ছিল। আমার প্রথম মা'র নাকি পাহাড়ের মত শরীর ছিল। বিয়ের পর আমরা তোর মাকে নিয়ে খুব ঠাট্টা করতাম। তারপর তুই হতে কেমন রোগা রোগা হয়ে গেল।'

তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ দুজনে কথা না বলে খেয়ে যায়। বিকেলে অনির এই ভাত খাওয়াটা একদম পছন্দ করেন না সরিৎশেখর। কিন্তু মেয়ের জন্য কিছু বলতেও পারেন না। অনেক কিছু এখন মেনে নিতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে। সরিৎশেখর বুঝতে পারছেন তাঁর পুঁজি দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। এতদিন চা-বাগানের চাকরিতে মাইনে ছাড়া বাড়তি কোন উপার্জন করেননি। বিলাসিতা ছিল না তাই জমানো টাকার বেশির ভাগ দিয়ে এই বাড়িটা তৈরি করার পর হাতে যা আছে তাতে মাত্র কয়েক বছর চলতে পারে। এখনও তাঁর স্বাস্থ্য ভাল, ইচ্ছে করলে এই শহরে কোন দেশী চা-বাগানের হেড অফিসে একটা চাকরি জুটিয়ে নিতে পারেন কিন্তু আর গোলামী করতে প্রবৃত্তি হয় না। চা-বাগানের ইতিহাসে এতদিন পেন্সনের ব্যাপারটাই ছিল না। রিটায়ার করার পর অনেক লেখালেখি করে কলকাতা থেকে তাঁর জন্য পঁচাত্তর টাকার একটা মাসিক পেন্সনের অনুমতি আনিয়েছেন। সরিৎ-শেখরের ধারণা তাঁর চিঠির চেয়ে ম্যাকফার্সনের সুপারিশ বেশী কাজ করেছে। মেমসাহেব এখনও প্রতি মাসে তাঁকে চিঠি লেখেন ডিয়ার বাবু বলে। স্বর্গছেঁড়ার জন্য কষ্ট হয় তাঁর, সরিৎশেখরকে তিনি ভোলেননি—এইসব। টানা টানা হাতের লেখা। অনিমেষকে সে চিঠি পড়ান সরিৎশেখর। খামের ওপর ডাকঘরের ছাপ থেকে দেশটাকে নাতির কাছে উপস্থিত করতে চেষ্টা করেন। মিসেস ম্যাকফার্সন লিখেছিলেন তোমার গ্র্যাণ্ডসন যখন এখানে ব্যারিস্টারি পড়তে আসবে তার সব খরচ আমার। সরিৎশেখর অনিমেষকে বিলেতে পাঠাবেন বলে যখন ঘোষণা করেন তখন সময়ের হিসাব তাঁর হারিয়ে যায়। পেন্সন পাবার পর চলে যাচ্ছে একরকম। তিনটে তো প্রাণী, এতবড় বাড়িটা খালি পড়ে থাকে। মহীতোষ তাঁকে টাকা পাঠাতে চেয়েছিলেন প্রতি মাসে, রাজী হননি তিনি। বলেছিলেন তাহলে ছেলেকে হোস্টেলে রাখ। আর কথা বাড়াননি মহীতোষ। টাকার দরকার হলে বাড়ি ভাড়া দিতে পারেন সরিৎশেখর। প্রচুর লোক আসছে ভাড়ার প্রস্তাব নিয়ে। এতগুলো ঘর খালি পড়ে আছে, কেউ এসে থাকবে তারও তো সম্ভাবনা নেই। তবু ভাড়া দেওয়ার কথা চিন্তাই করেন না সরিৎশেখর। এটা তাঁর এক ধরনের আনন্দ। কেউ ভাড়া চাইতে এলে তাকে মুখের ওপর না বলে দিয়ে মেয়ের কাছে এসে বলেন, 'বুঝলে হেম, এই যে বাড়িটা দেখছ—এই হল আমার আসল ছেলে, শেষ বয়সে এই আমাকে দেখবে।'

এখন প্রতি বছর তিস্তায় ফ্লাড আসে। যেমন ভাবে নিয়ম মেনে বর্ষা আসে শীত আসে তেমনি বন্যার জল শহরে ঢুকে পড়ে। নতুন বাড়িতে ওঠার পর জল আর জিনিসপত্র নষ্ট করার সুযোগ পায় না। শুধু প্রতি বছর সরিৎশেখরের বাগানের ওপর পলিমাটির স্তরটা বেড়ে যায়। এখন নদী দেখলে সরিৎশেখর বুঝতে পারেন দু-একদিনের মধ্যে বন্যা হবে কিনা। এমন কি তিস্তা যখন খটখটে শুকনো, সাদা বালির চরে হাজার হাজার কাশগাছ বাতাসে মাথা দোলায়, যখন ওপারের বার্নিশ-ঘাট অবধি জলের রেখা দেখা যায় না, ভাঙা ট্যাক্সিগুলো সারাদিন বিকট শব্দ করে তিস্তার বুকে ছুটে বেড়ায়, সেইরকম সময়ে একদিন হঠাৎ মাঝরাত্রে বোমা ফাটার মত শব্দ ওঠে তিস্তার বুকে আর সরিৎশেখর বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিশ্চিত হয়ে যান কাল ভোরে বেড়াতে গিয়ে দেখতে পাবেন তিস্তার শুকনো বালি রাতারাতি ভিজে গেছে। বিকেল নাগাদ ভুস করে জল উঠে স্রোত বইতে শুরু করবে। চোখের উপর এই শহরটার চরিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চোখের উপর অনিকে বড় হয়ে উঠতে দেখছেন। পড়াশুনায় ভাল ছেলেটা, পড়ার কথা কখনো বলতে হয় না। আজ অবধি কারোর কাছ থেকে কোনরকম নালিশ শুনতে হয়নি ওর বিরুদ্ধে। কিন্তু ভীষণ লাজুক অথবা গম্ভীর হয়ে থাকে ছেলেটা। এই বয়সে ওরকম মানায় না। জোর করে বিকেলে স্কুলের মাঠে পাঠাচ্ছেন ওকে, খেলাধুলা না করলে শরীর ঠিক থাকবে কি করে! ক্রমশ মাথা চাড়া দিচ্ছে ওর শরীর, এই সময় ব্যায়াম দরকার।

অনিমেষ শুনেছিল দাদু সেকালে ফার্স্ট ক্লাস অবধি পড়েছিলেন। কলেজে যাননি কোনদিন। কিন্তু এত ভাল ইংরেজী বুঝিয়ে দিতে পারেন যে ওদের স্কুলের রজনীবাবু অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। একবার প্রতিশব্দ লিখতে বলেছিলেন রজনীবাবু। অনিমেষ বাড়িতে এসে দাদুকে জিজ্ঞাসা করতে একটা শব্দের পাঁচটা প্রতিশব্দ পেয়ে গেল। রজনীবাবুর মুখ দেখে ক্লাসে বসে পরদিন অনিমেষ বুঝতে পেরেছিল তিনি নিজেও অতগুলো জানতেন না। ছোট ডিক্শনারিতে অতগুলো না পেয়ে রজনীবাবু ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কোত্থেকে ও এসব লিখেছে? অনিমেষের মুখ থেকে শুনে রজনীবাবু বিকেলে এসে দাদুর সঙ্গে আলাপ করে গিয়েছিলেন। ম্যাকফার্সন সাহেব দাদুকে একটা ডিক্শনারী দিয়েছিলেন যার ওজন প্রায় দশ সের হবে, অনিমেষ দু'হাতে কোনক্রমে এখন সেটাকে তুলতে পারে। রজনীবাবু মাঝে মাঝে এসে সেটা দেখে যান।

শেষ পর্যন্ত কিছুই চেপে রাখা গেল না। সরিৎশেখর যতই আড়াল করুন

মহীতোষের বিয়ের আঁচ এ বাড়িতে লাগতে আরম্ভ করল। মহীতোষ নিজে আসছেন না বটে কিন্তু তাঁর হবু শ্বশুরবাড়ির লোকজন নানারকম কথাবার্তা বলতে সরিৎশেখরের কাছে না এসে পারছেন না। সরিৎশেখর সকালে বাজারে গিয়ে একগাদা মিষ্টি নিয়ে আসেন, কখন কে আসে বলা যায় না। হেমলতা তা দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করেন। মেয়ের বাড়ি থেকে যাঁরা আসেন তাঁরা অনিকে দেখে একটু অস্বস্তির মধ্যে থাকেন সেটা অনি বেশ টের পায়। দাদু পিসীমা ওকে মুখে কিছু না বললেও ও যে ব্যাপারটা জেনে গেছে সেটা বুঝতে পেরে গেছেন। অনির ধারণা ছিল বিয়ে হলে খুব ধুমধাম হয়, অনেক আত্মীয়স্বজন আসে, কিন্তু ওদের বাড়িতে কেউ এল না। শুধু এক বিকেলে সাধুচরণ এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে সরিৎশেখরের কাছে এলেন। ওঁদের সাজগোজ দেখে কেমন সন্দেহ হল অনিমেষের, পা টিপে টিপে ও দাদুর ঘরের জানলার কাছে এসে কান পাতল। সাধুচরণ বলছিলেন, 'সব ঠিকঠাক আছে, এবার আপনাকে যেতে হয়।'

সরিৎশেখর বললেন, 'সন্ধ্যে সন্ধ্যে বিয়েটা হয়ে যাবে আশা করি, আমি আবার আটটার মধ্যে শুয়ে পড়ি।'

বৃদ্ধ-ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ, সন্ধ্যেবেলাতেই বিয়ে; আপনি খাওয়া-দাওয়া সেরে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারবেন।'

সরিৎশেখর বললেন, 'খাওয়া-দাওয়া? না বেয়াই মশাই, আমি তো খেতে পারব না। আমাকে এ অনুরোধ করবেন না।'

বৃদ্ধ বললেন, 'সে কি? তা কখনো হয়?'

সরিৎশেখর বললেন, 'হুম। আমার বাড়িতে আমার নাতি আছে যাকে আমরা এই বিয়ের কথা জানাইনি। তাকে বাদ দিয়ে আমি কোন আনন্দ-উৎসবে আহার করতে অক্ষম।'

বৃদ্ধ বললেন, 'কিন্তু তাকে তো আপনি নিজেই নিয়ে যেতে চাননি।'

সরিৎশেখর বললেন, 'ঠিকই। ঐ অনুষ্ঠানে ওর উপস্থিতি কি কারো ভালো লাগবে? তাছাড়া একজনকে যখন এনেছিলাম তখন অনেক আমোদ-আহ্লাদ করেছি তবু তাকে কি রাখতে পারলাম! ওসব কথা যাক। পাত্রের পিতা হিসেবে আমার কর্তব্যটুকু করতে দিন, এর বেশী কিছু বলবেন না।'

অনি শুনল দাদু গলা চড়িয়ে ডাকছেন, 'হেম, হেম।' রান্নাঘর থেকে সাড়া দিতে দিতে পিসীমা এ ঘরের দরজা অবধি এসে থেমে গেলেন, 'কি বলছেন?'

'আমি চললাম, সেই হারটা দাও তো।'

'ঐ তো, আপনার ড্রয়ারের মধ্যে আছে। কিন্তু আপনি জামা-কাপড় পাল্টালেন

না ? এরকম ময়লা পাঞ্জাবি পরে লোকে বাজারে যায়, বরকর্তা হয়ে যায় নাকি !'

অনি ড্রয়ার খোলার আওয়াজ পেল। তারপর শুনল দাদু বলছেন, 'আমি আটটার মধ্যে ফিরে আসব। অনিকে বলো ও যেন আমার জন্যে অপেক্ষা করে, একসঙ্গে খাব।'

পায়ের শব্দ পেতেই অনি দ্রুত সরে এল। আড়ালে দাঁড়িয়ে ও দেখল সাধুচরণ আর সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দাদু বাইরে বেরিয়ে এলেন। পিসীমার গলায় 'দুর্গা দুর্গা' শুনতে পেল সে। সাধুচরণ ও সেই ভদ্রলোকের পাশে দাদুকে একদম মানাচ্ছে না। লংক্লথের ময়লা পাঞ্জাবি, হাঁটুর নিচ অবধি ধুতি, লাঠি হাতে দাদু ওঁদের সঙ্গে হেঁটে গলির বাঁক পেরিয়ে গেলেন। দরজা বন্ধ করে পিসীমা ডাকলেন, 'অনি, অনিবাবা।'

সঙ্গে সঙ্গে অনিমেষ সোজা হয়ে দাঁড়াল। দাদু কোথায় যাচ্ছেন সেটা বুঝতে পেরে ওর অসম্ভব কৌতূহল হতে লাগল। চট করে এপাশ ওপাশ দেখে নিয়ে বারান্দায় ছেড়ে রাখা চটিজোড়া এক হাতে তুলে ও লাফ দিয়ে ভেতরের বাগানে নেমে পড়ল।

বাড়ির পেছন দিয়ে দৌড়ে ও যখন গলির মুখে এসে দাঁড়াল ততক্ষণে সরিৎ-শেখররা টাউন ক্লাব ছাড়িয়ে গেছেন। দূর থেকে তাঁদের দেখতে পেয়ে নিশ্চিন্তমনে হাঁটতে লাগল ও। এখন প্রায় শেষ-বিকেল। টাউন ক্লাবের মাঠে ফুটবল খেলা চলছে। রাস্তাটায় লোকজন বেশী, নিরাপদ দূরত্বে অনিমেষ হাঁটছিল। সাধুচরণ একটা রিকশা দাঁড় করিয়ে কি বলতে সরিৎশেখর ঘাড় নাড়লেন। অনিমেষ জানে দাদু রিক্‌শায় উঠবেন না। শরীর ঠিক থাকলে দাদুকে রিক্‌শায় ওঠানো সহজ নয়। অবশ্য এখন যদি দাদু রিকশায় উঠতেন তাহলে অনিমেষ কিছুতেই আর নাগাল পেত না। রিক্‌শায় না ওঠার জন্য সময় সময় ওর দাদুর ওপর খুব রাগ হতো, কিন্তু এখন এই মুহূর্তে ওর খুব ভাল লাগল। দাদুর সঙ্গে হেঁটে তাল রাখতে পারছেন না সাধুচরণ। সঙ্গের ভদ্রলোকটি প্রায় দৌড়চ্ছেন। বড় বড় পা ফেলে চলেছেন সরিৎশেখর লাঠি দুলিয়ে। সাধুচরণকে ও কোনদিন দাদু বলতে পারল না। এর জন্য অবশ্য হেমলতা অনেকটা দায়ী। প্রথম থেকেই সাধুচরণকে ভালভাবে দেখেননি হেমলতা। নিজের মেয়েকে যে কষ্ট দেয়, সে মেয়ে মরে গেলে তো কষ্ট পাবেই না—এটা তো জানা কথা কিন্তু তা বলে পাঁচজনকে বলে বেড়াবে, অর্ধমুক্তি হল আমার ! বাকি অর্ধেকটা যেন স্ত্রীর মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছে। হেমলতা কোনদিন ওকে কাকা জ্যাঠা বলতে পারেননি। সেটাই রপ্ত করেছিল অনি। সামনাসামনি কিছু বলত না কিন্তু আড়াল হলে ও পিসীমার মত নাম ধরে বলা

অভ্যাস করে ফেলল।

ঝোলনা পুল পার হয়ে করলা নদীর ধার দিয়ে ওঁদের থানার দিকে যেতে দেখে অনি দূরত্বটা বাড়িয়ে দিল। এখানে রাস্তাটা অনেকখানি সোজা, চট করে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকালে ও ধরা পড়ে যাবে। ঝোলনা পুলে উঠতে ওর বেশ মজা লাগে। দুটো মোটা তারের ওপর পুলটা বাঁধা, বেশ দোলে। নিচে করলা নদীর জল কচুরিপানায় একদম ঢাকা পড়ে আছে। এখনো সন্ধ্যে হয়নি। দাদুদের ওপর চোখ রেখে পুলের মাঝামাঝি এসে নতুন স্যারের সঙ্গে ওর চোখাচোখি হয়ে গেল। পুলের তারের জালে হেলান দিয়ে নতুন স্যার দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁকে দেখে নতুন স্যার হাসলেন, 'কোথায় যাচ্ছ অনিমেষ?'

কি বলবে বুঝতে না পেরে অনি বলল, 'বেড়াতে।'

'ও, তোমাদের এই নদীটাকে আমার খুব ভালো লাগে, জানো! কেমন চুপচাপ বয়ে চলে যায়। অথচ এর নাম কেন একটা তেতো ফলের নামে রাখল বল তো?' নতুন স্যার বললেন।

অনি দেখছিল দাদুরা খুব দ্রুত দূরে চলে যাচ্ছেন। কিছু বলা দরকার তাই বলল, 'করলা খেলে তো রক্ত পরিষ্কার হয়।'

'গুড।' খুব খুশী হলেন নতুন স্যার, 'এই নদী শহরের দূষিত রক্ত পরিষ্কার করছে। এককালে এসব জায়গায় দেবী চৌধুরানী নৌকো নিয়ে বেড়াতেন। ইংরেজদের সঙ্গে ওঁর খুব যুদ্ধ হয়েছিল। তিস্তার পারে এখনও নাকি একটা কালী-মন্দির আছে যেটা শুনেছি ওঁরই প্রতিষ্ঠিত। তুমি দেবী চৌধুরানীর নাম শুনেছ?'

অনি ঘাড় নাড়ল, 'না।'

নতুন স্যার বললেন, 'ঠিক আছে, তোমাকে পরে একদিন ওঁর কথা বলব। আজ বরং তোমাকে একটা বই দিই। এটা চিরকাল তোমার কাছে রেখে দেবে।' অনি দেখল নতুন স্যার তাঁর কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে একটা বই বের করে ওর দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন। বইটার মলাটে পাগড়ি পরা একজন মানুষের মুখ যাকে দেখলে মারোয়াড়ী দোকানদার বলে মনে হয়। আর ওপরে লেখা রয়েছে আনন্দমঠ, নিচে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নতুন স্যার বললেন, 'ইনি হলেন আমাদের সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। আর এই বই হল ভারতের স্বাধীনতার বীজমন্ত্র বন্দেমাতরমের উৎস। এই বই না পড়লে দেশকে জানা যাবে না, আমাদের ইতিহাসকে জানা যাবে না।'

বইটা থেকে মুখ তুলে অনি দেখল থানার রাস্তায় দাদুদের কাউকে আর দেখা যাচ্ছে না। করলার ওপর আবছায়া সন্ধ্যার অন্ধকার কোন ফাঁকে চুঁইয়ে নেমে

এসেছে। হঠাৎ কোন কথা না বলে বই বগলে করে ও দৌড়তে লাগল। নতুন স্যার খুব অবাক হয়ে ওকে কিছু বললেন কিন্তু সেটা শোনার জন্য সে দাঁড়াল না।

রাস্তাটা বাঁধানো নয়, একরাশ ধুলো উড়িয়ে ও থানার পাশে এসে দাঁড়াতেই ঢং ঢং করে পেটা ঘড়িতে শব্দ হতে লাগল। এখান থেকে রাস্তা দুই ভাগ হয়ে গিয়েছে। কোন রাস্তা দিয়ে দাদু গিয়েছেন কি করে বোঝা যাবে? হঠাৎ খেয়াল হল সেদিন দাদু হোটেলের কথা বলছিলেন। থানার ওপাশে কি একটা হোটেলের সাইনবোর্ড দেখেছিল ও একদিন। সেদিকেই পা চালাল অনি।

এখন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। রাস্তায় তেমন আলো নেই। দুই একটা রিক্‌শা ছাড়া লোকজন কম যাওয়া-আসা করছে। থানার সামনে দুটো সিপাই বন্দুক ঘাড়ে করে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। একা সন্ধ্যেবেলায় এইদিকে কখনো আসেনি ও। আনন্দমঠটা দুহাতে চেপে ধরে সামনে দিয়ে হেঁটে এল অনি। সামনেই একটা বিরাট বটগাছ, তার তলায় ভুজাওয়ালার দোকান। অনি গাছের তলায় চলে এল। এদিকে আলো নেই একদম, শুধু ভুজাওয়ালার দোকানের সামনে একটা গ্যাস পাইপ জ্বলছে। সেই আবছায়া অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অনি দেখল বেশ কিছু লোক হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। একটা কালো রঙের গাড়ির সামনের সিটে দাদু বসে আছেন। দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর মধ্যে সাধুচরণ ছাড়া স্বর্গছেঁড়ার মনোজ হালদার, মালবাবুকে দেখতে পেল ও। একটু বাদেই অনি অবাক হয়ে দেখল কয়েকজন লোক মহীতোষকে দুপাশে ধরে হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে আনছে। বাবাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে এখন। এক হাতে টোপর, ধুতি কুঁচিয়ে ফুলের মত অন্য হাতে ধরা, কপালে চন্দনের ফোঁটা, পাঞ্জাবিটা কেমন চকচক করছে আলোয়। বাবা এসে গাড়ির পিছনে উঠে বসলেন। সাধুচরণ আর সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক মালবাবুকে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। গাড়িটা কিন্তু হুস করে চলে যেতে পারল না। কারণ গাড়ির সামনে ধুতি পাঞ্জাবি পরা লোকজন হেঁটে যেতে লাগল পথ চিনিয়ে। সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে অনি গাড়িটাকে প্রায় ওর সামনে দিয়ে যেতে দেখল। দাদু গম্ভীরমুখে বসে আছেন। বাবা হেসে মালবাবুকে কি বলছেন। মুখ ফেরালেই ওঁরা ওকে দেখে ফেলতে পারতেন। দেখতে পেলে কি বাবা ওকে বকতেন? হঠাৎ ওর মনে পড়ল বাবার এইরকম পোশাক-পরা একটা ছবি স্বর্গছেঁড়ার বাড়িতে মায়ের অ্যালবামে আছে। মা বলতেন, বিয়ের ছবি। আনন্দমঠ জড়িয়ে ধরে অনি চুপচাপ গাড়ির খানিক পেছনে হাঁটতে লাগল।

গলির মুখটায় বেশ ভিড়, গাড়ি ঢুকল না। তিন-চারটে রোগা মতন মেয়ে শাঁখ বাজাতে বাজাতে এসে বাবাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে গেল, তারপর ভিড়টা

সিনেমা হলে ঢোকার মত গলির ভেতর চলে গেল। এখন চারিদিকে বেশ অন্ধকার। এ রাস্তায় আলো নেই, শুধু বিয়েবাড়ি বলে গলির মুখে একটা হ্যাজাক ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনির খুব কৌতূহল হচ্ছিল ভিতরে গিয়ে দেখতে সেখানে কি হচ্ছে! বাবা যখন মাকে বিয়ে করতে গিয়েছিল তখনও কি এইরকম ভিড় হয়েছিল? এইরকম আলো দিয়ে মায়েদের বাড়ি সাজানো হয়েছিল? মা বেঁচে থাকলে বাবা আর বিয়ে করতে পারতো না এটা বুঝতে পারে অনি। কিন্তু এখন, এই একটু আগে বাবাকে যখন মেয়েরা গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে গেল তখন তো একদম মনে হল না বাবার মনে কষ্ট আছে! বউ মরে গেলে যদি আবার বিয়ে করা যায় তো পিসীমা কেন বিয়ে করেনি? পিসীমা তো আবার শাড়ি পরে মাছ খেতে পারতো। আজন্ম দেখা পিসীমার চেহারাটায় ও মনে মনে শাড়ি সিঁদুর পরিয়ে হেসে ফেলল, দ্যুৎ, পিসীমাকে একদম মানায় না। ঠিক ওইসময় ও শুনতে পেল কে যেন ওর দিকে এগিয়ে আসতে আসতে জিজ্ঞাসা করছে, 'কি চাই খোকা? এখানে দাঁড়িয়ে কি করছ?'

অনিমেষ কি বলবে মনে মনে তৈরি করতে না করতে লোকটা এসে দাঁড়াল সামনে, 'নেমন্তন্ন খেতে এসেছ তো এখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে যাও।'

লোকটা ওর পিঠে হাত রেখে বলছে, ভেতরে যাও। এখন তো ও বেশ সহজে যেতে পারে। কিন্তু বাবা, দাদু—অনিমেষ এক পা এগিয়ে আবার থমকে দাঁড়াল।

'কি হল, দাঁড়ালে কেন? যাও।' লোকটা কথাটা শেষ করতেই ওর মনে হল এবার এক ছুটে পালিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু ততক্ষণে একটা সন্দেহ এসে গেছে লোকটার মনে, 'তোমার নাম কি? কোন বাড়িতে থাক?'

'আমি এখানে থাকি না।' অনিমেষ বলল।

'কোন পাড়ায় থাক? কার সঙ্গে এসেছ?'

'আমি নেমন্তন্ন খেতে আসিনি।' অনিমেষ প্রায় কেঁদে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটার চেহারা পালটে গেল, 'তাহলে এখানে ঘুরঘুর করছিস কেন? চুরিচামারির ধান্দা, অ্যাঁ? যা ভাগ।' অনিমেষ দেখল লোকটা চড় মারার ভঙ্গীতে একটা হাত উপরে তুলেছে। নিজেকে বাঁচাবার জন্য সরে যেতে না যেতেই লোকটা খপ করে ওর হাত ধরল, 'তোর হাতে এটা কি! বই। কোত্থেকে মেরেছ বাবা!' প্রায় ছোঁ মেরে বইটা কেড়ে নিয়ে লোকটা বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে উচ্চারণ করল, 'আনন্দমঠ, অ্যাঁ? ধান্দাটা কি?'

'আমার বইটা দিন।' অনিমেষ কোনরকমে বলল।

'অ্যাই চোপ্। যা পালা এখান থেকে।' লোকটা তেড়ে উঠতে পেছন থেকে

আর একটা গলা শোনা গেল, 'কি হয়েছে শ্যামসুন্দর ? চেঁচাচ্ছ কেন ?'

'আরে এই ছোকরা তখন থেকে ঘুরঘুর করছে, এ পাড়ায় কোনদিন দেখিনি।' লোকটা মুখ ফিরিয়ে বলল।

'খুব সাবধান। আজকাল চোর-ডাকাতের দল এইসব বাচ্চা ছেলেকে পাঠিয়ে খবরাখবর নেয়।' অনিমেষ দেখল একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক ওদের দিকে এগিয়ে আসছে।

হঠাৎ মাথা গরম হয়ে গেল ওর। শ্যামসুন্দর নামে লোকটা কিছু বোঝার আগেই ও ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত থেকে আনন্দমঠটা ছিনিয়ে নিল। এত জোরে লাফিয়ে উঠেছিল অনিমেষ যে শ্যামসুন্দর ব্যালেন্স রাখতে না পেরে ঘুরে মাটিতে পড়ে গিয়ে 'ওরে বাপরে বাপ' বলে চিৎকার করে অনিমেষকে জড়িয়ে ধরতে গেল। বেটাল হয়ে অনিমেষ মাটিতে পড়তে পড়তে কোনরকমে শ্যামসুন্দরের মুখে একটা পেনাল্টি শট কষিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। অনিমেষকে ছেড়ে দিয়ে নিজের মুখ দুহাতে চেপে 'ডাকাত ডাকাত' বলে শ্যামসুন্দর চেঁচাচ্ছে আর সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক হঠাৎ গলা ফাটিয়ে একটা বিকট শব্দ তুলতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে গলির ভিতরে অনেকগুলো গলায় হইহই আওয়াজ উঠল। অনিমেষ দেখল পিল পিল করে লোকজন বেরিয়ে আসছে গলি দিয়ে। আর দাঁড়াল না অনিমেষ, এক হাতে বইটা সামলে প্রাণপণে ছুটতে লাগল সামনের রাস্তা ধরে। কেউ পালিয়ে গেছে এটা বুঝতে পেরে শোরগোল বেড়ে গেল। বেশ কয়েকজন তার পিছনে ছুটে আসছে। কি করবে বুঝতে না পেরে ও একটা অজানা অন্ধকার গলির ভেতর ঢুকে পড়ল। এতদূর দৌড়ে এসে ওর হাঁপ ধরে যাচ্ছিল, মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে নিতে ও বুঝতে পারছিল আর পালাতে পারবে না। সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ কিছু একটায় পা জড়িয়ে ও ছিটকে রাস্তায় পড়ে গেল। ওর মনে হল ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে, একটা অসহ্য যন্ত্রণা পাক খেয়ে উঠছে পা বেয়ে। চুপচাপ শুয়ে থাকতে থাকতে ও টের পেল পেছনে কোন পায়ের শব্দ নেই। কোন গলা ভেসে আসছে না। তাহলে কি ওরা আর পেছন পেছন আসছিল না ? ও কি বোকার মত ভয়ের চোটে দৌড়ে যাচ্ছিল ? একটু একটু করে সাহস ফিরে আসতে শরীর ঠাণ্ডা হল, বুকের ভিতর ধুকধুকুনিটা কমে এল। অনিমেষ উঠে বসে নিজের বুড়ো আঙুলে হাত দিতেই আঙুলগুলো চটচটে হয়ে গেল। গরম ঘন বস্তুটি যে রক্ত তা বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল না। আঙুলের চটচটে অনুভূতিটা হঠাৎ ওকে কেমন আচ্ছন্ন করে ফেলল। একা এই অন্ধকারে মাটিতে বসে মাধুরীর

মুখটা দেখতে পেয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল অনিমেষ।

পায়ের গোড়ালির উপর ভর করে কয়েক পা হেঁটে আসতে ও একসঙ্গে অনেকগুলো আলো দেখতে পেল। আলোগুলো খুব উজ্জ্বল নয়, পর পর লাইন দিয়ে কিছুটা দূরে চলে গেছে। কাছাকাছি অনেকগুলো গলা শুনতে পেল সে। বেশির ভাগ গলাই মেয়েলি, কেউ হাসছে, কেউ গান গাইছে। এইরকম গলায় কোন মেয়েকে ও হাসতে শোনেনি কোনদিন। ওকে দেখে মেয়েগুলো মুখের কাছে আলো তুলে ধরল। অবাক চোখে অনিমেষ দেখল পর পর অনেকগুলো মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে সার দিয়ে। কেমন সব সাদা সাদা মুখ আর তাতে পড়েছে লণ্ঠন, কুপির আলো। যেন নিজেদের মুখ অনিকে দেখানোর জন্য ওরা আলোগুলো তুলেছে। একটি মেয়েলি গলায় চিৎকার উঠল, 'এ যে দেখি কেষ্ট-ঠাকুর, নাড়ুগোপাল, ননী খাবার ইচ্ছে হয়েছে বুঝি ?'

সঙ্গে সঙ্গে আলোগুলো নিচে নেমে এল, 'ওমা, এ যে দেখছি পুঁচকে ছেলে। আমি ভাবলাম নাগর এল বুঝি।'

খিলখিল করে হেসে উঠল একজন, 'এগুলো হল ক্ষুদে শয়তান, বুঝলে দিদি, একটু সুড়সুড়ি উঠেছে কি এসে হাজির।'

'ঝাঁটা মার, ঝাঁটা মার।'

'আঃ থামো তো, রাম না বলতেই রামায়ণ গাইছ।' অনিমেষ দেখল একটা লম্বা মতন মেয়ে লণ্ঠন হাতে ওর দিকে এগিয়ে এল, 'এই ছোঁড়া, এখানে এসেছিস কেন ?'

'আমি আর আসব না।' অনিমেষ তাড়াতাড়ি বলে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে হাসির রোল ছড়িয়ে পড়ল, 'কান ধরে বলতে বল রে।'

মেয়েটি এক হাত কোমরে রেখে অন্য হাতে হ্যারিকেন ধরে আবার বলল, 'কিন্তু এসেছিস কেন ? জানিস না এ মহল্লার নাম বেগুনটুলি, এখানে আসতে নেই! নাকি জেনেশুনে এসেছিস ?'

ঘাড় নাড়ল অনিমেষ, তারপর বলল, 'আসতে নেই কেন ?'

মেয়েটি কি বলতে গিয়ে থেমে গেল, তারপর একটু নরম গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কোন্ স্কুলে পড় ?'

হঠাৎ তুই থেকে তুমিতে উঠে গিয়ে অনিমেষের কেমন অস্বস্তি হতে লাগল, 'জেলা স্কুলে।'

বলতে বলতে ও যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে ফেলল। মেয়েটি বলল, 'কি হয়েছে, অ্যায়সা করছ কেন ?'

অনিমেষ পা-টা তুলে ধরতেই মেয়েটি মুখে হাত চাপা দিয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'ওমা, এ যে দেখছি রক্তগঙ্গা ছুটছে, ক্যায়সা হল ?'

অনিমেষ দেখল আরো কয়েকজন এগিয়ে এসে মুখ বাড়িয়ে ওর পা দেখছে। একজন বলল, 'ছেড়ে দে, এই সন্ধ্যেবেলায় আর ঝামেলা বাড়াস না।'

কে একজন জড়ানো গলায় গান গাইতে গাইতে এদিকে আসছে দেখে সবাই হইহই করে আবার বাতি নিয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রথম মেয়েটি সেদিকে একবার দেখে একটু ইতস্তত করে এক হাত অনিমেষের পিঠের ওপর রেখে বলল, 'তুমি আস্তে আস্তে আমার কামরায় উঠে এস তো।'

একটু এগোলেই সার দেওয়া মাটির ঘর দেখতে পেল অনিমেষ। তারই একটায় মেয়েটি ওকে নিয়ে ঢুকল। ঘরের মধ্যে লণ্ঠনটা রেখে মেয়েটি ওকে বসতে বলল। আসবাব বলতে একটা তক্তাপোশ, তার ওপর বিছানা করা। দুটো বালিশ, কোন পাশবালিশ নেই। দেওয়ালে একটা ভাঙা আয়না ঝোলানো, একদিকে দড়িতে কিছু জামাকাপড় এলোমেলো ভাবে টাঙানো। ওকে বসতে বলে মেয়েটি তক্তাপোশের তলা থেকে একটা টিনের স্যুটকেস টেনে বের করে তা থেকে অনেকটা পাড় ছিঁড়ে নিয়ে এসে বলল, 'দেখি, গোড় বাড়াও।' ওর খুব সঙ্কোচ হচ্ছিল মেয়েটি পা ধরায় কিন্তু হঠাৎ ওর মনে হল মেয়েটি খুব ভাল। এত ভাল যে তার কাছে আসতে নেই কেন? তপুপিসীর চেয়ে বেশী বড় হবে না মেয়েটি কিন্তু সাজগোজ একদম অন্যরকম। এরা কারা? এই যে এত মেয়ে একসঙ্গে রয়েছে, সন্ধ্যেবেলায় আলো নিয়ে ঘুরছে কি জন্যে? এটা কি কোন হোস্টেল? ওদের স্কুলে যেমন ছেলেদের বোর্ডিং আছে তেমন কিছু? কিন্তু মেয়েরা এত চেঁচিয়ে হাসবে কেন? ওর মনে পড়ে গেল হেমলতা ওকে যে অপ্সরাদের গল্প বলেছিলেন তারাও তো এই রকম হাসি গান নিয়ে থাকে, দরকার হলে ভগবানদের সভায় গিয়ে নেচে আসে। এরা কি নাচ জানে? দ্যুৎ, অপ্সরারা দারুণ সুন্দরী হয়, এরা তো কেমন কালো কালো। হঠাৎ ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে চাপ লাগতেই অনিমেষের নজর পায়ের দিকে চলে এল। ও দেখল ওর পায়ের ওপর ইয়া লম্বা একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়ে গেছে। ওদের ড্রিল স্যার খুব সুন্দর করে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার যে কায়দাটা ওদের শিখিয়ে দিয়েছেন এই মেয়েটা নিশ্চয়ই সেটা জানে না।

'কি, আর দরদ লাগছে?' মেয়েটি গিঁট বেঁধে ওর পা কোল থেকে নামিয়ে দিল। ঘাড় নেড়ে 'না' বলে অনিমেষ উঠে দাঁড়াতেই ওর মনে হল কি একটা যেন ওর কাছে নেই। কি নেই বুঝতে না পেরে ও নিজের হাতের দিকে তাকাল।

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল অনিমেষ। ও যখন দৌড়ে এই গলির মুখে আসে তখনও বইটা তার হাতে ধরা ছিল এটা স্পষ্ট মনে আছে। কারণ ঐ সময় ওর কুঁচকির কাছে কি একটা কামড়াতে ও বইটা হাতজোড়া হয়েছিল বলে একটুও চুলকোতে পারেনি। তাহলে নিশ্চয়ই অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে ও যখন আছড়ে পড়েছিল তখন বইটা ছিটকে গিয়েছে। গোড়ালির ওপর ভর করে ও প্রায় দৌড়ে বাইরে আসছিল কিছু না বলে। মেয়েটি চট করে ওর হাত ধরে বলল, 'চলতে পারবে তো ?'

দ্রুত ঘাড় নাড়ল অনিমেষ, 'হ্যাঁ' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে এল। মেয়েটি খুব অবাক হচ্ছিল ওর এইরকম পরিবর্তনে, লণ্ঠন হাতে পেছন পেছন খানিকটা এসে চেঁচিয়ে বলল, 'আরে শোন, সামালকে যাও।' ততক্ষণে অনিমেষ অনেকটা দূর চলে গেছে। কিন্তু গলিটার মধ্যে এত অন্ধকার কেন! যে জায়গাটায় ও আছাড় খেয়ে পড়েছিল সে জায়গাটা যে ছাই বোঝা যাচ্ছে না কোথায়। পা দিয়ে রাস্তাটা হাঁটকে দেখতে লাগল ও অন্ধের মতন। নতুন স্যার বলেছেন, এই বই না পড়লে আমাদের দেশকে জানা যাবে না, আমাদের ইতিহাস জানা যাবে না। এই অন্ধকারে অনিমেষ কোথাও বইটার অস্তিত্ব খুঁজে পেল না একা একা। ঠিক এই সময় অন্ধকার ফুঁড়ে একটা চিৎকার উড়ে এল, গলাটা ক্যানকেনে, 'কে রে এখানে ঘুরঘুর করে, ট্যাঁকখালির জমিদারের পো নাকি, বাপের বাপী বিয়ে দেখার বড় সাধ, না রে, যা বেরো এখান হতে।' চারপাশ তাকিয়ে অনিমেষ কাউকে দেখতে পেল না। এই অন্ধকার গলিতে কাউকে দেখা অসম্ভব। অথচ ওর মনে হচ্ছে এই কথাগুলো যে বলল সে যেন স্পষ্ট তাকে দেখতে পাচ্ছে। কেমন সিরসির করতে লাগল ওর। এখান থেকে এক দৌড়ে ও বড় রাস্তায় চলে যেতে পারে। কিন্তু বইটা ? ধীরে ধীরে ও পেছন দিকে তাকাল। একটা আলো পেলে হত, কেউ যদি একটা আলো দিত ওকে।

গোড়ালিতে ভর করে ও আবার ফিরে এল। ওকে দেখে একজন শিস দিয়ে উঠল, 'আ গিয়া মেরা জান—খিলাও দো খিলি পান।' আর একজন বলে উঠল, 'হায় কপাল, এ ছোঁড়ার দেখছি জোয়ার এসেছে, তুই যত ওকে ঘরে ফেরত পাঠাবি, কবুতরী, ও তত এখানে ঘুরঘুর করবে খ্যাখ।'

অনিমেষ দেখল সেই মেয়েটি লণ্ঠন হাতে দ্রুত ওর দিকে এগিয়ে এল। তাহলে এর নাম কবুতরী ? বেশ সুন্দর নাম তো। ওর কাছে এসে কবুতরী বলল, 'ফিন চলে এলে, ঘর যাও।' এখন ওর কথার মধ্যে বেশ একটা ঝাঁজ টের পেল অনিমেষ। সেই নরম ভাবটা নেই। মুখ ঘুরিয়ে ও আবার গলিটার দিকে

তাকাল—একদম ঘুটঘুট করছে। ওর কাছে আলো চাইলে কি খুব রেগে যাবে? কবুতরী সেটা লক্ষ্য করে বলল, 'ডর লাগছে নাকি? আসতে ডর নেই, যেতে ডর! চল, আমি যাচ্ছি। ফির কভি এখানে আসবি না।' লণ্ঠনটা এক হাতে ধরে অন্য হাতে অনিমেষকে টানতে টানতে কবুতরী হাঁটতে লাগল। কয়েক পা এগোতেই বাঁ দিকের রকে চোখ যেতে চমকে উঠল অনিমেষ। একটা শুকনো মুখ ফোকলা দাঁতে হাসছে। তার চোখ দুটো খুব বড়, সমস্ত চামড়া ঝুলছে। দুটো শুকনো পায়ের ফাঁকে মুণ্ডুটা ঝোলানো যেন, উবু হয়ে বসে আছে। বোধ হয় কেউ সরিয়ে না দিলে নড়তে পারে না। হ্যারিকেনের আলো ওর মুখ থেকে সরে যাবার আগেই ক্যানকেনে গলাটা বেরিয়ে এল ফোকলা মুখ থেকে, 'ক্যারে, বিয়ে দেখলি? অ্যাঁ?'

বুকের ভিতর হিম হয়ে যায় আচমকা। হাঁটতে হাঁটতে কবুতরী বলল, 'ডরো মৎ। ও বহুৎ ভাল বুড়ী আছে, আমাদের দেখভাল করে।' হোঁচট খাওয়ার জায়গাটায় এসে অনিমেষ দাঁড়িয়ে পড়ল। লণ্ঠনের আলো গলির ভিতর নাচতে নাচতে যাচ্ছে, ব্যাকুল চোখে ও চারধারে খুঁজতে লাগল। সব জায়গায় আলো যাচ্ছে না, বইটা কত দূরে যেতে পারে? কিছুদূর এগিয়ে থমকে দাঁড়াল কবুতরী, 'কি হল, খাড়া হয়ে গেলে কেন?' আর ঠিক তখনই ও দেখতে পেল রাস্তার পাশে নর্দমার গায়ে নরম পাঁকের ভিতর বর্শার মত গেঁথে আছে বইটা। একছুটে অনিমেষ বইটাকে তুলে নিল। টপটপ করে কয়েক ফোঁটা কাদামাখা জল গড়িয়ে পড়ল নিচে, তলার দিকটা কাদায় ভিজে কালো হয়ে গিয়েছে। নতুন স্যার কি বলবেন ওকে? হাত দিয়ে মলাটের কাদা মুছতে গিয়ে কাগজটা আরো কালো কালো হয়ে গেল। আলোটা বেড়ে গেলে ও দেখল কবুতরী পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, 'কি ঢুঁড়ছ? কার কিতাব?'

অনিমেষ বলল, 'আমার। পড়ে গিয়েছিল এখানে। কাদা লেগে গেছে।'

লণ্ঠনটা নামিয়ে রেখে কবুতরী হঠাৎ বইটা টেনে নিল। উবু হয়ে বসে মলাটের ওপর পাগড়ী মাথায় বঙ্কিমচন্দ্রের ছবিটা খানিকক্ষণ দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'নাম কি এই কিতাবের?'

অনিমেষ বলল, 'আনন্দমঠ।' বইটা খুলে পাতাগুলো ওল্টাতে ওল্টাতে কবুতরী বলল, 'জাদা নষ্ট হয়নি। শেষ পাতায় কিছুটা কাদা ছিল, আঙুল দিয়ে সেটাকে মুছতে খানিকটা দাগ হয়ে গেল। বইটা ফেরত দিয়ে কবুতরী জিজ্ঞাসা করল, 'এখন সাফ করলে আরো খারাপ হয়ে যাবে। শুখা হয়ে গেলে সাফ করো।'

শেষ পাতাটা খোলা ছিল বইটার। ওপরের কাদার দাগের নীচে শেষ লাইনটা

জলে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অনিমেষ হ্যারিকেনের স্বল্প আলোয় অনেক চেষ্টা করে লাইনটা পড়ে ফেলল—'বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।'

লাইনটার মানে ও কিছুতেই বুঝতে পারল না।

দাদুর সঙ্গে চলে আসার পর আর স্বর্গছেঁড়ায় যায়নি অনিমেষ। মহীতোষ এর মধ্যে অনেকবার এসেছেন জলপাইগুড়িতে। প্রত্যেকবারই স্ত্রীকে নিয়ে এসেছেন, রাত্রে থাকেন নি কখনো, বেলায় বেলায় চলে গিয়েছেন।

হেমলতা বলেছিলেন, 'মা না বলতে পারিস তুই, নতুন মা বলে ডাকিস, অনি। আমিও তাই বলতাম। হাজার হোক মা তো।' ওরা এলে ধারেকাছে থাকত না অনি। প্রথম দিকে কেমন একটা অস্বস্তি, পরে লজ্জা-লজ্জা করত। অথচ ওঁরা আসবেন ছুটির দিন দেখে যখন অনিকে বাড়িতে থাকতেই হয়। মহীতোষ বাড়ি এসে বেশির ভাগ সময় তাঁর বাবার সঙ্গেই গল্প করেন, চা-বাগানের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ নেন। সেই সময় তাঁর স্ত্রী রান্নাঘরে হেমলতার পাশে গিয়ে বসে থাকে। মেয়েটির বয়স অল্প এবং হেমলতা প্রথম আলাপেই বুঝে গিয়েছিলেন একদম মারপ্যাঁচ নেই মেয়েটার মধ্যে। এই একটা ব্যাপারে সাধুচরণ সত্যি কথা বলেছিলেন, মেয়েটির স্বভাবের সঙ্গে মাধুরীর যথেষ্ট মিল আছে। চিবুকের আদলটায় তো মাধুরী বসানো, সেই রকমই হাবভাব। তবে মাধুরী একটু ফরসা ছিল এই যা। প্রথম কদিন তো একদম কথাই বলেনি। হেমলতা তিনবার জিজ্ঞাসা করলে একবার উত্তর পান। সে সময় কি কারণে মহীতোষ এদিকে এসেছিলেন, হেমলতা তাঁকে ডেকে বললেন, 'ও মহী, তোর বউ-এর বোধ হয় আমাকে পছন্দ হয়নি, আমার সঙ্গে একদম কথা বলে না।'

মহীতোষ উত্তর দেননি কিছু, চুপচাপ চলে গিয়েছিলেন ঘর থেকে। তাঁর চলে যাওয়া বুঝতে পেরে খুব আস্তে অথচ দ্রুত নতুন বউ বলে উঠেছিল, 'আমার ভয় করে।'

'ভয়! ভয় কেন?' অবাক হয়েছিলেন হেমলতা।

মাথা নিচু করে নতুন বউ বলেছিল, 'আমি যদি দিদির মত না হই!'

ব্যাস। সঙ্গে সঙ্গে জল হয়ে গেলেন হেমলতা। মহীতোষের বিয়ে করাটা উনি একদম পছন্দ করেননি সেটা সবাই জানে। নতুন বউ এলে একটা দূরত্ব রেখে গেছেন এই কয়দিন, কখনো অনিকে বলেননি কাছে আসতে। এক সেই প্রথমদিন ওঁরা যখন জোড়ে এলেন, বউ এসে তাঁকে প্রণাম করল, কানের দুল দিয়ে আশীর্বাদ করলেন যখন তখন সরিৎশেখর অনিকে ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। ছেলেটা

আগাগোড়া মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থেকে ওঁদের প্রণাম করে চলে গেল। শ্বশুরের সামনে তখন নতুন বউ একমাথা ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে। এখন এই মেয়েটার কথা শুনে বুকটা কেমন করে উঠল হেমলতার। মাধুরীর মুখটা ভাবতে গিয়ে কাঁপুনি এল শরীরে। কোন রকমে নিজেকে সামলে বললেন, 'তোমার নামটা আমার একদম ভাল লাগে না বাপু, আমি তোমাকে কিন্তু মাধুরী বলে ডাকব।'

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে ওঁর দিকে তাকিয়েছিল নতুন বউ। হেমলতা দেখেছিলেন দুটো বড বড চোখ ওঁর দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে হেমলতা দেখলেন একটু একটু করে জল গডিয়ে এসে চোখের কোণায় জমা হচ্ছে। খুব বড একটা অন্যায় করে ফেলেছেন বুঝতে পেরে গেছেন তত্ক্ষণে। সরিৎশেখর চিরকাল তাঁকে বকাবকি করেছেন পেট-আলগা বলে, মনে যা আসে মুখে তা না বললে স্বস্তি পান না হেমলতা। এই মেয়েটাকে মাধুরী বলে ডাকলে মনটা শান্ত হবে ভেবেই কথাটা বলেছিলেন।

খপ করে নতুন বউ-এর হাতটা ধরলেন হেমলতা, 'রাগ করলি ভাই, আমি তোকে সত্যি বলছি, দুঃখ দিতে চাইনি।'

নতুন বউ-এর তখন গলা ধরে গেছে, 'আপনি আমাকে যা খুশি ডাকুন।'

হেমলতা বললেন, 'দেখি তোর একটা পরীক্ষা নিই। কাল রাত্রে পায়েস করেছিলাম। অনির জন্য একবাটি সরপাতা হয়ে আছে। ওটা নিয়ে ছেলেটাকে খাইয়ে আয় দেখি। বেলা হয়ে গেল।'

কথার নেশায় হেমলতা কখন টপ করে যে তুইতে নেমে এসেছেন নিজেই বুঝতে পারেন নি। বয়সে ছোট কাউকে যদি ভাল লেগে যায় তাহলে তাকে তুই না বললে একদম সুখ হয় না তাঁর।

ঘরের কোণায় মিটসেফের ভিতর পায়েসের বাটিগুলো চাপা দেওয়া আছে। আগের সন্ধ্যেবেলায় রাঁধা পায়েস এক-একটা বাটিতে ঢেলে রেখে দেন হেমলতা। নাডাচাড়া না হওয়ায় বাটিগুলোতে পায়েস জমে গিয়ে পুরু সর পড়ে যায়। সরিৎশেখরের ভালবাসার জিনিসের মধ্যে এখন এই একটা জিনিস টিকটিক করে বেঁচে রয়েছে। ভাল দুধ পাওয়া যায় না এখানে, স্বর্গছেঁড়ায় যখন পায়েস রান্না হত সাত বাড়ির লোক টের পেত। কালানোনিয়া চালের গন্ধে চারধার ম-ম করত। সরিৎশেখর নিজেই এক জামবাটি পায়েস দু বেলা খেতেন। দাদুর এই সখটা পেয়েছে নাতি, পায়েস খেতে বড় ভালবাসে ছেলেটা।

আজ মহীতোষরা আসবেন বলে প্রত্যেকের জন্য আলাদা বাটিতে পায়েস রেঁধে রেখেছেন হেমলতা। সকালে দেখেছেন সেগুলো জমে গিয়েছে বেশ। বিভিন্ন

পাইজের বাটি আছে মিটসেফে। নতুন বউ উঠে দাঁড়ালে তিনি মিটসেফটা ওকে দেখিয়ে দিলেন। বুকসমান মিটসেফের দরজা খুলে নতুন বউ সেদিকে তাকাতেই হেমলতা আড়চোখে দেখতে লাগলেন। অনির মন অল্পে ভরে না, ছোট বাটিতে পায়েস দিলে চেঁচামেচি করবেই। নতুন বউ কোন বাটিটা তোলে দেখছিলেন তিনি, মন বোঝা যাবে। দেওয়ার হাতটা টের পাওয়া যাবে। মেয়েটার বুদ্ধি আছে, মনে মনে খুশি হলেন হেমলতা। বড তিনটে বাটির একটাকে বের করে আনল নতুন বউ, ছোট দুটোতে হাত ছোঁয়াল না। যাক, অনিটার কখনো কষ্ট হবে না। চামচটাও মনে করে নিল।

হেমলতা বললেন, 'বড বাড়িতে রয়েছে ও, তুই গিয়ে ভাল করে আলাপ করে পায়েস খাইয়ে আয়।' এক পা হেঁটে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল নতুন বউ। কিছু একটা বলব বলব করে যেন বলতে পারছিল না। সেটা বুঝতে পেরেই যেন হেমলতা বললেন, 'কি হল, আরে বাবা নিজের ছেলের কাছে যাচ্ছিস লজ্জা কিসের। অনি বড় ভাল ছেলে, মনটা খুব নরম। নে যা, আমি আর বকবক করতে পারছি না, উনুন কামাই যাচ্ছে।'

ভেতরের বারান্দায় সরিৎশেখর মহীতোষের সঙ্গে বসেছিলেন। ঘাড ঘুরিয়ে নতুন বউকে দেখলেন সরিৎশেখর। একমাথা ঘোমটা, আঁচলের তলায় কিছু একটা ঢেকে নিয়ে উঠান পেরিয়ে আসছে। ওকে দেখলেই চট করে মাধুরীর কথা মনে পড়ে যায়। মাধুরীও ঘোমটা দিত তবে এতটা নয়। সে মেয়েকে পছন্দ করে এনেছিলেন তিনি, তাঁর পছন্দের জিনিস বেশীদিন টেঁকে না। ছেলের দিকে তাকালেন, মহীতোষও বউকে দেখছে। একটু গলা ঝেড়ে নিয়ে বললেন, 'মেয়েটাকে ওর বাপের কাছে নিয়ে যাও না কেন? প্রত্যেকবারেই দেখতে পাই এখানে এসেই ফিরে যাচ্ছ।'

হঠাৎ এ ধরনের কথার জন্য তৈরী ছিলেন না মহীতোষ। কিছু একটা নিয়ে স্ত্রীকে ওদিকে যেতে দেখে অবাক হয়েছিলেন তিনি। এই প্রথম এ বাড়িতে ওকে দিয়ে কোন কাজ করাচ্ছে দিদি। কিন্তু কার কাছে যাচ্ছে? ওখানে তো অনি থাকে। ছেলের সঙ্গে এখন ভাল করে কথা হয় না তাঁর, কেমন অস্বস্তি হয়। স্ত্রীকে অনির কাছে যেতে দেখে হঠাৎ খুব আরাম বোধ হচ্ছিল। এই সময় বাবার প্রশ্নটা কানে যেতে কি বলবেন বুঝতে না পেরে কান চুলকে বললেন, 'যেতে চায় না ও।'

ভ্রূ কুঁচকালেন সরিৎশেখর, 'সে কি! না না এ ঠিক কথা নয়। তোমারই উদ্যোগী হওয়া উচিত, এক শহরে বাড়ি, তার মা বাবা কি ভাবছেন বল তো!'

সরিৎশেখর নিজে কখনো ছেলের শ্বশুরবাড়িতে যান না, অনেক অনুরোধ সত্বেও যেতে পারেন না। মহীর বিয়ের রাত্রে বাড়ি ফিরে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল সে কথা কাউকে বলা হয়নি, এমন কি হেমলতাকেও নয়। নাতির মুখের দিকে চেয়ে সেদিন তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

নতুন বউ এদিকটায় কখনো আসেনি। বিরাট বারান্দা পেরিয়ে সার দেওয়া ঘরগুলোর কোনটায় অনিমেষ আছে বুঝে উঠতে সময় লাগল তার। দরজাটা ভেজানো ছিল। হঠাৎ তার মনে হল শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে, হাতে কোন সাড় নেই। এ বাড়িতে যেদিন প্রথম এসেছিল সেদিনও এ রকম মনে হয়নি। এতবড় একটা ছেলে যাঁর তাঁকে বিয়ে করতে কখনই ইচ্ছে হয়নি তার, তবু বিয়েটা হয়ে গেল। আর বিয়ের পর ইস্তক অহরহ যার নাম শুনছে ও, সে হল এই ছেলে। মহীতোষের কথাবার্তায় বুঝতে পেরেছে ছেলের মন জয় করতে মহীতোষ স্ত্রীকে যেন পরোক্ষভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন। কিন্তু সেটা কি করে হয়। আজ অবধি জেনেশুনে কোন মন জয় করার চেষ্টা ওকে করতে হয়নি। সেটা কি করে করতে হবে মহীতোষ তাকে শিখিয়ে দেয়নি কিন্তু। ভেজানো দরজাটা ঠেলল নতুন বউ।

বাবা এবং নতুন মা এসেছেন জানতে পেরে অনি চুপচাপ ঘরে বসেছিল। পিসীমার নির্দেশমত ও মনে মনে নতুন মা শব্দটাকে অনেকখানি রপ্ত করে নিয়েছে কিন্তু ব্যবহার করেনি। দূর থেকে কয়েকবার নতুন মাকে ও দেখেছে। এর আগে ওঁরা যখন এসেছেন তখন দুপুরের খাওয়ার সময় বাবা আর দাদুর পাশে বসে খেতে খেতে মাথা নিচু করে আড়চোখে দেখেছে, একটা রঙিন শাড়ি রান্নাঘরের দরজার অনেকটা আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে। খাওয়ার সময় বসে থাকাটা অত্যন্ত খারাপ, লাগে অনির। বাবা যেন না বললে নয় এরকম দু'একটা প্রশ্ন করেন। কত তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করতে পারবে সেই চেষ্টা চালিয়ে যায় অনি। পিসীমা পরিবেশন করে বলে স্বস্তি পায় ও। এতদিন যা মনে হয়নি, আজ ওঁরা যখন রিকৃশা থেকে নামলেন তখন অনি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। বাথরুমে টিনের বালতিতে ওর জামাকাপড় জলে ভিজিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে আসছিল পড়তে, এমন সময় রিকৃশাটা বাড়ির সামনে এসে থামে। মহীতোষ রিকৃশাওয়ালাকে পয়সা দিচ্ছিলেন যখন তখন নতুন মা রিকৃশা থেকে নেমে ঘোমটা ঠিক করে বাড়ির দিকে তাকাল। তার তাকানোর ভঙ্গিটা অনিকে কেমন চমকে দিল। ওর মনে যেটুকু আছে, মাধুরী এইরকম ভাবে তাকাতেন। এক ছুটে নিজের ঘরে চলে গিয়েছিল অনি, কেউ ওকে লক্ষ্য করেনি।

কালকের পড়া হয়ে গিয়েছিল। খুব একটা আটকে না গেলে ও পড়া বুঝতে সরিৎশেখরের কাছে যায় না। এমনিতে দাদু খুব ভাল কিন্তু পড়াতে গেলেই চট

করে এমন রেগে যান যে অনিকে অবশ্যই চড-চাপড় খেতে হয়। সে সময় ওঁর চেহারাই অন্যরকম হয়ে যায়। একটা সাধারণ ইংরেজী শব্দ অনি কেন বুঝতে পারছে না এই সমস্যাটা এত প্রবল হয়ে ওঠে যে সেটা সমাধান করতে প্রহার ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সামনের বছর থেকে মাস্টার রাখবেন মহীতোষ। সরিৎশেখরকে এ রকম বলতে শুনেছে ও। পিসীমাকে অনি বলেছে যদি মাস্টার রাখতেই হয় তাহলে নতুন স্যারকে যেন রাখা হয়।

অনি দেখল দরজাটা খুলে গেল, এক হাতে বাটি নিয়ে নতুন মা দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হতে মুখ নিচু করল অনি। এ ঘরে কেন এসেছে নতুন মা ? ও তো কাউকে বিরক্ত করতে যায়নি। যেন কিছুই ছাখেনি এই রকম ভঙ্গী করে অনি সামনে খুলে রাখা একটা বই-এর দিকে চেয়ে থাকল।

'পায়েসটা খেয়ে নাও।' বডদের মতন নয়, একদম ওদের মত গলায় কথাটা শুনতে পেল অনি। অবাক হয়ে তাকাল ও। পায়েস খেতে ওর খুব ভাল লাগে কিন্তু জ্ঞান হওয়া অবধি রান্নাঘরের বাইরে ভাতের সকডি এ বাড়িতে কাউকে আনতে ছাখেনি। পিসীমা এ ব্যাপারে ভীষণ খুঁতখুঁতে। জামা-কাপড না ছেড়ে পায়খানায় গেলে চিৎকার করে পাডা মাত করে দেন। পায়েস শোয়ার ঘরে বসে খেতে দেবেন, এ একেবারেই অবিশ্বাস্য। হয় পিসীমা জানেন না, নতুন মা না বলে নিয়ে এসেছে। উলটো ব্যাপারটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করল না অনিমেষের। খুব আস্তে ও বলল, 'আমি শোয়ার ঘরে পায়েস খাই না।'

থতমত হয়ে গেল নতুন বউ। কথাটা ওর একদম খেয়াল হয়নি, আসার সময় দিদিও বলে দেয়নি। এইটুকুনি ছেলে যে এতটা বিচক্ষণের মত কথা বলতে পারে ভাবতে পারেনি সে, শুনে লজ্জা এবং অস্বস্তি হল। মাথায় বেশ লম্বা ছেলেটা, গড়ন অবিকল মহীতোষের মত। মুখটা খুব মিষ্টি, চিবুকের কাছে এমন একটা ভাঁজ আছে যে দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে। এই ছেলে, এত বড় ছেলের মা হতে হবে, বরং দিদি হতে পারলে ও সবচেয়ে খুশি হত।

চেষ্টা করে হাসল নতুন বউ, তারপর ঘরটা দেখতে দেখতে অনির পাশে এসে দাঁড়াল, 'ঠিক বলেছ, আমার ছাই মাথার ঠিক নেই। যেই শুনলাম তুমি পায়েস খেতে ভালবাস নিয়ে চলে এলাম। একবারও মনে হল না যে এটা রান্নাঘর না, এখানে সকড়ি চলে না। তা এনেছি যখন তখন এক কাজ করা যাক্ আমি হাতে ধরে থাকি তুমি চামচ দিয়ে তুলে তুলে খাও।' পায়েসে গাঁথা চামচসুদ্ধ বাটিটা অনির সামনে ধরল নতুন বউ। সেদিকে তাকিয়ে অনির জিভে জল প্রায় এসে গেল, কি পুরু সর পড়েছে। কিন্তু কেউ বাটি ধরে থাকবে আর তা থেকে ও খাবে

এ রকম কোনদিন হয়নি। হঠাৎ ও নতুন বউ-এর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা বাঙাল, না?'

হকচকিয়ে গেল নতুন বউ, 'মানে?'

পায়েসের দিকে তাকিয়ে অনি বলল, 'পিসীমা বলেন, বাঙালরা সকড়ি-টকড়ি মানে না।'

খিলখিল করে হেসে ফেলল নতুন বউ। হাসির দমকে সমস্ত শরীর কাঁপছে তার। এই বাড়িতে আসার পর এই প্রথম সে বিয়ের আগের মত হাসতে পারছে। অনির খুব মজা লাগছিল। নতুন মা একদম তপুপিসীর মত করছে। কোন রকমে হাসির দমক সামলে নতুন বউ বলল, 'ঘটি ঘটি ঘটি, বাঙাল বললে চটি।' তারপরেই হঠাৎ গলার স্বর পালটে প্রশ্ন করল, 'তুমি আমার ওপর খুব রাগ করেছ, না?'

মাথা নিচু করল অনি। সেই রাত্রে বাড়িতে ফিরে বারান্দায় দাঁড়ানো সরিৎশেখরকে সে রেগেমেগে যেসব কথা বলেছিল তা কি বাবা জানেন? বাবা জানলেই নতুন বউ জানবে। পিসীমা তো কোনদিন অনির সঙ্গে ও ব্যাপারে কথা বলেননি। কিন্তু অনি জানে পিসীমা সব শুনেছিলেন। আবার বউ-এর দিকে ও পূর্ণচোখে তাকাল। শরীর দেখে খুব বড় বলে একদম মনে হয় না। একটুও ভারিক্কি দেখাচ্ছে না কিন্তু এখন যেভাবে ঠোঁট টিপে হাসছে চট করে মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। অনি বলল, 'আমি তোমাকে চিনি না, খামোখা রাগ করতে যাব কেন?'

এক হাতে পায়েসের বাটিটা তখনও ধরা, অন্য হাত অনির চেয়ারের পেছনে রাখল নতুন বউ, 'আমাকে তুমি কি বলে ডাকবে?'

একটু ভেবে অনি বলল, 'তুমি বল?'

'তোমাকে কেউ বলে দেয়নি?'

'হুঁ, বলেছে। পিসীমা বলেছে 'নতুন মা' বলতে।'

খুব ফিসফিস করে শব্দটা উচ্চারিত হতে শুনল অনি।

'তোমার নতুন মা বলে ডাকতে ভাল লাগবে তো?'

অনির কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল। কথাবার্তাগুলো এমনভাবে হচ্ছে যে, অন্য একটা অনুভূতির অস্তিত্ব টের পাচ্ছিল সে।

'অনি, আমাকে তুমি ছোট মা বলে ডাকবে? আমি তো চিরকাল নতুন থাকতে পারব না।'

ঘাড় নাড়ল অনি। নতুন মার চেয়ে ছোট মা অনেক ভাল। মায়ের কথা মনে করিয়ে দেবার জন্যেই যেন ছোট মা বলা।

'তাহলে এই পায়েসটা খেয়ে ফেল।' চামচটা এগিয়ে দিল ছোট মা।

হেসে ফেলল অনিমেষ, 'যদি না খাই ?'

কপট নিঃশ্বাস ফেলল ছোট মা, 'কি আর করা যাবে। ভাবব আমার কপাল এই রকম। তোমাকে তো আর বকতে পারব না।'

'কেন ? মায়েরা তো বকে।'

'হুঁ, ঠিকই তো। আগে তোমাকে খুউব ভালবাসি, না হলে বকব কি করে। এখন থেকে আমরা কিন্তু বন্ধু হলাম, ঠিক তো ?'

ঘাড় নাড়ল অনি, ওর খুব মজা লাগছিল।

'বন্ধু হলে কিন্তু সব কথা শুনতে হয়, বিশ্বাস করতে হয়। আমার আজ অবধি একটাও বন্ধু ছিল না। তুমি আমার বন্ধু হলে।'

হাত বাড়িয়ে চামচটা ধরল সে, পুরু সরের চাদর কেটে এক চামচ পায়েস তুলে মুখে পুরতে পুরতে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি খেয়েছ ?'

একগাল হেসে ছোট মা বলল, 'কেন ?'

'পিসীমা দারুণ পায়েস রাঁধে, খেয়ে দেখো।' নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে বলল অনি, 'মাও এত ভাল পারত না।'

নতুন বউ-এর সঙ্গে অনির ভাব হয়ে গিয়েছে জানতে পেরে মহীতোষ সবচেয়ে খুশি হলো। হেমলতার মনটা ব্যবহারে বোঝা যায়, নতুন বউ-এর ওপর তাঁর টান বেড়ে গেছে। সরিৎশেখরকে চট করে বোঝা মুশকিল। হেমলতা দুপুরে খাওয়ার সময় পাখার হাওয়া করতে করতে অনেকবার নতুন বউ-এর সঙ্গে অনির ভাবের কথা তুলেছেন। সরিৎশেখর হাঁ-না করেননি। চিরকালই আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে তাঁর একটা আড়াল-রাখা সম্পর্ক আছে, মনে কি হচ্ছে বোঝা যায় না। মহীতোষের বিয়ের রাত থেকে এ ব্যাপারে একটা কথাও তাঁর মুখ থেকে বের হয়নি।

এবার মহীতোষরা ফিরে যাবার পর বেশ কিছুদিন আসতে পারলেন না। চা পাতা তোলা হচ্ছে। এখন ফ্যাক্টরীতে দিনরাত মেশিন চলছে। রবিবারেও সময়-অসময়ে ডাক পড়ে। এখন স্বর্গছেঁড়া ছেড়ে কোথাও যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। অ্যানুয়াল পরীক্ষার পর অনির স্কুল এখন ছুটি। কিন্তু নতুন স্যার ওদের প্রত্যেকদিন স্কুলে যেতে বলেছেন। রোজ দুটো থেকে স্কুলের মাঠে মহড়া হচ্ছে। ছাব্বিশে জানুয়ারি আসছে। নতুন স্যার বলেছেন আমরা জন্মেছি পনেরই আগস্ট আর আমাদের অন্নপ্রাশন হবে ছাব্বিশে জানুয়ারি।

ঠিক এই সময় এক দুপুরে অনি সেজেগুজে বেরুচ্ছে, ডাকপিয়ন চিঠি দিয়ে গেল। শীতের এই দুপুরে পশ্চিমে সূর্য চলে গেলে সরিৎশেখর পেছন-বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে শুয়ে থাকেন রোদে গা ডুবিয়ে। ডাকপিয়ন ওঁর হাতে চিঠিটা দিয়ে গেল। খামের ওপর ঠিকানা পড়ে তিনি চিৎকার করে ডাকলেন, 'দাদুভাই, তোমার চিঠি।'

ভেতরের কলতলায় বাসন মাজছিলেন হেমলতা। এখনও স্নান হয়নি তাঁর, জল লেগে পায়ের হাজা জ্বলছে, বাবার চিৎকার শুনে হাত থামিয়ে বললেন, 'ওমা, অনিকে আবার কে চিঠি দিল!'

ঘর থেকে বেরিয়ে চিৎকারটা শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল অনিমেষ। আজ অবধি তাকে কেউ চিঠি দেয়নি। চিঠি দেবার মত বন্ধু তার কেউ নেই।

অবশ্য ওর ঠিকানা স্কুলের অনেকের কাছে আছে। স্কুল বন্ধ হবার সময় যারা বাইরে যায় তারা পছন্দমত ছেলের ঠিকানা নিয়ে যায়। কিন্তু কোনবার চিঠি দেয়নি কেউ তাকে। বিশু আর বাপী যেন কেমন হয়ে গিয়েছে। ওরা কোনদিন তাকে চিঠি দেয়নি। বেশ একটা উত্তেজনা বুকের ভেতরে নিয়ে অনিমেষ বারান্দায় দাদুর কাছে গেল। ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন সরিৎশেখর, এক হাত ওপরদিকে তোলা, তাতে একটা মোটা নীল খাম ধরা। খামটা নিয়ে একছুটে ভিতরে চলে এল ও, এদিক ওদিক চেয়ে সোজা বাগানে নেমে গেল। সুপুরিগাছে বসে একজোড়া ঘুঘু সমানে ডেকে যাচ্ছে। পেয়ারাতলায় এসে খামটা তুলতেই মিষ্টি একটা গন্ধ পেল সে। চট করে মায়ের কথা মনে পড়ে গেল ওর। মার শরীর থেকে ঠিক এরকম গন্ধ বেরুত। মার একটা খুব বড় সেন্টের শিশি ছিল। এই চিঠি যে লিখেছে সেও কি সেই সেন্ট মাখে। খামের ওপর লেখাটা দেখল ও। গোটা গোটা মুক্তোর মত অক্ষরে তার নাম লেখা দাদুর কেয়ার অফে। নীল আকাশের চেয়ে নীল খামটা সন্তর্পণে খুলতেই ভাঁজ করা কাগজ হাতে উঠে এল। চিঠির বুক চিরে চারটে ভাঁজের রেখা চারদিকে চলে গিয়েছে। চিঠির তলায় চোখ রাখল অনি, 'আমার স্নেহাশিষ জানিও। ইতি, আশীর্বাদিকা, তোমার ছোট মা।' উত্তেজনাটা হঠাৎ কমে এল অনির। জানা হয়ে গেলে কোন কিছু নতুন থাকে না। উত্তেজনার জায়গায় কৌতূহল এসে জুড়ে বসল। চিঠিটা পড়ল সে, 'স্নেহের অনি। এই পত্র পাইয়া নিশ্চয়ই খুব অবাক হইয়াছ। এখানে আসিয়া শুধু তোমার কথা মনে পড়িতেছে। তুমি নিশ্চয় জান এই সময় তোমার পিতার চাকরিতে ছুটি থাকে না, তাই আমাদের জলপাইগুড়ি যাওয়া হইতেছে না। তাই বলি কি, তোমার যখন পাসের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে তখন আমার

নিকট চলিয়া আসিও। এখন তো আমরা বন্ধু, বন্ধুর নিকট বন্ধু আসিবে না?

তোমাকে লইয়া আমি নদীর ধারে বেড়াইব। শুনিতেছি নদী বন্ধ হইবে, উহা কি জিনিস আমি জানি না। কুলগাছে প্রচুর কুল ধরিয়াছে। তুমি জানিয়া খুশি হইবে কালীগাই-এর একটি নাতনী হইয়াছে। রং সাদা বলিয়া নাম রাখিয়াছি ধবলি। বাড়িতে এখন এত দুধ হইতেছে যে খাইবার লোক নাই। তুমি আসিলে আমি তোমাকে যত ইচ্ছা পায়েস খাইয়াইব। জানি দিদির মত ভাল হইবে না।

গতকাল এখানকার স্কুলের ভবানী মাস্টার আমাদের বাড়িতে আসিয়াছিলেন। তোমাদের স্কুল এই বৎসর হইতে নতুন বাড়িতে উঠিয়া যাইতেছে। ভবানী মাস্টারের ইচ্ছা তুমি অবশ্যই আগামী ছাব্বিশে জানুয়ারি এখানে থাক। কারণ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রথম পতাকা তুমি উত্তোলন করিয়াছিলে। ছাব্বিশে জানুয়ারিতেও সেই কাজটি তোমাকে দিয়া তিনি করাইতে চান। শুনিলাম এই বৎসরই তিনি অবসর লইয়া দেশ চলিয়া যাইবেন।

তোমার পিতা পরে পত্র দিতেছেন, দিদিকে বলিও। গুরুজনদের আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম দিলাম। তুমি আমার স্নেহাশিষ জানিও। ইতি, আশীর্বাদিকা, তোমার ছোট মা।'

'পুনশ্চ॥ এ জীবনে আমি কাহাকেও দুঃখ দিই নাই। অনি, তুমি কি আমাকে দুঃখ দিবে?'

চিঠিটা পড়ে অনিমেষ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। এখন সেই ঘুঘু দুটোই শুধু নয় একরাশ পাখি সমস্ত বাগান জুড়ে তারস্বরে চেঁচামেচি শুরু করেছে। চোখের সামনে স্বর্গছেঁড়ার গাছপালা মাঠ নদী যেন একছুটে চলে এল। সেই কাঁটাল গাছের ঝুপড়ি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট ছোট পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থাকা লাল চিংড়িগুলো কিংবা সবুজ গালচের মত বিছানো চা-গাছের উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে আসা কুয়াসার দঙ্গল একটা নিঃশ্বাস হয়ে অনিমেষের বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

ভবানী মাস্টার চলে যাবেন! 'একটা কথা মনে রাখবা বাবা, নিজের কাছে সৎ থাকলে জীবনে কোন দুঃখই থাকে না।' একটা ঘাম জড়ানো নস্যির গন্ধ যেন বাতাসে ভেসে এল। স্বর্গছেঁড়ায় যাবার যে ইচ্ছেটা মাধুরী চলে যাওয়ার পর একদম চলে গিয়েছিল সেটা হঠাৎ ঝুপ ঝুপ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মায়ের কথাটা ভাবতেই বুকের মধ্যে একটা শীতল ছোঁয়া লাগল অনির। স্বর্গছেঁড়ায় গেলে সবাইকে দেখতে পাবে ও, শুধু মা নেই। তাঁর জায়গায় ছোট মা সারা বাড়িময়

ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিয়ের পরপর হেমলতা রাগ করে বলেছিলেন, 'দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে? মা হল মা, সৎমা সৎমাই।' আচ্ছা, সৎমা বলে কেন? সৎ মানে তো ভাল, ভাল মা-রা আবার খারাপ হবে কি করে। কিন্তু ছোট মাকে তো মায়ের মত মনেই হয় না, বরং দিদির মত নিজের মনে হয়। সৎমারা নাকি খুব অত্যাচার করে। ছোট মাকে দেখে, এই চিঠি পড়ে, কেউ সে কথা বললে অনি তাঁকে মিথ্যুক বলবে। এখানে ছোট মাকে তার ভাল লেগেছে কিন্তু স্বর্গ-ছেঁড়ায় গেলে মাকে মনে পডবেই, তখন ছোট মাকে—। অনির মনে হল বাবাকে যদি সে জিজ্ঞাসা করতে পারত, মাকে ভুলে গেছে কিনা? কিন্তু তবু স্বর্গছেঁড়ায় যাবার জন্য বুকের মধ্যে যে ছটফটানি শুরু হয়ে গেছে সেটা যাচ্ছে না। নতুন স্যার বলেছিলেন, 'মা নেই কে বলল? জন্মভূমিই তো আমাদের মা। বন্দেমাতরম্।' শব্দটা উচ্চারণ করলেই শরীর গরম হয়ে ওঠে। তখন আর কারো মুখ মনে পড়ে না ওর। পেয়ারা গাছের তলায় পায়চারি করতে করতে ও নিচু গলায় আবৃত্তি করতে লাগল, 'আমরা অন্য মা জানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ি নাই—আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জসমীরণ শীতলা, শস্যশ্যামলা—।' হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল অনি। একদৃষ্টে ও মাটির দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। পেয়ারা গাছের তলায় ছোট ছোট ঘাসের ফাঁকে কালো মাটি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেই মাটিটাকে চেনা যাচ্ছে না আর। সেই স্বর্গছেঁড়া থেকে চলে আসার দিন ও রুমালে করে লুকিয়ে এক-মুঠো মাটি এনে পেয়ারা গাছের তলায় রেখে দিয়েছিল। যখনই মন খারাপ করত তখনই এসে মাটিটাকে দেখত, মাটিটা দেখা মানে স্বর্গছেঁড়াকে দেখা। তারপর এক সময় ভুলে গিয়েছিল সেই মাটির কথা। এতদিন ধরে কত বৃষ্টি গেল, প্রতি বছরের বন্যা গেল। এখন আর কাউকে আলাদা করে চেনা যাবে না। মাটিদের চেহারা কেমন এক হয়ে যায়। আমাদের মা নাই বাপ নাই, আমাদের জন্মভূমি আছে। চিঠিটা পকেটে রাখতে রাখতে অনি ঠিক করল এখন ও স্বর্গছেঁড়ায় যাবে না।

এবারও অনি ভাল রেজাল্ট করে নতুন ক্লাসে উঠল। তবে প্রথম তিনজনের মধ্যে ও জায়গা পাচ্ছে না, সরিৎশেখর ওর প্রগ্রেস রিপোর্টে দেখেছেন, অঙ্কে ও খুব কম নম্বর পাচ্ছে। মহীতোষ চাইছেন, স্কুলের অঙ্কের মাস্টারমশাইকে বাড়িতে শিক্ষক হিসেবে রাখতে, কিন্তু অনির এক গোঁ—নতুন স্যার ছাড়া ও কারো কাছে পড়বে না। সরিৎশেখর নতুন স্যার নিশীথ সেনের সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছেন। ভদ্র-

লোক বাংলার শিক্ষক, টিউশনি করেন না, তা ছাড়া ইদানীং জলপাইগুড়ির একটি দলের সঙ্গে ওঁর যোগাযোগের কথা সবাই জানে। নিজে সারাজীবন কংগ্রেসকে সমর্থন করেছেন সরিৎশেখর, কিন্তু সেটা দূর থেকে। জলপাইগুড়িতে আসার পর সকাল-বিকাল বাইরে বেরিয়ে স্থানীয় নেতাদের যে চেহারা দেখেছেন তাতে এখনকার পলিটিকস্ ঠিক কি জিনিস তিনি বুঝতে পারছেন না। এই সেদিন বাজারে যাবার সময় দিনবাজার পোস্টঅফিসের সামনে দুজন ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর মুখোমুখি দেখা, দুজনেই খদ্দর পরেছেন, একজনের মাথায় গান্ধীটুপি। টুপিহীন লোকটিকে যেন কোথায় দেখেছেন এরকম মনে হতে ওঁরা এসে তাঁর সঙ্গে আলাপ করলেন। টুপি পরা লোকটি বললেন, 'নমস্কার, আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।'

সরিৎশেখর বললেন, 'আমার কাছে?'

'হ্যাঁ। আপনি তো স্বর্গছেঁড়া টি এস্টেটের বড়বাবু?'

'একদিন ছিলাম।'

'আপনি আমাকে চেনেন না। আমি বনবিহারী সেন, মিউনিসিপাল ইলেক্শনের সময় কংগ্রেসের হয়ে আপনার কাছেই দাবী জানাতে যেতাম, হা হা হা।' প্রাণ খুলে হাসলেন ভদ্রলোক।

'দাবি কেন বলছেন, কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া আমাদের কর্তব্য।' সরিৎশেখর খুব সৎ গলায় বললেন।

'ভাল ভাল। কিন্তু জানেন এত কষ্টে স্বাধীনতা এনে দিলাম তবু দেশের লোকজন আমাদের প্রাপ্য সম্মানটা দিতে চায় না। আচ্ছা, আপনার একটি ছেলে শুনেছি কম্যুনিস্ট, কি নাম যেন—'

বনবিহারীবাবু পাশের লোকটির দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, 'প্রিয়তোষ।'

বনবিহারীবাবু ঘাড় নাড়লেন, 'হ্যাঁ, সে ফিরেছে? পুলিস কিন্তু ওয়ারেন্ট উইথড্র করে নিয়েছে। আসলে আমরা কারো সঙ্গে শত্রুভাবে থাকতে চাই না। ভারতবর্ষ একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।'

সরিৎশেখর বললেন, 'এ ছেলের ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই।'

দু হাত দু দুদিকে বাড়িয়ে উৎফুল্ল গলায় বনবিহারীবাবু চিৎকার করে উঠলেন, 'এই তো, এই যে আদর্শের কথা বললেন সমস্ত দেশবাসীর তা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। আপনার মত লোকই তো এখন সবচেয়ে বেশী দরকার। হ্যাঁ, আপনার কাছে কেন যাচ্ছিলাম, বলি।'

পাশের লোকটি বললেন, 'এসব কথা ওঁর বাড়িতে গিয়ে বললে হত না?'

বনবিহারীবাবু ঘাড় নাড়লেন, 'আরে না না হলধর, ইনি হলেন আমাদের

ঘরের লোক, এঁর সঙ্গে অত ভদ্রতা না করলেও চলবে। হ্যাঁ সরিৎবাবু, আপনি তো জানেন ছাব্বিশে জানুয়ারী আমাদের প্রজাতন্ত্র দিবস। তা এই দিনটিকে সার্থক করে তোলার জন্য আমরা একটা বিরাট পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। চাঁদমারির মাঠে ঐতিহাসিক জমায়েত হবে, কলকাতা থেকে নেতারা আসবেন, কিন্তু আমাদের স্থানীয় অফিসে বসে এত বড ব্যাপারটা অর্গানাইজ করা যাবে না। আমাদের ইচ্ছা আপনার বিরাট বাড়িটা তো পড়েই আছে, ওটা আমরা সাময়িক ভাবে অফিস হিসেবে ব্যবহার করি। আপনি কি বলেন?'

থতমত হয়ে গেলেন সরিৎশেখর, 'কিন্তু আমার বাড়ি তো খুব বড নয়। তা ছাড়া, বাড়ি ভাড়ার কথা—।'

'আমি জানি আপনি ভাড়া দেবেন না, আর সেটা দিয়ে আপনাকে অপমান করব না। আমরা আপনার সহযোগিতা চাই। প্রকৃত দেশসেবী হিসেবে এটা আপনার কাছে নিশ্চয়ই আশা করতে পারি।' বনবিহারীবাবু রুমালে নাক মুছলেন।

মুহূর্তেই সরিৎশেখর চিন্তা করে নিলেন। পার্টি অফিস করতে দিলে বাড়িটার হাল কয়েক দিনেই যা হবে অনুমান করা শক্ত নয়। এত সাধের তৈরী বাড়িতে পাঁচ ভূতে আড্ডা জমাবে, প্রাণ ধরে সহ্য করতে পারবেন না তিনি। হোক সেটা কংগ্রেসের অফিস, এ ব্যাপারে তাঁর কোন দুর্বলতা নেই। এ বাড়ি তাঁর ছেলের মত, অসময়ে দেখবে, তাকে বকে যেতে দিতে পারেন না তিনি। বনবিহারীবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি হয়তো জানেন না আমি অ্যাকটিভ পলিটিস্ কোনদিন করতাম না। তবে দূর থেকে কংগ্রেসকে সমর্থন করে এসেছি। আমার ভূমিকা আজও একই। আপনাদের এই প্রজাতন্ত্র দিবসের কর্মযজ্ঞে দূর থেকে সমর্থন জানিয়ে যাব। আচ্ছা, নমস্কার—।'

সরিৎশেখরকে হাঁটতে দেখে বনবিহারীবাবু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন প্রথমটা, তারপর কোনরকমে বললেন, 'কিন্তু আমি যে নিশীথের কাছে শুনেছিলাম—।'

ঘুরে দাঁড়ালেন সরিৎশেখর, 'কে নিশীথ?'

'জিলা স্কুলের টিচার নিশীথ সেন।'

'কি বলেছে সে?'

'নিশীথ বলল, আপনারা কংগ্রেসের সাপোর্টার। আপনার এক নাতি যে জেলা স্কুলে পড়ে, সে নিশীথের কংগ্রেসাজ্‌মের প্রচণ্ড ভক্ত। নিশীথ তাকে গড়েপিটে তৈরি করছে, তারও ইচ্ছা বাড়িতেই কংগ্রেস অফিস হোক। আমি কি তাহলে ভুল রিপোর্টেড হলধর? তুমি তো সেই সাপ্লায়ারের কাজ করা থেকে

সরিৎবাবুকে চেন?' সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বিস্মিত বনবিহারীবাবু প্রশ্নটা করলেন।

এতক্ষণ টুপিহীন লোকটিকে চিনতে পারলেন সরিৎশেখর। স্বর্গছেঁড়া চা বাগানের একজন ফায়ারউড্ সাপ্লায়ারের হয়ে এই লোকটা মাঝে মাঝে অফিসে যেত। মাল না দিয়েও সাপ্লাই হয়েছে বলে চেষ্টা করার জন্য সাপ্লায়ারের কণ্ট্রাক্ট বাতিল হয়ে গিয়েছিল। সরিৎশেখর তখন শুনেছিলেন এই লোকটিই নাকি সে জন্য দায়ী। হলধর বলল, 'নিশীথ তো মিথ্যে কথা বলবে না আপনাকে।'

সরিৎশেখর হাসলেন, 'আমার নাতিকে আমার চেয়ে সেই ভদ্রলোক দেখছি বেশী চিনে গেছেন। ভাল ভাল। আচ্ছা চলি।' আর দাঁড়ালেন না তিনি।

বাজার থেকে ফিরে সরিৎশেখর সোজা অনির ঘরে এলেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকতে ভালবাসে অনি, সরিৎশেখর ঘর দেখে খুশী হলেন। নিজের জামা-কাপড ও নিজেই কাচে, হেমলতা ইস্ত্রি করে দেন। কিন্তু বই-এর টেবিল দেখে বিরক্ত হলেন সরিৎশেখর, সব স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। পড়ার টেবিলে বসে অনি তখন ছবি আঁকছিল, দাদুকে দেখে সেটা চাপা দিল। সচরাচর এই ঘরে সরিৎ-শেখর আসেন না, দরকারে অনিই তাঁর কাছে যায়।

সরিৎশেখর বললেন, 'নতুন বইগুলোর এই অবস্থা কেন, সাজিয়ে রাখতে পার না?' বুক-লিস্ট পাবার পর সদ্য কেনা হয়েছে বইগুলো। ওর ওপর একটা পুরোনো বই দেখে হাতে তুলে নিলেন সরিৎশেখর, বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠ। পাতা উল্টে দেখলেন বেশীর ভাগ জায়গায় লাল পেন্সিলে আণ্ডারলাইন করা আছে। নাতিকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, 'এই বই কোথায় পেলে?'

অনি বলল, 'নতুন স্যারের কাছ থেকে এনেছি।'

'পড়েছ?'

ঘাড় নাড়ল অনি, 'হ্যাঁ, আমার অনেকটা মুখস্থ হয়ে গেছে। ধরবে?'

'কেন মুখস্থ করলে?'

প্রশ্নটা যেন আশা করেনি অনি, একটু থেমে বলল, 'আমার ভাল লাগে।'

নাতির দিকে ভাল করে তাকালেন সরিৎশেখর। হঠাৎ ওঁর মনে হল অনি আর সেই ছোটটি নেই। জলপড়া গাছের মত হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে অনেকখানি উঠে এসেছে। প্রতিদিন দেখতে দেখতে এই বড় হয়ে ওঠা ব্যাপারটা তিনি টের পাননি। এমন কি গলার স্বর পর্যন্ত পালটে যাচ্ছে ওর।

সরিৎশেখর বললেন, 'নতুন স্যার তোমাকে কি বলেছেন একটু শুনি।'

অনি দাদুর দিকে তাকাল, 'কি কথা?'

সরিৎশেখর বললেন, 'এই দেশের কথা, কংগ্রেসের কথা।'

অনি হাসল, 'নতুন স্যার আমাকে খুব ভালবাসেন দাদু। বলেন, তোমার মত সিরিয়াস ছেলে এই স্কুলে আর কেউ নেই।'

সরিৎশেখর বললেন, 'আচ্ছা! খুব ভাল।'

অনি যেন উজ্জীবিত হল কথাটা শুনে, 'পরিশ্রম, আত্মদান আর ইতিহাস ছাড়া কোন জাতি বড় হতে পারে না। আমাদের এই দেশ স্বাধীন হয়েছে একমাত্র কংগ্রেসের ওই সব গুণ ছিল বলে। তা ছাড়া যে কোন জাতির যদি উপযুক্ত নেতা না থাকে সে জাতি দেশ শাসন করতে পারে না। আমাদের পণ্ডিত নেহরু হলেন সেই রকম এক নেতা।'

চোখ বন্ধ করলেন সরিৎশেখর। কি বলবেন ঠিক বুঝতে পারছেন না তিনি। এখন রাস্তাঘাটে যে সব ছেলেকে দেখেন তাদের থেকে অনি আলাদা। কিন্তু ওর নিশীথ সেন এই সব ব্যাপার ওর মাথায় ঢুকিয়ে ভাল করছে না খারাপ করছে বোঝা যাচ্ছে না।

'তুমি কি নতুন স্যারকে বলেছ যে, এই বাড়িতে কংগ্রেস অফিস হলে আমার আপত্তি হবে না?' গম্ভীর গলায় প্রশ্নটা করলেন তিনি।

দাদুর গলার স্বর শুনে অনি চট করে মাথাটা নিচু করে ফেলল। নতুন স্যার যখন বলেছিলেন, ছাব্বিশে জানুয়ারীর প্রিপারেশনের জন্য বড বাড়ি চাই তখন ও এই কথাটা বলেছিল। তাদের বাড়িতে কংগ্রেস অফিস হলে বড বড় নেতারা এখানে আসবেন, তাঁদের দেখতে পাবে অনি—এটা ভাবতেই কেমন লাগছিল। খুব সন্তর্পণে মাথা নাড়ল সে, 'হ্যাঁ।'

সরিৎশেখর এতটা আশা করেননি। তাঁর খুব বিশ্বাস ছিল নিশীথ সেন বানিয়ে বানিয়ে কথাটা বলেছে। হঠাৎ প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল ওঁর, গলা চড়িয়ে বললেন, 'কিসে আমার আপত্তি আছে আর কিসে নেই—এ কথা তুমি জানলে কি করে?'

দাদুর গলা সমস্ত ঘরে গমগম করছে এখন। খুব অবাক হয়ে অনি দাদুর দিকে তাকাল। এই রকম মুখ নিয়ে দাদু কোনদিন তার সঙ্গে কথা বলেননি। অসহায় ভঙ্গিতে ও বলল, 'কিন্তু তুমি তো কংগ্রেসী। দেশবন্ধু, সুভাষ বোস, মহাত্মা গান্ধীর কথা তুমি তো বলতে। তাই আমি ভাবলাম—।'

হঠাৎ হাত বাড়িয়ে নাতির কান ধরলেন সরিৎশেখর। উত্তেজনায় তাঁর সমস্ত শরীর কাঁপছিল, 'ভীষণ পেকে গেছ তুমি। আমি কংগ্রেসী তোমাকে কখনও বলেছি? মহাত্মা গান্ধী এক সময় কংগ্রেস ছেড়ে দিয়েছিলেন, সুভাষ বোসকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এ সব খবর নতুন স্যার বলেছে?' টকটকে লাল কানটাকে

এবার ছেড়ে দিলেন সরিৎশেখর, 'মানুষের ইতিহাস দিয়ে মানুষকে বিচার করি না আমি, একটা মানুষ কি রকম সেটা তার বর্তমান দেখেই বোঝা যায়। স্বাধীনতার আগে আমরা যা ছিলাম, এই তো তিন বছর চলে গেল প্রায়, কতটুকু এগিয়ে দিয়েছে কংগ্রেস দেশটাকে ?' শেষের কথাটা নাতিকে ধমকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

কানের ব্যথায় এবং সহসা দাদুর এই নতুন চেহারাটা দেখতে পেয়ে অনি কেঁদে ফেলল এবং কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'নতুন স্যার বলেছেন রাতারাতি দেশ তৈরি করা যায় না।'

'পঁচিশ বছরেও পারবে না। সব নিজের পকেট ভরার ধান্ধায় রয়েছে, দেশট উচ্ছন্নে গেলে ওদের লাভ। সে কংগ্রেস আর এই কংগ্রেস এক নয়। আটচল্লিশ সালের তিরিশে জানুয়ারী গান্ধীজীর সঙ্গে সে কংগ্রেস মরে গেছে।' এতক্ষণে সরিৎশেখরের খেয়াল হল একটি নাবালকের কাছে এ সব কি বলে যাচ্ছেন। বিদ্যাসাগরী চটিতে শব্দ করে বেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। ঘুরে নাতির দিকে তাকালেন। অনি এখন কাঁদছে না, হাঁ করে দাদুর দিকে তাকিয়ে আছে। বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল সরিৎশেখরের। জীবনে এই প্রথম তিনি অনির গায়ে হাত দিলেন। তাঁর সারাজীবনে অনেক কঠোর কাজ তিনি করেছেন কিন্তু এই নাতির ব্যাপারে তাঁর মনের ভেতর যে দুর্বলতা ওর জন্মমুহূর্ত থেকে এসেছিল তাকে সরাতে পারেননি কখনো। কিন্তু আজ যখন শুনলেন কে এক নিশীথ সেন ওকে গড়েপিঠে তৈরি করছে তখন থেকে বুকের মধ্যে অদ্ভুত একটা ঈর্ষা বোধ করতে শুরু করেছেন তিনি। ছোট ছেলেটা কখন তাঁর অজান্তে রাজনীতির মধ্যে ঝাঁপিয়ে এখন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ওর ভবিষ্যৎ কি তিনি জানেন না। সে রাজনীতি ব্যক্তিগতভাবে তিনি অপছন্দ করেন। কিন্তু সেটাও তাঁকে খুব বড আঘাত দেয়নি! সহ্য হয়ে গেছে এক সময়। এখন এই ছোট্ট কাদার তালটাকে যদি কেউ রাজনীতির আগুনে সেঁকে, তাহলে সহ্য করতে কষ্ট হবে বইকি।

অনির কাছে এগিয়ে এলেন তিনি। আস্তে করে দু হাতে ওর মুখটা ধরলেন, 'দাদু, তুমি তো এখন অনেক ছোট, এ সব কথা তোমার ভাববার সময় নয়। এখন তোমার কর্তব্য অধ্যয়ন করা। নিজের দেশের ইতিহাস পড়ে দেশকে প্রথমে জানো, তারপর বড় হয়ে নিজের চোখে তার সঙ্গে দেশকে মিলিয়ে নিয়ে তবে স্থির করবে এ সব করবে কি না।'

অনি দাদুর এই পরিবর্তনে খুব খুশী হতে পারছিল না। সামনের দিকে মুখ তুলে

সে বলল, 'কিন্তু নতুন স্যার বলেন, আমাদের কোন ইতিহাস নেই। যা আছে তা ইংরেজদের লেখা।'

সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন সরিৎশেখর। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, 'শোন, আমি চাই না তুমি এ সবের মধ্যে থাক। দাদুভাই, একটা কথা চিরকাল মনে রেখো, নিজে উপযুক্ত না হলে কোন জিনিস গ্রহণ করা যায় না। আমি চাই তুমি ফার্স্ট ডিভিশনে স্কুল থেকে বেরুবে। তার আগে তোমাকে এ সব কথা বলতে যেন না শুনি। আর হ্যাঁ, ওই নতুন স্যারের সঙ্গে বেশী মেলামেশা না করলেই ভাল। সামনের মাস থেকে তোমাদের অঙ্কের মাস্টার বাড়িতে পড়াতে আসবেন।'

হনহন করে বেরিয়ে যেতে যেতে সরিৎশেখরের নিজেরই মনে হল, তিনি বৃথা এই শব্দগুলো ব্যবহার করলেন। বঙ্কিমবাবু ঠিকই বলেছেন, 'এ যৌবনজলতরঙ্গ রোধিবে কে ?' কিন্তু সেই তরঙ্গটাকে এরা দশ বছর বয়সেই চাপিয়ে দিল যে।

বন্দেমাতরম্‌! জেলা স্কুলের বিরাট মাঠ জুড়ে চিৎকারটা উঠে সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে পড়ল। প্রায় সাড়ে চারশ' ছেলে তিনটে লাইনে ভাগে ভাগে মাঠ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকের পরনে স্কুলের য়ুনিফর্ম। প্রথম দিকে স্কাউটরা, পরে সমস্ত স্কুল। একটু আগে হেড মাস্টারমশাই ছাব্বিশে জানুয়ারীর পতাকাটা তুললেন। লাইনের সামনে দাঁড়িয়ে অনির মনে পড়ছিল স্বর্গছেঁড়ার কথা। সাতচল্লিশ সালের পনেরই আগস্ট পতাকা তোলার সময় তার কি অবস্থাটাই না হয়েছিল। প্রত্যেকটা ক্লাসের ছেলেদের সামনে একজন করে লিডার দাঁড়িয়ে। নতুন স্যার অনিকে ওর ক্লাসের লিডার ঠিক করেছেন। এই নিয়ে রিহার্সালের সময় থেকে মণ্টু ওর পেছনে লেগে আছে, নেহাত নতুন স্যারের জন্য কিছু বলতে পারছে না। আজকেও একটু আগে লাইনে দাঁড়িয়ে নেতাজীর পেঁয়াজি বলে ক্ষেপাচ্ছিল। যেহেতু সে লিডার তাই মুখটা সামনে ফেরানো, ফলে মণ্টুকে কিছু বলতে পারছে না। বন্দে মাতরম্‌ ধ্বনি উচ্চারণ করার সময় ওর গায়ে সেই কাঁটাটা আবার ফিরে এল। এমন কি দাদু যে অনেক গম্ভীর মুখে আজকের মিছিলে যেতে পার্মিশন দিয়েছেন— সে কথাটাও ভুলে গিয়েছিল। আজকাল দাদু যেন কেমন হয়ে গিয়েছেন।

হেডমাস্টার মশাই-এর বক্তৃতার পর নতুন স্যার মঞ্চে উঠলেন, 'এবার আমরা সবাই সুশৃঙ্খল ভাবে মার্চ করে চাঁদমারির মাঠে যাব। তোমরা জানো নিশ্চয়ই কলকাতা থেকে বিশিষ্ট নেতারা সব সেখানে এসেছেন। তাছাড়া সরকারের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত আছেন। আমরা স্কুলের তরফ থেকে সেই ঐতিহাসিক জমায়েতে যোগ দিয়ে পবিত্র কর্তব্য পালন করব।'

স্কুলের সমস্ত মাস্টারমশাই এমন কি ওদের পাগল ড্রইং-স্যার অবধি সামনে হাঁটতে লাগলেন। সাড়ে চারশ ছেলে ভাগে ভাগে মাঠ ছেড়ে রাস্তায় নামল মার্চ করতে করতে। অনি একবার দেখতে পেল ক্লাস টেনের অরুণদার হাতে বিরাট জাতীয় পতাকাটা উড়ছে। অত বড় পতাকা নিয়ে অনি কখনোই সোজা হয়ে হাঁটতে পারত না। অরুণদাকে খুব হিংসে হচ্ছিল ওর।

রাস্তায় পড়তেই গান শুরু হল। 'চল্ চল্ চল্, ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল।' তালে তালে, এতদিনের রিহার্সাল মনে রেখে যখন সবাই গাইতে গাইতে পা ফেলছে তখন মানুষজন অবাক হয়ে ওদের দেখতে লাগল। টাউন ক্লাব মাঠের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ও দেখল রাস্তার দুপাশে ভিড়ের মধ্যে সরিৎশেখর দাঁড়িয়ে আছেন লাঠি হাতে। হঠাৎ দাদুকে ভীষণ বুড়ো বলে মনে হল ওর। চোখাচোখি হতে দাদু মাথা নেড়ে হাসলেন। তখন দ্বিতীয় গানের মাঝামাঝি জায়গায় এসে গিয়েছে। অনি দাদুর দিকে চেয়ে লাইনটা সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইল, 'সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে অবলা কেন মা এত বলে।'

করলা নদীর ওপর কাঠের পুলটা পেরিয়ে পোস্ট অফিসের সামনে দিয়ে ওদের মিছিলটা এঁকেবেঁকে গাইতে গাইতে এগোতেই ওরা দেখতে পেল এফ ডি আই থেকে ছেলেরা বেরুচ্ছে। এফ ডি আই-এর সঙ্গে জেলা স্কুলের চিরকালের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, খেলাধুলায় ওদের কাছে হেরে গেলেও পড়াশুনায় জেলা স্কুল ওদের থেকে এগিয়ে থাকে প্রতিবার। এফ ডি আই-এর ছেলেদের দেখে চিৎকারটা যেন হঠাৎই বেড়ে গেল। হঠাৎ মন্টু চেঁচিয়ে বলল, 'অনিমেষ, ওদের রাস্তা ছাড়িস না, আমরা আগে বেরিয়ে যাব।' ওদের রাস্তা জুড়ে চলতে দেখে অসহায় হয়ে এফ ডি আই-এর ছেলেরা অপেক্ষা করতে লাগল।

চাঁদমারির মাঠে তিলধারণের জায়গা নেই। সামনের দিকে ওরা যেতে পারল না। স্কাউটরা ড্রিল-স্যারের সঙ্গে অন্যদিকে চলে গেল। পুলিস, স্কাউট, গার্লস-গাইডরা পতাকাকে অভিবাদন জানালে। চাঁদমারির গায়ে বিরাট মঞ্চ তৈরি হয়েছে। মন্টু বলল, 'চল সামনে যাই, এখান থেকে কিছুই দেখতে পাব না।' ভিড় ঠেলে সামনে যাওয়া সোজা কথা নয়, অনির মাঝে মাঝে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল ভিড়ের চাপে। শেষ পর্যন্ত ওরা একদম মঞ্চের সামনে যখন এসে দাঁড়াল তখন সমস্ত শরীর এই শেষ জানুয়ারীর সকালেও প্রায় ঘেমে উঠেছে। অনি দেখল বিরাট মঞ্চের ওপর নেতারা বসে আছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন বিরাট লোক, যাঁর

ছবি প্রায়ই কাগজে বের হয়, অনি তাঁকে বেশ স্পষ্ট দেখাত পাচ্ছে। পাশেই পুলিস ব্যাণ্ডে 'ধনধান্যেপুষ্পেভরা' বাজছে। মন্টু বলল, 'আমি এরকম কখনও দেখিনি।'

অনি হাসল, 'কি করে দেখবি, প্রজাতন্ত্র দিবস তো এর আগে আসেনি।'

একটু পরেই অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল। প্রথমে পায়ে পায়ে বিরাট পুলিসবাহিনী মার্চ করে এসে পতাকাকে স্যালুট করে গেল। পেছনের ব্যাণ্ডের তালে তালে ওদের পা পড়ছিল। স্কাউট আর গার্লস গাইডদের যাবার সময় মাঝে মাঝে হাসি শোনা যাচ্ছে জনতার মধ্যে থেকে। একটি মোটা মেয়ে ঠিক সোজা হয়ে হাঁটতে পারছিল না, বেচারার পায়ে বোধ হয় ফোস্কা পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেই বিরাট ব্যক্তিটি কপালে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছেন তখন থেকে। অনি বুঝতে পারছিল ওঁর হাত ব্যথা করছে। এর পরেই বন্দে-এ-এ মাতরম্ ধ্বনি দিতে দিতে কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ নিয়ে নেতারা এগিয়ে এলেন অভিবাদন জানাতে। সেই চিৎকারের সঙ্গে গলা মিলিয়ে জনতার মধ্যে কেউ কেউ বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিল। অনির সমস্ত শরীরে এখন অদ্ভুত উত্তেজনা তির তির করে ওঠানামা করছে। আর সেই সময় ঘটে গেল ব্যাপারটা।

কংগ্রেসের লোকজন যখন প্রায় মঞ্চের সামনে এসে পড়েছেন ঠিক তখনই আট-ন'টি যুবক দৌড়ে জনতার ভিতর থেকে বেরিয়ে মঞ্চের কাছাকাছি চলে গেল। ওদের ছোটার ভঙ্গীতে এমন একটা তৎপরতা ছিল যে জনতা এমন কি মার্চ করে আসা কংগ্রেসীরাও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। অনি শুনল ওরা পাগলের মত হাত নেড়ে চিৎকার করেছে, 'ইনকিলাব—জিন্দাবাদ। ইনকিলাব—জিন্দাবাদ। এ আজাদী—ঝুটা হ্যায়।' প্রথম কথাটার মানে অনি বুঝতে পারছিল না। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়, সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের ওপর শোরগোল পড়ে গেল। হঠাৎই অজস্র পুলিস এসে ওদের ঘিরে ফেলল। ওরা তখনও সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে—'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'। অনি বিস্ময়ে ওদের দেখছিল। পুলিস লোকগুলোকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু ওরা যাচ্ছে না কিছুতেই। ঠিক সেই সময় কংগ্রেসীরাও ধ্বনি তুলল—'বন্দেমাতরম্।' এদেরও গলার জোর যেন হঠাৎ বেড়ে গেল, 'ইনকিলাব —জিন্দাবাদ'। তারপরই অনির সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ও দেখল নির্দয়ভাবে পুলিসের লাঠি লোকগুলোর ওপর পড়ছে। যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে ওরা মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। আর সেই জটলা থেকে একপাটি জুতো সাঁ করে তীরের মত আকাশে উঠে মঞ্চের ওপর দাঁড়ানো কপালে হাত ঠেকিয়ে রাখা লোকটির মাথায় ঠোক্কর খেল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি আর্তনাদ করে পেছনের চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লেন। মঞ্চের সবাই এসে তাঁকে ঘিরে ধরেছেন। একজন লোক,

বোধ হয় ডাক্তার, ব্যাগ হাতে ছুটে এলেন।

এতক্ষণে পুলিস ওদের সরিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে। একটা বড গাড়িতে ওদের তুলে পুলিসরা শহরে চলে গেল।

এখন একটা থিতনো ভাব চারধারে। কেউ কোন কথা বলছে না। জনতার কেউ কেউ উসখুস করে বেরিয়ে যাচ্ছে বাইরে। অবস্থা স্বাভাবিক করতে থেমে দাঁড়ানো কংগ্রেসীরা আবার 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিতে দিতে চলে গেলেন। মঞ্চের ওপর তখনও সবাই ওই নেতাকে নিয়ে ব্যস্ত। কংগ্রেসীদের এই যাওয়াটায় কারো মনে কোন প্রতিক্রিয়া হল না।

মণ্টু বলল, 'চল, আমরা পালিয়ে যাই।'

অনিমেষ বলল, 'কেন ?'

মণ্টু চাপা গলায় বলল, 'মারামারি হতে পারে।' বলে ছুট দিল। সঙ্গে সঙ্গে ওদের ক্লাসের কয়েকজন ওর পেছন ধরল। অনি দৌড়তে গিয়ে হঠাৎ কি মনে হতে না দৌড়ে হাঁটতে লাগল জনতার মধ্যে দিয়ে। আসবার সময় মানুষ-ঠাসা হয়ে ছিল মাঠটা, এখন কেমন ফাঁকা ফাঁকা হয়ে গেছে, হাঁটতে কোন কষ্ট হচ্ছে না।

'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' মানে কি ? অনি হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল। এই ধ্বনি এর আগে শোনেনি সে। কথাটা কি বাংলা ? নতুন স্যার বলেন, ইংরেজ পুলিসের অত্যাচার সহ্য করেও কংগ্রেসীরা বন্দেমাতরম্ ধ্বনি ছাড়েনি। এরাও তো আজ পুলিসের মার খেয়েও ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলেছে। কেন ? এখন তো দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। ওরা তবে কি বলতে চায় ? কেন ওরা মারকেও ভয় করে না ? হঠাৎই ওর ছোটকাকা প্রিয়তোষের কথা মনে পড়ে গেল। এই লোকগুলো কি ছোটকাকার দলের ? ছোটকাকা কোথায় চলে গেছে। পিসীমা বলতেন পুলিসের ভয়ে প্রিয় আসে না। কেন পুলিসকে ভয় করবে ? এখন তো সবাই বন্দেমাতরমের পুলিস। অনির বুকের মধ্যে আজকের মার-খাওয়া ছেলেগুলোর জন্যে একটু মমতা জমছিল। কেন কংগ্রেসীরা পুলিসদের নিষেধ করল না মারতে ? ওরা তো প্রথমে কোন অন্যায় করেনি, পরে অবশ্য জুতো ছুঁড়েছিল। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদের' মানেটা জানবার জন্য অনি নতুন স্যারকে খুঁজতে লাগল।

॥ ৪ ॥

সরিৎশেখর আজ সকালে শিলিগুড়ি গিয়েছেন। ওঁর দীর্ঘদিনের পরিচিত পাগলাঝোড়া টি এস্টেটের রিটায়ার্ড হেডক্লার্ক তেজেন বিশ্বাসের গৃহপ্রবেশ আজ। সরিৎশেখরের

যাবার ইচ্ছে ছিল না বড় একটা, গেলেই খরচ। ইদানীং টাকাপয়সার ব্যাপারে আগের মতন দরাজ হতে পারেন না তিনি। পেন্সনের টাকা, সামান্য শেয়ার ডিভিডেণ্ড আর মহীতোষের পাঠানো অনির নামে কিছু টাকা—এর মধ্যেই তাঁকে ম্যানেজ করতে হয়। সেটা করতে গিয়ে এখন একটা আধুলি তাঁর কাছে একটা টাকার মতই মূল্যবান। তাই তেজেন বিশ্বাস যখন এসে হাতজোড় করে যাবার জন্য অনুরোধ করল তখন সরিৎশেখর বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। এখন প্রতিদিন তাঁকে হিসাব করে চলতে হয়। ব্যাঙ্কে প্রায় তলানিটুকু পড়ে আছে, বাড়িটা এবার ভাড়া না দিলেই নয়। অবশ্য হেমলতার নামে ব্যাঙ্কে বেশ কিছু টাকা তিনি এক সময় রেখেছিলেন। কিন্তু সে টাকার কথা চিন্তা করতে গেলে নিজেকে কেমন ছোট মনে হয়। তা তেজেন বিশ্বাসের বাড়িতে হেমলতা প্রায় জোর করে পাঠালেন বাবাকে। এই একঘেয়ে জীবনের বাইরে একটু ঘুরে আসা হবে, মনটা ভাল থাকবে। সেজেগুজে আজ সকাল নটার ট্রেনে শিলিগুড়ি চলে গেলেন সরিৎশেখর, সন্ধ্যের ট্রেনে ফিরে আসবেন অবশ্যই।

আজ স্কুল ছুটি। দাদু চলে যাওয়ার পর অনি পড়ছিল নিজের ঘরে। শীত চলে গেছে, স্কুলে পড়াশুনা এখন জোর কদমে চলছে। এমন সময় বাইরের দরজায় খুব জোর কড়া নড়ে উঠল। বই রেখে ঘরের বাইরে এসে অনি দেখল পিসীমা রান্নাঘরে রয়েছেন, কড়ানাড়ার শব্দ বোধ হয় কানে যায়নি। ইদানীং হেমলতা কানে একটু কম শুনছেন। কড়াটা আর একবার শব্দ করে উঠতেই অনি দৌড়ে এসে দরজা খুলল।

মাঝবয়সী একজন মহিলা, মাথায় অনেকখানি ঘোমটা দেওয়া, অথচ ঘোমটা দেওয়ার ধরন থেকে বোঝা যায় অনভ্যস্ত হাতে দেওয়া, একটি বছর তুয়েকের বাচ্চার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। অনিকে দেখামাত্র মহিলা হাসলেন, তারপর বললেন, 'তুমি নিশ্চয়ই অনি, না?' অনি দেখল হাসবার সময় মহিলার কালো মাড়ি বেরিয়ে পড়ে। কেমন একটা বিচ্ছিরি সেণ্ট না পাউডারের গন্ধ ওঁর শরীর থেকে আসছে। অনি ঘাড় নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

সঙ্গে সঙ্গে মহিলা বাচ্চাটাকে বললেন, 'প্রণাম করো, প্রণাম করো, তোমার দাদা হয়।' বলামাত্র দম দেওয়া পুতুলের মত বাচ্চাটা হেঁট হয়ে হাত বাড়িয়ে ওর পায়ের মাটি ছুঁয়ে মাথায় বোলাল। অনি চমকে উঠে সরে দাঁড়াতে গিয়েও সুযোগ পেল না। আজ অবধি কেউ তাকে প্রণাম করেনি, এতকাল ওই সবাইকে প্রণাম করে এসেছে। ওর মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছিল। এই সময় বাচ্চাটা আধো আধো গলায় বলে উঠল, 'জল খাবো।'

মহিলা বললেন, 'খাবে বাবা, একটু দাঁড়াও। দাদা তোমাকে জল খাওয়াবে, দুধ খাওয়াবে, সন্দেশ খাওয়াবে, তাই না?'

অনি হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কে?'

'আমি?' মহিলা আবার হাসবার চেষ্টা করলেন, 'চিনতে পারছ না তো! আচ্ছা আগে বল, বাড়িতে এখন কে কে আছেন?'

'আমি আর পিসীমা।'

'দাদু কোথায় গেছেন, বাজারে?'

'না। দাদু আজ শিলিগুড়িতে গিয়েছেন।'

'ও, তাই নাকি!' বলে মহিলা ঘুরে দাঁড়ালেন গেটের দিকে। সেখানে কেউ নেই কিন্তু মহিলা গলা তুলে ডাকলেন, 'চলে এস, তোমার বাবা বাড়িতে নেই।' অনি অবাক হয়ে দেখল গেটের একপাশে ইলেক্‌ট্রিক পোস্টের আড়াল থেকে একটা লোক বেরিয়ে এদিকে আসছে। তার মুখ চোখ কেমন বসা-বসা, গায়ের শার্ট খুব ময়লা আর পাজামার নিচের দিকটায় অনেকটা ফাটা। কাছাকাছি হতে অনির মনে হল এঁকে সে চেনে, থুতনির কাছে অতখানি দাড়ি ঝোলা সত্ত্বেও ভীষণ পরিচিত মনে হচ্ছে। ও চকিতে মহিলার দিকে তাকাল। এতক্ষণ যেটা লক্ষ্য করেনি সেটা দেখতে পেয়ে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। মহিলার শাড়িটা বোধ হয় ঠিক আস্ত নেই আর বাচ্চার জুতোর ডগা ফেটে পায়ের আঙুল বেরিয়ে এসেছে। ঠিক এই সময় লোকটি কাছাকাছি হয়ে মোটা গলায় বলল, 'আমাদের অনির দেখি স্বাস্থ্য বেশ ভাল হয়েছে।' কথাটা শোনামাত্র অনি আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না। কয়েক লাফে সমস্ত বাড়িটা ডিঙ্গিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে উপস্থিত হল। হেমলতা তখন মাটিতে বঁটি নিয়ে বসে তরকারি কুটছিলেন। ছেলেটাকে হনুমানের মত দুপদাপ করে আসতে দেখে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই অনি তাঁর কানের কাছে গরম নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলল, 'জ্যাঠামশাই এসেছে।'

অল্পের জন্যে বঁটিতে আঙুলটা দু'টুকরো হল না, হেমলতা ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে এসেছে?'

'জ্যাঠামশাই, সঙ্গে একজন বউ আর এইটুকুনি একটা বাচ্চা ছেলে।'

কথাটা বলতে বলতে অনি দেখল পিসীমা সোজা হয়ে বড় বড় চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। যেন বিশ্বাস হচ্ছে না এমন গলায় হেমলতা বললেন, 'পরিতোষ এসেছে? তুই চিনতে পারলি? কিন্তু ও তো বিয়ে-থা করেনি—যাঃ, তুই ভুল দেখেছিস।'

হেমলতা উঠতে যাচ্ছেন এমন সময় হাঁকটা ভেসে এল রান্নাঘরে, 'ও দিদি,

কোথায় গেলে ! ত্যাখো, কাদের এনেছি ।'

সঙ্গে সঙ্গে হেমলতা বজ্রাহতের মত বললেন, 'পরিই তো । কিন্তু এখন আমি কি করবো, গুরুদেব, আমি কি করবো এখন ?'

'আরে তোমাকে ডাকতে ডাকতে গলা ধরে এল আর তুমি এখানে বসে আছ, বাইরে এস, প্রণাম করি ।' অনি দেখল জ্যাঠামশাই রান্নাঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন ।

হেমলতা ভাইয়ের দিকে তাকালেন । এত বিচ্ছিরি চেহারা হয়েছে যে চট করে চেনা মুশকিল । এই ভাই তাঁর বড় ভাই, এককালে সেই ছেলেবেলায় ওঁর কত আদরের ছিল—হঠাৎ বুকের ভিতরটা কেমন নড়েচড়ে উঠতেই কোনরকমে নিজেকে সামলে নিলেন হেমলতা । বাবা ওকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন, এ বাড়িতে ওর প্রবেশোধিকার নেই । এতদিন পর কোথা থেকে উদয় হল ?

যেন হেমলতা কি চিন্তা করছেন টের পেয়ে গেল পরিতোষ, 'কিছু চিন্তা করো না, তোমাদের ফাদার ফেরার আগেই কেটে পড়ব ।'

এতক্ষণে হেমলতা যেন সাড় পেলেন, শক্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন এলি ?'

'তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছিল, তাছাড়া—' একটু থেমে অনির দিকে তাকাল পরিতোষ, 'অনেকদিন বউ-বাচ্চাটা পেটভরে খায়নি ! অবশ্য তোমাদের ফাদার বাড়ি থাকলে আমি ঢুকতাম না । বউটা শালা কিছুতেই শুনতে চায় না । একবার শ্বশুরবাড়ি আসবেই, বাঙাল তো, গোঁ ভীষণ ।'

'বাঙাল ? বাঙালের মেয়ে বিয়ে করেছিস তুই ?'

'বিয়ে করিনি । করতে বাধ্য হয়েছি । আমার একটা বাচ্চা ছেলে আছে, তাকে তুমি দেখবে না ?'

হেমলতা উঠে দাঁড়ালেন । বাবাকে তিনি চেনেন । আজ অবধি ভুলেও একবার বড ছেলের নাম করেননি কখনো । বরং প্রিয়তোষের খোঁজখবর গোপনে নেবার চেষ্টা করছেন তিনি—হেমলতা সেটা বুঝতে পারেন । পরিতোষ তাঁর কাছে মৃত । এই অবস্থায় হেমলতার কি করা উচিত ? ভাইকে থাকতে বলা মানে বাবাকে অসম্মান করা নয় ? আর সন্ধ্যের মধ্যেই তো তিনি ফিরবেন, তখন ? অবশ্য সন্ধ্যে হতে অনেক দেরি আছে । হেমলতা দরজার সামনে এলে পরিতোষ ঝুঁকে তাঁকে প্রণাম করতে যেতেই তিনি চমকে পিছিয়ে দাঁড়ালেন, 'রাস্তার ময়লা কাপড়ে ছুঁয়ে দিয়ো না, আমার স্নান হয়ে গেছে ।'

পরিতোষ সোজা হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'আমার তো আর জামাকাপড়

নেই।'

হেমলতা বললেন, 'তাহলে সরে দাঁড়াও, প্রণাম করার প্রয়োজন নেই।'

পরিতোষ দিদির কাছ থেকে এই ধরনের কথা আশা করেনি, স্খলিত গলায় সে উচ্চারণ করল, 'তুমি মাইরি ফাদারের মতই নিষ্ঠুর।'

সঙ্গে সঙ্গে একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'নিজে যেন সাধুপুরুষ। এক ফোঁটা দয়ামায়া নেই যার সে আবার অন্যকে নিষ্ঠুর বলে।'

কথাটা শুনেই পরিতোষ গর্জে উঠল, 'অ্যাই, চুপ।'

'চুপ করবো কেন? অনেক চুপ করেছি, আর নয়।'

কয়েক পা এগিয়ে হেমলতা উঠোনের দিকে তাকাতেই দেখলেন বারান্দার সিঁড়িতে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে একটি রোগাটে বউ বসে আছে। বুঝতে পেরেও জিজ্ঞাসা করলেন হেমলতা, 'এরা কারা?'

যেন কিছুই হয়নি এমন গলায় পরিতোষ বলল, 'ওই তো, তোমার ভাইবৌ আর ভাইপো। দিদিকে আবার প্রণাম করতে যেও না, রাস্তার কাপড়ে আছ।'

'এমন ভান করো যেন বুদ্ধিতে বৃহস্পতি।' মুখ নেড়ে পরিতোষকে কথাটা বলল মহিলা, তারপর হঠাৎ গলার স্বর বদলে গেল তার। বাচ্চাটাকে সঙ্গে নিয়ে হেমলতার দিকে এগিয়ে এসে প্রায় কেঁদে ফেলল, 'মুখে বড় বড় কথা বলত লোকটা, তাই শুনে ভুলে গেলাম। বিয়ের পর একদিনও পেটভরে খেতে পাইনি, বুকের দুধ শুকিয়ে যাওয়ার পর একে আর দুধ দিতে পারিনি। দিদি, আমি ওকে জোর করে নিয়ে এসেছি আপনার কাছে, আপনিও তো মেয়ে, আমাকে ক্ষমা করবেন না?'

হেমলতার পেছনে পেছনে অনি বেরিয়ে এসেছিল। হঠাৎ পরিতোষ যেন তাকে আবিষ্কার করে বলে উঠল, 'এই ছেলেটা, তুমি এখানে কি করছ? যাও, বড়দের কথার মধ্যে থাকতে নেই।' তারপর চাপা গলায় বলল, 'ফাদারের পেয়ারের নাতি তো, এলেই সব রিপোর্ট করবে।'

সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলেন হেমলতা, 'পরি, তুই—তুই একেবারে উচ্ছন্নে গিয়েছিস। ছি ছি ছি। সারাটা জীবন বাবাকে জ্বালিয়ে এলি, নিজের এক পয়সা রোজগার করার মুরোদ নেই, আবার এই মেয়েটাকে বিয়ে করে কষ্ট দিচ্ছিস্, ছি।'

হাসল পরিতোষ, 'বিয়ে আমি করিনি, আমাকে করেছে।'

মহিলা এই সময় ডুকরে কেঁদে উঠতে হেমলতা বিচলিত হয়ে উঠোনে নেমে এলেন। জ্যাঠামশাইয়ের ধমক খেয়ে অনি কি করবে বুঝতে পারছিল না। লোকটা খারাপ, খুবই খারাপ, তাদের বাড়িতে কেউ এভাবে কথা বলে না। ও দেখতে

বাচ্চাটা টলতে টলতে হেঁটে উঠোন পেরিয়ে বকফুলের গাছের দিকে চলে যাচ্ছে—সেদিকে কারো নজরও নেই। জ্যাঠামশাইয়ের শরীরের পাশ কাটিয়ে ও নিচে নেমে বাচ্চাটাকে ধরতে গেল। বেচারা এত নির্জীব যে সামান্য হেঁটে আর দাঁড়াতে পারছিল না, অনিকে পেয়ে ওর হাঁটু জড়িয়ে ধরল। পরিতোষ সেটা লক্ষ্য করে বলল, 'বাঃ, তুই ভাইয়ে দেখছি বেশ ভাব হয়েছে।'

মহিলা তখনও কাঁদছিল। হেমলতা তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বয়েস বেশী নয় কিন্তু অসম্ভব পোড়-খাওয়া—দেখলেই বোঝা যায়। ভাল খেতে না পেয়ে শরীর ক্ষয়াটে হয়ে গেছে। এ বাড়ির বউ হবার কোন গুণ চেহারায় নেই। মাধুরী বা নতুন বউয়ের চেহারা দেখলে মনটা যে স্নিগ্ধতায় ভরে যায় এই মেয়েটির মধ্যে তার বিন্দুমাত্র ছায়া নেই।

হেমলতা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কি?'

যেন বেরিয়ে আসা কান্নাটা গিলছে এমন গলায় উত্তর এল, 'সাবিত্রী।'

'তোমার বাবা কি বিয়ে দেবার আগে খোঁজখবর নেননি?' কাটা-কাটা ভাবে শব্দগুলো উচ্চারণ করলেন হেমলতা। উঠোনের এক কোণে বাচ্চাটাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে অনি অন্যদিকে তাকিয়ে পিসীমার কথা শুনছিল। এতদিনের দেখা পিসীমার সঙ্গে এই পিসীমাকে ও কিছুতেই মেলাতে পারছিল না। হঠাৎ ওর মনে হল, পিসীমার গলা দিয়ে যেন দাদু কথা বলেছেন।

'আমার বাবা নেই, যশোরে দাঙ্গার সময় মারা যায়। বিয়ের পর আমরা জানতে পারলাম উনি ত্যাজ্যপুত্র।' সাবিত্রী বলল।

'বাঃ, বিয়ের আগে ছেলের বাড়িঘর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন বোধ করলে না কেউ? চমৎকার!' হেমলতা হিসাব মেলাতে পারছিলেন না।

পরিতোষ হাসল, 'তখন আর উপায় ছিল না যে। আমাকেও কেটে পড়তে দিল না, রাতারাতি জোর করে বিয়ে দিয়ে দিল। নইলে আমাদের বংশে—'

'চুপ কর্! তোর মুখে বংশ কথাটা একদম মানায় না। যাক্, বাচ্চাটাকে নিয়ে যখন এসেছ তখন এমনি চলে যেতে বলছি না। সন্ধ্যেবেলায় বাবা আসার আগেই বিদায় হয়ো। আর তাঁর অনুমতি না পেলে এই বাড়িতে কখনই এসো না—মনে থাকে যেন।' হনহন করে আবার রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন হেমলতা।

পিসীমা চোখের আড়াল হওয়ামাত্র অনি জ্যাঠামশাইকে মাথার ওপর দু'হাত তুলে একটা নাচের ভঙ্গী করতে দেখল। জেঠিমার কান্না চট করে থেমে গিয়ে কালো কালো দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। বড় বড় পা ফেলে জ্যাঠামশাই জেঠিমার

কাছে নেমে এসে চাপা গলায় বললেন, 'দারুণ হয়েছে। তুমি মাইরি জব্বর অ্যাক্টিং করলে সাবু। বড়দি একদম আউট।'

জেঠিমা বললেন, 'ঝগড়াটা না বাধালে তোমার দিদি আমার কথা শুনতোই না।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'আমি তো ঘাবড়ে যাচ্ছিলাম। ভাবছিলাম তুমি অরিজিনাল ছাড়ছ কিনা!'

জেঠিমা বললেন, 'পাগল! একটা কথা তো সত্যি বলেছ।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'কি?'

'এই বাড়িটার কথা। এতবড় বাড়ি যার তাকে কি বকা যায়?' এমনভাবে হাসলেন জেঠিমা যে অনির খুব খারাপ লাগল।

'এটা আমার বাবার বাড়ি—আমার নয়। তা ছাড়া আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করা হয়েছে - নো রাইট এই বাড়িতে।' জ্যাঠামশাই উদাস গলায় বললেন। ওঁর চোখ সমস্ত বাড়িটায় ঘুরছিল।

'দেখো না, আস্তে আস্তে সব জল হয়ে যাবে। মানুষের রাগ আমার জানা আছে। কিন্তু শেষবার একটা সত্যি কথা বল তো, শুধু টাকা চুরি করেছিলে বলে ত্যাজ্যপুত্র করেছিল না অন্য কারণ ছিল?' জেঠিমার চাপা গলার স্বর কেমন হিসহিসে।

পরিতোষ খুব অস্বস্তির মধ্যে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, 'ফাইটিং করো না, একটু লটঘট করেছিলাম। প্রথম যৌবন তো।'

'কি বললে? বুড়ো ভাম, পাঁচ বছর আগে প্রথম যৌবন ছিল তোমার—'

ফুঁসে ওঠা সাবিত্রীকে হাত জোড় করে থামিয়ে দিল পরিতোষ, 'নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যেতে চাও? আরে পুরুষমানুষের ওরকম একটু-আধটু হয়ই, তা নিয়ে কেউ মাথা খারাপ করে না। তাছাড়া দুজনের ধান্দাই তো এক।'

সাবিত্রী নিজেকে অনেকটা সামলে নিলেও বোঝাই যায় হজম করতে পারছে না ব্যাপারটা। হঠাৎ ও এদিক ওদিক তাকিয়ে ছেলেকে খুঁজতে গিয়ে দেখল সে অনির হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর ওপর বিরক্ত হয়ে উঠল সে, 'খুব তো চেঁচিয়ে ভেতরের খবর বলছ, ওদিকে ছোঁড়াটা হাঁ করে সব গিলচে।' কথাটা শোনামাত্র পরিতোষ ঘাড় ঘুরিয়ে অনিকে দেখতে পেয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সাবিত্রী চাপা গলায় তাকে বাধা দিল, 'খবরদার, বকাবকি করবে না। মিষ্টি কথায় ওকে হাত করে নিতে হবে।'

অনি দেখল জেঠিমা ওর দিকে আসছে। বাচ্চাটা তখন থেকে ঠায় ওর হাত

ধরে দাঁড়িয়ে আছে। অনি বুঝতে পারছিল ছেড়ে দিলেই এ পড়ে যাবে। জেঠিমা বললেন, 'কি সুন্দর দেখতে তোমাকে অনি। আহা, মার জন্য খুব কষ্ট হয়, না? সৎমা মারে?'

অনি জেঠিমার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছিল না কি জবাব দেবে। আজ অবধি এ ধরনের প্রশ্ন তাকে কেউ করেনি। এরা এ বাড়িতে আসা নিয়ে নিজেদের মধ্যে ষড়যন্ত্র করেছে এটা ও বুঝতে পারছিল। ত্যাজ্যপুত্র হলেও জ্যাঠামশাই এ বাড়ির সব খবর রাখে।

বাচ্চাটকে সামনে এগিয়ে দিয়ে অনি বলল, 'একে ধরুন।'

সাবিত্রী অবাক হয়ে বাচ্চাটাকে টেনে নিতে দেখল অনি গটগট করে উঠোন পেরিয়ে অন্যদিকে চলে গেল। রাগে গা জ্বলে গেল সাবিত্রীর। বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে পরিতোষের কাছে এসে বলল, 'দেখলে, ছেলেটার তেল দেখলে? কথাটার জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করলে না।'

পরিতোষ মুখ বেঁকাল, 'ফাদারের সব কটা ব্যাড ভাইসেস ও পেয়েছে। আচ্ছা করে আড়ং ধোলাই দিতে হয়।'

চোখের আড়াল হতেই অনি পা টিপে টিপে বাগানের মধ্যে দিয়ে ফিরে এল। গাছের আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে ও রান্নাঘরের ওপর নজর রাখতে লাগল।

বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে জামা খুলতে খুলতে পরিতোষকে বলতে শুনল অনি, 'ও বড়দি, আজ তোমার হাতের রান্না খাবো।'

হেমলতা কোন উত্তর দিলেন না। পরিতোষ কান পেতে উত্তরটা শোনার চেষ্টা করে না পেয়ে যেন খুশী হল। অনি দেখল জ্যাঠামশাই জেঠিমার দিকে একটা চোখ কুঁচকে হাসলেন। জামাটা খুলতেই অনির চোখ বড় হয়ে গেল। জ্যাঠামশাইয়ের গেঞ্জিটা ছিঁড়ে ফেটে একাকার। দু'এক জায়গায় সেলাই করে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। পিসীমা বলেন গেঞ্জি সেলাই করে পরলে লক্ষ্মী চলে যায়। জ্যাঠামশাই কি করে ওটা পরেন?

জ্যাঠামশাই পায়ের ওপর পা দিয়ে বললেন, 'দিদির রান্না কোনদিন খাওনি তো, আহা, মাইরি তোমরা রাঁধতে জানো না।'

জেঠিমা খিঁচিয়ে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে, 'রান্না করার মত জিনিস কোনদিন এনেছ যে রাঁধবো? শুনলে গা জ্বলে যায়।'

হঠাৎ জ্যাঠামশাই বলে উঠলেন, 'যাও না, দিদিকে একটু সাহায্য করো। একা একা রাঁধছেন, তুই একটা পদ তৈরি করে নিজের কৃতিত্ব দেখাও।'

জেঠিমা হতচকিত হয়ে বোধ হয় রান্নাঘরের দিকে এগোচ্ছিলেন, এমন সময়

পিসীমার গলা ভেসে এল, 'কাউকে আসতে হবে না। রাস্তার কাপড়ে এ বাড়িতে কেউ রান্নাঘরে ঢোকে না। বাথরুমে জল আছে, বাচ্চাটাকে একবারে স্নান করিয়ে দিতে বল। ভদ্রলোকের মতন দেখতে হোক।'

কথাটা শুনে জেঠিমার মুখ বেঁকে যেতে দেখল অনি। জ্যাঠামশাই চট করে উঠে দাঁড়ালেন, 'সেই ভাল, যাও মন দিয়ে সাবান মেখে স্নান করে নাও। আমি বরং ছোঁড়াটার কাছ থেকে লেটেস্ট খবর নিই গে।'

জ্যাঠামশাইকে এদিক ওদিক তাকাতে দেখে অনি চট করে বাগানের ভিতরে চলে গেল গেল। ইদানীং ঝোপঝাড় বেশী হয়ে গেছে বলে সরিৎশেখর লোক লাগিয়ে বাগান সাফ করার কথা বলেন। লোক পাওয়া আজকাল মুশকিল বলেই এখনও পরিষ্কার হয়নি। অনি এই সুযোগটাকে কাজে লাগাল। জ্যাঠামশাইয়ের মুখোমুখি হতে ওর একদম ইচ্ছে হচ্ছে না। লোকটাকে অত্যন্ত বদ মনে হচ্ছে ওর।

খেতে বসে অবাক হয়ে গিয়েছিল অনি। একটা লোক এত ভাত খেতে পারে? একসঙ্গে খেতে চায়নি ও, পিসীমা তাগাদা দিয়ে স্নান করিয়ে বসিয়েছেন। বাচ্চাটার খাওয়া আগেই হয়ে গিয়েছিল। তাকে বড ঘরের মেঝেতে বিছানা করে ঘুম পাড়িয়ে আসা হয়েছে। পরিতোষ স্নান করে সরিৎশেখরের একখানা ধুতি লুঙ্গির মতন জড়িয়েছে। হেমলতা এতক্ষণ সেটা লক্ষ্য করেননি। অনির বারংবার তাকানো দেখে বুঝতে পারলেন, 'তুই বাবার ধুতি পরেছিস?'

পরিতোষ খেতে খেতে বলল, 'সিম্পল রান্না অথচ কি টেস্ট, আহা। হ্যাঁ, কি বললে? ধুতি? আমার পাজামার চেহারা দেখেছ? তুমি কোনদিন ও রকম পাজামা আমাকে পরতে দেখেছ? দিস ইজ লাইফ। বুঝলে!'

'খেয়ে উঠে ধুতি ছেড়ে রাখবি। একেই তোদের ঢুকতে দিয়েছি বলে ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি, তারপর যদি এ সব জানতে পারে—' কথাটা শেষ করলেন না হেমলতা।

পরিতোষ দিদির দিকে তাকাল, 'মাইরি দিদি, এটা কি মুসলমানদের তালাক যে ত্যাজ্যপুত্র বললাম আর সমস্ত সম্পর্ক চুকে গেল? তুমি বুকে হাত দিয়ে বল তো, ছেলেবেলার আমার কথা মনে পড়লে কষ্ট হয় না?'

হেমলতা একবার অনির দিকে তাকিয়ে বলব কি বলব না ভাবতে ভাবতে বলে ফেললেন, 'কিন্তু বাবা বলেন যে দুষ্ট ক্ষত হাতে হলে সেটা বাড়তে না দিয়ে যদি হাতটা কেটে ফেলতে হয় তাই ভাল, শরীরটা বাঁচে।'

অদ্ভুতভাবে হাসল পরিতোষ। তারপর বলল, 'আর একটু ভাত দেবে? কম পড়বে না তো!'

হেমলতা ভেতর থেকে ভাত এনে দিতে পরিতোষ বলল, 'ব্যাপারটা কি জানো,

তোমরা চিরকাল হাতটা কেটে ফেলার কথাই ভেবেছ, ওষুধ দিয়ে হাতটা সারিয়ে তোলার কোন চেষ্টাই করোনি। তুমি কি ভেবেছ আমি পাষাণ? আমার মনের মধ্যে তোমাদের কথা আসে না? আমরা সব ভুলে যেতে পারি, কিন্তু ছেলেবেলার কথা ভুলে যেতে পারি?'

হেমলতা বললেন, 'এ সব কথা এখন থাক।'

জ্যাঠামশাই আবার কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, জেঠিমা বলে উঠলেন, 'দিদি যখন বলছেন, তখন আর কথা বাড়াচ্ছ কেন?'

জেঠিমা স্নান করেছেন, কিন্তু সেই আগের কাপড়ই তাঁর পরনে। কথাটা সঙ্গে সঙ্গে যেন মেনে নিলেন জ্যাঠামশাই, 'ঠিক আছে, থাক। আমাকে আর একটু আমড়ার টক দাও।'

খাওয়াদাওয়ার পর অনি নিজের ঘরে চলে এল। এখন জ্যাঠামশাইকে অনেকটা জানা হয়ে গেছে। মুখ হাত ধোওয়ার সময় জ্যাঠামশাই বলেছিলেন যে ওঁরা হলদিবাড়িতে আছেন এখন। দাদু যে ট্রেনে শিলিগুড়ি থেকে আসবেন তাতেই ওঁদের উঠতে হবে যদি যেতে হয়। না হলে কাল সকালে ট্রেন আছে—রাতটা থেকে যেতে হয়। পিসীমা সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন, সে চিন্তা যেন ঘুণাক্ষরে মাথায় না আসে, বিকেলের অনেক আগেই ওদের চলে যেতে হবে।

কথাটা শোনার পর থেকে অনি ভাবছিল স্টেশনে যদি মুখোমুখি দেখা হয় তাহলে দাদু ওঁদের চিনতে পারবেন কি না। জ্যাঠামশাইয়ের চেহারা খারাপ হয়ে গেছে, দাড়ি রেখেছেন, তবু দাদু ঠিক চিনে ফেলবেন। কিন্তু তারপর কি হবে? বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনি এইসব ভাবছে, তখন দরজা খুলে পরিতোষ মাথা বাড়াল, 'বাঃ, বেশ ঘরটা তো!' অনি তড়াক করে উঠে দাঁড়াতেই পরিতোষ ঘরে ঢুকে চেয়ার টেনে বসল, 'পড়াশুনা কেমন হচ্ছে?'

কোন রকমে অনি বলল, 'ভাল।'

'খারাপ হবার কথা নয়। সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছ বাবা—আমার ছেলেটাকে দেখেছ? পেট পুরে খাবার দিতেই পারি না তো পড়াশুনা করাবো—সৎমা কেমন চীজ? শহরের মেয়ে তো?' অনির একটা পেনসিল টেবিল থেকে তুলে কানে সুড়সুড়ি দিতে দিতে জ্যাঠামশাই এমনভাবে কথা বলে যাচ্ছিল যে অনি ঠিক তাল রাখতে পারছিল না।

শেষের কথাটা না ধরে অনি বলল, 'সৎমা?'

জ্যাঠামশাই বলল, 'আরে তোমার বাবা আবার বিয়ে করেনি? আমি শালা চিন্তাই করতে পারি না, এত বড় ছেলে যার সে কি করে বিয়ে করে—তা বাবার

এই বউ তোমার সৎমা হল না ? তুমি কি বলে ডাক ?'

'ছোট মা।' কথাগুলো শুনতে অনির খুব খারাপ লাগছিল।

'ওই হল, বাচ্চা কাঁটালের আর এক নাম এঁচোড়। দেখতে শুনতে কেমন ?'

'ভাল।'

'তোমার জেঠিমার চেয়ে ভাল ?'

কোন রকমে অনি বলল, 'জানি না।'

'কি ফরসা ছিল এককালে, দেখলে মনে হত বেনারসী ল্যাংড়া খাচ্ছি। এখন অবশ্য না খেয়ে না খেয়ে আমসত্ত্ব হয়ে গিয়েছে—ছোটকা আসে না ?'

জ্যাঠামশাই কথা শুরু করেন যেভাবে শেষ সেভাবে করেন না। ছোটকা মানে প্রিয়তোষ এটা বুঝতে পারল অনি, 'না।'

'শালা এক নম্বরের বুদ্ধু। বাঙালী হয়ে পলিটিক্স বোঝে না। আরে আখের গোছাতে হবে বলেই যদি দল করবি তবে কংগ্রেস কর। আমার কাছে গিয়েছিল একদিন। তোমার কাছে টাকাপয়সা আছে ?' জ্যাঠামশাই ওর দিকে ফিরে চাইলেন।

অনি প্রথমে কথাটা ধরতে পারেনি, শেষে দ্রুত ঘাড় নাড়ল, 'না। ছোটকাকু এখন কোথায় ?'

'জানি না। তোমার জেঠিমার হাতে তেল-মুড়ি খেয়ে হাওয়া হয়ে গেল। বেশীক্ষণ রাখা রিস্কি—কে দেখে ফেলবে—ফাদারের কাছ থেকে টাকা নেয় না ? এখন তো সব কম্যুনিস্টরা দেখি ঝাণ্ডা নিয়ে মিছিল করে, পুলিস কিছু বলে না, ও শালা তাহলে অন্য কারণে পালিয়েছে, তাই না ?' কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন জ্যাঠামশাই। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দুবার আড়মোড়া ভেঙে বললেন, 'জব্বর খাওয়া হয়ে গেছে আজ। অনেক প্রাইভেট কথা বললাম, কাউকে বলিস না ভাই।'

উনি ঘর থেকে চলে যাবার পর অনির খেয়াল হল জ্যাঠামশাই ওকে ভাই বললেন। ও হেসে ফেলল, লোকটা যেন কি রকম। আচ্ছা, আখের গোছাতে কি লোকে কংগ্রেস করে ? আখের গোছানো মানে তো বড়লোক হওয়া। নতুন স্যার মোটেই বড়লোক নয়। তবে ?

যাবার সময় হেমলতা প্রায় তাড়িয়ে ছাড়লেন। সাবিত্রীর যেন যেতে কিছুতেই ইচ্ছে করছিল না। বার বার বলছিল, 'দিদি, আমি না হয় খোকাকে নিয়ে থেকে যাই। উনি দেখবেন, খোকাকে ফেলতে পারবেন না।'

হেমলতা কান দেননি সে কথায়। বলেছেন, সরিৎশেখর বাড়িতে থাকাকালীন

ওরা আসুক, উনি কিছু বলবেন না, কিন্তু ওঁর অনুপস্থিতিতে এদের থাকা চলবে না। অনি দেখছিল যাওয়ার সময় অনেকগুলো পোঁটলা হয়ে গিয়েছে। এগুলো পিসীমা দিয়েছেন, না ওঁরা জোর করে নিয়েছেন, বুঝতে পারছিল না। প্রায় দরজার কাছে গিয়ে পরিতোষ বলল, 'যাঃ, এক পেটি চা দাও।'

হেমলতা ইতস্তত করে বললেন, 'মহী এখনও চা পাঠায়নি।'

'এমন গুল মারো না! আমি দেখলাম খাটের তলায় দুটো পেটি পড়ে আছে। একটা নিচ্ছি।' বলে সটান ভিতরে গিয়ে একটা পাঁচ পাউণ্ডের পেটি বের করে আনল।

হেমলতা বললেন, 'সন্ধ্যে হয়ে আসছে। এবার—।'

পোঁটলাগুলো গুছিয়ে বেঁধে নিয়ে ওরা হেমলতাকে প্রণাম করল। সকালে ওঁদের প্রণাম করা হয়নি, অনি এবার চট করে প্রণামটা সেরে নিল। জ্যাঠা-মশাইকে করার সময় তিনি হঠাৎ এক হাতে ওকে জড়িয়ে ধরলেন, 'মাইরি দিদি, আমি শালা এক নম্বরের হারামী।'

হেমলতা বললেন, 'মুখ খারাপ না করে এবার এসো।'

'আসতে বলছ?' অনিকে ছেড়ে দিল পরিতোষ।

'না। আর হ্যাঁ, এই টাকাটা তোমার ছেলেকে মিষ্টি খেতে দিলাম। জন্মাবার পর ওকে প্রথম দেখলাম তো।' হঠাৎ হাতের মুঠো থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে সাবিত্রীর দিকে বাড়িয়ে ধরতেই সে সেটাকে হেমলতার বোঝার আগেই নিয়ে ব্লাউজের ভিতর ঢুকিয়ে ফেলল।

'মাইরি দিদি, তুমি নমস্য। জন্মাবার পর অনিকে ফাদার আংটি দিয়েছিল আর তুমি আমার ছেলেকে দশ টাকা দিলে। অবশ্য তাই বা কে দেয়।'

কথাটা শেষ করে পরিতোষ পুঁটলি নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। সাবিত্রী তার পিছনে বাচ্চাকে নিয়ে হাঁটছিল। অনি পিসীমার পাশে দাঁড়িয়ে ওদের যাওয়া দেখছিল। প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। গেটের বাইরে গিয়ে সাবিত্রী বাচ্চাটাকে নিয়ে একবার ঘুরে দাঁড়াল। অনি শুনল এতক্ষণে বাচ্চাটাকে দিয়ে জেঠিমা বলাতে পারল, 'টা—টা।'

হঠাৎ হেমলতা বললেন, 'অনিবাবা, দাদু এলে এদের আসার কথা তুমি বলে ফেলো না, বুঝলে?'

অবাক হয়ে অনি বলল, 'কেন?'

হেমলতা একটু অস্বস্তিতে বললেন, 'সারাদিন পরিশ্রমের পর একথা শুনলে ওঁর শরীর খারাপ হবে। যা বলার আমি বলব।'

'কিন্তু দাদু যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন ?'

হাসলেন হেমলতা, 'না করবেন না।'

কিন্তু সেই রাত্রে, সরিৎশেখর আসার অনেক পরে, অনি যখন বুক তুরুতুরু হয়ে বসে আছে তখন দাদুর চিৎকার শুনতে পেল। তাড়াতাড়ি পা টিপে টিপে দাদুর শোওয়ার ঘরের দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল ও। সরিৎশেখর বলছিলেন, 'তুমি অন্যায় করেছ। কেন তাকে ঢুকতে দিলে ?' পিসীমা চাপা গলায় কি যেন বললেন। 'তুমি জানো সে চারধারে বলে বেড়াচ্ছে ব্যাঙ্কে আমার নামে লাখ টাকা আছে। আমি নাকি চামার।' সরিৎশেখর আক্ষেপের গলায় বললেন।

পিসীমার গলা শুনতে পেল অনি, 'আমি বলে দিয়েছি যেন এ বাড়িতে সে আর কোনদিন না আসে। আপনি এ নিয়ে আর চিন্তা করবেন না।'

'তুমি ভীষণ অন্যায় করেছ ঐ অপদার্থটাকে বাড়িতে ঢুকতে দিয়ে। আঃ, আমার রাত্রে ঘুম হবে না।' কিছুক্ষণ চুপচাপ। অনি চলে আসবে ভাবছে, এমন সময় শুনতে পেল দাদু জিজ্ঞাসা করছেন, 'বাচ্চাটা কার মত দেখতে হয়েছে ?'

'মায়ের আদল আসে।' পিসীমা বললেন, 'মা-মুখো বাচ্চারা সুখী হয়।'

সরিৎশেখরের গলার আওয়াজটা অন্য রকম ঠেকল অনির কাছে।

আজ ইন্টারস্কুল ক্রিকেট ফাইন্যালে জেলা স্কুল নয় রানে এফ ডি আইকে হারিয়েছে। স্কুলের উপর-ক্লাসের ছেলেরা বিজয়-উল্লাস চলার সময় হেডমাস্টার মশাইকে ধরেছিল যাতে আগামী কাল স্কুল ছুটি থাকে। সেটা পাওয়া গেল কিনা এখনও জানা যায়নি। তাই স্কুলের সামনে বেশ কিছু ছাত্রের জটলা হয়েছে। মাঠের একপাশে গোলপোস্টের গা ঘেঁষে নতুন স্যারের সঙ্গে অনিরা বসে ছিল। এমন সময় এফ ডি আই স্কুলের নবীনবাবু ওদের কাছে এলেন। নবীনবাবুকে এর আগে দেখেছে অনি। ভীষণ নস্যি নেন আর কংগ্রেস করেন। ছাব্বিশে জানুয়ারীতে কংগ্রেসের প্রসেশনে নবীনবাবুর হাতে পতাকা ছিল। এফ ডি আই-এর ছেলেরা পোশাক পালটে চুপচাপই চলে গেল। ইন্টারস্কুলের যত খেলা হয় প্রতিটিতেই প্রায় ওরা জেলা স্কুলকে হারায়, শুধু এই ক্রিকেটটা বাদে। আজকে জেলা স্কুলের অরুণ ব্যানার্জী দারুণ খেলেছে, সামনেবার ও থাকছে না, তখন দেখা যাবে—এইসব বলতে বলতে ওরা চুপচাপই চলে গেল।

নবীনবাবু রুমালে নাক মুছতে মুছতে নতুন স্যারকে বললেন, 'নিশীথ, তোমার সঙ্গে একটু আলোচনা ছিল।' নবীনবাবুকে দেখে অনির খুব হাসি পাচ্ছিল।

খেলা চলার সময় কোন বল বাউণ্ডারী পেরিয়ে গেলে নিজের স্কুলের ছেলেদের গালাগালি দিয়ে ভূত তাগাচ্ছিলেন। অনিদের স্কুলের বড়রা সেই গালাগালিগুলো আওড়ে যাচ্ছিল সঙ্গে সঙ্গে।

নতুন স্যার বললেন, 'আরে বসুন না এখানে, এখনও তেমন ঠাণ্ডা নেই।'

নবীনবাবু একটু ইতস্তত করে বললেন, 'ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে তো, হিমটিম লাগলে—তাছাড়া—' বলে ওদের দিকে তাকালেন নবীনবাবু।

নতুন স্যার বললেন, 'খুব ব্যক্তিগত কথা?'

নবীনবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, 'রাজনীতির ব্যাপার।'

নতুন স্যার হাসলেন, 'ও, তাহলে নির্দ্বিধায় বলতে পারেন। এরা আমার খুব অনুগত ছাত্র। তেমন গুরুতর ব্যাপার নয় আশা করি!'

নবীনবাবু এবার ধুতি সামলে ঘাসের ওপর বসলেন, 'এবারও আমরা তোমাদের কাছে হেরে গেলাম। ফুটবলে দেখে নেব।'

নতুন স্যার হাসলেন। অনির খুব ইচ্ছে করছিল ফুটবল নিয়ে কথা হোক। ওঁদের স্কুলের দুজন ছেলে আজ আট বছর ধরে নাকি ফুটবল খেলার জন্য পাস করতে পারছে না। নবীনবাবু বললেন, 'ছাব্বিশে জানুয়ারীর পর একদম হইচই হল না, কেমন যেন আলুনি-আলুনি লাগছে।'

নতুন স্যার বললেন, 'হইচই করার মত লোক নেই, আর ঘটনাটাও কোন ভদ্রলোক সমর্থন করেন নি।'

নবীনবাবু বললেন, 'কিন্তু ওদের পার্টির সভ্যদের ধরে পুলিস প্যাঁদালো, এ তো সবাই চোখের ওপর দেখেছে।'

নতুন স্যার বললেন, 'ওরা পার্টির সভ্য নয় নিশ্চয়ই। কোন পার্টি এই ধরনের হঠকারী কাজ করবে না। আমরা তো জানি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার পর ওরা এখনও অগোছালো।'

নবীনবাবু বললেন, 'তাহলে এ কাজ করল কে?'

নতুন স্যার বললেন, 'নিশ্চয়ই কিছু মাথাগরম ছেলে। পুলিস নাকি বলেছে, সবাই শহরের নয়। এসব নিয়ে ভাববেন না।'

নবীনবাবু বললেন, 'আমি ভাবতে পারি না নিশীথ, এত কষ্ট করে এত রক্ত দিয়ে কংগ্রেস স্বাধীনতা আনলো, আর সেদিনের কয়েকটা পুঁচকে ছোঁড়া তাকে অপবিত্র করে দিল! এই প্রতিদান?'

হঠাৎ নতুন স্যারের গলার স্বর পালটে গেল, 'এ কথাই তো দেশের মানুষকে বোঝাতে হবে। গান্ধীজীকে হত্যা করতে এ দেশের মানুষের হাত তো কাঁপেনি।

কিন্তু সেটা কজনের হাত ? যীশুখ্রীষ্ট নিহত না হলে পৃথিবীর কয়েক কোটি মানুষের চোখ খুলত না। আমরা সেই কথাই সবাইকে বোঝাব।'

নবীনবাবু সামনে ঝুঁকে যেন অনিরা শুনতে না পায় এমন গলায় বললেন, 'কাল শশধরবাবুর সঙ্গে দেখা হল। ঐ ঘটনাটাকে কাজে লাগিয়ে লাল পার্টির বারোটা বাজাতে প্ল্যান হচ্ছে।'

নতুন স্যার বললেন, 'সে কি! এটা তো ওদের কাজ নয়, আমরা জানি।'

নবীনবাবু বললেন, 'জানাটা আর জানানোটা এক নয়। শশধরবাবু বললেন এই সুযোগে ওদের মুখে কালি বোলালে ইলেকশনে ওরা মাথা তুলতে পারবে না। নাথিং ইজ আনফেয়ার ইন ওয়ার।'

নতুন স্যার বললেন, 'ইলেকশন! কবে ?'

নবীনবাবু কৌটো খুলে আবার নস্যি তুললেন, 'তা জানি না, তবে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে নির্বাচন তো অবশ্যম্ভাবী।'

হঠাৎ নতুন স্যার বললেন, 'যারা সেদিন কাজটা করল তাদের একজনকে আমি চিনি। খুব ভাল কবিতা লিখত। আর আশ্চর্যের ব্যাপার, ও যে কোন রাজনীতিতে বিশ্বাস করে আমি কোনদিন টের পাইনি।'

নবীনবাবু রুমালে নাক মুছতে মুছতে বললেন, 'শশধরবাবু আজ তোমাকে একবার দেখা করতে বলেছেন।'

নতুন স্যার বললেন, 'বাড়িতে থাকবেন ?'

নবীনবাবু বললেন, 'না-না। তোমাদের পাড়ায় বিরাম করের বাড়িতে আজ সন্ধ্যেবেলায় উনি আসবেন, সেখানেই যেতে বলেছেন। বিরামবাবুকে চেন ?'

'হ্যাঁ, ওঁর স্ত্রীর সঙ্গেও আলাপ আছে।'

'খুব সুন্দরী মহিলা, না ?'

নবীনবাবু প্রশ্নটা করতে অনি দেখল নতুন স্যার চট করে ওদের দিকে একবার তাকিয়ে নিলেন। তারপর একটু অস্বস্তি-মাখানো গলায় বললেন, 'ওই মহিলারা যে রকম হন আর কি।'

নবীনবাবু হাসলেন, 'একটু হাতে রেখো, মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনে আমাদের ক্যাণ্ডিডেট হচ্ছেন। ইনকিলাব পার্টিদের কে হচ্ছে জানো ?'

নতুন স্যার অন্যমনস্ক হয়ে ঘাড় নাড়লেন। কথাগুলো শুনতে শুনতে অনি ফস করে বলে বসল, 'আচ্ছা, ইনকিলাব জিন্দাবাদ মানে কি ?'

সবাই ওর দিকে অবাক হয়ে তাকাতে নতুন স্যার বললেন, 'হঠাৎ তোমার মাথায় এই প্রশ্নটা এল কেন ?'

অনি আস্তে আস্তে বলল, 'বন্দেমাতরম্ শব্দটার মানে তো আমরা জানি, কিন্তু ইনকিলাব জিন্দাবাদ মানে তো জানি না। আচ্ছা, এখন থাক, আমি পরে জিজ্ঞাসা করব।'

কথা বলার ধরন দেখে সবাই হো হো করে হেসে উঠতে অনি মাথা নিচু করল। হঠাৎ হঠাৎ মুখ থেকে নিজের অজান্তে কথা বেরিয়ে যায়। নতুন স্যার বললেন, 'পরে কেন? আচ্ছা, তোমরা যে সব হাসছ তোমাদের কেউ মানেটা বল দেখি?'

অনি চোখ তুলে দেখল, ওরা কেউ কথা বলছে না, প্রশ্নটা শুনে নিজেদের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। হঠাৎ নবীনবাবু ফিসফিস করে বলে উঠলেন, 'আমাকে জিজ্ঞাসা করো না। আমি চলি।' নতুন স্যার কিছু বলার আগেই উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

'আরে আপনি যাচ্ছেন কোথায়? একসঙ্গে শশধরবাবুর কাছে যাব ভেবেছিলাম।' নতুন স্যার বলে উঠলেন।

'শশধরবাবু? বিরাম করের বাড়িতে যাবে? তা হলে অবশ্য—।' একটু যেন খুশী হলেন নবীনবাবু, 'আমার সঙ্গে আলাপ নেই, এই সুযোগে আলাপ হয়ে যাবে, চল।'

নতুন স্যার বললেন, 'আরে এখনও তো সন্ধ্যে হয়নি।'

নবীনবাবু বললেন, 'বয়স অল্প তো, ঠাওর পাও না। এই সন্ধ্যে হয়নি মনে হওয়া সময়টা খুব ডেঞ্জারাস। চোরা হিম কখন মাথার ভেতর ঢুকে গিয়ে চেপে বসবে টের পাবে না। আমার আবার সাইনাসের ট্রাবল আছে। সাইনাস কি বংশগত রোগ?'

নতুন স্যার উঠতে উঠতে বললেন, 'জানি না। তাহলে আপনার পক্ষে নস্যি নেওয়া তো উচিত হচ্ছে না।'

ওঁকে উঠতে দেখে অনিরাও উঠে পড়ল। এখন সন্ধ্যে হয়নি বটে, কিন্তু পশ্চিমের আকাশটার লাল আভাটা কেটে গেছে। স্কুলের বিশাল মাঠটা জুড়ে অদ্ভুত শান্ত এক ছায়া ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে।

নতুন স্যার বললেন, 'চল, হাঁটতে হাঁটতে কথা বলা যাক।'

নবীনবাবুর কথাটা মনঃপূত হল না, 'না না, ওরা আবার হাঁটবে কেন, ছাত্রদের পড়ার সময় হয়ে গেছে। এখন তোমাদের কর্তব্য মন দিয়ে পড়াশুনা করা, রাজনৈতিক আলোচনা করার জন্য পরে অনেক সময় আছে। সন্ধ্যে হয়ে আসছে, এখন বাবারা দৌড়ে বাড়ি চলে যাও।'

নতুন স্যার হেসে অনির কাঁধে হাত রাখলেন, 'বাড়ি যেতে হলে ওদের বড়

করি, তাই ওরা ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট করে দিয়েছে।' তপুপিসী বোঝালেন। 'তা হ্যাঁরে, কার কাছে শুনলি আমি এখানে আছি ?'

অনি বলল, 'শুনলাম পিসীমা বলছিল।'

তপুপিসী বলল, 'বড়দি, মেসোমশাই ভাল আছেন ?' অনি ঘাড় নাড়ল।

'কেউ তোকে পাঠিয়েছে আমার কাছে ?' তপুপিসী চোখ বড় বড় করল।

ঘাড় নাড়ল অনি, 'না।'

এই প্রথম অনির মনে হল, ও যে জন্য তপুপিসীর কাছে এসেছে সেটা বলতে ওর কেমন সঙ্কোচ হচ্ছে। ছোটকাকুর কোন খবর তপুপিসীর কাছে পেতে হলে যে সম্পর্কটা থাকা দরকার সেটা আছে কি ? অনির মনে পড়ল সেই চিঠিটার কথা, যার অর্থ তখন সে বুঝতে পারেনি কিন্তু তপুপিসীর জন্য কষ্ট হয়েছিল। এই তো তপুপিসী বাড়ি-ঘর ছেড়ে একা একা এখানে আছেন, কেন, কি জন্যে ?

তপুপিসী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন এসেছিস বল না রে ?'

এবার অনি ঠিক করল, ও বলেই ফেলবে। মাথা নিচু করে ও বলল, 'আমি একটা কথার মানে বুঝতে পারি না। ছোটকাকু থাকলে আমি জিজ্ঞাসা করতাম। তুমি জানো কোথায় ছোটকাকু আছে ?'

'আমি জানবো এই ধারণা তোর কি করে হল ?' যেন একটা গভীর কুয়োর ভেতর থেকে কথা বলছে তপুপিসী।

অনি সত্যি কথা বলে ফেলল, 'আমি তোমার চিঠিটা পড়েছিলাম, পুলিস সেটা পায়নি। ছোটকাকু চলে যাবার পর পুলিস এসে ওটা পেলে তোমাকে ধরত। দাদুর আলমারিতে চিঠিটা রয়েছে, তুমি যদি চাও এনে দিতে পারি।'

তপুপিসী বলল, 'কি কথার মানে তুই বুঝতে পারিস না অনি ?'

'বন্দেমাতরম আর ইনকিলাব জিন্দাবাদ, ছোটকাকু কেন দ্বিতীয়টাকে বেছে নিল ? কোনটা বড় ?' অনি বলল।

কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে তপুপিসী বলল, 'তুই এত ছোট ছেলে, তোর এ সবে কি দরকার ! এ বড় শক্ত জিনিস, ভীষণ নেশা। মদের চেয়েও খারাপ নেশা। এ নেশা সব খায়। আমরা সাধারণ মানুষ, আমাদের এই নেশা থেকে অনেক দূরে থাকা উচিত।'

ঠিক সেই সময় ঢং ঢং করে পেটা ঘড়িতে ভিজিটরদের যাবার নির্দেশ বাজল। অনি দেখল গার্জেনরা সব গেটের দিকে চলে যাচ্ছেন। তপুপিসী হঠাৎ কেমন কেমন গলায় বলে উঠলেন, 'অনি, তার খবর কখনও যদি পাস আমাকে বলে যাবি ? আমায় ছুঁয়ে বলে যা, বলে যাবি তো ?'

কে যেন এসে খবর দিয়ে গেল মহীতোষ খুব অসুস্থ, বিকেলের দিকে রোজই জ্বর আসছে। জলপাইগুড়ি থেকে স্বর্গছেঁড়ায় সরিৎশেখর পোস্ট অফিস মারফৎ চিঠিপত্র খুব একটা পাঠাতেন না। চার ঘণ্টার পথ কোন কোন সময় চার দিন নিয়ে নিত ডাকবিভাগ। খেয়েদেয়ে দুপুর নাগাদ কিং সাহেবের ঘাটে গিয়ে দাঁড়ালেই হল, প্রচুর লোক স্বর্গছেঁড়া, বীরপাড়া, বানারহাটে যাচ্ছে। তাদেরই কারো হাতে চিঠি দিয়ে দিতেন তিনি, মহীতোষ সন্ধ্যে নাগাদ পেয়ে যেতেন। যাঁরা স্বর্গছেঁড়ার লোক নন অথচ মহীতোষকে চেনেন তাঁরা যাবার সময় স্বর্গছেঁড়ার চৌমাথার পেট্রল-পাম্পে চিঠি রেখে যেতেন। চিঠি দেবার না থাকলেও সরিৎশেখর দুপুরে কিং সাহেবের ঘাটে যেতেন। ওখানে গেলে পুরো ডুয়ার্সের হালফিল খবর পাওয়া যায়। কোর্ট-কাছারি করতে অজস্র মানুষ আসছেন ওদিকে মাল-বাজার নাগরাকাটা আর এদিকে ফালাকাটা-হাসিমারা থেকে। অনেকেই সরিৎশেখরকে চেনেন, দেখা হলে নমস্কার করে খবরাখবর নেন। তাছাড়া টিম্বার মার্চেন্টরা তো আছেনই, ওঁদের জলপাইগুড়িতে না এসে উপায় নেই। তা আজ বিকেলে ফেরার সময় এই খবরটা পেলেন। মহীতোষ যে অসুস্থ এ কথা আগে কেউ বলেনি, কেউ চিঠি লেখেনি। বিকেলের দিকে জ্বর আসছে এটা ভাল কথা নয়। তিস্তার পাশ ঘেঁষে যে কাঁচা পথটা দিয়ে রোজ হাঁটাচলা করতেন সেটার ওপর মাটি পড়ছে। পি. ডব্লু. ডি. অফিসের সামনে দিয়ে ঘুরে আসতে হল।

অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিলেন সরিৎশেখর। আজকাল লাঠি আর পা কেমন মিলেমিশে পথ মেপে নেয়। লাস্ট বাস বানিশ থেকে ছাড়ে বিকেল ছটায়। এখনও ঘণ্টা দেড়েক সময় আছে, অনিকে নিয়ে রওনা হলে রাত নটার মধ্যে স্বর্গছেঁড়ায় পৌঁছে যাওয়া যায়। তেমন বোধ করলে মহীতোষকে এখানে নিয়ে এসে চিকিৎসা করতে হবে। হঠাৎ তাঁর মনে হল আজ অবধি তাঁকে শুধুই দায়িত্বপালন করে যেতে হচ্ছে। চাকরিতে যখন ছিলেন তখন তো বটেই, আজ নিঃসঙ্গ অর্থহীন অবসর-জীবনেও এইসব সাংসারিক চিন্তা তাঁকে ভাবতে বাধ্য করে। সব ছেড়েছুড়ে একা একা বেঁচে থাকার সুখ পাওয়া আর হল না। অথচ হেম আজকাল প্রায়ই বলে থাকে যে তিনি নাকি অত্যন্ত নির্দয়, পাষাণ। তাঁর কথাবার্তা অত্যন্ত ঠোঁটকাটা এবং পরবর্তী প্রতিক্রিয়া না ভেবে বলা। হেম এসব কথা আগে বলতে সাহস পেত না, ইদানীং বলে থাকে। সরিৎশেখরের মাঝে মাঝে মনে হয়, মেয়ের মাথাটায়

কিছু গোলমাল হয়েছে। কারণ রাতারাতি তাঁর সম্পর্কে যে ভয়টা সকলের ছিল সেটা হেম খোয়ালো কি করে। মাঝে মাঝে এমন উপদেশ দেয় যে বন্ধুর মত মনে হয়, খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে গোলমাল করলে মায়ের মত ধমকে ওঠে, আবার বাবার সংসারে পড়ে থেকে জীবনটা নষ্ট হল বলে যখন আক্ষেপ করে তখন চট করে বড় বউএর কথা মনে পড়ে যায়। এ এক অদ্ভুত খেলা মেয়ের সঙ্গে, হেমলতাও মৌজ হয়ে খেলে যায়। অনির সঙ্গে কথাবার্তা কম হয়। পড়াশুনা খারাপ করছে না, করলে রেজাল্ট ভাল হতো না। তাঁর কড়া নির্দেশ আছে যেখানেই থাকো সন্ধ্যের মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে। সকালে অঙ্কের মাস্টার পড়িয়ে যায় অনিকে, মহীতোষ তার টাকা দিচ্ছে। কিন্তু বাজারদর যে ভাবে বাড়ছে সংসারের খরচ সামলানো মুশকিল হয়ে পড়ছে তাঁর। ফলে হেমলতার জমা-টাকায় হাত দিতে হয়। মনে মনে ভীষণ কুণ্ঠার মধ্যে আছেন তিনি।

প্রতিজ্ঞা করেছিলেন স্বর্গছেঁড়ায় ফিরে যাবেন না আর। জীবনের সব প্রতিজ্ঞাই কি রাখতে পারা যায়? দ্রুত পা চালালেন সরিৎশেখর। হাসপাতাল পাড়া থেকে দুটো সাইকেল-রিকশা রেস দিয়ে আসছিল কোর্টের দিকে। মোড় ঘোরার সময় এ ওকে ডিঙ্গিয়ে যেতে যেতে পরস্পরকে ছুঁয়ে ফেলতেই ঘটে গেল ব্যাপারটা। সরিৎশেখর দেখলেন রিকশাটা দ্রুত তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। কিছু বোঝার আগেই হাঁটুর ওপর প্রচণ্ড একটা আঘাত তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দিল না। প্রায় মুখথুবড়ে পড়ে গেলেন সরিৎশেখর। হইহই করে লোকজন ছুটে এল চারধার থেকে। রিকশা রাস্তার একপাশে কাত হয়ে উলটে আছে। রিকশাওয়ালা ছোকরাটা মাটিতে শুয়ে। ওরা যখন সরিৎশেখরকে তুলে ধরল তখন তাঁর চোখে অন্ধকার, চশমা নেই, লাঠিটা ছিটকে গেছে হাত থেকে। মাজাভাঙা লাউডগার মত হিলহিল করছে শরীর, ছেড়ে দিলেই ধুপ করে পড়ে যাবেন, বাঁ পা-টা যেন তাঁর শরীরে নেই। আর তারপরেই বেদনাটা অনুভব করলেন তিনি, যেন একটা ধারালো করাত দিয়ে কেউ তাঁর পা কেটে দিচ্ছে। ছেলেরা অনেকেই সরিৎশেখরকে চিনতো, দাঁড়িয়ে থাকা অন্য রিকশাটায় ওরা ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। ধাক্কা লাগার পর সেটার কিছু হয়নি, এমন কি রিকশাওয়ালারাও চুপচাপ ভদ্রলোকের মত দাঁড়িয়ে ছিল।

অন্ধকারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অনি বাড়ি ফিরে আসতো। সূর্য ডুবে গেলে যে ছায়াটা চারধার জুড়ে থাকে সেটা মন-কেমন করার। কারণ একটু বাদেই দৌড়তে হবে, পিসীমা ঠাকুরঘর থেকে সন্ধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসার আগেই কল-তলায় পৌঁছে যেতে হবে। এই একটি ব্যাপারে সরিৎশেখর দারুণ কড়া। রাত

হয়ে গেলে কি হবে অনি অনুমান করতে পারে।

আজ অবশ্য সেরকম কোন সমস্যা তার নেই। ছুটির পর বাড়ি এসে বেরুতে যাবে এমন সময় শচীন আর তপন এসে হাজির হল। শচীন ওদের ক্লাসের গোল-গাল মার্কা ভাল ছেলে, ওর বাবার দুটো চা-বাগানে শেয়ার আছে। শচীন তপনকে নিয়ে এসেছে অনিকে নেমন্তন্ন করতে। স্কুলে বললে হবে না বলে বাড়ি বয়ে এসেছে, তার দিদির বিয়ে।

ভেতরের বারান্দায় চেয়ার পাতা ছিল, সেখানে ওদের বসিয়ে অনি পিসীমাকে ডেকে আনল। দাদু বাড়িতে নেই, নিশ্চয়ই কিং সাহেবের ঘাটে গিয়েছেন। অনির বন্ধুরা খুব কমই বাড়িতে আসে, পিসীমা তড়িঘড়ি দেখতে এলেন। আজকাল পিসীমা বাড়িতে শেমিজ পরেন না, কেমন যেন হয়ে গেছেন। কিছুতেই খেয়াল থাকে না।

হেমলতাকে দেখে অনির বন্ধুরা উঠে দাঁড়াল। ফুটফুটে দুটো ছেলেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হেমলতা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'বসো বসো, দাঁড়াতে হবে না, তোমরা তো সব অনির বন্ধু? তা আমাদের বাড়িতে আসো না কেন? কি নাম তোমাদের?'

অনির খুব মজা লাগছিল, পিসীমা যখন কথা বলেন তখন যেন থামতে চান না। ওর বন্ধুরা বেশ হকচকিয়ে গেছে, কোন্ উত্তরটা দেবে বুঝতে পারছে না। অনি বলল, 'পিসীমা, এ হচ্ছে তপন, খুব ভাল গান গায় আর ও—।'

অনিকে থামিয়ে হেমলতা বললেন, 'তপন কি?'

তপন এবার চটপট বলল, 'মিত্র।' বলে এগিয়ে এসে হেমলতাকে প্রণাম করল।

হেমলতা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'বেঁচে থাক, বাবা। মিত্তির হল কুলীন কায়েত।'

অনি বলল, 'আর এ হচ্ছে আমাদের ক্লাসের গুড বয়। ওর দিদির বিয়েতে নেমন্তন্ন করতে এসেছে।'

হেমলতা বললেন, 'কি নাম তোমার, বাবা?'

'আমার নাম শচীন রায়।'

শচীন এগিয়ে গেল প্রণাম করতে। কিন্তু বেচারা নিচু হতে না হতেই হেমলতা ধড়মড় করে কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন, 'না না, থাক থাক, প্রণাম করতে হবে না।' শচীন তো বটেই, অনিও খুব অবাক হয়ে গেল পিসীমার এ রকম ব্যবহারে। একটু সামলে নিয়ে হেমলতা বললেন, 'বামুনের ছেলে তুমি—।'

কথা শেষ করার আগেই অবাক গলায় শচীন বলল, 'না না, আমরা বৈদ্য।'

হেমলতা তাই শুনে দোনোমনা হয়ে বললেন, 'একই হল। বক্তিরাও তো এক ধরনের বামুন। তোমরা সব বসে গল্প কর।' হেমলতা আর দাঁড়ালেন না। উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে আর একবার ওদের দেখে গেলেন।

শচীন বলল, 'তোর পিসীমা খুব সেকেলে, না রে ?'

অনি বলল, 'কই, না তো ?'

তপন বলল, 'যাঃ। আমি প্রণাম করলাম কিছু হল না। ও প্রণাম করতেই বামুন-টামুন বের করে ফেললেন।'

শচীন বলিল, 'মিত্ররা তো কায়েত সবাই জানে। আগেকার লোকেরা বামুনদের শুধু সম্মান দিত। তোর পিসীমার কথা বাড়িতে গিয়ে বলতে হবে।'

তপন গম্ভীর গলায় বলল, 'স্বাধীনতা এলেও আমরা যে কত পরাধীন তা তোর পিসীমাকে দেখলে বোঝা যায় অনি।'

এসব কথা শুনতে অনির একদম ভাল লাগছিল না। পিসীমা এমন কাণ্ড করবেন ও ভাবতে পারেনি। বক্তি না বামুন না জেনেই প্রণাম নিলেন না, বন্ধুদের কাছে ওই খবরটা ওরা নিশ্চয়ই ছড়িয়ে দেবে। খুব খারাপ লাগছিল ওর। এমন সময় রান্নাঘর থেকে হেমলতা চাপা গলায় তাকে ডাকলেন। হেমলতা এইভাবে তাকে ডাকেন না, অন্য সময় তাঁর চিৎকার শুনে সরিৎশেখর অবধি বিরক্ত হয়ে ধমক দেন, 'কি কাকের মত চেঁচাচ্ছ ?'

চটপট হেমলতা জবাব দিতেন, 'কি করব, জন্মাবার সময় তো কেউ মধু দেননি।' তা এখন এই যে হেলমতা ওকে ডাকছেন, ওঁকে মোটেই কর্কশ মনে হচ্ছে না। অনি উঠে রান্নাঘরে এল।

হেমলতা প্লেট সাজিয়ে বসেছিলেন। তিলের নাড়ু, নারকোলের নাড়ু আর মোটা পাকা কলা। হেমলতা বললেন, 'হ্যাঁরে, ও আবার এসব খাবে-টাবে তো ! নাহলে বল ছুটো লুচি ভেজে দিই।'

অনি বলল, 'কে খাবে না, কার কথা বলছ ?'

হেমলতা বললেন, 'ঐ যে, ফরসা মতন—।'

অনি বলল, 'দুজনেই তো ফরসা। তপন—?

হেমলতা দ্রুত ঘাড় নাড়লেন, 'না না, যে প্রণাম করতে আসছিল—।'

'ও, শচীনের কথা বলছ ! তুমি কিন্তু ওকে প্রণাম না করতে দিয়ে খুব অন্যায় করেছ। আমার বন্ধুরা শুনলে ক্ষ্যাপাবে।' অনি সোজাসুজি বলে ফেলল।

হেমলতা বলে উঠলেন, 'না বাবা, প্রণাম করতে হবে না। তা ও কি খাবে এসব ?'

'খাবে না কেন ?' অনি দুটো প্লেট হাতে নিয়ে যেতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, 'একটাতে বেশী দিয়েছ কেন অত ?'

হেমলতা হাসলেন, 'বেশী কোথায় ? ওটা ওকে দিবি।'

অনি বলল, 'কেন ? দুজনকেই সমান দাও। তপন কি দোষ করল ? একেই প্রণাম নেবার সময় অমন করলে, খাবার সময় যদি তপনকে কম দাও তো ও ছেড়ে কথা বলবে ?'

হেমলতা যেন অনিচ্ছায় দুটো প্লেটের খাবার সমান করতে চেষ্টা করলেন, 'হ্যাঁরে ছেলেরা খুব শান্ত, না রে ?'

'কোন্ ছেলেটা ?' অনির হঠাৎ মনে হল পিসীমাকে যেন অন্য রকম লাগছে। এমন ভঙ্গিতে পিসীমাকে কথা বলতে ও কোনদিন ছাখেনি।

'ওই যে, বদ্যিব্রাহ্মণ—।'

'ওঃ', অনি প্রায় খিঁচিয়ে উঠল, 'তুমি বার বার ওই যে ওই যে করছ কেন ? শচীন নামটা বলতে পারছ না ?'

হেমলতা কিছু বললেন না। অনি খাবার নিয়ে চলে গেলে একা রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। তার কোন ছবি নেই, মুখ মনে নেই, এই শরীরে কোন চিহ্ন সে একে যেতে পারেনি, কারণ শরীরটা তখন তৈরি হয়নি। সে শুধু বেঁচে আছে হেমলতার কাছে এটা নাম হয়ে, বুকের মধ্যে একটা নাম জপের মন্ত্রের মত অবিরত ঘুরেফিরে আসে। সে-মানুষকে তিনি মনে করতে পারেন না, শুনেছেন বড সুন্দর ছিল লোকটা, খুব ফরসা। তারপর এতদিন ধরে নামটাকে সম্বল করে কল্পনায় চেহারাটাকে তৈরি করে নিজের সঙ্গে খেলে খেলে যাওয়া। আজ এতদিন বাদে সেই নামের একটি মানুষকে তিনি প্রথম দেখলেন। ফর্সা সুন্দর চেহারার একটি কিশোর। হোক কিশোর, নামটা শুনে বুকের মধ্যে লোহার মুঠোয় কে দম টিপে ধরেছিল। এ নামের মানুষের কাছে কি করে তিনি প্রণাম নেবেন ?

হেমলতা চুপচাপ একা একা কাঁদতে লাগলেন। যৌবনের শুরুতে যে মানুষটা তাঁকে কুমারী রেখে চলে গিয়েছিল স্বার্থপরের মত, আজ এতদিন পরে তার নামটার সঙ্গে মিলিয়ে একটা ছবি পেয়ে গিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

সরিৎশেখরের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে তপন আর শচীন চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, অনি যেন অবশ্যই যায়, ওর দাদুকে যেন অনি বলে যে ওরা এতক্ষণ বসে ছিল। জলপাইগুড়িতে তখন একটা অদ্ভুত নিয়ম চালু ছিল। কোন বিবাহ-অনুষ্ঠানে পত্র দিয়ে অথবা মুখে নিমন্ত্রণ করলেই চলবে না, অনুষ্ঠানের দিন

ঘনিষ্ঠদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে আসতে হবে। এ রকম অনেকবার হয়েছে, এই সামান্য ত্রুটির জন্য বিবাহ-অনুষ্ঠান ফাঁকা হয়ে গেছে, বাড়িতে বলা হয়নি বলে অনেকেই আসেননি।

শচীনরা চলে গেলে অনি চুপচাপ গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। এখন খেলার মাঠে গিয়ে কোন লাভ নেই। পিসীমা আজ ওরকম করছিলেন কেন? শচীনকে নাম ধরে ডাকছিলেন না পর্যন্ত। হঠাৎ ওর খেয়াল হল পিসীমার বরের নাম ছিল শচীন। দাদু একদিন সে-সব গল্প বলেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনি ঘুরে দাঁড়াল। এখন ও বুঝতে পেরে গেছে কেন শচীনকে উনি প্রণাম করতে দেননি। ইদানীং ও পিসীমার সঙ্গে ঠাট্টাতামাশা করে, বয়স হয়ে যাবার জন্যে বোধ হয় পিসীমা ওকে প্রশ্রয় দেন। এরকম একটা ব্যাপার আবিষ্কার করে অনি এই নিয়ে একটু মজা করবে বলে হাঁটতে যেতেই পেছন থেকে একজন তাকে ডেকে উঠল। অনি ফিরে দেখল, ওদের পাড়ার একটি বড ছেলে ওকে ডাকছে, 'এই খোকা, তোমার নাম অনি তো?'

অনি ঘাড় নাড়ল।

'তাড়াতাড়ি বাড়িতে খবর দাও, তোমার দাদুর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।' ছেলেটি গেটের কাছে এসে দাঁড়াল।

দাদুর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? অনি হতভম্বের মত তাকাল। কি করতে হবে কি বলতে হবে বুঝতে পারছিল না। ছেলেটি আবার বলল, 'দাঁড়িয়ে থেকো না, যাও। খুব খারাপ কিছু না, পায়ে চোট লেগেছে বোধ হয়, ভয়ের কিছু নেই।'

দুর্ঘটনা ঘটে গেছে অথচ ভয়ের কিছু নেই—এ কথা লোকে চট করে বিশ্বাস করতে চায় না। তা ছাড়া প্রিয়জনের দুর্ঘটনা মানেই একটা মারাত্মক ব্যাপার হয়ে যায়। অনি যখন ছুটে গিয়ে হেমলতাকে চেঁচিয়ে এই খবরটা দিল তখনও হেমলতা তার স্বামীর ঘোরে আছেন, চোখে জল। খবরটা শুনে আচম্বিতে কি করবেন বুঝতে না পেরে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন। বাবার দুর্ঘটনা ঘটেছে, যে লোকটা একটু আগে সুস্থ শরীরে বেড়াতে গেল সে লোকটা এখন হাসপাতালে—এ কথা ভাবলেই বুকটা কেমন করে ওঠে। এই দীর্ঘ জীবনটা তাঁর বাবার সঙ্গে কেটেছে, বাবা ছাড়া তিনি কিছু ভাবতেই পারেন না। ফলে এই খবরটা ওঁর শরীর নিঙড়ে একটা ভয়ের কান্না বের করে আনল। স্বামীর কথা ভাবতে গিয়ে যে কান্নাটা বুকে ঘোরাফেরা করছিল এতক্ষণ, আশ্চর্যভাবে সেটা চেহারা পালটে ফেলল এখন। সেই কান্নাটা এখন হেমলতাকে যেন সাহায্য করল।

হাসপাতালে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি বাড়ির ঘর-দোর বন্ধ করে তালা দিতে

গিয়ে হেমলতা আবিষ্কার করলেন বাড়িটা একদম খোলা পড়ে থাকছে। এত বড় বাড়িতে তালা দিয়ে এর আগে সবাই মিলে কোথাও যাওয়া হয়নি। হেমলতা দেখলেন বাগানের ভেতর দিয়ে কেউ এসে তালা ভেঙে যদি সব বের করে নিয়ে যায় তবে পাড়ার লোকে কেউ টের পাবে না। কিন্তু একটা বড় আতঙ্ক ছোট ভয়ের সম্ভাবনাকে চাপা দিতে পারে, হেমলতা ইষ্টনাম জপ করতে করতে অনিকে নিয়ে বের হলেন।

অনি দেখল, পিসীমা থান-শেমিজের ওপর একটা সুতীর চাদর জড়িয়েছেন। এর আগে কখনও সে পিসীমার সঙ্গে রাস্তায় বের হয়নি। এখানে আসার পর পিসীমা কখনও বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন কিনা মনে পড়ে না। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। টাউন ক্লাব মাঠের পাশ দিয়ে যেতেই ওরা রিকশা পেয়ে গেল। হেমলতা তখন থেকে শুধু নাম জপ করে যাচ্ছেন। দাদুর পায়ে চোট লেগেছে, ভয়ের কিছু নেই, শোনার পরও কিন্তু অনি সহজ হতে পারছিল না। খারাপ খবর নাকি লোকে টপ করে দেয় না, সইয়ে সইয়ে দেয়। দাদু যদি মরে গিয়ে থাকে এতক্ষণে তাহলে ও কি করবে?

হাসপাতালে প্রথমে ঢুকল অনি। পিসীমা পেছন পেছন। রিকশা থেকে নেমেই অনি দেখল পিসীমা মাথায় ঘোমটা দিয়েছেন। এ রকম বেশে ওঁকে দেখে অনির খুব হাসি পেলেও কিছু বলল না। তাড়াহুড়োয় পয়সাকড়ি আনা হয়নি বলে রিকশাওলাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হল। ফিরে গিয়ে একেবারে ডবল পাবে। কড়া ওষুধের গন্ধ নাকে ধক করে আসতেই অনির মনে হল, হাসপাতালে থাকতে খুব কষ্ট হয়। অনুসন্ধান লেখা কাউন্টারটায় কেউ নেই। একটা শুঁটকো মতো বেয়ারাগোছের লোক মেঝেতে বসে ছিল, অনিদের বোকার মত চাইতে দেখে বলল, 'কি খুঁজছ, বাবা?'

অনি বলবে কি বলবে না ভেবে বলে ফেলল, 'আমার দাদু কোথায় তাই জানতে এসেছি।'

লোকটা কেমন অথর্বের মত তাকাল, 'জানতে চাইলেই জানতে পারবে না। ছটার পর বাবুদের ডিউটি খতম।' হাত দিয়ে ফাঁকা চেয়ার দেখাল সে, 'কি কেস?'

অনি ঠিক বুঝতে পারল না প্রথমটা, 'মানে?'

'বাঁচবে না কষ্ট পাবে?' লোকটা উদাস গলায় জিজ্ঞাসা করল। অনিকে ঘুরে পিসীমার দিকে চাইতে দেখে লোকটা বুঝিয়ে দিল, 'চুকে গেলেই বেঁচে যাওয়া যায়, এখানে থাকলেই তো ভোগান্তি, কষ্ট। কিন্তু চাইলেই কি যাওয়া যায়? এই যে, ছাখো, আমি একেবারে খোদ যাবার দরজা—এই হাসপাতালে কাজ করছি আর

প্রতিদিন চলে যাবার জন্য চেষ্টা করছি তবু সে শালা কি আমাকে টিকিট দেবে? তা কখন ভর্তি হয়েছে?'

'বিকেলে। অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে পায়ে।' অনি বলল।

'ও সেই রিকশা কেস? বাঁচার কোন আশা নেই, সে শালা দয়া করবে না, অনেক ভোগান্তি আছে। তা তিনি আছেন ওই সামনের হলুদ বাড়িতে। এসে অবধি ডাক্তার নার্সদের ধমকে বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছেন। যাও, রিকশা কেস বললেই যে কেউ এখন বলে দিতে পারবে।' লোকটা একফোঁটা নড়ল না।

তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে অনি বলল, 'বাঁচার আশা নেই বলল, না?'

হেমলতা বললেন, 'তার মানে ভগবান নিয়ে যাবে না, ওর কাছে মরে যাওয়া মানে বেঁচে যাওয়া। যত বদ লোক!'

হেমলতা হাঁটছিলেন টিপটিপে পায়ে। হাসপাতালের বারান্দায় রুগীরা সার দিয়ে শুয়ে রয়েছে। রাজ্যের মানুষের ছোঁয়া লেগে যাওয়ায় তাঁর হাঁটাটা শ্লথ হচ্ছিল। দুবার তাগাদা দিয়ে অনি এগিয়ে গিয়েছিল হলুদ বাড়ির দরজায়। এখন ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হয়ে গেছে। দলে দলে মানুষজন হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। দরজায় একজন দারোয়ানগোছের লোক ওদের আটকালো। অনি ব্যাপারটা তাকে বললেও সে যেতে দিতে নারাজ, সময় চলে গেছে।

ততক্ষণে হেমলতা এসে পড়েছেন, শুনে খেঁকিয়ে উঠলেন, 'আমরা কি জেনে বসে আছি যে কখন ওঁর অ্যাক্সিডেণ্ট হবে আর আমাদের সে খবর পেয়ে আসতে তোমাদের সময় চলে যাবে?'

দারোয়ান বলল, কখন 'অ্যাডমিট হয়েছে আপনার স্বামী?'

হেমলতা সব ভুলে চিৎকার করে উঠলেন, 'মুখপোড়া বলে কি! ওরে উনি আমার বাবা, স্বামীকে অনেক দিন আগে খেয়েছি।' অনির চট করে মনে পড়ে গেল, দাদু বলেন পিসীমার নাকি রাক্ষস গণ।

দারোয়ানটা একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'কি হয়েছিল?'

এবার অনি চটপট বলল, 'রিকশায় লেগেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে দারোয়ানের চেহারা বদলে গেল, 'আরে বাপ, যান যান, বাঁ দিকে ঘুরে তিন নম্বর বেড।'

লোকটা এরকম ভয় পেল কেন বুঝতে পারল না অনি। পিসীমা তখনও গজগজ করছেন, 'এদের এখানে চাকরি দেয় কেন? মেয়ে বউ বুঝতে পারে না। যত বদ লোক।'

সরিৎশেখর বিছানার ওপর হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। তাঁর একটা পা মোটা

ব্যাণ্ডেজে জড়ানো, টান টান করে রাখা। ওদের দেখে তিনিই কাছে ডাকলেন, 'এই যে, এদিকে এস। দ্যাখো কিভাবে এঁরা সব আছেন। এটা কি হাসপাতাল না শুয়োরের খাঁচা। ঘরময় নোংরা ছিল, আমি বলেকয়ে সরিয়েছি, নইলে তোমরা ঢুকতে পারতে না।'

হেমলতা বাবার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে?'

সঙ্গে সঙ্গে গলা তুললেন সরিৎশেখর, 'স্বাধীন হয়ে সব উচ্ছন্নে গেছেন। আমি এখানে এসে এক ঘণ্টা পড়ে আছি, একটা ডাক্তার নেই যে এসে দেখবে! নাকি তার ডিউটি ওভার, নতুন লোক আসেনি। ভাবতে পার? ইংরেজ আমলে এ সব জিনিস হলে হ্যাঙ্ আনটিল ডেথ হয়ে যেত। আমি কালই জহরলাল নেহেরুকে লিখব।'

সরিৎশেখরের পাশের বেডে শুয়ে থাকা একজন রুগী চিনচিনে গলায় বলে উঠলেন, 'আমাদের খাবার থেকে চুরি করে ওরা, কি জঘন্য খাবার!'

সরিৎশেখর হেমলতাকে বললেন, 'শুনলে? চুরি করা আমি বের করছি! আমি এখানকার দেখনবাহার নাইটিঙ্গেলদের বলেছি খাবারের চার্ট দেখাতে, একটা কিছু বিহিত করতে হবে। ওই যে আট নম্বরের বাচ্চাটা চল্লিশ মিনিট চেঁচিয়েও বেডপ্যান পায়নি, আমি এলে তবে দিল। হ্যাঁ মশাই, সিভিল সার্জেন কখন আসেন হাসপাতালে?'

পাশের লোকটি বলল, 'সকালে।'

হেমলতা এবার প্রায় অসহিষ্ণু গলায় বললেন, 'আপনার পায়ের অবস্থা কি রকম?'

'যন্ত্রণা হচ্ছে খুব।' এতক্ষণে মুখ বিকৃতি করলেন সরিৎশেখর, 'কাল সকালে বোধ হয় প্লাস্টার করবে। দুপুর নাগাদ বাড়ি গিয়ে ভাত খাব।'

'পারবেন?' হেমলতা যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

'পারব না কেন? আমার একটা পা তো ঠিক আছে।' হঠাৎ যেন তাঁর কথাটা মনে পড়ে যেতেই তিনি অনিকে কাছে ডাকলেন, 'শোন, তুমি কাল সকালের ফার্স্ট বাসে স্বর্গছেঁড়ায় চলে যাবে।'

অনি অবাক হয়ে বলল, 'কেন? আমার স্কুল যে খোলা!'

সরিৎশেখর বললেন, 'সারাজীবনে অনেক স্কুল খোলা পাবে। আমি যেতে পারছি না, তুমি অবশ্যই যাবে। তোমার বাবার খুব অসুখ।'

কিং সাহেবের ঘাটের চায়ের দোকানগুলো বোধ হয় দিনরাত খোলা থাকে।

ভদ্রলোক বললেন, 'ও শুনবে কেন? আমরা তো পুরো ট্যাক্সি রিজার্ভ করিনি।'

এবার যেন মহিলা ধৈর্য রাখতে পারলেন না, 'তাই কর। আঃ! তুমি জানো না ওরা কি রকম। আজ অবধি কেউ কাবুলীওয়ালার বউ ছাখেনি, জানো?'

হঠাৎ ভদ্রলোকের গলার স্বর পালটে গেল, 'তাতে তোমার কি এসে গেল, তুমি তো আমার স্ত্রী।'

অনি দেখল ভদ্রমহিলার মুখ অসম্ভব লাল হয়ে গেছে। তাঁর একপাশে ওর বয়সী যে ছেলেটা চুপচাপ বসে আছে তার মুখটা অসম্ভব রকমের গোবেচারা। এ রকম লালটু গোলালু মার্কা ছেলে ওদের দলে একটাও নেই। হঠাৎ ছেলেটা বলে উঠল, 'কাবুলীওয়ালারা খুব ভাল, না মা? আখরোট দেবে আমাদের?'

ভদ্রমহিলা খিঁচিয়ে উঠলেন, 'আঃ, তুমি চুপ কর। যেমন বাপ তেমনি ছেলে।'

ছেলেটি হতচকিত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ মা, মিনিকে দিত, আমি পড়েছি।'

অনি ঠিক বুঝতে পারছিল না ছেলেটা কোন পড়ার কথা বলছে। তবে আন্দাজ করল ও কাবুলীদের নিয়ে কোন গল্প পড়েছে।

দর ঠিকঠাক হয়ে গেলে লোকগুলো যখন গাড়িতে উঠতে যাবে তখন অনি পিঠে একটা হাতের স্পর্শ পেল। ঘাড় ঘুরিয়ে সে দেখল, ভদ্রমহিলা অনেকটা ঝুঁকে প্রায় তার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলছেন, 'তুমি আমাদের এখানে এসে বসো তো ভাই, সামনের সিটটা ওদের ছেড়ে দাও।'

অনি কি করবে বুঝে না উঠতেই ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন, 'চলে এসো পেছনে, কুইক।' ভদ্রলোক জানলা ছাড়বেন না, তাঁর কি সব দেখার আছে। গোলালু ছেলেটা প্রায় নাকে কেঁদে উঠল, সে ওপাশের জানলা থেকে সরবে না। অনি নেমে দাঁড়িয়েছিল। একটা ছোকরা কাবুলী ওর মাথায় আলতো করে টোকা মারল। তারপর ওরা চারজন ড্রাইভারের পাশে গিয়ে অদ্ভুত ভাষায় উঃ আঃ করতে করতে বসে পড়ল। শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক নেমে দাঁড়াতে অনি পেছনের সিটে বসতে পেল। ছোট্ট কাপড়ের ঝোলাটা কোলের ওপর রেখে মহিলার পাশে বসতেই অনির মনে হল অদ্ভুত এক ফুলের বাগানে সে ঢুকে পড়েছে। এতো রকম ফুলের গন্ধ একসঙ্গে নাকে আসছে যে দিশেহারা হয়ে যেতে হয়। মায়ের গা থেকে যে রকম গন্ধ বের হত এটা সে রকম নয়, মহিলার শরীর থেকে যে সৌরভ বের হচ্ছে তা মানুষকে যেন অবশ করে দেয়। সামনের সিটে বসে যে কেন গন্ধটা পায়নি বুঝতে পারছিল না অনি। কাবুলীরা উঠে বসেই প্রায় একই সঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়ে ওদের দেখল। একজন কি একটা মন্তব্য করতেই সবাই ঠা-ঠা করে হেসে উঠল। অনি দেখল ভদ্রমহিলা এক হাতে ছেলেকে জড়িয়ে ধরেছেন, অন্য হাত তার

পিঠের ওপর রাখা।

ড্রাইভারের সঙ্গী এবং অবশিষ্ট কাবুলীটা ফুটবোর্ডে উঠল। সঙ্গীটি ওঠার আগে হ্যাণ্ডেল নিয়ে কয়েক মিনিট প্রাণপণে ঘুরিয়ে ইঞ্জিন স্টার্ট করতে সেটা সফল হয়ে এল। ইঞ্জিন গর্জে উঠতেই গাড়িটা থরথর করে কাঁপতে লাগল। অনির মনে হতে লাগল মন্টুর কথা সত্যি, যে কোন সময় গাড়ির সব কটা অংশ খুলে পড়ে যেতে পারে। বিকট চিৎকার করে গাড়িটা চলতে শুরু করল এবার। ভেতরে বসে কানে তালা লাগার যোগাড। অনি দেখল পেছনের সিটের গদি এখনও সবটা উঠে যায়নি।

দুপাশে বালি আর বালি, ইতস্তত কিছু কাশগাছ, গাড়িটা যত জোরে ছুটছে তার বহুগুণ বেশীশব্দ করছে। মাঝে মাঝে মরা নদীর খাঁজে কিছু জল জমে রয়েছে। অবলীলায় ট্যাক্সি সেটা পেরিয়ে এল। কাবুলীগুলো খুব মজা পেয়েছে, অনি শুনল, ওরা চিৎকার করে গান ধরেছে। অনির বসতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। মহিলা তাকে প্রায় চেপ্টে ফেলেছেন। ওঁর পেটের গমের মত রঙের চর্বি যত নরম হোক ওজনে দমবন্ধ করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। ভদ্রমহিলা বোধ হয় অনির পেছনদিক দিয়ে স্বামীকে চিমটি কেটেছিলেন, কারণ তিনি হঠাৎ উঃ করে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। মহিলা কেমন হাসি-হাসি গলায় বললেন, 'কাবুলীওয়ালারাও গান গায়, শুনেছ আগে?'

ভদ্রলোক বললেন, 'হুঁ। সেক্স এলে ওরা গান গায়।'

প্রায় আঁতকে উঠলেন মহিলা, 'সে কি!'

সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'তোমার অবশ্য ভয়ের দিন অনেক আগে চলে গেছে। আয়নায় মুখ দ্যাখো না তো!'

অনি দেখল মহিলা হঠাৎ চুপ করে গেলেন। ওঁর হাতটা নির্ভার হয়ে ওর পিঠের ওপর এলিয়ে পড়ে আছে। মুখ ঘুরিয়ে অনি দেখল একটা ঠোঁট চেপে ধরে তিনি ছেলের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন। কেন হঠাৎ এমন হল সে বুঝতে পারছিল না। সেক্স মানে কি? এই শব্দটাই সব গোলমালের কারণ। মানে জিজ্ঞাসা করলে যদি ভদ্রলোক চটে যান? ও মনে মনে কয়েকবার আওড়ে শব্দটা মুখস্থ করে ফেলল। বাড়িতে ফিরে গিয়ে ডিক্সনারীতে এর মানেটা দেখতে হবে। আর এই সময় আর্তনাদ করে গাড়িটা থেমে গেল। অনি দেখল চারধারে এখন মাথা অবধি কাশগাছের বন। একটা ডাহুক পাখি ডাকছে কোথাও। ড্রাইভারের স্যাঙাত লাফিয়ে নামল, 'হালারে টাইট দেবার লাগব।' বলে পাশ থেকে একটা কাশগাছের ডাঁটা ছিঁড়ে নিয়ে ইঞ্জিনের ঢাকনা খুলে ভেতরে কোথাও গুঁজে দিতেই

আবার শব্দ করে গাড়িটা ডেকে উঠল। ব্যাপারটা এতটা আকস্মিক যে কাবুলীগুলো পর্যন্ত হাঁ হয়ে গেল। ভদ্রলোক চাপা গলায় বললেন, 'আমার গাড়ি হলে মেকানিক ডাকতে হত।'

নদীর ধারে এসে ট্যাক্সিটা দাঁড়াতেই কাবুলীগুলো আগে লাফিয়ে নামল। এপারে কোন দোকানপাট নেই। প্রায় রোজই ঘাট জায়গা বদলাচ্ছে, তাছাড়া পাহাড়ের বৃষ্টি হলেই শুকনো চরে আট-দশটা মোটা ধারা গজিয়ে এক হয়ে যাবে। ওপারে বার্নিশে। বার্নেশও বলে অনেকে। লোকজন দোকানপাটে জমজমাট। এই সাতসকালে সেখানে গঞ্জের ভিড। সমস্ত ডুয়ার্স এবং সুদূর কুচবিহার থেকে বাসগুলো এসে ওই বার্নিশে বসে থাকে। তিস্তা পেরিয়ে জলপাইগুড়িতে আসার উপায় নেই। তাই বার্নিশের রবরবা এত। বার্নিশের নিচে মণ্ডলঘাট, জলপাই-গুড়িতে আসার সময় ওরা মণ্ডলঘাট দিয়ে এসেছিল।

গাডি থেকে নেমে অনি দেখল জোড়া-নৌকো একটাও নেই, ছোট ছোট নৌকো দুটো দাঁড়িয়ে আছে। পাড়ে ভিড নেই একদম, একটা নৌকোয় গোটা আটেক লোক বসে আছে। তবে এই সিকি মাইল চওড়া তিস্তায় এখন প্রচণ্ড ঢেউ, জলের রঙ লালচে। হঠাৎ দেখলে কেমন ভয়-ভয় করে। ড্রাইভারের সঙ্গী এসে তার কাছে টাকা চাইল। ও দেখল ভদ্রলোক মহিলা এবং গোলালুকে নিয়ে নৌকোর দিকে এগোচ্ছেন। টাকাটা দিয়ে ও চটপট এগোল। আসবার সময় পিসীমা তিনটে এক টাকার নোট তাকে দিয়েছেন। এক টাকা ট্যাক্সির ভাড়া, চার আনা নৌকোর ভাড়া, পাঁচসিকা বাসভাড়া আর আট আনায় দুটো রাজভোগ। একদম হিসেব করে দেওয়া টাকা। সকালবেলায় সাততাড়াতাড়ি না খেয়ে বেরোনো—তাই রাজভোগ বরাদ্দ।

ভদ্রলোক উঠে গেছেন নৌকোয়, উঠে ছেলেকে প্রায় কোলে করে টেনে তুলেছেন। অনিকে আসতে দেখে মহিলা বললেন, 'তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছি ভাই। একসঙ্গে এলাম তো। যাই কি করে!'

অত বড় মহিলা তাকে ভাই বলছেন, অনির কেমন অস্বস্তি হল। ও কি মাসীমা না বলে দিদি বলবে? ওঁরা নিশ্চয়ই খুব আধুনিক। বড়লোক হলেই বোধ হয় আধুনিক হয়। মন্টু বলে বিলেতে আমেরিকায় ছেলেমেয়েরা বাপ-মায়ের বন্ধু। ওদের চেয়ে আধুনিক কে আছে? মহিলা তো তাকে শুধু ভাই বললেন।

অনি দেখল ঢেউ-এর দোলায় নৌকোটা পাড়ের বালিতে ঘষা খেয়ে আবার হাতখানেক সরে যাচ্ছে। সে সময় তার ফাঁক দিয়ে লালচে জলের স্রোত দেখা যাচ্ছে। ভদ্রমহিলা বোধ হয় সেই দিকে চোখ পড়ার পর আর এগোতে পারছেন

না। ওদিকে ভদ্রলোক কিন্তু উদাস চোখে বার্নিশের দিকে চেয়ে আছেন। নৌকোটা ছোট। দু'ধারে সরু তক্তা পাতা, যাত্রীরা সেখানে বসে আছে। মাঝখানে কাঠের বীমগুলো এখন ফাঁকা। গোলালু জুলজুল করে বাবার পাশে বসে মাকে দেখছিল। অনির একটু ভয়-ভয় করছিল। সে সাবধানে নৌকোতে উঠতেই সেটা সামান্য দুলে উঠল। প্রথমে মনে হয়েছিল বুঝি এবার ব্যালান্স থাকবে না কিন্তু সেটা চট করে ফিরে এল। সোজা হয়ে বেশীক্ষণ দাঁড়ানো যায় না। ও ঘুরে দেখল ভদ্রমহিলা ওর দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, 'বেশী দুলছে না তো?' অনি ঘাড় নেড়ে হাত ধরতেই ভদ্রমহিলা শরীরের সব ওজন নৌকোর ওপর অনিকে ভর করে ছেড়ে দিলেন। অনির মনে হল ওর দমবন্ধ হয়ে যাবে, ও উলটে জলে পড়ে যাবে। কিন্তু কিছুই হল না, সামলে নিয়ে ভদ্রমহিলা সেখানেই কাঠের ওপর বসে পড়ে অনিকে বললেন, 'বসো।' অনি বসতে বসতে শুনতে পেল মহিলা বলছেন, 'স্বার্থপর, জেলাস!' ঠিক বুঝতে না পেরে ওঁর দিকে তাকাতেই তিনি হেসে ফেললেন, 'না না, তোমাকে নয় ভাই। এম্মা, তোমাকে কেন বলব! তুমি আমার কত উপকার করলে! কোথায় যাচ্ছ?'

'স্বর্গছেঁড়ায়।' অনি বলল।

'দারুণ রোমাণ্টিক নাম, না? আমরা যাচ্ছি ময়নাগুড়ি। আজই ফিরে আসব। জলপাইগুড়িতে থাক?' কাঁধে হাত রেখে পা নাচালেন মহিলা।

হ্যাঁ।'

'এলে দেখা করো। আমরা থাকি বাবুপাড়ায়। বাড়ির নাম ড্রিমল্যাণ্ড। মনে থাকবে তো?'

অনি ঘাড নাডল। 'ও কোন্ স্কুলে পড়ে?'

'কে? ও, প্রিন্স? কার্শিয়াং-এ পড়ে। ছুটিতে এসেছে। আমার একটা মেয়ে আছে, দারুণ সুন্দরী, আমার চেয়েও। ওর সঙ্গেই আমার মেলে বেশী। প্রিন্স ওর বাবার মতন, স্বার্থপর। ওহো, তোমার নাম কি? কোন্ স্কুলে পড়?' এত কথার পর মহিলার এবার যেন প্রশ্নটা মনে পড়ল। ঠিক সে সময় মাঝিরা এসে নৌকোয় উঠতে সেটা খুব জোরে দুলে উঠল। মহিলা ওকে এক হাতে জড়িয়ে ধরলেন। সেই রকম ফুলের বাগানে ঢুকে পড়ে অনি বলল, 'আমার নাম অনিমেষ, জেলা স্কুলে পড়ি।'

নৌকোটা ছেড়ে দিল। নৌকোর মুখে একটা মোটা লম্বা দড়ি বেঁধে কয়েকজন সেটাকে টানতে লাগল পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে। সেই টানে নৌকো এগিয়ে যেতে লাগলো ওপারের দিকে। অনি শুনতে পেল ভদ্রলোক গোলালুকে বলছেন, 'একে বলে গুণ টানা।' গোলালু বুঝল কিনা বোঝা গেল না। ও কেন জেলা স্কুলে না

পড়ে কার্শিয়াং-এ পড়ে? সেখানে নিশ্চয়ই একা থাকতে হয়। ওর হঠাৎ গোলালুর জন্য কষ্ট হল। মা থেকেও ও মার কাছে থাকতে পারছে না। ঢেউ বাঁচিয়ে নৌকো-টাকে অনেক দূরে নিয়ে এসে মাঝিরা লাফিয়ে তাতে উঠে বসল। সঙ্গে সঙ্গে ছপ-ছপ করে বৈঠা পড়তে লাগল জলে। বাঁধন খুলে যেতেই স্রোতের টানে সোঁ সোঁ করে নৌকো নদীর ভিতর ঢুকে পড়ল।

বড় বড় ঢেউ দেখা যাচ্ছে মাঝ নদীতে। এক একটা এত বড় যে তার আড়ালে বার্নিশ ঘাট ঢাকা পড়ে যাচ্ছে পলকের জন্য। হঠাৎ নৌকার একধারে বসে থাকা রাজবংশীরা চিৎকার করে উঠল, 'তিস্তা বুড়িকি জয়!' সঙ্গে সঙ্গে সেটা গর্জন করে ফিরে এল। মাঝিরা প্রাণপণে নৌকো ঠিক রাখার চেষ্টা করছে। চিৎকার করে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে ওরা। অনি দেখল বড় ঢেউয়ের কাছাকাছি নৌকো এসে যেতেই একটা দিক কেমন উঁচু হয়ে যাচ্ছে নৌকোর।

গোলালু ওর বাবাকে জড়িয়ে চোখ বন্ধ করে বসে আছে। ভদ্রলোক অন্য হাতে নৌকোর তক্তা শক্ত করে ধরে আছেন। ভদ্রমহিলা এই সকালে কুল কুল করে ঘামছেন। তাঁর মুখের রঙ কাদা হয়ে গড়িয়ে পড়ছে একধারে। সমস্ত শরীর দিয়ে যেন অনিকে জড়িয়ে ধরেছেন। ছিটকে ছিটকে জল আসছে নৌকোয়। কাবুলিগুলো পর্যন্ত নদীর চেহারা দেখে ভয়ে চুপচাপ হয়ে বসে গেছে।

এবার ঢেউটা পার হবে নৌকো। অনি দেখল স্রোতটা এখানে গর্তের মত নিচে নেমে গিয়ে হঠাৎ তুবড়ির মত ওপরে ফুঁসে উঠেছে। নৌকো সেই টানে নিচে নেমে যেতেই অদ্ভুত একটা ঝাঁকুনি লাগল। সেটা সামলে জলের টানে ওপরে উঠতেই একটু বেটাল হয়ে গেলে হুড়মুড় করে একরাশ জল নৌকোয় উঠে এল। আর তখনই অনি দেখল বেটাল নৌকোর একপাশে বসে থাকা একটা লোক টুপ করে জলে পড়ে গেল চুপচাপ। যেন ভেতরে ভেতরে কেউ কাজ করে যায়, নইলে সেই মুহূর্তে মহিলার বাঁধন খুলে অনি ঘুরে বসত না। আর বসতেই ও দেখল সেই শরীরটা ছুটন্ত জলের সঙ্গে পাক খেয়ে তার নিচ দিয়ে নৌকোর তলায় ঢুকে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকে পড়ে অনিমেষ তার পিঠের জামা চেপে ধরল মুঠোয়। জলের স্রোতে শরীরটার ওজন কমে গিয়েছে, তবু তাকে ধরে রাখা অনির পক্ষে অসম্ভব। পিঠের দিকে টান লাগায় শরীরটার নিচ দিক নৌকোর তলায় ঢুকে গেল আর লোকটা চট করে আধা উলটে গেল। অনি দেখল লোকটার সারা শরীর কাপড়ে মোড়া, বাঁচার স্বাদ পেয়ে একটা হাত ওপরে বাড়িয়ে দিয়েছে। এভাবে কতক্ষণ সে ধরে না থাকতে পারে? মহিলা থাকলে সে নিজে জলে পড়ে যেত। মহিলা তার কোমর দু'হাতে ধরে রাখায় সে ব্যালেন্স রাখতে পারছে। এতক্ষণে নৌকোটা

সেই বড় ঢেউ-এর জায়গাটা পেরিয়ে এসেছে। দুজন মাঝি দৌড়ে ছুটে এল অনিকে সাহায্য করতে। তারা এসে ঝুঁকে পড়ে লোকটাকে ধরতেই সে হাত বাড়িয়ে নৌকোর কাঠ ধরতে গেল। নাগাল পাচ্ছে না দেখে অনি হাতটা ধরে সাহায্য করতে যেতেই দেখল সে কোনরকমেই মুঠো করতে পারছে না। কারণ মুঠো করার জন্য আঙুলগুলোই তার নেই। এই জলে ভেজা হাতের যেখানে সে চেপে ধরেছিল সে জায়গাটা যেন কেমন কেমন লাগছে। আর এই সময় চিৎকারটা শুনতে পেল অনি। কানের কাছে মহিলা প্রচণ্ড আর্তনাদ করে তার কোমর ছেড়ে দিলেন। দিয়ে আলুথালু হয়ে দৌড়ে স্বামীর পাশে গিয়ে বসলেন।

যেহেতু এখন নৌকো দুলছে না, অনি সোজা হয়ে একা দাঁড়াতে পারল। ততক্ষণে নৌকোটা পাড়ের কাছে এসে গেছে এবং এই মাঝি দুটো লোকটাকে টেনে অনিরা যেখানে বসেছিল সেখানে তুলেছে। অনি দেখল মৃতপ্রায় একটা মানুষ নৌকোর কাঠের ওপর এলিয়ে পড়ে আছে। মুখভর্তি দাড়ি, দাঁত নেই, হাঁ করে বুক কাঁপিয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। অনি দেখল লোকটার নাক নেই, কানের অর্ধেকটা খসা, চুলের জায়গায় ছোপ ছোপ দাগ। পুরো মুখটা ঢেকে বসেছিল সে নৌকোয়। আর এতক্ষণ পরে অনি টের পেল ওর শরীর থেকে অদ্ভুত একটা পচা গন্ধ বেরুচ্ছে। কেমন একটা গা-ঘিনঘিনে ভাব সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ল এবার। অনি নিজের হাতের দিকে তাকাল। তারপর ঝুঁকে তিস্তার জলে হাত ধুয়ে নিল। আর এই সময় একটা মাঝি ওকে বলে উঠল, 'পুণ্য করলেন না ভাই, আপনের পাপই হইল।' কথাটার মানে বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তার দিকে তাকাতেই সে বলল, 'এ তো মানুষ না, জন্তুর অধম। মইরা গেলেই এ শান্তি পাইত, তিস্তা বুড়ীর কোল থিকা ছিনাইয়া আইন্যা কি লাভ হইল!'

অনি এত অবাক হয়ে গিয়েছিল যে ওর জামাকাপড়ের অনেকটা যে জলে ভিজে গেছে টের পেল না, 'কিন্তু ও মরে যেত যে!'

মাঝিরা হাসল, 'হক কথা। কিন্তু বাঁইচ্যা যাইত।'

ঠিক তখন কাল সন্ধ্যেবেলায় হাসপাতালের সেই লোকটার মুখ মনে পড়ল। এই পৃথিবী থেকে চলে যাওয়া মানে বেঁচে যাওয়া—লোকটা বলেছিল। এখন এই মাঝিও প্রায় সেই কথাই বলছে। নিজের মায়ের কথা ভাবল অনি, মা কি বেঁচে গেছে? তাকে ফেলে রেখে মা কি শান্তিতে আছে? মানুষের কেন পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না বুঝতে পারছিল না অনি। হঠাৎ ওর মনে হল হাসপাতালের সেই লোকটা অথবা খসে-যাওয়া-শরীরে লোকটা বোধ

হয় একই রকমের।

পাড়ে নৌকো এসে ভিড়তেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভিড় জমে গেল নৌকোটার সামনে। সবাই একে একে পয়সা দিয়ে নেমে গেলে অনি মাঝিটাকে পয়সা দিতে গেল। সে ঘাড় নেড়ে বলল, 'না, আপনের ভাড়া লাগব না।'

পাড়ে দাঁড়িয়ে দুলন্ত নৌকোয় দাঁড়ানো মাঝিকে সে বলল, 'কেন?'

মাঝি হাসল, 'আপনি যা করছেন তা ক'জনা করে!'

কিছুতেই পয়সা নিল না সে। অনেকগুলো বিস্মিত মুখের সামনে দিয়ে অনি ওপরে উঠে এল। সার সার বাস দাঁড়িয়ে। জায়গাগুলোর নাম মাথার ওপর লেখা—লঙ্কাপাড়া—আলিপুরদুয়ার—কুচবিহার—নাথুয়া—ফালাকাটা। এইসব চেনা বাসগুলোকে দেখতে পেয়ে ওর খুব খিদে পেয়ে গেল। খাবারের দোকান খুঁজতে গিয়ে ও দেখল ভদ্রলোক, মহিলা আর গোলালু একটা মিষ্টির দোকানে বসে আছেন। হাসিমুখে ওঁদের কাছে যেতেই অনি দেখল মহিলার মুখ কালো হয়ে গেল। একটা চেয়ার খালি ছিল, অনি সেটা ধরতেই তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'বসো না, বসো না, খবরদার, ছোঁয়া লেগে যাবে।' হাঁ হয়ে গেল অনি। মহিলা স্বামীকে বললেন, 'ওকে এখান থেকে যেতে বলে দাও। সংক্রামক রোগ, অলরেডি ওর ভেতরে এসে গিয়েছে কিনা কে জানে।'

ভদ্রমহিলার দিকে আড়চোখে দেখে নিয়ে ওঁর স্বামী অনিকে বললেন, 'তুমি বরং কার্বলিক সোপ দিয়ে হাতটা ধুয়ে নিও। হিরোর ডেফিনেশন সব মানুষের কাছে সমান নয় ভাই। উইশ ইউ গুড লাক।'

ভীষণ কান্না পেয়ে গেল অনির। কোনরকমে দ্রুত দোকান থেকে বেরিয়ে এল সে। খাবার ইচ্ছেটা এখন একদম চলে গেছে। এসব রোগ কি সংক্রামক? তার ভেতরে কি চলে আসতে পারে? এখানে কার্বলিক সোপ সে কোথায় পাবে! চারদিকে তাকিয়ে হঠাৎ নাকের কাছে হাতটা নিয়ে এল সে। না তো, কোন গন্ধ নেই। এই সময় সামনের বাসে হর্ন বেজে উঠতে সে দেখল তার ওপর আলিপুর দুয়ার লেখা, বাসটা এখনই ছাড়বে। স্বর্গছেঁড়ার ওপর দিয়ে একে যেতে হবে।

প্রায় অন্ধের মতন সে বাসে উঠে বসল। এখান থেকে মিষ্টির দোকানটা দেখা যাচ্ছে। জানলার পাশের সিটে বসে অনি দেখল ওদের টেবিলে বড় বড় রাজভোগ এসে গিয়েছে। আজ অবধি কেউ তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করেনি। সে কি জানতো লোকটার খারাপ অসুখ আছে? একটা মানুষ ডুবে যাচ্ছে দেখে তার

বুকের মধ্যে এমন একটা ব্যাপার হল যে সে ঠিক থাকতে পারেনি। হঠাৎ ওর মনে পড়ল, মাঝিগুলো তো নির্দ্বিধায় লোকটাকে টেনে তুলেছিল। ওরা কি কার্বলিক সোপে হাত ধোবে? ওদের মনে যদি কোন চিন্তা না এসে থাকে সে এত ভাবছে কেন? মহিলা নিশ্চয়ই ভুল বুঝেছেন অথবা তিনি মোটেই আধুনিক নন। সংস্কার না থাকার নামই নাকি আধুনিক হওয়া, আমেরিকানদের মত—মণ্টু প্রায়ই বলে। ওর মনে পড়ল মাঝি ওকে বলেছে আপনি যা করেছেন তা ক'জনে পারে? অদ্ভুত একটা শান্তি একটু একটু করে ফিরে আসছিল অনির।

এই সময় ড্রাইভার গাড়ি ছাড়ল দুবার হর্ন বাজিয়ে। সামান্য লোক হয়েছে গাড়িতে। কণ্ডাক্টর দরজা বন্ধ করে চেঁচাল, 'ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, স্বর্গছেঁড়া, বীরপাড়া—আলিপুর দুয়ার।' আর বাসটা এবার নড়তেই হঠাৎ অনি লক্ষ্য করল কি একটা ছুটে আসছে তার দিকে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেই কালো মতন জিনিসটা চটাৎ করে এসে লাগল জানলার ওপরে। একটা কাদার তাল ঝুলে থাকল জানলায়। একটু নিচু হলেই সেটা গলে অনির মুখে এসে লাগত। বিস্মিত, হতভম্ব অনি সমস্ত শরীরে কাঁপুনি নিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল একটা লোক ওকে দেখে চেঁচাচ্ছে, 'কেন বাঁচালি, কেন বাঁচালি, মরতে চেয়েছিলাম তো তোর বাপের কি, শালা! কেন বাঁচালি?' সেই আধখানা শরীরটা নৌকোর ওপর থেকে এসে ভেজা কাপড়ে হিংস্র হয়ে লাফাচ্ছে আর নাকিস্বরে অনির দিকে তাকিয়ে একই কথা বলে যাচ্ছে। ও কি করে টের পেল যে অনি বাঁচিয়েছে? নিশ্চয়ই কেউ বলে দিয়েছে। অনির বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল, চোখের সামনে জলের আড়াল। ও তড়াতাড়ি কাচের জানলাটা বন্ধ করে দিল। ঝাপসা হয়ে গেলে সব মানুষকে সমান দেখায়।

বাবার অসুখের খবর পেয়ে জোর করে দাদু তাকে পাঠালেন কিন্তু ধূপগুড়ি না পেরোনো পর্যন্ত সেকথা খুব একটা মনে পড়েনি অনির। ডুডুয়া নদী ছাড়িয়ে রাস্তাটা বাঁক নিতে যেই স্বর্গছেঁড়া চা-বাগানের গাছগুলো চোখে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে একটা উত্তেজনা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। কদ্দিন বাদে সে আবার এইসব গাছগাছালি, ডানদিকের মদেসিয়া কুলিদের ঘরবাড়ি দেখতে পাচ্ছে। মুখ বাড়িয়ে একটাও পরিচিত মুখ দেখল না ও। যদিও স্বর্গছেঁড়া বাজার এখান থেকে মাইল দুয়েক, তবু কেউ কেউ তো এদিকে আসতেও পারে। তারপর যেই বিরাট শালের মাঝখানে কাজ-করা ফুলের মত চা-বাগানের মধ্যিখানে মাথা তোলা ফ্যাক্টরী-বাড়িটা চোখে পড়ল তক্ষুনি ওর বুকটা কেঁপে উঠল। বাবার খুব অসুখ, ওই ফ্যাক্টারীতে বাবা নিশ্চয়ই কাজ করতে যেতে পারছেন না। চা-বাগানের শেষে

বাঁ দিকে বাবুদের কোয়ার্টার, দু'দুটো চাঁপা গাছ বুকে নিয়ে বিরাট খেলার মাঠ চুপচাপ পড়ে আছে। অনি চিৎকার করে বাস থামাল।

মাটিতে নামতেই ইউক্যালিপটাস গাছের শরীর-ছোঁয়া বাতাসটাকে নাক ভরে টেনে নিয়ে ও চারপাশে তাকাল। কোয়ার্টারগুলোর দরজা বন্ধ। রাস্তার এপাশে মাড়োয়ারীদের দোকানের সামনে একজন পশ্চিমাগোছের লোক উবু হয়ে বসে তাকে দেখছে। চোখাচোখি হতে দাঁত বের করে হাসল, অনি তাকে চিনতে পারল না। বাড়ির সামনে পাতাবাহারের যে সার দেওয়া গাছগুলো ছিল সেগুলো যেন শুকিয়ে এসেছে। ক্লাবঘর তালাবন্ধ, অনি বারান্দায় উঠে এসে দরজার কড়া নাড়ল।

ডানদিকের খিড়কি দরজা খুলে বাগান দিয়ে বাড়ির ভেতরে যাওয়া যায়, কিন্তু হঠাৎ এই সদরের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ওর মনটা কেমন হয়ে গেল। এখন এ বাড়িতে মা নেই। এই বারান্দা, এ বাড়ির ঘর উঠোন যে কোন জায়গায় ও মাকে কল্পনা করতে পারে। মা মারা গেছেন জেনেও ও মাঝে মাঝে নিজের সঙ্গে খেলা করে ভাবত মা স্বর্গছেঁড়ায় আছেন, গেলেই দেখা হবে। এখন এই সত্যটার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে অদ্ভুত কষ্ট হচ্ছিল ওর। মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে বাবাকে মনে পড়ে যেতে শক্ত হয়ে দাঁড়াল অনি। বাবার কি হয়েছে? দাদু কেন জোর করে ওকে স্বর্গছেঁড়ায় পাঠালেন? হঠাৎ অনি কুঁই কুঁই শব্দ পেয়ে পেছন ফিরে তাকাতেই দেখতে পেল একটা কালো রঙের ঘেয়ো নেড়ি কুকুর চার পা মুড়ে মাটিতে বসে ওর দিকে কেমন আদুরে চোখে তাকিয়ে শব্দ করছে। কুকুরটাকে চিনতে পারল ও, মা এঁটো ভাত দিতেন, কালু বলে ডাকতেন, আর একদম পছন্দ করতেন না পিসীমা কুকুরটাকে। আশ্চর্য, ও কি করে অনিকে চিনতে পারল! আর একবার কড়া নাড়তেই ভেতরে খিল খোলার শব্দ হল। দরজার কপাট খুলে যেতে অনি দেখল ছোট মা দাঁড়িয়ে আছে।

'ওমা, তুমি! কি চমকে দিয়েছ, আমি ভাবলাম কে না কে?' সত্যিই অবাক হয়ে গেছে ছোট মা, হাত বাড়িয়ে অনির ব্যাগটা নিয়ে কাছাকাছি হতেই আবার বলল, 'আরে, তুমি যে দেখছি আমাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছ মাথায়!'

অনি এখন চট করে কথা বলতে পারছিল না। অনেকদিন ছোট মা জলপাই-গুড়ি যায় নি। মহীতোষ একা গেছেন মাস কয়েক আগে। কিন্তু একটা মানুষের চেহারা যে এই সামান্য কয়েক মাসের ব্যবধানে এত খারাপ হতে পারে ছোট মাকে না দেখলে বোঝা যাবে না। কি রোগা হয়ে গেছে শরীরটা! দেখে মনে হয় ছোট মায়েরই খুব কঠিন অসুখ হয়েছে। কিন্তু গালের ওপর অতখানি কাটা দাগ কেন? অনি সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি কি পড়ে গিয়েছিলে?'

'না তো !' বলেই ছোট মা প্রশ্নটা বুঝতে পারল, 'ও হ্যাঁ, খোঁচা লেগেছিল একবার। তা তুমি হঠাৎ চলে এলে যে, স্কুল কি ছুটি ?'

'না, ছুটি না। দাদু জোর করে পাঠালেন, বাবার নাকি খুব অসুখ, কি হয়েছে ?' অনি ছোট মার পেছনে পেছনে ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ওদের বাইরের ঘরটা সেইরকমই রয়ে গেছে। এমন কি দু'দুটো সোফার ওপরে যে কভার ছিল সেগুলো অবধি একই রকম আছে, ছিঁড়ে যায় নি। ছোট মা বলল, 'অসুখ মানে ? বাবাকে কে খবর দিল ?' ছোট মা ঘুরে ওর দিকে তাকাল।

'জানি না। কাল বোধ হয় কেউ দাদুকে বলেছে। কিন্তু বাড়ি আসার সময় একটা রিকশার সঙ্গে অ্যাক্সিডেণ্টে দাদুর পা ভেঙে গেছে, আজ প্লাস্টার করে হাসপাতাল থেকে আসবে।' অনি খবরটা দিল।

'ও মা ! কি করে হল ? এখন কেমন আছেন ?'

'ভাল।'

'কিন্তু ওঁর এই অবস্থায় তুমি চলে এলে কেন ?'

'কি করব! দাদু যে জোর করে আমাকে পাঠালেন, কোন কথা শুনতে চাইলেন না। বাবা কোন্ ঘরে ? এখন কেমন আছেন ?'

খুব আস্তে ছোট মা বললেন, 'এখন ভাল আছেন, ফ্যাক্টরীতে গিয়েছেন।'

অবাক হয়ে গেল অনি, 'সে কি ! তাহলে কাল যে দাদু খবর পেলেন বাবা খুব অসুস্থ। দাদু লোকের কথায় চট করে বিশ্বাস করেন।' অনির মনে হল ছোট মা খুব কষ্ট করে হাসতে চেষ্টা করল।

মাঝের ঘরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল অনি। কোন জানলা খোলা নেই, যাওয়া-আসার দরজায় ভারী পর্দা ঝোলানো। প্রায়ান্ধকার ঘরের এক কোণায় টেবিলের ওপর প্রদীপ জ্বলছে। সেই প্রদীপের আলোয় অনি দেখতে পেল মাধুরী খুব গম্ভীর মুখে তাকিয়ে আছেন। বেশ বড় ফ্রেমের চৌহদ্দিতে মাধুরীর একটা অচেনা ছবি এনলার্জড করে ধরে রাখা হয়েছে। যেহেতু ঘরের ভেতর আলো আসার রাস্তা নেই তাই ছবির ওপর পড়া প্রদীপের আলোটা অদ্ভুতভাবে চোখ কেড়ে নেয়। অনির মনে হল মাকে যেন দেব-দেবীর মত লাগছে, এ-বাড়ির সবাই এখানে এসে পুজা করে যায়। কিন্তু এই বন্ধ ঘরে কিছুক্ষণ থাকলে দম বন্ধ হয়ে যাবে। একটা চাপা অস্বস্তি সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। মুখ ঘুরিয়ে ছোট মার দিকে তাকাতেই দেখল ছোট মা একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। খুব দ্রুত অনি বলল, 'জানলা বন্ধ করে রেখেছ কেন, খুলে দাও।'

সঙ্গে সঙ্গে ছোট মা চমকে উঠল, 'না, না। এ ঘরের জানলা খোলা বারণ। চল, ভেতরে যাই।' ছোট মা আর দাঁড়াল না। অনি দেখল ঘরের ভেতর ঠিক ছবির সামনে একটা খাট পাতা। ঘরটা থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে ছবিটার দিকে আর একবার তাকিয়ে ওর মনে হল মা যখন খুব গম্ভীর হয়ে যেতেন অথবা কোন কারণে যখন মায়ের মন খারাপ হয়ে যেত তখন এইরকম দেখাত।

ভেতরের ঘরে যেখানে অনিরা শুতো সেখানে একটা ছোট খাট আর তার চারপাশের কাপড়চোপড় দেখে বুঝতে অসুবিধে হল যে এটা ছোট মার ঘর, ছোট মা একাই শোয় এখানে।

ছোট মা বলল, 'আগে একটু জিরিয়ে নাও, আমি তোমার জন্য খাবার করি।'

অনি বলল, 'ঝাড়িকাকু কোথায়?'

ছোট মা যেন সামান্য ভ্রূকুটি করল, 'তুমি জান না?'

অনি ঘাড় নাড়ল। ছোট মা মুখ নিচু করে বলল, 'তোমার বাবার সঙ্গে তর্ক করেছিল বলে উনি ছাড়িয়ে দিয়েছেন। তা আমার অসুবিধে হচ্ছে না কিছু, একা মানুষ সারাদিন বসে থাকতাম, এখন কাজ করতে করতে বেশ দিনটা কেটে যায়।' ছোট মা উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলে অনির মনে হল ও যেন একদম অচেনা কোন পরিবেশে চলে এসেছে।

জুতো খুলে খালি পায়ে অনি উঠোনে এসে দাঁড়াল। ঝাড়িকাকুকে বাবা ছাড়িয়ে দিয়েছেন? পিসীমা বলতেন, ঝাড়িকাকু এ বাড়িতে এসে বাবাকে কোলে-পিঠে করেছেন, কাকুকে তো মানুষ করেছেন বলা যায়। ইদানীং অনির মনে হত ও সবকিছু বুঝতে পারে, ও অনেক বড় হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখন এই কাঁঠালগাছ আর তালগাছের দিকে তাকিয়ে ও কিছুতেই বুঝতে পারল না যে বাবা কি করে ঝাড়িকাকুকে ছাড়িয়ে দেন!

বাড়ির ভেতর যে বাগানটা ছিল সেটা অপরিষ্কার হয়ে আছে। অনি তারের দরজা ঠেলে পেছনে এল। গোয়ালঘরের আশেপাশে বেশ জঙ্গল হয়ে গিয়েছে। সেদিকে এগোতেই খুব দ্রুত হাম্বা হাম্বা ডাক শুনতে পেল অনি। গলাটা ধরা-ধরা, কিন্তু অনি চিনতে পারল। কাছাকাছি হতে ও একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল। গোয়ালঘরের কাছে বিচুলির স্তূপের পাশে কালীগাইকে বেঁধে রাখা হয়েছিল। অনিকে দেখে সে সমস্ত শক্তি দিয়ে দড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। এখন ওর অনেক বয়স, শরীর হাড়জিরজিরে হয়ে গেছে, ফলে বেচারার গলায় দড়ির চাপ লাগায় চোখ বড় বড় হয়ে যাচ্ছে। অনি দৌড়ে ওর পাশে যেতে গরুটা একদম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর খুব অভিমানী মেয়ের মত মাথা নিচু করে ফোঁস

ফোঁস শব্দ করতে লাগল। অনি ঘাড়ে হাত রাখতেই কালী ওর লম্বা গলাটা চট করে তুলে যেন অনিকে জড়িয়ে ধরতে কোমরের কাছে ঘষতে লাগল। সেই ফোঁস ফোঁস শব্দটা সমানে চলছে। অনি শব্দটার মানে বুঝতে পারছিল। বেচারার প্রচুর বয়স হয়ে গেছে। এখন নিশ্চয়ই আর দুধ দেয় না। মা ওকে এইটুকুনি কিনে এনেছিল। তারপর ওর নাতিপুতি বিরাট বংশে গোয়ালঘর ভর্তি হয়ে গেল। হঠাৎ অনির খেয়াল হল আর কোন গরুকে দেখতে পাচ্ছে না তো! কালীর আদরের চোটে যখন অস্থির তখন অনি ছোট মার গলা শুনতে পেল, 'তোমাকে দেখে ওর খুব আনন্দ হয়েছে না?'

অনি দেখল ছোট মা তারের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। কালী ওকে সরতে দিচ্ছে না, ওর গলায় হাত বোলাতে বোলাতে অনি বলল,' আর গরুগুলো কোথায়?'

ছোট মা বলল, 'ঝাড়ি চলে যাওয়ার পর তোমার বাবা রাগ করে সবকটাকে বিক্রী করে দিলেন।'

অনি অবাক হয়ে বলল, 'বিক্রী করে দিলেন?'

ছোট মা হাসলো 'দিদি খুব যত্ন করত, আমি পারি না, তাই। ঝাড়ি থাকতে ও-ই করত সব। তা যেদিন সবগুলোকে নিয়ে হাটে চলে যাবে সেদিন এই গরুটার কি কান্না! ঠিক বুঝতে পেরেছিল এ বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে। এখন তো আর দুধ দেয় না বেচারা, গায়ে জোরও নেই যে চাষ করবে, বোধ হয় কেটেই ফেলত ওকে। এমনভাবে কাঁদতে কাঁদতে আমার দিকে তাকাল যে আমি পারলাম না। তোমার বাবাকে অনেক বলেকয়ে ওকে রেখে দিলাম। বেশী দিন আর বাঁচবে না।'

হঠাৎ অনি আবিষ্কার করল কালীগাই-এর গলায় আদর করতে করতে কখন ওর দুই চোখ ঝাপসা হয়ে গেছে। ছোটমা সেই সময় ডাকল, 'এসো, হাতমুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে নাও। সেই কোন সাতসকালে বেরিয়েছ।'

ছোট মার হাতের রান্না ভাল, তরকারিটা খেতে খেতে অনির মনে হল। একটু ঝাল-ঝাল, কিন্তু বেশ সুস্বাদু। লুচি ওর খুব প্রিয় জিনিস, ফুলকো হলে কথাই নেই। ঠিক এই সময় অনি শুনতে পেল বাইরের ঘরের দরজায় কে যেন খুব জোরে জোরে শব্দ করছে। খেতে খেতে ও উঠতে যাবে ছোট মা রান্নাঘর থেকে ছুটে এল, 'তুমি খাও, আমি দেখছি।'

ভেতরের বারান্দায় জলখাবার খাবার চল এ বাড়িতে এখনও আছে। টুলমোড়াগুলো পাল্টায়নি। খেতে খেতে অনি পিসীমার ঘরটার দিকে তাকাল, দরজা খোলা, ওটা বোধ হয় গুদামঘর করা হয়েছে। ঘরটার ওপরে পেয়ারা গাছটা

তার সব ডালপালা যেন নামিয়ে দিয়েছে, বেশ ডাঁশা ডাঁশা পেয়ারা হয়েছে গাছটায়। এই সময় বাইরের ঘরে বেশ জোরে একটা ধমক শুনতে পেল অনি, 'কোথায় আড্ডা মারা হচ্ছিল, অ্যাঁ? আধঘণ্টা ধরে ডাকছি, দরজা খোলার নাম নেই?' ছোট মা বোধ হয় কিছু বলতেই চিৎকারটা জোরদার হল, 'কেন আস্তে বলব কেন? বিয়ের সময় তোমার বাপ তো বলে দেয় নি তোমার কান খারাপ!'

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল, অনি উঠে দাঁড়াল। গলাটা নিচে নেমে আসতে ও স্পষ্ট চিনতে পারল। আর চিনতে পেরেই হতভম্ব হয়ে গেল। মহীতোষকে এ গলায় কোনদিন কথা বলতে শোনেনি অনি। আজ অবধি বাবাকে কারো সঙ্গে ঝগড়া করতে দ্যাখেনি পর্যন্ত। মায়ের সঙ্গে যখন ঠাট্টা করতেন তখন বাবার গজদাঁত দেখা যেত। ও কিছুতেই মেলাতে পারছিল না। এমন কি বাবা যখন জলপাইগুড়ি যান তখনও তো এ ধরনের কথা বলেন না। মেয়েদের এ বাড়িতে কেউ বকেছে, এমন গলায়, মনে করতে পারে না অনি। তা ছাড়া, ওর যে জন্য আসা, বাবার এই গলা শুনে কিছুতেই মনে হচ্ছে না যে তাঁর কোন অসুখ করেছে।

'ধূপ জ্বলছে না কেন, ধূপ?' আবার চিৎকার ভেসে এলো, এবার কাছে। বোধ হয় বাবা এখন মাঝের ঘরে চলে এসেছেন। তবে স্বরটা কেমন কাঁপা-কাঁপা, সুস্থ নয়।

ছোট মার গলা শুনতে পেল ও, 'নিবে গেছে।'

'অ্যাই!' গর্জনটা অদ্ভুতভাবে গোঙাল যেন, 'সারাদিন খ্যাটন মারছ, একটা কাজ বললে পাওয়া যাবে না, না?'

'আঃ। আস্তে কথা বল।' ছোট মা যেন ধমকে উঠলেন।

'ও বাবা! আবার গলায় তেজ হয়েছে দেখছি। ঝেড়ে বিষ নামিয়ে দেব?'

জবাবে ছোট মা বলল, 'অনিমেষ এসেছে।'

প্রথমে বোধ হয় বুঝতে পারেননি বাবা, 'কে এসেছে? আবার কে জুটল?'

ছোট মা বলল, 'অনিমেষ—অনি।'

এবার চটপট বাবার কেমন হয়ে যাওয়া গলাটা কানে এল, 'অনি? অনি এসেছে! কোথায়?'

'ভেতরে, খাচ্ছে।' খুব নির্লিপ্ত ছোট মার গলা।

তু'মি আনালে?'

'না, বাবা পাঠিয়েছেন, তোমাকে দেখতে। অসুখের খবর পেয়েছেন কার মুখে। কাল বাবারও পা ভেঙেছে।'

'সে কি ! কি করে ?'

'রিকশার ধাক্কা লেগে। আজ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবেন। তবু ছেলেকে পাঠিয়েছেন তোমায় দেখতে, আর তুমি—।' কেমন ধরা-ধরা লাগল ছোট মার গলা।

'অ্যাই, আগে বলোনি কেন যে ও এসেছে ? ছেলেকে শাখাতে চাও, না ? প্রতিশোধ নিতে চাও, না ?'

'তুমি আমাকে কিছু বলার সুযোগ দাওনি। রোজ রোজ তুমি যা কর আমি আর পারি না—।' এবার যেন কেঁদে ফেলল ছোট মা।

সঙ্গে সঙ্গে বাবা বলে উঠলেন, 'অ্যাই, চুপ। খবরদার এ ঘরে দাঁড়িয়ে তুমি কাঁদবে না। ছেলেকে শোনাচ্ছ বুঝতে পারছি। খবরদার, কোন নালিশ করবে না।'

ছোট মা বলল, 'চমৎকার ! তোমার নামে আমি ঐটুকু ছেলের কাছে নালিশ করব ? গলায় দড়ি জোটে না তার চেয়ে !'

বাবা বললেন, 'গুড, গুড। তা সে কোথায় ? অনেকদিন পরে এল, না ?'

অনির খুব লজ্জা করছিল। বাবার গলা তার আসার খবর পেয়ে অদ্ভুতভাবে যে পাল্টে গেল এটা টের পেয়ে লজ্জাটা যেন আরো বেড়ে গেল। মা বেঁচে থাকতে বাবা কি কখনও এরকম ভাবে কথা বলতে পারতো ? বাবার গলা ক্রমশ এদিকে এগিয়ে আসছে। ওর ইচ্ছে করছিল দৌড়ে এখান থেকে চলে যায়, বাবার সঙ্গে এই মুহূর্তে দেখা না হলেই যেন ভাল হয়।

মহীতোষ এলেন। খুব শব্দ করে। জুতো মশমশিয়ে। বারান্দায় পা দিয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে যেন অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। এই কয় মাসে লাউডগার মত চড় চড় করে বেড়ে গেছে শরীরটা, মাথায় মহীতোষকে ধরতে আর দেরি নেই। নিজের ছেলেকে এখন হঠাৎ লোক-লোক বলে মনে হল মহীতোষের। চোখাচোখি হতেই গলা ঝাড়লেন মহীতোষ, 'কখন এলে ?'

অনি কয়েক পা এগিয়ে এসে বাবাকে প্রণাম করল। প্রণাম সেরে উঠতে উঠতে ওর খেয়াল হল ছোট মাকে প্রণাম করেনি। এখন চারপাশে ছোট মাকে দেখতে পেল না। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটু আগে।'

বাবার চেহারাটা এরকম হয়ে গেল কি করে ? কেমন রোগা-রোগা, চোখের তলায় কালি, গাল ভাঙা। মাথার চুল লালচে-লালচে—মাঝে মাঝে চিকচিক

করছে। অসুখটা কি। মহীতোষ বললেন, 'স্কুল বন্ধ ?'

'না। অসুখের খবর শুনে দাদু জোর করে পাঠালেন।'

'অসুখ ? কার অসুখ ? আরে না, না, কে এসব বাজে কথা রটায়। আমি ভাল আছি। স্কুল যখন খোলা তখন তোমার আসা উচিত হয় নি। তোমার মা থাকলে রাগ করতেন। তোমার এখন ফার্স্ট ডিউটি অধ্যয়ন। তোমার মায়ের ঘরে গিয়েছ ?' মহীতোষ চোখ বড় বড় করে তাকালেন।

অনির হঠাৎ মনে হল বাবা ঠিক স্বাভাবিক ভাবে কথা বলছেন না। কথাগুলো যেন অসংলগ্ন এবং সেটা তিনি নিজেও টের পাচ্ছেন না। মায়ের ঘর মানে ? যে ঘরে মায়ের ছবি আছে সেই ঘর ? ও না বুঝে ঘাড় নাড়ল।

মহীতোষ বললেন, 'গুড। ও ঘরে গিয়ে চুপচাপ করে বসে থাকলে দেখবে, 'ইউ ক্যান ফিল হার।' অনি লক্ষ্য করল কথাটা বলার সময় বাবার চোখ কেমন জলজ্বল করে উঠল। ওর মনে পড়ল ছোট মা খবর দেওয়া সত্ত্বেও বাবা দাদুর অ্যাক্সিডেন্টের কথা বলছেন না কিছু! ও ঠিক করল না বললে সেও কিছু জানাবে না। কারণ ওর মনে হল বাবার মাথায় এখন অন্য কোন চিন্তা রয়েছে, দাদুর কথাটা একদম ভুলে গিয়েছেন।

ছোট মাকে রান্নাঘর থেকে জলখাবার নিয়ে বের হতে দেখে বাবা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন, 'আচ্ছা, তুমি তাহলে আজকের দিনটা থাক অনি। স্কুল কামাই করা ঠিক কথা নয়। দাদুর ওখানে তোমাকে রেখেছি—হ্যাঁ, দাদুর নাকি পা ভেঙে গেছে, রিকশার সঙ্গে ধাক্কা লেগে ?'

অনি ঘাড় নাড়ল, 'কাল বিকেলে হয়েছে, হাসপাতালে ছিলেন। আজ প্লাস্টার করে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে।'

এবার যেন মহীতোষের কানে শোনা চেহারাটাকেই সামনাসামনি দেখতে পেল অনি, 'অ্যাঁ! দাদুকে হাসপাতালে রেখে তুমি চলে এসেছ ? আশ্চর্য অকৃতজ্ঞ ছেলে! লেখাপড়া শিখে তুমি বাঁদর তৈরি হচ্ছ ? যে তোমাকে বুকে আগলে রেখেছে তার প্রতি কর্তব্য বলে কিছু নেই ? ছি ছি ছি!'

জীবনে এই প্রথম কেউ তাকে এসব শব্দ দিয়ে তৈরী কড়া বাক্য শোনাল। অনি বাবার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সমস্ত শরীরে একটা আলোড়ন অনুভব করল। তারপর কোনরকমে বলল, 'আমি আসতে চাই নি, দাদু জোর করে পাঠালেন।' এখন অনির আর কান্না পাচ্ছিল না, এত শক্ত কথা শুনেও ওর ভেতরে কোন অভিমান হচ্ছিল না। বরং ও খুব শক্ত হয়ে সিঁটিয়ে দাঁড়াল।

'তুমি আসতে চাওনি, গুড, গুড। তা এই প্রথম বাপ-মায়ের কথা মনে

পড়ল ? গিয়েছে তো অনেকদিন, আমরা এখানে কেমন আছি খোঁজ রেখেছ ! "আমি আসতে চাইনি"—তা তো বলবেই !' মহীতোষ কেমন ঠাট্টা অথচ রাগ-রাগ গলায় বললেন। এর জবাব কি দেবে অনি ? মা থাকতে বাবা তাকে আনতে চান নি। এখন এলেও দোষ না এলেও দোষ। অনি কোন কথা বলছে না দেখে মহীতোষ ছেলের দিকে তাকালেন। তারপর দু'পা এগিয়ে অনির কাঁধে হাত রাখলেন, 'রাগ করো না, একটু বুঝতে শেখো। তোমার মা তো তোমার জন্যই মারা গেলেন !'

চমকে উঠল অনি, 'আমার জন্য ?'

ঘাড় নাড়লেন মহীতোষ, 'হ্যাঁ। তোমার জেলে যাবার ভবিষ্যৎ-বাণীটা শোনার পর থেকেই ছটফট করছিল। না হলে বৃষ্টির মধ্যে কেউ ঐ অবস্থায় ছাদে আসে। আমিও দোষী, বুঝলি অনি, আমি যদি তখনই হাসপাতালে নিয়ে যেতাম—। ওর চলে যাওয়ার জন্য আমরা সবাই দায়ী।'

হঠাৎ ছোট মার গলা মহীতোষকে যেন বাধা দিল, 'অনেক হয়েছে, ছেলেটা এল আর সঙ্গে সঙ্গে ওকে নিয়ে পড়লে। ওকে ছেড়ে দাও।' লুচির থালাটা টেবিলের ওপর রাখল ছোট মা।

মহীতোষ ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার মা আমার সঙ্গে এভাবে কোনদিন কথা বলেনি।'

অনি কোন উত্তর দিল না। বাবার দিকে না তাকিয়ে আস্তে আস্তে উঠোনে নেমে এল। এই মুহূর্তে ও বাবাকে যেন সহ্য করতে পারছিল না।

বাইরের খোলা মাঠে একরাশ ছাগল গলায় ঘন্টি বেঁধে টুং টাং শব্দ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনি আচ্ছন্নের মত সেখানে এসে দাঁড়াল। এখন মনে হচ্ছে এই বাড়িতে ওর কোন জোর নেই। নিজের বাড়ি বলে ও আর ভাবতে পারছে না। এখন যদি জলপাইগুড়িতে চলে যেতে পারত, ও ঠিক করল বিকেলের বাসে ফিরে যাবে। বাবা কি করে এত বদলে গেলেন ? বাবার এই চেহারাটা জলপাই-গুড়িতে ওরা কেউ টের পায়নি।

সামনের আসাম রোড দিয়ে হুস হুস করে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। একরাশ মদেসিয়া মেয়ে পিঠে টুকরি বেঁধে চা পাতি নিয়ে ফ্যাক্টরীর দিকে ফিরে যাচ্ছে। অনি কোয়ার্টারগুলোর সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। মাথার ওপর ঠা-ঠা রোদ এখন। বিশু বা বাপীরা এখন নিশ্চয়ই স্কুলে। সীতাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে অনি শুনতে পেল কেউ তার নাম ধরে ডাকছে। ও দেখল বাড়ির জানলায় সীতার ঠাকুমা বসে আছেন। ওকে তাকাতে দেখে হাত নেড়ে ডাকলেন।

ঠাকুমাকে দেখে অনির খুব ভাল লাগল। অনি যখন এখানে থাকত তখন ঠাকুমা রোজ বিকেলে ওদের বাড়িতে পিসীমার কাছে বেড়াতে আসতেন। ঠাকুমার কাছে ওরা কত মজার গল্প শুনেছে।

গেট খুলে বাগান পেরিয়ে বারান্দায় উঠল অনি। সীতাদের কোয়ার্টারটা একই রকম আছে, চোখ বন্ধ করে ও ঘোরাফেরা করতে পারে। বাঁ দিকের ঘরে ঠাকুমা বসে আছেন। ওকে দেখেই ফোকলা দাঁতে বলে উঠলেন, 'আয় দাদু, কাছে এসে বস, কখন এলি ?'

ঠাকুমার চেহারা একই রকম আছে। বিছানার ওপর ছড়ানো পা দুটো দেখল অনি, বেশ ফোলা ফোলা। 'চোখে বড় কম দেখি আজকাল, তাই ভাবলাম সত্যি দেখছি তো! কি লম্বা হয়ে গেছিস দাদু, আয় কাছে এসে বস।'

হাত বাড়িয়ে বিছানার একটা ধার দেখিয়ে দিতে অনি সেখানে বসল, 'কেমন আছ ঠাকুমা ?'

'ওমা, গলার স্বর ত্থাখ, একদম ব্যাটাছেলে ব্যাটাছেলে লাগছে। তা হ্যাঁ দাদু, এখান থেকে চলে গিয়ে আমাদের এমন করে ভুলে যেতে হয়?' ঠাকুমা তার শির বার করা হাত অনির গায়ে বোলাতে লাগলেন।

মনটা কেমন হয়ে যাচ্ছিল অনির, আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি একইরকম আছ।'

'সে কি! দু'রকম হতে যাবো কেন? কিন্তু আজকাল একদম হাঁটতে পারি না রে, বাতে পেড়ে ফেলেছে, পা দুটো ত্থাখ, কলাগাছ। কবে যে ছাই যমের রুচি হবে। সে বেটি তো স্বার্থপরের মত কলা দেখিয়ে চলে গেল!' ঠাকুমার শেষ কথাটা শুনে অনি ওঁর মুখের দিকে তাকাতেই তিনি কেঁদে ফেললেন, 'গৃহপ্রবেশে যাবার আগে আমায় বলে গেল তোমার ওপর সব দায়িত্ব, এবার দিদি নেই। তা আমি বসে বসে আটখানা কাঁথা সেলাই করে রেখেছিলাম, মাধুর বড় ইচ্ছে ছিল মেয়ে হোক এবার।' ডুকরে ওঠা কান্নাটাকে কোনরকমে সামলে আবার বললেন, 'তা সেসব কাঁথা আমার কাছে পড়েই রইল। মহীকে এত করে জিজ্ঞাসা করলাম, বাঁচাতে পারলি না কেন? জবাব দেয় না।'

মায়ের কথা ঠাকুমা এভাবে বলবেন আন্দাজ করতে পারেনি অনি। এসব কথা শুনেও ওর কান্না পাচ্ছে না কেন আজ? হঠাৎ ঠাকুমা গলা নামিয়ে যেন কোন গোপন কথা বলছেন এই ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর সৎমা বড় ভাল মেয়ে রে। এত লোককে দেখলাম, মেয়ে দেখলে আমি চিনতে পারব না? বেশ মেয়ে, কিন্তু বড় দুঃখী। তুই ওকে কষ্ট দিস না ভাই।'

হাসতে চেষ্টা করল অনি, 'কি যা-তা বলছ! আমি কষ্ট দিতে যাব কেন?'

ঠাকুমা যেন কি বলতে গিয়ে বললেন না। তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললেন, 'তোর দাদু কেমন আছে রে?'

অনি দাদুর খবরটা দিতেই মাথা নাড়তে লাগলেন বুড়ী, 'এই বয়সে পা ভাঙলে কি আর জোড়া লাগে! দেখেশুনে তো রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হয়। তা হ্যাঁ দাদু, তেনার পা সেরে গেলে শিগ্‌গীর একবার নিয়ে আসতে পারবি?'

'কেন?'

'দরকার আছে ভাই। নইলে যে সব ভেসে যাবে। আমি তো বিছানা থেকে উঠতে পারি না, আমার কথা কে শোনে! কিন্তু আমার কানে তো সব আসে। দাদুভাই, আমাদের সবাইকে ভগবান নিজের নিজের জায়গায় থাকতে দিয়েছেন, আমরা যদি বাড়াবাড়ি করি তবে তিনি সইবেন কেন? তা তুই কিন্তু মনে করে তেনাকে বলিস!'

ব্যাপারটা কেমন অস্পষ্ট অথচ কিছু একটার ইঙ্গিত পাচ্ছে অনি। ও জানে ঠাকুমাকে, এ বিষয়ে বেশী প্রশ্ন করে লাভ হবে না।

ঠাকুমা হঠাৎ চিৎকার শুরু করলেন, 'ও বউমা, দ্যাখ কে এসেছে। তোমার বন্ধুর ছেলে গো।'

সাধারণত চা-বাগানের এইসব কোয়ার্টারের রান্নাঘর একটু দূরে, উঠোন পেরিয়েই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সেখান থেকে মহিলাকণ্ঠে সাড়া এল। অনি বলল, 'সীতা কোথায়? স্কুলে?'

'সে মুখপুড়ি গলা ফুলিয়ে বিছানায় কাৎ হয়ে আছে। যা না, পাশের ঘরে গিয়ে দ্যাখ না, দুদিনের জ্বরে কি চেহারা হয়েছে!'

অনি উঠে পাশের ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। এখানে দাঁড়িয়েই ও সীতাকে দেখতে পেল। একটা বড় খাটের ঠিক মধ্যিখানে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। মুখটা ঘামে ভর্তি। চোখ দুটো বোজা—অঘোরে ঘুমুচ্ছে। শব্দ না করে পাশে এসে দাঁড়াল অনি। বোধ হয় জ্বর ছাড়ছে ওর, বালিশ অবধি ঘামে ভিজে গেছে। ঘুমোলে মানুষের মুখ কেমন আদুরে আদুরে হয়ে যায়।

ডাকতে মায়া হল অনির, ফিরে যাবে বলে ঘুরতেই ও সীতার মাকে দেখতে পেল। রান্না করতে করতে বোধ হয় ছুটে এসেছেন, 'ও মা, অনি কখন এলি?' দেখেছেন মা, কি লম্বা হয়ে গেছে!'

ঠাকুমা বললেন, 'ওদের গুষ্টির ধাত লম্বা হওয়া।'

'এই তো আজ সকালে।' অনি হাসল।

'তোর নাকি এত পড়ার চাপ যে আসবার সময়ই পাস না?' সীতার মা

বললেন।

অনি বলল, 'কে বলল ?'

'তোর নতুন মা!' কথাটা বলেই ভদ্রমহিলা চট করে শাশুড়ীর দিকে তাকালেন। তারপর বলে উঠলেন, 'দাঁড়িয়ে কেন, বস। আজকে নাড়ু বানিয়েছি, খেয়ে যা। ছেলেবেলায় ও নাড়ু খেতে কি ভালবাসত, না মা ?'

ঠাকুমা হাসলেন, 'একবার হেমের ঠাকুরঘরের নাড়ু চুরি করে খেয়েছিল বলে দশবার ওঠবোস করেছিল।'

অনি বলল, 'আজ থাক ঠাকুমা। আমি এইমাত্র খেয়ে আসছি।'

ঠাকুমা বললেন, 'থাক মানে ? এ বাড়ি থেকে না খেয়ে যাবি ? বড় হয়ে গেছিস বুঝি ! আর ও মেয়েটা যদি ঘুম থেকে উঠে শোনে যে তুই এসে না কথা বলে চলে গেছিস তাহলে আমাকে আস্ত রাখবে ?'

সীতার মা বললেন, 'তুমি ওকে ডেকে তোল, অবেলায় ঘুমোচ্ছ ! আমি তোমার নাড়ু নিয়ে আসছি।' রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন তিনি।

অনি আবার সীতার দিকে ফিরে তাকাল। ঠোঁটটা ঈষৎ ফাঁক হয়ে থাকায় সাদা দাঁত চিকচিক করছে। মুক্তোর মত ঘামের ফোঁটা কপালময়, গলায় ছড়ানো। রুক্ষ একরাশ চুল ফেঁপে ফুলে বালিশটাকে অন্ধকার করে রেখেছে। হঠাৎ অনির খুব অস্বস্তি হতে আরম্ভ করল। ও ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ঠাকুমা পাশের ঘরের খাটে বসে খোলা দরজা দিয়ে তাকে দেখেছেন। চোখাচোখি হতে হেসে বললেন, কি কি হল, চেঁচিয়ে ডাক। মেয়েটা একটু কালা আছে।'

হঠাৎ অনির মনে পড়ল ছেলেবেলায় সীতা কানে একটু কম শুনতো। ও এবার ঝুঁকে পড়ে চেঁচিয়ে ডাকল, 'সীতা, সীতা !'

আচমকা ঘুম ভেঙে গেলে যে অস্বচ্ছতা থাকে সেটা কাটিয়ে উঠতে একটু সময় লাগল সীতার। মুখের সামনে একটি অনভ্যস্ত মুখ দেখতে পেয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

একটু সময় সামলে উঠতে দিয়ে অনি বলল, 'খুব ভয় পেয়ে গেছিস, না ?'

খুব দ্রুত খাটের ওপর বাবু হয়ে বসে গায়ের চাদরটা শরীরে জড়িয়ে নিতে নিতে সীতা হাসতে চেষ্টা করল, দুর্বলতায় হাসিটা সচ্ছল হল না, 'শেষ পর্যন্ত আমাদের মনে পড়ল ?'

জবাব দিতে গিয়ে কথা আটকে গেল অনির। সীতা কেমন বড়দের মত কথা বলছে। এখন ও বসে আছে গায়ে চাদর জড়িয়ে কিন্তু তবু কেমন বড়-বড় দেখাচ্ছে। যুৎসই উত্তর খুঁজে না পেয়ে সামান্য হাসল অনি, 'জ্বর বাধিয়ে বসে

আছিস ?'

'এই একটু। কখন আসা হল ?' সীতার বোধ হয় অস্বস্তি হচ্ছিল, খাট থেকে নেমে দাঁড়াল।

অনি বলল, 'সকালে। তুই শো, উঠলি কেন ?'

'সারাক্ষণই তো শুয়ে আছি। তা নিজের থেকে আমাদের বাড়িতে আসা হয়েছে, না ঠাকুমা ডাকল ?' সীতা চোখ বড় বড় করল।

এখন এই মুহূর্তে সত্যি কথাটা বলতে অনির ইচ্ছে করছিল না। ওকে ইতস্তত করতে দেখে সীতা ঘাড় ঘুরিয়ে পাশের ঘরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠাকুমা, তুমি ওকে ডেকেছ, না ?'

বুড়ী প্রথমে ঠাওর না করতে পারলেও শেষে বললেন, 'ও আসব আসব করছিল আর আমিও ডেকে ফেললাম, কেন কি হয়েছে ?'

সীতা বলল, 'জলপাইগুড়ির জেলা স্কুলে পড়ে তো, আমাদের এখানে আসাটা মানায় না।'

ঠাকুমা হেসে বললেন, 'পাগলি।'

অনি ঘাড় নাড়ল, 'ঠিক ঠিক। এখনও বাচ্চা আছিস তুই।'

চোখের কোণে তাকাল সীতা, 'তাই নাকি! এখনও হাফ প্যাণ্ট পরা হয় কিন্তু।'

অনি চট করে জিভটা সামলে নিল। ও সীতাকে বলতে পারত যে, সে-ও ফ্রক পরে, কিন্তু ক্রমশ ও টের পাচ্ছিল সীতা যেন ওর চেয়ে অনেক বেশী বুঝে কথা বলে। সেই ছেলেবেলার সীতা, যে কিনা শক্ত হাতে হাত ধরলে কেঁদে ফেলত, সে কেমন করে কথা বলছে ত্যাখ।

প্রসঙ্গ ঘোরাতে চাইল অনি, 'বিশু বাপীদের খবর কি রে ?'

পিঠের ফুলে থাকা ডানগোছের চুলটাকে সামনে এনে সীতা আঙুলে তার ডগা জড়াতে জড়াতে বলল, 'বিশু তো কুচবিহারে জেঙ্কিংস স্কুলে পড়ছে। চিঠি লেখালেখি পর্যন্ত হয় না ?'

ঘাড় নাড়ল অনি, 'না।'

'চমৎকার! আমি ভাবলাম শুধু আমিই বঞ্চিত। আর বাপীর কথা না বলাই ভাল। অন্যের কাছে শুনলেই হয়।' সীতা গম্ভীর মুখে বলে আবার খাটে পা ঝুলিয়ে বসে পড়ল। বোধ হয় দাঁড়াতে ওর কষ্ট হচ্ছিল।

'কেন, কি হয়েছে ওর ?'

'খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে বাপী। মেয়েদের টিটকিরি দেয়, সাইকেল নিয়ে পেছন পেছন ঘোরে। রাজারহাট স্কুলে ভর্তি হয়েছিল, যায়ই না।' মুখ বাঁকাল

সীতা।

'তোকে কিছু বলেছে?' বাপীর চেহারাটা ও এই বর্ণনার সঙ্গে মেলাতে পারছিল না।

'ইস্, অত সাহস আছে? একদিন রাস্তায় হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলেছিল—এই সীতা, রাবণ এলে খবর দিস; কি অসভ্য ছেলে!'

হেসে ফেলল অনি, 'তুই কি বললি?'

'আমি খুব চেঁচামেচি করে উঠতে ও পালিয়ে গেল। যাবার আগে কেমন ঘাবড়ে গিয়ে বলে গেল, তুই আমাদের সেই সীতা তো রে, বড় হয়ে গেলে তোরা সব কেমন হয়ে যাস। ও চলে গেলে দম ফেলে বাঁচি বাবা।' সীতা বুকে হাত রাখল, জানি না, আমার সামনে যিনি আছেন তিনি শহরে এ সব করেন কিনা। দেখে তো মনে হয়, খুব শান্তশিষ্ট।'

হঠাৎ অনি আবিষ্কার করল যে, সীতা ওকে এতক্ষণ ধরে তুই বা তুমি কোনটাই বলছে না। এভাবে সম্বোধন না করে কথা বলা খুব সহজ নয়, কিন্তু সীতা বেশ অবলীলায় তা চালিয়ে যাচ্ছে।

এই সময় সীতার মা এক ডিশ খাবার হাতে ঘরে এলেন। অনি দেখল, তিল আর নারকোলের নাড়ুতে ডিসটা সাজানো, সন্দেশও আছে।

সীতার মা বললেন, 'নাও, খেয়ে নাও। তুমি যা ভালবাস তাই দিলাম।'

খাবার দেখে আঁতকে উঠল অনি, 'এখনও পেট ভরাট, এত খেতে পারব না।'

সীতা হঠাৎ হেসে উঠল শব্দ করে, 'ও ঠাকুমা, শুনছ, তোমার নাড়ুগোপাল বলছে খেতে পারব না, শহরের জল পেটে পড়লে সব পালটে যায়।'

অনি একটু ধমকের গলায় বলল, 'খুব পাকা পাকা কথা বলছিস তুই।'

সীতার মা বললেন, 'ঠিক বলেছ তুমি। ভীষণ অসভ্য মেয়ে। ভাবছি এবার ওকে এখানকার স্কুল থেকে ছাড়িয়ে জলপাইগুড়িতে তপুদের স্কুলে পাঠিয়ে দেব। হোস্টেল আছে বেশ হবে তখন।'

পাশের ঘরে খাটের ওপর বসে ঠাকুমা বললেন, 'মেয়ে হয়েছে যখন, তখন পরের ঘরে তো যাবেই একদিন, এখান থেকে বাড়ির বাইরে পাঠানোর কি দরকার?'

সীতার মা বললেন, 'না, এখানে ওর পড়াশুনা হচ্ছে না।'

ঠাকুমা বললেন, 'জন্মেছে তো হাঁড়িখুনতি ঠেলতে—বিয়ে নিয়েও তো সেই একই গতি। মেয়েকে পড়াশুনা করে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়র হতে দেবে?'

চট করে কথাটার জবাব দিলেন না সীতার মা, 'যাই বলুন, শহরের ভাল স্কুলে পড়লে চেহারাই অন্য রকম হয়ে যায়। এই দেখুন আমাদের অনিকে, এখানকার

ছেলেদের চেয়ে কত আলাদা, দেখলেই বোঝা যায়।'

সীতা ফুট কাটল, 'নাড়ুগোপাল নাড়ুগোপাল!'

সীতার মা মেয়েকে ধমক দিলেন।

অনি যতটা পারে খেল, তারপর খানিকক্ষণ গল্প করে চলে আসার জন্য উঠল। ঠাকুমা আবার দাদুকে বলার জন্য অনিকে মনে করিয়ে দিলেন। বাইরে এখন রোদ নেই বলা যায়। একটা বিরাট মেঘ ভুটানের পাহাড় থেকে ভেসে এসে এই স্বর্গছেঁড়ার ওপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। তাই চারধার কেমন ছায়া-ছায়া।

সীতা বাইরের দরজা অবধি হেঁটে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কবে যাওয়া হবে?'

অনি বলল, 'বোধ হয় কাল।'

কেমন উদাস গলায় সীতা বলল, 'আজ বিকেলে কি বাপীর সঙ্গে আড্ডা মারা হচ্ছে?'

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল অনি, 'কেন?'

'এখানে এলেই হয়।' সীতা দরজার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ওর গায়ে এখন চাদর নেই। জ্বর না থাকলেও তার ছাপটা মুখে স্পষ্ট। ওর শরীর এবং পায়ের দিকে তাকাতেই অনির মনে হল—সীতা খুব বড় হয়ে গেছে। সেই কামিনটার মত সীতার শরীর এখন। চাহনিটা দেখে বোধ হয় সীতা সোজা হয়ে দাঁড়াল, 'বিকেলে না এলে আর কথা বলব না। অসভ্য।' বলে সীতা দ্রুত পায়ে ভেতরে চলে গেল।

হঠাৎ অনির বুকের ভিতর কি যেন কেমন করে উঠল। সীতাকে আর একবার দেখার জন্য মুখ ফিরিয়ে ও দেখল জানলায় বসে ঠাকুমা ওর দিকে চেয়ে আছেন।

বাগানের এলাকা ছাড়িয়ে আসাম রোড ধরে বাজারের দিকে হাঁটতে বেশ অবাক হয়ে গেল অনি। দুপাশে এত দোকানপাট হয়ে গেছে যে, জায়গাটাকে চেনাই যায় না। আগে যেসব জায়গায় শুধু হাটবারে ত্রিপল টাঙিয়ে দোকান বসত সেখানে বেশ মজবুত কাঠের দোকানঘর দেখতে পেল সে। দোকানদারদের অধিকাংশই অচেনা, বোঝা যাচ্ছে বাইরে থেকে প্রচুর লোক স্বর্গছেঁড়ায় এসে স্থায়ী আস্তানা গেড়ে বসেছে। শুয়োর-কাটার মাঠটা ছাড়িয়ে আগে নদী, ওপারের ধানক্ষেত স্পষ্ট দেখা যেত, এখন সব আড়ালে পড়ে গিয়েছে।

বিলাসের মিষ্টির দোকানটা বেশ বড হয়েছে যেন, নতুন শো-কেসের মধ্যে মিষ্টির থালাগুলো দূর থেকে দেখা যায়। বিলাসকে কাছেপিঠে দেখল না সে। আঙরাভাসা নদীর পুলটার ওপরে এসে দাঁড়াল অনি। নীচে লকগেটের তলা

দিয়ে সেই রকম জল প্রচণ্ড স্রোতে ফেনা ছড়িয়ে বয়ে যাচ্ছে ওদের কোয়ার্টারের পিছন দিক দিয়ে ফ্যাক্টরীর হুইল ঘোরাতে। অনির মনে পড়ল বাপী একবার বলেছিল, এখান থেকে সাঁতরে সীতার বাড়ির পেছন অবধি যাবে, আর যাওয়া হয়নি। বাপীটা এরকম হয়ে গেল কি করে? মেয়েদের টিটকিরি দিলে কি লাভ হয়? বরং সীতার মত মেয়েরা তো চেঁচামেচি করবে। তা ছাড়া খামোকা টিটকিরি দেবেই বা কেন?

ভরত হাজামের দোকানটা নেই। সেখানে এখন বেশ বড়সড় সেলুন হয়েছে, ওপরে সাইনবোর্ডে নাম পড়ল অনি, 'কেশচর্চা'। রাস্তা থেকেই ভেতরের বড় বড় আয়না, চেয়ার দেখা যায়। বুকে সাদা কাপড় বেঁধে তিনজন লোক চুল কাটছে খদ্দেরেরা। সেই ল্যাংড়া কুকুর বা ভরত হাজাম, কাউকে কাছেপিঠে চোখে পড়ল না। নাচ বুড়িয়া নাচ, কান্ধে পর নাচ—অনি হেসে ফেলল।

চৌমাথায় এসে অনির চমক আরো বেড়ে গেল। স্বর্গছেঁড়া যেন রাতারাতি শহর হয়ে গিয়েছে। পুরো চৌমাথা ঘিরে পান সিগারেট, রেস্টুরেন্ট আর স্টেশনারি দোকানে ছেয়ে গেছে। ওপাশের পেট্রলপাম্পের গায়ে অনেক নতুন নতুন সাইন-বোর্ড ঝুলছে। সকাল পেরিয়ে যাওয়া এই সময়টায় আগে স্বর্গছেঁড়ার রাস্তায় লোকজন থাকত না বললেই চলে, এখন জলপাইগুড়ির মত জমজমাট হয়ে আছে। এমন সময় কুচবিহার-জলপাইগুড়ি রুটের একটা বাস এসে স্ট্যাণ্ডে দাঁড়াতে অনি সেদিকে তাকাল। দুতিনজন কুলি মাল বইবার জন্য ছুটে গেল সেদিকে। তাদের একজনের দিকে নজর পড়তে অনি সোজা হয়ে দাঁড়াল, ঝাড়িকাকু। হাফপ্যান্ট আর ময়লা একটা ফতুয়া মতন পরে বাসের মাথার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে, স্বর্গ-ছেঁড়ায় এখন কেউ মালপত্র নিয়ে নামল না। অনির মনে হচ্ছিল, ও ভুল দেখছে। সেই ঝাড়িকাকু এখন কুলিগিরি করছে! ভিড়টা একটু হালকা হতে ঝাড়িকাকু ঘুরে দাঁড়াতে রাস্তার এপাশে দাঁড়ানো অনির সঙ্গে চোখাচোখি হল। অনি দেখল, প্রথমে যেন চিনতে পারেনি চট করে, তারপর হঠাৎ ঝাড়িকাকুর চেহারাটা একদম অন্য রকম হয়ে গেল। যেন অনিকে ছাখেনি এমন ভান করে দ্রুত পা চালিয়ে অন্যদিকে চলে যেতে চাইল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অনি আর দেরি করল না। পেছন পেছন দৌড়ে গিয়ে চিৎকার করতে লাগল, 'ও ঝাড়িকাকু, ঝাড়িকাকু!'

কয়েক পা হেঁটে বোধ হয় আর এড়াতে পারল না, ঝাড়িকাকু দাঁড়িয়ে পড়ল। হাঁপাতে হাঁপাতে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল অনি, 'আরে, তুমি আমাকে দেখেও চলে যাচ্ছিলে কেন?' ঝাড়িকাকুর একটা হাত ধরল সে। খুব বুড়িয়ে গেছে ঝাড়িকাকু। মুখে কাঁচা-পাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গাল ভেঙে গেছে, হাতময় শিরা

জড়ানো। অনি প্রথমেই টের পেল, ওর হাতে ধরা খড়খড়ে শক্ত হাতটা থরথর করে কাঁপছে। তারপরই মুখ বিকৃত করে অতবড় মানুষটা একটা কান্না চাপবার চেষ্টা করে যেতে লাগল প্রাণপণে। কারো চোখে জল দেখলেই অনির চোখ কেমন করে ওঠে, 'এই, তুমি কাঁদছ কেন?'

এবার হাউমাউ করে উঠল ঝাড়িকাকু, 'তোর বাবা আমাকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে রে, এই এট্টুখানি দেখেছি যে মহীকে সে আমাকে দূর করে দিল।'

এরকম একটা দৃশ্য প্রকাশ্য চৌমাথায় ঘটতে দেখে মুহূর্তেই বেশ ভিড় জমে গেল। দু'তিনজন কুলিগোছের লোক ঝাড়িকাকুকে বারংবার জিজ্ঞাসা করতে লাগল, কি হয়েছে? কোন্ শালা মেরেছে? ঝাড়িকাকু কারো কথার জবাব দিচ্ছিল না বটে, কিন্তু অনির খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। সবাই তার দিকে সন্দেহের চোখে যে তাকাচ্ছে এটা বুঝতে পারছিল সে। যারা অনিকে চিনতে পারছে তারা কেউ কেউ বলতে লাগল, 'নিজের হাতে মানুষ করেছে—এ বাবা নাড়ির বাঁধনের চেয়ে বেশী।' ভিড়টা যখন বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে এমন সময় দু'তিনটে সাইকেল খুব জোরে ঘণ্টি বাজাতে বাজাতে ওদের পাশে এসে ব্রেক কষে দাঁড়াল। 'কি খেলা হচ্ছে, পকেটমার নাকি?' গলাটা খুব চেনা-চেনা মনে হল অনির, সামনে মানুষের আড়াল থাকায় দেখতে পাচ্ছিল না। আরো দুজন কি একটা বলে এগিয়ে আসতেই ভিড়টা চট করে হালকা হয়ে গেল। অনি দেখল, একটা লম্বাটে ছেলে এসে ওদের দেখে ভ্রূ কুঁচকে বলে উঠল, 'ক্রাইং কেস!'

'সে আবার কি!' ওপাশে সাইকেলে ভর দিয়ে কথাটা যে বলল তাকে এবার দেখতে পেল অনি। চোখাচোখি হলে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর অনি কিছু বোঝার আগেই বাপী তীরের মত ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল। ঝনঝন করে একটা সাইকেলকে মাটিতে পড়ে যেতে শুনল সে। সেদিকে কান না দিয়ে বাপী ততক্ষণ একনাগাড়ে কি সব বলে গিয়ে শেষ করল, 'গুড বয় হয়ে শেষ পর্যন্ত আমাকে ভুলে গেলি, অনি?'

ভীষণ বিহ্বল হয়ে পড়েছিল অনি, 'না, ভুলব কেন? তুইও তো আমাকে চিঠি দিস না?'

বাপী বলল, 'ভেবেছিলাম দেব, কিন্তু এত বানান ভুল হয়ে যায় না, যে লজ্জা করে! আমি না খুব খারাপ হয়ে গেছি, সবাই বলে।'

'কেন? খারাপ হতে যাবি কেন?' অনির কেমন কষ্ট হচ্ছিল।

'দূর শালা, তা আমি জানি নাকি! এই শোন, আমি এখন বীরপাড়ায় যাচ্ছি, একটা ঝামেলা হয়েছে, সামলাতে হবে। বিকেলবেলায় দেখা হবে, হ্যাঁ?'

অনি ঘাড় নাড়তেই বাপী দৌড়ে সাইকেলটাকে মাটি থেকে তুলে লাফিয়ে সিটে উঠল। অনি দেখল ওর তুই সঙ্গীকে নিয়ে তিনটে সাইকেল দ্রুত বীরপাড়ার দিকে চলে গেল।

বোধ হয় অন্য একটা ঘটনা সামনে ঘটে যাওয়ায় ঝাডিকাকু সামলে নিয়েছিল এরই মধ্যে। বাপীরা চলে গেলে কয়েকজন দূর থেকে ওদের দেখতে লাগল কিন্তু আগের মত কাছে এসে ভিড় করল না। অনি দেখল লঙ্কাপাড়া থেকে একটা প্রাইভেট বাস এসে স্ট্যাণ্ডে দাঁড়াতেই কুলিরা সেদিকে ছুটে গেল। ঝাডিকাকু একবারও বাসটার দিকে না তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কখন এলি? কর্তাবাবু কেমন আছে?'

'সকালে। দাতুর পা ভেঙে গেছে কাল, এমনিতে ভাল আছে।'

'সে কি? পা ভাঙল কেন? এই বুড়ো বয়সে—পড়ে গিয়েছিল?'

'না, রিকশায় ধাক্কা লেগেছিল।'

শুনে ঝাড়িকাকু জিভ দিয়ে কেমন একটা চুক চুক শব্দ করল।

'দিদি কেমন আছে?'

'ভাল। কিন্তু তুমি কেমন আছ?'

'আমি ভাল নেই রে।' ঝাড়িকাকু ওকে নিয়ে হাঁটতে লাগল স্কুলের রাস্তায়। যদিও শরীর দেখেই বোঝা যায় তবু অনি জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

'আমার যে কেউ নেই রে, একা একা কি ভাল থাকা যায়।' অনি কথাটা শুনে ঝাড়িকাকুর হাতটা চট করে জড়িয়ে ধরে হাঁটতে লাগল। ঝাড়িকাকু বলল, 'তুই আমার সঙ্গে হাঁটছিস দেখলে মহী রাগ করবে।'

'কেন, রাগ করবে কেন? তুমি কি আমার পর?'

'তুই যে কবে বড় হবি!'

'আমি তো বড় হয়েছি, তোমার চেয়ে লম্বা!'

'এই বড় নয়। যে বড় হলে মহীর মত আমাকে চড় মারা যায়!'

'কেন তোমাকে মেরেছিল বাবা? কি করেছিলে তুমি?'

'কি হবে সেকথা শুনে। হাজার হোক মহী তোর বাবা, বাবার নিন্দে কোন ছেলের শুনতে নেই।' মুখ ঘুরিয়ে নিল ঝাড়িকাকু।

তবু অনি জেদ ধরল, মা বলত সত্যি কথা বললে শুনলে কোন পাপ হয় না।'

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল ঝাড়িকাকু, 'মা! তোর মায়ের কথা মনে আছে?'

অবাক হয়ে গেল অনি, কেন থাকবে না! সব মনে আছে।'

'আমি খবরটা শুনে বিশ্বাস করতে পারিনি। এই সেদিন কর্তাবাবু মহীকে

বিয়ে দিয়ে নিয়ে এলেন তোর মাকে। তারপর তুই হলি—কি যে হয়ে যায় সব। তোর মা চলে গেলে মহীটা একদম ভেঙে পড়েছিল। তখন রোজ রাত্রে ওর ঘরে শুতাম আমি। একা শুলেই কান্নাকাটি করত। ওর খাটের পাশে মাটিতে শুয়ে আমি শুধু তোর মায়ের কথা ছাড়া সব গল্প করতাম।' ঝাড়িকাকু কথা থামিয়ে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলল।

এসব খবর অনির জানা নেই। ঝাড়িকাকু কোন রকমে তখন বাবাকে রান্না করে খাওয়াচ্ছে—এই খবরটাই শুনেছিল শুধু। তাই বাকিটা শোনার জন্য বলল, 'তারপর?'

বাঁ হাতের ডানায় চট করে মুখটা ঘষে নিয়ে ঝাড়িকাকু বলল, 'তারপর যখন মহীর আবার বিয়ের কথা উঠল তখন ও কিছুতেই রাজী হচ্ছিল না। আমারও পছন্দ ছিল না। কিন্তু অন্য বাবুরা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওর মত করিয়ে বিয়ে দিয়ে দিল।' হঠাৎ ওর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝাড়িকাকু বলল, 'তোর নতুন মায়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে?'

হেসে ফেলল অনি, 'বা রে! কেন হবে না?'

ঝাড়িকাকু বলল, 'বড ভাল মেয়ে রে। বিয়ের পর বছর তিনেক তো বেশ ভাল ছিল সবাই। আমি ভাবতাম, যাক, এই ভাল হল। তোর মায়ের অভাব টের পেতে দিত না মেয়েটা। এমন কি আমার সঙ্গে থেকে গরুর কাজও শিখে নিয়েছিল। যে গেছে তার জন্যে মানুষ কতদিন দুঃখ করতে পারে। কিন্তু এই মেয়েটা রাতারাতি যেন এই বাড়ির লোক হয়ে গেল।'

'আরে! তুমি আমাদের বডবাবুর নাতি না?'

অনি মুখ ঘুরিয়ে দেখল, একজন বৃদ্ধ মতন লোক ওর দিকে তাকিয়ে আছেন।

মাথা নাড়ল অনি, 'হ্যাঁ।'

'বড়বাবু কেমন আছেন?' বৃদ্ধ যেখানে দাঁড়িয়ে তার পিছনে বিরাট স-মিল। অনি এতক্ষণে চিনতে পারল। ওঁর নাম হারাণচন্দ্র পাল। খুব বড়লোক। দু-তিনটে স-মিল আছে, বাসফাস, জমিটমি আছে। দাদুর কাছে শুনেছে অনি একদম ছোটবেলায় ইনি স্বর্গছেঁড়ায় এসে মুড়ি বিক্রী করতেন। পা ভাঙার কথাটা বলতে গিয়েও ঘাড নাড়ল অনি। ক্লাসে সংস্কৃতের স্যার পড়া জিজ্ঞাসা করলে মণ্টু এইরকম ভাবে ঘাড় নাড়ে। হাঁ কিংবা না দুটোই হয়।

'ভাল, ভাল। তুমি তো বেশ বড় হয়ে গেছ হে। কিন্তু এত রোগা কেন? তালপাতার সেপাই! আরে দেশ গড়তে গেলে স্বাস্থ্য ভাল চাই। সেই পনেরই আগস্ট সকালে ফ্ল্যাগ তুলেছিলে তুমি, যতই বড় হও, দেখেই চিনেছি। হেঁ হেঁ। বেশ বেশ।' বৃদ্ধ হাসি-হাসি মুখ করে ছবির মত দাঁড়িয়ে আছেন দেখে ওরা

আবার হাঁটতে লাগল। সাতচল্লিশ সালের পনেরই আগস্টের কথাটা বৃদ্ধ বলতেই ওর বেশ রোমাঞ্চ হচ্ছিল। স্বর্গছেঁড়ার অনেকেই নিশ্চয়ই মনে করে রেখেছে তার কথা। উঃ, ফ্ল্যাগটা কি দারুণ উড়েছিল।

ভবানীমাস্টারের মুখটা মনে পড়তেই ও দেখা করার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল। ঝাড়িকাকু চুপচাপ কিছু ভাবছিল। ও বলল, 'চল, স্কুলে যেতে যেতে সব শুনব।'

'কেন, স্কুলে কি হবে?' ঝাড়িকাকু ব্যাপারটা পছন্দ করল না।

'ভবানীমাস্টারকে দেখে আসি।'

'কাকে?'

'ভবানীমাস্টার। আমাদের পড়াত না? ভবানীমাস্টার, নতুন দিদিমণি!'

'ও! সে স্কুল তো উঠে গিয়েছে। এখন হিন্দুপাড়ায় বিরাট স্কুল হয়েছে। তোমাদের সেই নতুন দিদিমণির বিয়ে হয়ে গিয়েছে ময়নাগুড়িতে। আর ভবানী-মাস্টারের খুব অসুখ, বাঁচবে না।'

'কি হয়েছে?' অনি সেই মুখ মনে করতে চেয়ে স্পষ্ট দেখে ফেলল।

'শরীর নাকি অবশ হয়ে গেছে। কলোনিতে আছে, আমি দেখিনি।'

একটা অদ্ভুত নিঃসঙ্গতা-বোধ অনিমেষকে ঘিরে ধরল আচমকা। এইসব মানুষ এবং এই পরিচিত জায়গাটা যদি এমনি করে তার চেহারা পালটে একদম অচেনা হয়ে যায় তাহলে সে কি করবে।

অনি জিজ্ঞাসা করল, 'কলোনিতে কোথায় উনি আছেন তুমি জানো?'

ঝাড়িকাকু ঘাড় নাড়ল। তারপর বলল, 'কেন?'

'আমি যাব। তুমি চল আমার সঙ্গে, খুঁজে নেব।' অনি জোর করে ঝাড়ি-কাকুর হাত ধরে কলোনির দিকে হাঁটতে লাগল। দুপাশে কাঁচা কাঠের গন্ধ বেরুচ্ছে। স-মিলগুলো থেকে একটানা করাত চালাবার শব্দ হচ্ছে। একটা ট্রাক্টর চা-পাতা বোঝাই ক্যারিয়রকে টেনে নিয়ে ফ্যাক্টরীর দিকে চলে গেল।

অনি পুরোনো কথার খেই ধরে জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর কি হল? বাবা তোমাকে মারল কেন?'

ঝাড়িকাকু বলল, 'এসব কথা থাক।'

'তুমি বার বার থাক ব'লো না তো!' অনি প্রায় ঝাঁঝিয়ে উঠল।

ঝাড়িকাকু বিব্রত হয়ে ওর দিকে তাকাল। এই ছোট্ট মানুষটা খুব দ্বিধায় পড়েছে বোঝা যাচ্ছিল। তারপর যেন বাধ্য হয়ে বলল, 'তোর নতুন মাকে নিয়ে তোর বাবা মাঝে মাঝে কুচবিহারে যেত ডাক্তারের কাছে। শেষে একদিন দুজনের মাঝে কি ঝগড়া! মেয়েটাকে সেইদিন প্রথম কথা বলতে দেখলাম। লোকে বলে,

মহী নাকি বাচ্চা-বাচ্চা করে ক্ষেপে গিয়েছিল। থাক, তুই এসব কথা শুনিস না—।'

'আঃ! বলো বলছি।' অনি অধীর হয়ে পড়ল।

'তারপর মহী মদ খেতে লাগল। প্রথমে লুকিয়ে লুকিয়ে খেত। কোথা থেকে ও একজন লোককে ধরে এনেছিল যে নাকি ছবির সামনে বসে ভূত নামাতে পারে। রোজ রাত্রে দরজা বন্ধ করে ওরা নাকি তোর মাকে নামাত। একদিন তোর মায়ের একটা ছবি বিরাট করে বাঁধিয়ে নিয়ে এসে খুব ধূপধুনো দিতে লাগল। জানলা দরজা বন্ধ করে দিল। নাকি ও তোর মায়ের সঙ্গে ওখানে এসেই কথা বলতে পারে। কত অন্যায় করেছে সব নাকি এখন খেয়াল পড়ছিল। তোর নতুন মা কেমন চুপচাপ হয়ে যেতে লাগল। একদিন ঘরে ঝাঁট দিতে গিয়ে আমি জানলাটা খুলেছিলাম, সে-সময় ও মদ খেয়ে বাড়ি ফিরল। জানলা খোলা দেখে কি হম্বিতম্বি, আমি আর পারলাম না, বললাম, এরকম করলে আমি কর্তাবাবুকে সব বলে দেব। এই শুনে ও আমাকে মারতে লাগল। বলল, চাকর চাকরের মত থাকবি। একে মাতাল, তারপর ইদানীং ওর মাথার ঠিক নেই, আমি চুপচাপ মার খেতে লাগলাম। তাই দেখে নতুন বউ ছুটে এসে ওকে ধরতে মহী বলল, 'ও খুব দরদ! এই মুহূর্তে তুই বেরিয়ে যা। আমি চলে এলাম।'

'আসার সময় কিছু বলল না?'

'তোর নতুন মা আমাকে অনেক করে বলেছিল, ক্ষমা চেয়েছিল মহীর হয়ে। কিন্তু যে বাড়িতে সারাজীবন কাটিয়ে এলাম নিজের দিকে না তাকিয়ে, সেই বাড়ির ছেলে চড় মারলে আর থাকা যায়! কর্তাবাবু যাওয়ার সময় আমার সব মাইনের টাকা মহীর কাছে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেটা আর ফেরত নিইনি। চলে আসার সময় ও মনে করে দেয়নি। যদি কোনদিন ইচ্ছে হয় তো দেবে, আমি চাইব না।'

'কেন চাইবে না, তোমার নিজের টাকা না?' শক্ত হয়ে গিয়েছিল অনি এসব কথা শুনে। ছোট মায়ের মুখের কাটা দাগটা যে কোত্থেকে এল এতক্ষণে বুঝতে আর অসুবিধে হচ্ছে না। অনি দেখল ও বাবার ওপর রাগতে পারছে না। অদ্ভুত নিরাসক্ত হয়ে বাবার মুখটা মনে করার চেষ্টা করল। বাবা যেন অনেক দূরের মানুষ, তাঁর কোন ব্যাপারই তাকে স্পর্শ করছে না। কিন্তু ছোটমায়ের জন্য ওর কষ্ট হতে লাগল। বাবা যখন বিয়ে করেছিল তখনও ওর কিছু মনে হয়নি, এখনও হল না। শুধু ওর মনে হল, ও বাড়িতে দুজন খুব কষ্টপাচ্ছে, একজন ছোট মা আর একজন যাঁকে ছবিতে পুরে দরজা-জানলা বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

অনি আবার প্রশ্নটা করতে ঝাড়িকাকু বলল, 'সব সময় কি চাওয়া যায়!

টাকা চাইলেই তো ও চাকর বলে দিয়ে দিত। ও নিজে থেকেই দেবে।'

'দাদুকে বললে না কেন? তুমি তো জলপাইগুড়িতে যেতে পারতে!'

'লজ্জা করছিল। তাছাড়া এসব শুনলে কর্তাবাবু কষ্ট পাবে। তাই একজনকে দিয়ে কাল খবর পাঠিয়েছিলাম যে দেখা হলে বলতে যে মহীর খুব অসুখ। এ বাড়ির ছেলে হয়ে মদ খায় কি করে? বড়দা যে ত্যাজ্যপুত্র হয়েছে ভুলে গেল। আর মহীর মত শান্ত ছেলে, আঃ! নিশ্চয়ই ভূতে পেয়েছে ওকে। এরকম হলে বাগানের কাজ থাকবে না ওর। লোকে বলছে ওর নাকি মাথার ঠিক নেই। আমি তো আর যাই না যে দেখব।'

অনি ঝাড়িকাকুর দিকে তাকাল। দাদুকে গিয়ে সব কথা বলতে হবে। শুনলে নিশ্চয়ই দাদু বাবাকে ত্যাজ্যপুত্র করে দেবেন। কিন্তু তাহলে ছোট মায়ের কি হবে? কি করা যায় বুঝতে পারছিল না অনি। বাবাকে কি ভূতে পেয়েছে? বন্ধ জানলা-দরজার অন্ধকার ঘরে বসে বাবা যদি মায়ের সঙ্গে কথা বলতে পারে, তবে তো সে মায়ের ভূত! কথাটা মনে হতেই ও হেসে ফেলল। মা কখনো ভূত হতে পারে না। যত সব বুজরুকি। ও ঠিক করল ব্যাপারটা কি আজ রাত্রে দেখবে।

কলোনির মুখটাতে এসে ঝাড়িকাকু কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল ভবানীমাস্টার কোথায় থাকেন। আগে স্বর্গছেঁড়ার এই অঞ্চলটায় লোকবসতি ছিল না। ওপাশে হিন্দুপাড়ায় কুলিলাইনটা অবশ্য ছিল কিন্তু সে বানারহাটের রাস্তায়। এদিকটায় খুঁটিমারি ফরেস্টের গা ঘেঁষে স্বর্গছেঁড়া টি এস্টেটের অন্য প্রান্ত। খাসমহলের এই জায়গাগুলো তখন আগাছা জঙ্গলে ভরতি ছিল। সাত-চল্লিশ সালের পর ওপারের মানুষেরা এপারে আসতে শুরু করলে এইসব জায়গা-গুলোর চেহারা পালটে গেল রাতারাতি। অনি এই প্রথম এমন একটা জায়গায় এল যাকে কলোনি বলে। কলোনি শব্দটা এর আগে ও শোনেনি। ভেতরে ঢুকে ও দেখল সরু রাস্তার দুপাশে কাঠ আর টিনের ছোট ছোট বাড়ি, এর উঠোনের গায়ে ওর শোওয়ার ঘর। সদর অন্দর কিছু নেই। বোঝাই যায় যাঁরা এসেছেন তাঁরা বাধ্য হয়ে এখানে আছেন।

ছোট্ট একটা কাঠের বাড়ির গায়ে আলকাতরা বোলানো, দরজা বন্ধ, ওরা জানল এখানেই ভবানীমাস্টার থাকেন। একটা ভাঙা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওরা দরজার গায়ে এসে দেখল একটা মা-কুকুর তার তিন-চারটে বাচ্চাকে চোখ বুজে শুয়ে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে। বোধ হয় এসময় কারো আসার কথা নয় বলে সে খুব বিরক্ত হয়ে দুবার ডাকল। বন্ধ দরজায় শব্দ করতেই ভেতরে কেউ খুব আস্তে কিছু বলল। কয়েকটা বাচ্চা ওদের দেখছিল রাস্তায় দাঁড়িয়ে, তাদের একজন বলল,

দরজা খোলাই আছে, জোরে ঠেললেই খুলে যাবে। সত্যি দরজাটা খোলাই ছিল। অনি ভেতরে ঢুকেই ভবানীমাস্টারকে দেখতে পেল। ঘাড় ঘুরিয়ে অতিকষ্টে দরজার দিকে ঠিকরে বেরোনো দুটো চোখে যিনি তাকিয়ে আছে তাঁকে দেখে পাথর হয়ে গেল অনি। সমস্ত শরীর বিছানার সঙ্গে লেপ্টানো, বিছানাটা অপরিষ্কার। মাথার পেছনে জানলাটা খোলা।

'কে ? সামনে এস—' অদ্ভুত একটা শব্দ বেরুল গলা থেকে। বুঝতে কষ্ট হয়।

অনি পায়ে পায়ে ভবানীমাস্টারের সামনে এল। ঝাড়িকাকু ঢুকল না ঘরে। অনি দেখল দুটো চোখ ক্রমশ তার মুখের ওপর স্থির হল এবং সেই চোখের দিকে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না।

মাস্টারমশাইয়ের শরীর শুকিয়ে চিমসে হয়ে গেছে কিন্তু মুখখানা প্রায় একই-রকম আছে। যদিও কাঁচাপাকা দাড়িতে সমস্ত মুখ ঢাকা তবু চিনতে কোন অসুবিধে হবার কথা নয়। একটা ঘড়ঘড়ে শব্দ বেরুল গলা থেকে, 'অ-নি-মে-ষ।'

তাড়াতাড়ি ঘাড় নাড়ল অনি, 'হ্যাঁ।' ভবানীমাস্টার তাকে চিনতে পেরেছেন।

'অ-নে-ক বড় হ-য়ে-ছ।' ঘড়ঘড় শব্দটা উচ্চারণের অনেকটা ঢেকে দিচ্ছিল। কথা বললে হয়তো কষ্ট বেড়ে যাবে, অনি বলল, 'কথা বলবেন না।'

ভবানীমাস্টার হাসলেন, 'প্যা-রা-লা-ইসিস।'

এমন সময় বাইরের থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এল, 'কে আইছে শুনলাম, দুদিন পরেই তো মরব এখন আইয়া কামটা কি ? অ। আপনারা আইছেন, উনার কেউ হন নাকি ?'

সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়িকাকুর গলা শুনল অনি, 'না না। মাস্টারের ছাত্র এসেছে।'

উত্তরে সেই মহিলাকণ্ঠ বিরক্ত হল, 'এখন আর পড়াতেই পারব নাকি উনি। উনি যাইলে আমার পরান জুড়ায়, আর পারি না।'

ভবানীমাস্টার বললেন, 'তো-তো-মার মনে আ-ছে পতাকা তু-লে-ছিলে ?'

অনি বলল, 'হ্যাঁ। আপনার সব কথা মনে আছে আমার।'

'বড় হও বাবা, বড় হও।' কথাটা বলতে বলতে চোখের কোল বেয়ে একটা সরু জলের ধারা বেরিয়ে এসে কানের দিকে চলে গেল। অনি আর দাঁড়াতে পারছিল না। শায়িত মানুষকে প্রণাম করতে নেই। ও চট করে এগিয়ে গিয়ে হাতের চেটো দিয়ে ভবানীমাস্টারের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে দৌড়ে বাইরে চলে এল।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর কাঁঠাল গাছতলায় এসে দাঁড়াল অনি। বাড়ি

ফেরার পর থেকে ছোট মার সঙ্গে কথাই হচ্ছে না প্রায়। এমন কি অনিকে খাবার দেবার সময় মনে হচ্ছিল রান্নাঘরে ওঁর খুব কাজ, সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করার সময় পাচ্ছেন না। উঠোনে ডাঁই করা বাসন অথচ বাড়িতে কাজের লোক নেই—বাবার ওপর অনি ক্রমশ চটে যাচ্ছিল। ছোট মাকে এখন সব কাজ করতে হয়। বিয়ের পর পায়েসের বাটি হাতে নিয়ে ওর ঘরে আসা ছোট মার সঙ্গে এখন কেমন রোগা জিরজিরে হয়ে যাওয়া ছোট মার কোন মিল নেই। সত্যি বলতে কি ছোট মার জন্যে ওর কষ্ট হচ্ছিল।

অনির খাওয়া হয়ে যাবার পর মহীতোষ এলেন। ভাগ্যিস একসঙ্গে খেতে বসা হয়নি! তখন বাবার পাশে বসে চুপচাপ শব্দ না করে চিবিয়ে যাওয়া, একটা দমবন্ধ-করা-পরিবেশে কথা না বলে খাবার গেলা—অনির মনে হল ও খুব বেঁচে গেছে। কাঁঠাল গাছতলায় দাঁড়িয়ে বাবার গলা শুনতে পেল সে, 'অনি কোথায়?' ছোট মার জবাবটা স্পষ্ট হল না। মহীতোষ গলা চড়িয়ে বললেন, 'এই রোদ্দুরে টো টো করে না ঘুরে মায়ের কাছে গিয়ে বসতে তো পারে। ভক্তি নেই, বুঝলে, আজকালকার ছেলেদের মাতৃভক্তি নেই।' ছোট মার গলা শোনা গেল না।

অনি ঘুরে দাঁড়াল। ও ভাবল চেঁচিয়ে বাবাকে বলে যে মাকে ও যেরকম ভালবাসে তা বাবা কল্পনা করতে পারবে না। কিন্তু বলার মুহূর্তে যেন অনির মনে হল কেউ যেন তাকে বলল, কি দরকার, কি দরকার! কিছুদিন হল অনি এই রকম একটা গলা মনে মনে শুনতে পায়। যখনই কোন সমস্যা বড় হয়ে ওঠে, তার খুব অভিমান বা রাগ হয়, তখনই কেউ একজন মনে মনে তাকে নিষেধ করে। এই নিষেধ যদি চুপচাপ মেনে নেওয়া যায় তা হলে কোন ক্ষতি হয় না। ক'দিন আগে একটা ব্যাপার হয়েছিল। ওদের স্কুলে একজন নতুন টিচার এসেছেন দক্ষিণেশ্বর থেকে, খুব ভক্ত লোক। আর বেশ ভাল লেগেছিল দেখতে। একদিন হলঘরে প্রেয়ারের পর উনি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দিলেন 'ওঁ, ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ।' ওরা ভেবেছিল এটা মাস্টারমশাই-এর নিছক খেয়াল। দিন সাতেক পরে হঠাৎ ক্লাসে এসে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন লাইনটা কার স্পষ্ট মনে আছে, কে লিখতে পারবে? কেউ খেয়াল করেনি, ফলে এখন ঠিকঠাক সাহস পাচ্ছিল না। অনি সঠিক জবাব দিতে তিনি ওকে কাছে ডেকে বললেন, 'চিরকাল লাইনটা মনে রাখবে। সুখে কিংবা দুঃখে, বিপদে-আপদে মনে মনে লাইনটা বলে নিজে কপালে মা শব্দটা লিখবে। দেখবে তোমার অমঙ্গল হবে না।' কথাটা বলে ওর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, রামকৃষ্ণ কে ছিলেন জানো তো?' ঘাড় নেড়েছিল অনি।

'শুভ। তিনি ছিলেন পরম সত্য, পরম আনন্দ। তাঁর আলোর কাছে কোন কালো ঘেঁষতে পারে না।'

কথাগুলো তখন ভাল করে বুঝতে না পারলেও মনে মনে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে নিয়েছিল অনি। তারপর থেকে এই প্রক্রিয়াটাকে অনেকবার কাজে লাগিয়েছে ও। যেমন, বিকেল ফুরিয়ে সন্ধ্যে হয়ে গেলে দেরি করে বাড়ি ফেরার জন্য বুকটা যখন ঢুকঢুক করে ওঠে তখন চট করে ওই চারটে শব্দ আওড়ে কপালে মা লিখলে অনি লক্ষ্য করেছে কোন গোলমালে পড়তে হয় না। এই আজকে যখন ঝাড়িকাকুকে চৌমাথায় ছেড়ে ও বাড়ি ফিরল তখন মনে হচ্ছিল এখন বাবার মুখোমুখি হতে হবে, একসঙ্গে খেতে হবে। বাড়িতে ঢোকার আগে প্রক্রিয়াটা করতে ফাঁড়া কেটে গেল।

রামকৃষ্ণকে ভগবান মনে করে প্রণাম করার একটা কারণ থাকতে পারে কিন্তু এটা অনিমেষের কাছে স্পষ্ট নয় মাস্টারমশাই কেন 'মা' শব্দটা কপালে লিখতে বলেছিলেন ? আশ্চর্য, শব্দটা লেখার পর সারা শরীরে মনে কেমন একটা নিশ্চিন্তি সৃষ্টি হয়।

সারাটা দুপুর ওর প্রায় টো-টো করেই কেটে গেল। ওদের বাড়ির পেছনের বাগানের সেই চেনা-চেনা গাছগুলো অদ্ভুত বড়সড় আর অগোছালো হয়ে গিয়েছে। সেই বুনো গাছগুলো যাদের বুকে জোনাকির মত হলুদ ফুল ফুটতো তেমনি ঠিকঠাক আছে। এই দুপুরে ঘুঘুগুলো একা একা হয়ে যায় কেন ? এমন গলায় কি কষ্টের ডাক যে ডাকে। অনি ঘুরতে ঘুরতে নদীর কাছে এসে দেখল জলেরা এখনও তেমনি চুপচাপ বয়ে যায়।

এক সময় সূর্যটা খুঁটিমারির জঙ্গলের ওপাশে মুখ ডোবালে স্বর্গছেঁড়া ছায়া-ছায়া হয়ে গেল। এখন একরাশ পাখির চিৎকার আর মদেসিয়া কুলিকামিনদের ভাঙা ভাঙা গান জানান দিচ্ছিল রাত আসছে। নদীর ধার ধরে অনি চা-বাগানের মধ্যে চলে গিয়েছিল। ছোট ছোট পায়েচলা পথ, দু পাশে ঠাসবুনোট কোমরসমান চায়ের গাছে ফুল ফুটেছে, শেড্‌ট্রিগুলোতে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়াপাখি বসে সবুজ করে দিয়েছে। এখন চা-বাগানের মধ্যে কেউ নেই। লাইনে ফেরার জন্য পথ সংক্ষেপ করে কোন কোন কামিন মাথায় বোঝা নিয়ে দূর দূর দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ এই নির্জন পরিবেশে বিশাল সবুজের অঙ্গীভূত ঢেউ-এ দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে অনির মনে হতে লাগল ও খুব একা, ভীষণ একা। ওর মা নেই, বাবা নেই, কোন আত্মীয় বন্ধু নেই। ঠিক এই মুহূর্তে ও দাদু বা পিসীমার কথা ভাবতে চাইছিল না। ওঁদের বিরুদ্ধে অনির কোন অভিযোগ নেই কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে

চুপ করে রইল। অনি বলল, 'বাবা আগে এমন ছিল না, মা থাকতে বাবা একদম অন্য রকম ছিল।'

খুব গাঢ় গলায় ছোট মা বলল, 'কি জানি! বোধ হয় আমি খারাপ, তাই।'

উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসল অনি, 'তুমি মিথ্যে কথা বলছ।'

হঠাৎ ঝট করে উঠে বসল ছোট মা, 'বেশ, আমি মিথ্যে কথা বলছি। আমার খুশী তাই বলছি।'

'কেন? মিথ্যে কথা বললে—।' অনি কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। কেউ অন্যায় করছে এবং এরকম জেদের সঙ্গে স্বীকার করছে—কখনো ছাখেনি সে।

খুব কাটা-কাটা গলায় ছোট মা বলল, 'উনি যা করছেন করুন তবু আমাকে এখানে থাকতে হবে। আমার পেটে বিদ্যে নেই যে রোজগার করব। ভাইদের কাছে গলগ্রহ হয়ে থাকার চেয়ে এখানে অপমান সহ্য করা অনেক সুখের। নিজের জন্যে মিথ্যে বলতে হবে, আমাকে আর প্রশ্ন করবে না তুমি।'

অনি চুপ করে গেল। ছোট মার কথাগুলো বুঝে উঠতে সময় লাগল। ওর হঠাৎ মনে হল এতক্ষণ ও যে-ভাবে কথা বলেছে সেটা ঠিক হয়নি। জলপাইগুড়িতে প্রথম পরিচয়ের দিন যাকে বন্ধু এবং নিজের চৌহদ্দির মধ্যে বলে মনে হয়েছিল, এখন এই রাত্রে তাকে ভীষণ অচেনা বলে মনে হতে লাগল। কিন্তু ছোটমা তাকে একটা চূড়ান্ত সত্যের মুখোমুখি দাঁড করিয়ে দিয়েছে। বাবার এইসব কাজ, কাজ না বলে অত্যাচার বলা ভাল, ছোট মাকে মুখ বুজে সহ্য করতে হচ্ছে তাব ভাইদের কাছে গিয়ে থাকা সম্ভব নয় বলে। ছোট মা যদি লেখাপড়া শিখতো তাহলে চাকরি করতে পারত, সেটাও সম্ভব নয়। আচ্ছা, আজ যদি বাবা তাকে—। সঙ্গে সঙ্গে অনি যেন চোখের সামনে সরিৎশেখরকে দেখতে পেল, পেয়ে বুকে বল এল। দাদু জীবিত থাকতে তার কোন ভয় নেই। কিন্তু দাদুকে আজকাল কেমন অসহায় লাগে মাঝে মাঝে, পিসীমার সঙ্গে টাকাপয়সা নিয়ে প্রায়ই চাপা কথা-কাটাকাটি হয়। হোক, তবু তার দাদু আছে কিন্তু ছোট মার কেউ নেই। ও গম্ভীর গলায় বলল, 'তুমি চিন্তা করো না। আমি পাস করে চাকরি করলে তুমি আমার কাছে গিয়ে থাকবে। বাবা কিছু করতে পারবে না।'

উঠে দাঁড়াতে দাঁড়তে ছোট মা বলল, 'ছি! বাবাকে কখনো অসম্মানের চোখে দেখতে নেই, ভুল বুঝতে পারলে তিনি ঠিক হয়ে যাবেন।'

অনি কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, বাবার বিরুদ্ধে কিছু বললেই ছোট মা একদম সমর্থন করে না কেন? ছোট মা উঠে মিটসেফ থেকে একটা বিরাট জামবাটি বের করে ওর সামনে এনে রাখল, 'তোমার জন্যে করেছি। বাড়িতে তো আর দুধ হয়

না, অনেক কষ্টে এটুকু যোগাড় করতে পেরেছি।' অনি দেখল জামবাটির বুক-টৈটম্বুর পায়েসের ওপর কিসমিসগুলো ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়ে আছে, একটা তেজপাতা তিনভাগ শরীর ডুবিয়ে কালো মুখ বের করে আছে। চোখাচোখি হতে ছোট মা বলল, 'ভাল না হলেও খেতে হবে অনি, দিদির মত হয়নি আমি জানি।'

অনি হাসল, ছোট মা সেই প্রথম দিনের কথাটা এখনও মনে রেখেছে।

'এ বেলা একদম নিরামিষ, তোমার খেতে অসুবিধে হবে খুব।'

ছোট মার কথা শুনে হাসল অনি, 'এতখানি পায়েস পেলে আমার কোন খাবারের আর দরকার নেই।' একটা চা-চামচ দিয়ে ধারের দিকের একটু পায়েস নিয়ে মুখে দিয়ে বলল, 'ফাইন।' তারপর চোখ বুজে সেটাকে ভালভাবে গলাধঃকরণ করে বলল, 'পিসীমার চেয়ে একটু কম ভাল হয়েছে তবে মায়ের চেয়ে অনেক ভাল। পিসীমা ফাস্ট, তুমি সেকেণ্ড, মা থার্ড।'

অনির কথা শুনে বেশ মজা পাচ্ছিল ছোট মা। সারাদিন এবং এই একটু আগেও যে অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, ছেলেটা খেতে আরম্ভ করার পর থেকে সেটা টুপ করে চলে গেল। যে যা ভালোবাসে তাকে সেটা তৈরী করে খাওয়াতে যে এত ভাল লাগে এর আগে এমন করে জানা ছিল না। কি তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছে ছেলেটা। আর এই সময় প্রচণ্ড জোরে একটা শব্দ উঠল, কেউ যেন মনের সুখে দরজায় লাথি মারছে। খেতে খেতে চমকে উঠে অনি বলল, 'কিসের শব্দ?'

ছোট মার খুশীর মুখটা মুহূর্তেই কালো হয়ে গেল যেন, রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে কোনরকমে বলে গেল, 'তুমি খাও, আমি আসছি।'

শব্দটা থামছে না, ঘড়ির আওয়াজের মত বেজে যাচ্ছে। তারপর দরজা খোলার শব্দ হতে একটা হুঙ্কার এদিকে ভেসে এল। খাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে অনি সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর এক ছুটে বাঁধানো উঠোন পেরিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ল। ছোট মার ঘরে একটা ছোট্ট ডিমবাতি জ্বলছে, এত অল্প আলো যে চলতে অসুবিধে হয়। মায়ের ছবির ঘরের দরজায় এসে থমকে দাঁড়াল ও। বাবা কথা বলছেন, জড়িয়ে জড়িয়ে, কোন কথার শেষটা ঠিক থাকছে না, 'কোথায় আড্ডা মারছিলে, আমি দু ঘণ্টা ধরে নক্ করছি খেয়াল নেই, অ্যাঁ?'

ছোট মা বলল, 'অনিকে খেতে দিচ্ছিলাম।'

'অনি? হু ইজ অনি? মাই সন? সন বড় না ফাদার বড়, অ্যাঁ? আমার আসবার সময় কেন দরজায় বসে থাকোনি, অ্যাঁ?'

ছোট মা খুব আস্তে বলল, 'কাল ছেলেটা চলে যাবে, আজকের রাতটায় এসব

না করলেই নয় ?'

'জ্ঞান দিচ্ছ ? সেদিনকার ছুঁড়ি আমাকে জ্ঞান দিচ্ছে, অ্যাঁ ! বিনে পয়সায় মা হয়েছ, মা-গিরি দেখাচ্ছ ? ভাল, ভাল। মাধু গিয়ে আচ্ছা প্রতিশোধ নিয়েছে। নইলে একটা বাঁজা মেয়েছেলে কপালে জুটল !' গলাটা টলতে টলতে মায়ের ঘরে চলে এল, 'অ্যাই, ধূপ জ্বলছে না কেন ?'

ছোট মা দৌড়ে মহীতোষের পাশ দিয়ে এসে বোধ হয় ধূপ জ্বেলে দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার গলা থেকে একটা আর্তনাদ উঠল, 'উঃ !'

কৌতূহলে অনিমেষ এক পা বাড়াতেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ছোট মার ডান হাতের কব্জিটা বাবার মুঠোয় ধরা, বাবা সেটাকে মোচড়াচ্ছেন। সমস্ত শরীর বেঁকিয়ে ছাড়াবার চেষ্টা করেও পারছে না ছোট মা। বাবা সামনের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শাস্তি দিচ্ছি, অন্যায় করলেই শাস্তি পেতে হবে, হুঁ হুঁ বাবা !'

বাবার দৃষ্টি অনুসরণ করে অনি মাধুরীর ছবিটা দেখতে পেল। অত বড ছবিটার ওপর তুটো চাইনিজ লণ্ঠনের আলো পড়ায় মুখটা একদম জীবন্ত। সকালে ছবিটায় অদ্ভুত একটা বিমর্ষ ভাব দেখতে পেয়েছিল অনি, এখন সেটা নেই যেন। বরং উল্লাসময় এক ধরনের উপভোগ করার অভিব্যক্তি মায়ের মুখে। চোখ তুটো কি খুব চকচক করছে ? না আলো পড়ায় ওরকম হয়েছে ! ছবির মাকে ওর একদম পছন্দ হচ্ছিল না। ও মহীতোষের দিকে তাকাল। এখনও উনি ছোট মাকে শাস্তি দিয়ে যাচ্ছেন, ছোট মা ইচ্ছে করলে ঠেলে ফেলে দিতে পারে বাবাকে কিন্তু দিচ্ছে না। অনি যেন শুনতে পেল কে যেন তার কানের কাছে বলে গেল, বল, বল, ভয় কিসের ? অনি সঙ্গে সঙ্গে মহীতোষকে বলল, 'ছোট মাকে মারছেন কেন ?'

মহীতোষ পাথরের মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন, তু চোখ কুঁচকে লক্ষ্য করার চেষ্টা করলেন কে কথা বলছে। এই সময় তাঁর শরীরের নিম্নভাগ স্থির ছিল না। অনিকে চিনতে পেরে বললেন, 'আমি যে মারছি তোমাকে কে বলল ? তোমার এই মা বলেছে ? তুমি একে মা বল তো, অ্যাঁ ?'

অনি দেখল ছোট মা সামান্য জোর দিয়ে নিজের হাতটা বাবার মুঠো থেকে ছাড়িয়ে নিল। মহীতোষ বলল, 'গতরে জোর হয়েছে দেখছি !'

'মেরে ছোট মার গালে দাগ কে করে দিয়েছে ?' অনি প্রশ্নটা এমন গলায় করল যে মহীতোষ প্রাণপণে সোজা হবার চেষ্টা করলেন। ছোট মা মুখে আঁচল দিয়ে বিস্ফারিত চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। তুই পা এগিয়ে এক হাত বাড়িয়ে

মহীতোষ বললেন, 'অনি, পুত্র, পুত্র আমার। এখানে এস, এই বুকে মাথা রেখে শুনে নাও।'

অনি কিছু বোঝার আগেই মহীতোষ কয়েক পা টলতে টলতে হেঁটে এসে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। অনির স্পর্শ শরীরে পেতেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন তিনি, 'মাধু, ছাখো, কে আমার বুকে এসেছে, অঁ্যা!'

এই প্রথম অনিমেষ জ্ঞানত পিতার আলিঙ্গন পেল এবং সেই আলিঙ্গনে ওর সমস্ত শরীর গুলিয়ে উঠল যেন। বাবার মুখ দিয়ে যে বিশ্রী ক্লেদাক্ত গন্ধ বের হচ্ছে তা সহ্য করতে পারছিল না অনি। তীক্ষ্ণ গলায় ও চিৎকার করে উঠল, 'আপনি মদ খেয়েছেন?'

প্রশ্নটা শুনেই ছোট মা পেছনে দাঁড়িয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। মহীতোষ ছেলেকে জড়িয়ে ধরে ঘাড় ঘুড়িয়ে তাকে ধমক দিলেন, 'আঃ, ফঁ্যাচ ফঁ্যাচ ক'রো না তো, পিতা-পুত্রের কথাবার্তার মধ্যে ফঁ্যাচফঁ্যাচানি। হঁ্যা বাবা, ইয়েস, আমি ড্রিঙ্ক করেছি। ইউ মে আস্ক মি, হোয়াই? লুক অ্যাট হার', এক হাতের আঙুল তীরের মত মাধুরীর ছবিটার দিকে বাড়িয়ে মহীতোষ বললেন, 'ছাখো ও কেমন খুশী হয়েছে। ইওর মাদার। তোমাকে ও পেটে ধরেছিল, হোলি মাদার! ওর খুশীর জন্য খেয়েছি।'

'আপনি কি ওঁর খুশীর জন্য ছোট মাকে মারেন? গলাটা এত জোরে যে মহীতোষ দু হাতের মধ্যে দাঁড়ানো প্রায় তাঁর চিবুক অবধি লম্বা ছেলের মুখ দেখবার চেষ্টা করে বললেন, 'ইউ আনফেথফুল সন, কোনদিন নিজের মাকে ছোট করে দেখবে না। আমি প্রত্যেক রাত্রে মাধুরীর সঙ্গে কথা বলি। এখানে, এই ঘরে দাঁড়িয়ে, ডু ইউ নো?'

অনির আর সহ্য হচ্ছিল না গন্ধটা, এক ঝটকায় মহীতোষের হাতের আড়াল সরিয়ে ও বলল, 'আমার মা কখনো পেত্নী হতে পারেন না। আপনি মিথ্যে বলছেন!'

'কি? আমি মিথ্যে বলছি? আমি মিথ্যে বলছি!' হাত বাড়িয়ে খিমচে ধরলেন মহীতোষ ছেলেকে। মাতাল হলেও বাবার গায়ের জোরের সঙ্গে পেরে উঠছিল না অনি, 'মাকে যদি আপনি এত ভালবাসেন, মা যদি—না, তাহলে আপনি মদ খেতেন না, ছোট মার উপর অত্যাচার করতেন না। শুনেছি ভূতে ধরলে মানুষ অন্যরকম হয়ে যায়, আপনার সেরকম হয়েছে!'

সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছেড়ে দিয়ে মহীতোষ ছোট মার দিকে ছুটে গেলেন, 'তুমি ওকে এসব শিখিয়েছ, আমার ছেলেকে আমার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছ।'

দু হাতের আড়ালে মুখ রেখে ছোট মা সেই চাপা কান্নার মধ্যে গলা ডুবিয়ে বলে উঠল, 'আমি বলিনি, বিশ্বাস করো, আমি কিছু বলিনি।'

কিন্তু কথাটা একদম বিশ্বাস করলেন না মহীতোষ, রাগে উন্মাদ হয়ে বলে চললেন, 'কাল সকালে বেরিয়ে যাবে তোমাকে আমার দরকার নেই, একটি বাঁজা মেয়েছেলের মুখ দেখা পাপ। তোমার জন্য সে এই কয় বছর আমার কাছে আসছিল না, তুমি আমার ছেলেকে –।'

প্রচণ্ডভাবে মাথা নেড়ে হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে কেঁদে উঠল ছোট মা, 'আমি কাউকে কিছু বলিনি।'

বোধ হয় সমস্ত শরীরের ওজন দিয়ে মহীতোষ ডান হাতখানা শূন্যে তুলেছিলেন, যেটার লক্ষ্য ছিল ছোট মার গাল। ঠিক সেই পলকে অনিমেষ যেন শুনতে পেল, যাও, ছুটে যাও। কিছু বোঝার আগেই সে তীরের মত এগিয়ে গিয়ে মহীতোষের ডান হাত চেপে ধরে ওদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। ব্যালেন্স সামলাতে না পেরে মহীতোষ ছেলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছিলেন, অনি নিজেকে বাঁচাতে সরে দাঁড়াতেই নেশাগ্রস্ত শরীরটা দুম করে মাটিতে পড়ে গেল। পড়ে যাওয়াটা এত দ্রুত ঘটে গেল এবং একটা মানুষ যে পুতুলের মত সোজা চিৎ হয়ে পড়তে পারে অনি বুঝতে পারেনি। মেঝের ওপর পড়ে থাকা নিথর শরীরটার দিকে ওরা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে ছিল। যেন বিশ্বাস করাই যায় না যে এই লোকটাই এতক্ষণ এখানে ছিল। অনির আগে ছোট মা চিৎকার করে ছুটে গেলেন মহীতোষের কাছে। অনি দেখল ছোট মা বাবার মাথাটা কোলের ওপর নিয়ে প্রাণপণে ডাকছেন। বাবার মাথাটা একটা পাশে বার বার ঘুরে যাচ্ছে। যন্ত্রণায় ঠোঁট দুটো বেঁকে গেছে। হাত-পা টান-টান, শরীরে কোন আলোড়ন নেই। প্রথমে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছিল অনিমেষ, বাবার ওপর আর কোনরকম শ্রদ্ধা ছিল না তার, এই মুহূর্তে। বাবা মদ খায়, ছোট মাকে মারে, তার মৃতা মায়ের নাম করে যা ইচ্ছে বলে—। এখন যে এভাবে পড়ে আছে তা স্বাভাবিক নয়। বাবার জোরের সঙ্গে সে পারবে না কিছুতেই, তাই ওই সামান্য ঠেলায় এভাবে পড়ে যাওয়াটাও বিশ্বাস করা যায় না।

'তুমি, তুমি ওকে মারলে?' হঠাৎ ফোঁস করে উঠল ছোট মা। থতমত হয়ে অনি দেখল বাবার মাথা থেকে বেরিয়ে আসা রক্তে ছোট মার শাড়ি ভিজে যাচ্ছে।

'আমি!' কোনরকমে বলল সে।

'কেন মাতাল মানুষটাকে ঠেলে দিলে। আমাকে মারলে তোমার কি এসে যেত।

ও যদি আমাকে মেরে সুখ পায়, পাক না। তোমার কি তাতে?' নিজের আঁচলটা বাবার মাথায় চেপে ধরে ছোট মা ডুকরে ডুকরে কথাগুলো বলল।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অনি চারপাশে অনেকগুলো মুখ দেখল, নড়ে-নড়ে ভেঙে-চুরে যাচ্ছে। মুখগুলো কার? নাকি একজনের মুখ হাজার হয়ে যাচ্ছে! শিরশিরে একটা শীতল বোধ ওর শিরদাঁড়ায় উঠে এল। মুহূর্তেই কপাল ভিজে যাচ্ছে ঘামে। ও দেখল মায়ের ছবিটা বড় বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

অদ্ভুত একটা ভয় ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ও কি বাবাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল? না, কখনো নয়। গলা প্রায় বুজে যাচ্ছিল অনির, ও কথা বলল, 'বিশ্বাস করো আমি ইচ্ছে করে করিনি। আমি ভাবিনি বাবা পড়ে যাবেন।'

হঠাৎ যেন ছোট মার গলার স্বর বদলে গেল। খুব ধীরে ছোট মা বলল, 'ওকে একটু ধরবে অনি। খাটের ওপর শুইয়ে দিই।'

মহীতোষকে শুইয়ে দিতে ওদের একটু কষ্ট হল, দেহটা বেশ ভারী। ছোট মার হাত মাথার ফেটে যাওয়া জায়গায় আঁচল চেপে রেখেছে। অনি বলল, 'আমি একছুটে ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনছি।'

ও যেই বেরুতে যাবে এমন সময় ছোট মার ডাক শুনল। দরজা অবধি পৌঁছে ঘুরে দাঁড়িয়ে পেছনে তাকাল সে। ছোট মার মুখটা অস্পষ্ট। পাশে বাবার শরীরটা আবছা দেখা যাচ্ছে। ওদের পেছনে দেওয়ালে মায়ের ছবিটা ঝকঝক করায় সামনেটা কেমন হয়ে গিয়েছে। ছোট মা যেন অনেক দূর থেকে তাকে বলল, 'অনি, আমার একটা কথা রাখবে?'

গলার স্বরে এমন একটা মমতা ছিল যে অনি স্পষ্ট শুনতে পেল কে যেন তাকে বলছে হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ও বলল, 'হ্যাঁ।'

'তুমি সরে গিয়েছ বলে ও পড়ে গেছে এ কথা যেন কেউ জানতে না পারে, কেউ না।' ছোট মার প্রত্যেকটা কথা স্পষ্ট।

'মানে?'

'ও নিজেই ভার সামলাতে পারেনি, এ কথা সবাই জানবে!'

'কিন্তু বাবা—?'

'মাতাল মানুষের কোন খেয়াল থাকে না। জেগে উঠলে যা বলব বিশ্বাস করবে।'

অনি বুঝতে পারছিল না কেন ছোট মা এ কথা বলছে। সবাই যদি শোনে

অনি বাবাকে ফেলে দিয়েছে, তাহলে—। ওর বুকের ভেতর থেকে অনেক অনেক অনেকদিন পরে একটা কান্নার দমক উঠে এল গলায়, 'কেন ?'

ছোট মা বলল, 'আমার জন্য। আর জানতে চেয়ো না। কেউ যেন জানতে না পারে, মনে থাকে যেন। যাও, দেরি করো না, ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনো।'

কখনো কখনো অন্ধকার বন্ধুর মত কাজ করে। এখন স্বর্গছেঁড়ায় গভীর রাত। ঘুটঘুটে অন্ধকারে জোনাকিরা ঘুরে বেড়ায়, লাইনে মাদল বাজে। সার দেওয়া কোয়ার্টারের দরজাগুলো বন্ধ। মাঠের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টারের দিকে যেতে যেতে এই অন্ধকারটা যদি শেষ না হতো তাহলে যেন ও বেঁচে যেত। বাবার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে কি করবে সে ? ডাক্তারবাবুর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ও বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল। তারপর অন্ধকারে উচ্চারণ করল, 'ওঁ ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ।' একটা ঘোরের মধ্যে ও মা শব্দ আঙুলের ডগা দিয়ে কপালে লিখতেই অদ্ভুত শান্ত হয়ে গেল শরীরটা। মাধুরী ওকে জড়িয়ে ধরলে যেমন হতো।

নিশ্চিন্তে ডাক্তারবাবুর দরজার কড়া নাড়তে লাগল অনিমেষ।

॥ ৬ ॥

বালির চরের ওপর দিয়ে ওরা তিনজন হেঁটে যাচ্ছিল। এখন তিস্তার জল একটা খাতেই বয়ে যাচ্ছে, সেটা বার্নিশের দিকে। ফলে এদিকের বিরাট চরটা শুকিয়ে খটখট করছে। চর নেমে কিছুটা গেলেই কাশ গাছের জঙ্গল চাপ বেঁধে ওপরে উঠে গেছে। জেলা স্কুলের মুখোমুখি নদীর বুকের জঙ্গলটা বেশ ঘন, দিব্যি লুকিয়ে থাকা যায়। মাঝে মাঝে পায়ে চলার পথ আছে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। সেনপাড়ার ওদিক থেকে গরীব মেয়েরা তিস্তায় কাঠ কুড়োতে যায়। পাহাড় থেকে ভেঙে পড়া গাছের শরীর তিস্তায় ভাসতে ভাসতে আসে। মেয়েরা সাঁতরে সাঁতরে সারাদিন ধরে সেগুলোকে জড়ো করে নদীর ধারে। বিকেলে সেগুলো মাথায় মাথায় চলে যায় পাড়ায়। তারপর টুকরো হয়ে রোদে শুকিয়ে বাবুদের রান্নার জ্বালানির জন্য বিক্রি হয়ে যায়। জঙ্গলের যেখানে শুরু সেখানে কিছু লোক তরমুজের খেত করে দিনরাত পাহারা দেয়। এখন তরমুজ পাকার সময়। আর কদিন বাদেই সমস্ত জঙ্গলটা একদম সাদা হয়ে যাবে। দারুণ কাশফুল ফুটবে তখন।

অনি এর আগে দুই-তিনবার বালির চরে এসেছে, জঙ্গলে ঢোকেনি। মন্টুর এসব জায়গা খুব চেনা। প্রায়ই টিফিনের সময় স্কুল পালিয়ে ও একা একা এখানে

ঘোরে। এই জঙ্গলে কোন হিংস্র জানোয়ার সচরাচর থাকে না কিন্তু শিয়াল তো আছে। মাঝে একবার তিস্তার জলে ভেসে এসে একটা বাচ্চা বাঘ এখানে লুকিয়ে ছিল। অতএব ভয় যে একদম নেই তা বলা চলে না। জঙ্গলে ঘুরে ও কি ত্যাখে কিছুতেই বলতে চায় না, জিজ্ঞাসা করলে বিজ্ঞের মত হাসে। তপন থাকে আশ্রমপাড়ায়, সব কটা দেশাত্মবোধক গান ওর মুখস্থ। অথচ ও নতুন স্যারকে নিয়ে খারাপ খারাপ রসিকতা করে।

জঙ্গলে ঢোকার আগে তরমুজ খেত। পাকাপাকি কোন ব্যাপার নয়, জল এলেই পালিয়ে যেতে হবে তবু খেতের বাউণ্ডারী দেওয়া হয়েছে। মাঝে মাঝে খুঁটি পুতে সেগুলোর মধ্যে দড়ি বেঁধে দেওয়ায় আলাদা হয়েছে খেতগুলো। ওদের তিনজনকে বালির চর পেরিয়ে সেদিকে যেতে দেখে একজন হেঁকে উঠল, 'কে যায়? কারা যায়?'

মন্টু বলল; 'আমি গো বুড়োকর্তা। সঙ্গে আমার বন্ধুরা।'

অনি দেখল খেতের মধ্যে অনেক জায়গায় লাঠির ডগায় কাকতাড়ুয়ারা ছেঁড়া জামা পরে হাওয়ায় দুলছে। তেমনি একজন শুধু মাথায়, চোখমুখ আঁকা কালো হাঁড়িটাই যা নেই, বালির ওপর উবু হয়ে বসে এক হাতের আড়ালে চোখের রোদ্দুর ঢেকে ওদের দেখছে। মন্টুর কথা শুনে একগাল হাসল বুড়ো, 'অ, খোকাবাবু তাই কও! এত চোরের আওন যাওন বাড়ছে আজকাল যে চিনতে পারি না। কালকের ফলটা মিষ্টি ছিল?'

'হ্যাঁ, খুব মিষ্টি ছিল।' মন্টু বলল।

'যাও কই?'

'এক আনি পয়সা আছে, একটা তরমুজ দেবে?'

বুড়ো হাসল, 'বোঝলাম।'

'তাহলে যাওয়ার সময় নিয়ে যাব, কেমন?' কথাটা বলে ও চাপা গলায় অনিদের বুঝিয়ে দিল, 'যাওয়ার সময় প্রত্যেকে একটা করে নিয়ে যাব, বুঝলি?'

তপন বলল, 'পয়সা?'

মন্টু খিঁচিয়ে উঠল, 'আমাকে পয়সা দেখাচ্ছিস? আমি তোদের মত বাচ্চা নাকি?'

জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়লে আর হাকিমপাড়া দেখা যায় না। শুধু দূরে জেলা স্কুলের লাল ছাদটা চোখে পড়ে। জঙ্গল সরিয়ে সামান্য এগিয়ে একটা খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল ওরা। চারধারে জঙ্গল, মাঝখানে টাকের মত পরিষ্কার বালি। হঠাৎ মন্টু বলল, 'এই অনি, আজকে আমাকে কেমন দেখাচ্ছে বল তো?'

অনি মণ্টুকে ভাল করে দেখল। ওর মাথার চুল বেশ কোঁকড়া, গায়ের রঙ খুব ফর্সা। কিন্তু ওকে তো অন্যরকম কিছু দেখাচ্ছে না। রোজকার মত য়ুনিফর্ম পরাই আছে। ওর মুখ দেখে মণ্টু সেই বিজ্ঞের হাসিটা হাসল। এই হাসিটা দেখলে অনির নিজেকে খুব ছোট বলে মনে হয়। মণ্টু ওদের বন্ধু, এক ক্লাসে পড়ে, কিন্তু ও অনির চেয়ে অনেক বেশী কিছু জানে। মণ্টু হাসিটা শেষ করে জিজ্ঞাসা করল, 'আজকে আসবার সময় কর-বাড়ির দিকে তাকাসনি?'

অনি ঘাড় নেড়ে না বলল।

তপন বলল, 'মুভিং ক্যাসেল পায়চারি করছিল বারান্দায়।'

মণ্টু বলল, 'জানলার ফাঁক দিয়ে রস্তার চোখদুটো তো দেখিসনি তোরা, আহা। তখনই বুঝতে পেরেছিলাম আমাকে আজ অন্যরকম দেখাচ্ছে।'

ওদের স্কুলের উল্টোদিকে যে বিরাট বাড়িটা অনেকখানি বাগান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেটা এখানকার মিউনিসিপ্যালিটির অন্যতম কর্তা শ্রীবিরাম কর মহাশয়ের। মণ্টু একদিন ওকে দেখিয়েছিল বাড়ির গেটের গায়ে ওঁর নামের আগে কে যেন 'অ' অক্ষরটা লিখে গেছে। মানেটা ঠাওর করতে পারেনি প্রথমটায়। মণ্টু বলেছিল, 'তুই একটা গাডল। নতুন স্যারের চ্যালা হয়ে বুদ্ধু রয়ে গেলি।' তারপর মুখ খারাপ করে কথাটার মানে বুঝিয়ে দিয়েছিল। কান-টান লাল হয়ে গিয়েছিল অনিমেষের। অথচ মণ্টুকে খারাপ ছেলে ভাবতে পারে না। ক্লাসে যে কোন প্রশ্নের উত্তর ঠিকঠাক দেয়। অ্যানুয়াল পরীক্ষার সময় ইচ্ছে করে দুটো উত্তর না লিখে ছেড়ে দেয় যাতে ফার্স্ট না হতে পারে। নতুন স্যার কারণটা জিজ্ঞেস করাতে ও বলেছিল, 'ফার্স্ট হলে ঝামেলা। ক্লাসের ক্যাপ্টেন হতে হয়, সবাই গুড বয় ভাবে।' সবাই অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল। নতুন স্যারও।

মণ্টু যে সব খারাপ কথা জানে, অনিমেষ তা জানে না। সেই জন্যে মণ্টু ওর চেয়ে যেন এক হাত এগিয়ে আছে। তপনটা মুখে কিছু বলে না। কিন্তু মণ্টুর সব ইঙ্গিত ও চটপট বুঝতে পারে। আলাউদ্দিন খিলজীর চিতোর আক্রমণটা ক্লাসে পড়ানো হয়ে গেলে তপন আর মণ্টু দুজনে মিলে দেবলাদেবীর নাচ ওদের দেখাল। নাচটা দেখতে খুব বিশ্রী, তপন মেয়েদের ঢং করে দেবলাদেবী সাজছিল আর মণ্টু আলাউদ্দিন খিলজী। নাচ শেষ হলে মণ্টু বিজ্ঞের মত জিজ্ঞাসা করেছিল, 'পৃথিবীতে সবচেয়ে আরাম কিসে পাওয়া যায়?'

কে যেন বলেছিল, 'ঘুমুতে সবচেয়ে আরাম।'

পেটুক অজিত বলেছিল, 'খুব পেট ভরে রসগোল্লা খেতে দারুণ আরাম।'

তপন মাথা নেড়ে বলেছিল, 'ধুস। একবার খেলার মাঠে আমার পেট কামড়েছিল। উঃ, কি যন্ত্রণা। দৌড়ে বাড়ি ফিরছি, কপালে ঘাম জমে যাচ্ছে। তারপর একসময় আর পা যেন চলতে চায় না। যখন ল্যাট্রিন থেকে বেরিয়ে এলাম, ওঃ, তখন এত আরাম এত হাল্কা লাগল—এরকম আর হয় না।'

তপনের বলার ভঙ্গীতে ব্যাপারটা এত জীবন্ত ছিল সবাই যেন বুঝতে পেরে একমত হয়ে গেল। কিন্তু মণ্টু বলল, 'তপন অনেকটা ঠিক কথা বলেছিস কিন্তু পুরোটা নয়। আচ্ছা অনিমেষ, ট্রয়ের যুদ্ধটা কার জন্য হয়েছিল?'

'হেলেনের জন্য।' তপন উত্তরটা দিয়ে দিল।

'লঙ্কাকাণ্ড?'

'সীতার জন্য।' উত্তরটা অনেকগুলো মুখ থেকে বুলেটের মত ছুটে এল।

'আলাউদ্দীন খিলজী কেন চিতোর আক্রমণ করেছিল?'

'পদ্মিনীর জন্য।' সবাই হেসে উঠতেই মণ্টু সেই বিজ্ঞের হাসিটা হেসে হাত তুলে ওদের থামাল, 'আমরা কেন মুভিং ক্যাসেলকে মাসীমা বলে ডাকি?'

এবার কিন্তু কোন শব্দ হল না, চট করে উত্তরটা খুঁজে না পেয়ে এ ওর মুখের দিকে চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। শুধু তপন খিকখিক করে হেসে উঠল। অনি বুঝতে পারছিল না এর সঙ্গে আরামের কি সম্পর্ক। মুভিং ক্যাসেল হল বিরাম কর মশাই-এর স্ত্রী। গোলগাল লম্বা এবং প্রচণ্ড ফরসা মহিলা। বাংলায় বলা হয় চলন্ত দুর্গ, পেছন থেকে দেখলে মনে হয় ওঁর শরীরের মধ্যে অনেকে লুকিয়ে থাকতে পারে। দারুণ সাজেন মহিলা, ওঁর মেয়েরাও ঠিক পাত্তা পায় না। জলপাইগুড়ি শহরের মেয়েরা খুব একটা উগ্র নয়, বরং স্কুলগুলোর সুবাদে একটা গোঁড়া রক্ষণশীল ভাব বজায় আছে। অবশ্য ইদানীং বাইরের কিছু মেয়ে আসার পর হাওয়া বদলাতে শুরু করলেও দেখলেই বোঝা যায় কে স্থানীয় কে বাইরের। সেক্ষেত্রে মিসেস বিরাম কর যাঁকে সবাই মুভিং ক্যাসেল বলে সত্যিই ব্যতিক্রম। গায়ের রঙ ফরসা বলেই হাতকাটা লাল সরু ব্লাউজ যে ওঁকে মানাবে একথা ওঁর চেয়ে বেশী কেউ জানে না। অনি পেছন থেকে ওঁর রিকশায় চলে যাওয়া শরীর দেখে একদিন ভেবেছিল বোধ হয় চাপ-চাপ মাখন দিয়ে ওঁকে তৈরি করা হয়েছে। বিরাম কর মহাশয়ের নাম ছেলেরা রেখেছে ফড়িংদা। মণ্টু বলে ওর এক দাদা নাকি বারো বছর আগে জেলা স্কুলে পড়ত, তারাও নাকি এই একই নামে ওঁদের ডেকে গেছে। মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশনের সময় ফড়িংদার চেয়ে মুভিং ক্যাসেলকে বেশী ব্যস্ত দেখায়। মুভিং ক্যাসেলের তিন মেয়েরই নাম, শুধু ওদেরই, জলপাইগুড়ি শহরে আর কারো নেই। তিনজনেই মায়ের কাছ থেকে গল্পের মত

রং পেয়েছে, জেলা-স্কুলের ছেলেরা কাকে ফেলে কাকে দেখবে বুঝে উঠতে পারে না। মেয়েগুলো এমন নির্লিপ্তের মত তাকায় যে কাউকে দেখছে কিনা বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। মণ্টুর অবশ্য নিশ্চিত ধারণা যে রম্ভা ওর দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকে। রম্ভা সবচেয়ে ছোট। মেনকা উর্বশী রম্ভা। মেনকাই শুধু শাড়ি পরে। নতুন স্যারের সঙ্গে কর-বাড়ির খুব ভাব হয়েছে। হোস্টেলের ছেলেরা বলে প্রায়ই, নতুন স্যার রাত্রের মিল অফ করে মুভিং ক্যাসেলের নেমন্তন্ন খান। এখন তাই জলপাইগুড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে নিশীথ+মেনকা লেখাটা দেখা যাচ্ছে। নতুন স্যারকে নিয়ে এসব ব্যাপার অনির খুব খারাপ লাগে।

মণ্টু বলল, 'কেউ পারলি না তো! পারবি কি করে, তোরা তো আর নভেল পড়িস না!'

অনি বলল, 'এর সঙ্গে আরামের কি সম্বন্ধ?'

মণ্টু হাসল, 'চিরকাল মেয়েদের জন্য যুদ্ধ হয়েছে, কত রাজ্য ছারখার হয়ে গিয়েছে, তাই তা থেকে যে আরাম হয় সেটার কোন তুলনা হয় না। মানুষ তো কষ্ট পাবার জন্য এসব করে না। সে তোরা ঠিক বুঝবি না।' সত্যি, ব্যাপারটা ওরা ঠিক বুঝল না এবং অনি মনে মনে একমত হল না।

এখন তরমুজের খেত পেরিয়ে কাশবনের ভেতর সরু পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তপন বলল, 'গুল মারিস না। রম্ভা দেখেছে বলে তুই অন্যরকম হয়ে গেছিস, না? রম্ভা আজকাল আমার দিকেও তাকায়। আমি গান গাই জানে বোধ হয়।'

চট করে ঘুরে দাঁড়াল মণ্টু, 'খুব খারাপ হয়ে যাবে তপন। মুখ সামলে কথা বলবি। রম্ভা ইজ মাই লভার, আই লভ রম্ভা।'

ভেংচি কাটল তপন, 'ইস্! তুই জেনে বসে আছিস না যে রম্ভা তোকে ভালবাসে?'

একটু থতমত হয়ে মণ্টু বলল, 'আমি বললেই বাসবে।'

তপন চিৎকার করে উঠল, 'এঃ, তোর কেনা চাকর না? যখনই হুকুম করবি তখনই ভালবাসবে! আবার ডাঁট মারা হচ্ছে!'

'আলবৎ মারব। তুই কি পুরুষমানুষ যে রম্ভা তোকে চাইবে? পরিস তো একটা ঢলঢলে প্যান্ট, আবার কথা।' মণ্টুর কথাটা শুনে তপন হাঁ হয়ে গেল। অনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছিল। ওর মনে হচ্ছিল যে কোন মুহূর্তে ওরা মারামারি শুরু করে দেবে। কার কথাটা যে সত্যি বুঝতে পারছিল না ও। এতদিন ধরে মিশে অনি ওদের এই ব্যাপারটার কথা একটুও টের পায়নি বলে নিজেই অবাক হচ্ছিল।

তপন বলল, 'তুই পুরুষ নাকি ? পুরুষ হলে দাড়ি কামায়, বুঝলি। তুই দাড়ি কামাস ?'

মণ্টু হঠাৎ খেপে গিয়ে দুই হাত আকাশে নেড়ে চ্যালেঞ্জ করে বলল, 'ঠিক আছে তপন, তুই যখন প্রমাণ চাস তো প্রমাণ দেব। অনি, তুই শুনলি সব, আমি চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করছি। বেশ তোর প্যাণ্ট খোল, আমরা দেখব।'

কেমন আমসি হয়ে গেল তপনের মুখ। বোধ হয় এত অবাক হয়ে গিয়েছিল যে কোন কথা বলতে পারল না। অনিও চমকে গিয়ে মণ্টুর দিকে তাকাল।

সেইরকম বিজ্ঞের হাসি হাসল মণ্টু, 'কাওয়ার্ড। শুধু মুখেই জগৎ জয় করিস। বেশ ছাখ আমার দিকে।' এই বলে ঝটপট করে ওর চাপা প্যাণ্ট খুলে ফেলল। প্যাণ্ট খোলার সময় অনি চট করে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল। ও দেখল মণ্টু বালির ওপর ওর শার্ট প্যাণ্ট ছুঁড়ে দিল। তারপর শুনল মণ্টু বলছে, 'এবার ছাখ।' খুব সঙ্কোচে মুখ ফেরাল অনি। কোমরে হাত রেখে গোড়ালি উঁচু করে ব্যায়ামবীরের মত মণ্টু ঘুরে ঘুরে নিজেকে ছাখাচ্ছে। ওর পরনে একটা সাদা ল্যাঙ্গট, ব্যায়াম করার সময় অনেকে পরে। আর সঙ্গে সঙ্গে অনির খুব খারাপ লাগতে আরম্ভ করল। ওর নিজের একটাও জাঙ্গিয়া নেই, ল্যাঙট তো দূরের কথা। দাদু ওকে সুন্দর জামাকাপড় কিনে দেন কিন্তু ওর যে একটা জাঙ্গিয়া দরকার তা কারো খেয়াল হয় না। এখন এই মুহূর্তে ও অনুভব করল জাঙ্গিয়া বা ল্যাঙট না পরলে পুরুষমানুষ হওয়া যায় না। মণ্টু বলল, 'ছাখ, পুরুষমানুষ কাকে বলে! তুই লাইফে ল্যাঙট পরেছিস ?'

তপন খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল। কি বলবে বুঝতে না পেরে অনির দিকে তাকাল। তারপর মুখ নিচু করে ও বলল, 'বুদ্ধদেব বলেছেন মনটাই সব, শরীর কিছু নয়।'

'ওসব বাক্যি বইতে থাকে।' ফের জামাপ্যাণ্ট পরতে পরতে মণ্টু বলল, 'রম্ভা যদি আমাকে এই ড্রেসে দেখত তাহলে একদম ম্যাড হয়ে যেত।'

কথাটা শুনে অনি হেসে ফেলল, 'ম্যাড হলে তো কামড়াবে!'

'ড্যাম! সে ম্যাড নাকি ? তোদের সঙ্গে কথা বলে সুখ নেই।' তারপর গলার স্বর ভারী করে বলল, 'তপন, ফ্রেণ্ডশিপ রাখতে চাস তো ল্যাঙ মারতে যাস না। আমি তোর চেয়ে আগে পুরুষ হয়েছি, আমার চান্স আগে। একেই শালা আমি জ্বলেপুড়ে মরছি। কদমতলার একটা ছেলে রোজ বিকেলে ওদের বাড়ির সামনে নাকি তিনবার সাইকেলের বেল বাজিয়ে যায়। বল তোরা, এসব কি ভাল কথা ?' তপন যেন ততক্ষণ এইসব কথা কিছুই শুনতে পায়নি এমন ভান করে

সামনের জঙ্গল দু'হাতে সরাতে সরাতে বলল, 'আর ক্যাঁচক্যাঁচ করিস না। যা দেখাবি বলেছিলি তা কোথায়, নাকি সব গুল ?'

শার্টের বোতাম আটকে মন্টু বলল, 'এ শর্মা গুল মারে না। চল দেখাচ্ছি। এই যে অনিমেষচন্দর, চল, দেখব তোমার শরীর কেমন ঠাণ্ডা থাকে।' কথাটা শুনে অনিমেষের কান গরম হয়ে গেল আচমকা।

জঙ্গলটা ধরে খানিক এগোতেই কয়েকটা মিহি গলা শুনতে পেল অনিমেষ। আওয়াজটা কানে যেতে মন্টু হাত নেড়ে ওদের থামতে বলল। ও মুখে কোন কথা বলছে না কিন্তু ইশারা ইঙ্গিতে এমন একটা পরিবেশ চটপট তৈরি করে ফেলল যে অনিমেষের মনে হল ব্যাপারটা ভাল হচ্ছে না। মন্টু এখন প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে, ওরা পেছন পেছন। মাথার ওপর কাশগাছ ছাদের মত ছেয়ে রয়েছে, দূর থেকে কেউ ওদের বুঝতে পারবে না। হাঁটু দুটো ক্রমশ জ্বালা করতে লাগল বালিতে ঘষা লেগে। কি একটা সরসর করে ওদের পাশ দিয়ে দ্রুত চলে যেতে অনি ফিসফিস করে বলল, 'এই, আজ বাড়ি চল।'

তপন বলল, 'দূর বোকা, ওটা তো শিয়াল।'

মন্টু হাসল, 'ফক্স দেখে ভয় পাচ্ছিস, টাইগ্রেস দেখে কি করবি ?' আর ঠিক সেই সময় একগাদা হাসি ছিটকে এল ওদের দিকে। মেয়েলি গলায় কে যেন কি একটা কথা বলে উঠল চেঁচিয়ে। আর একটু এগোতেই জঙ্গলটা পাতলা হয়ে এল। জলের শব্দ হচ্ছে ছলাৎ ছলাৎ করে। অনিমেষ দেখল মন্টু কাশগাছ সরিয়ে ছোট্ট একটা ফাঁক তৈরি করেছে। অনিমেষ আর তপন ওর পাশে মাথা রাখতেই পুরো নদীটা সিনেমার মত ওদের সামনে উঠে এল। তিস্তার জল এখন অত ঘোলা নয়, করলা নদীর চেয়ে একটু অপরিষ্কার। নদীটা এখানে বাঁক নিয়েছে সামান্য। প্রথমে কাউকে নজরে এল না অনিমেষের, শুধু একটা মেয়ে গান গাইছে এটা বুঝতে পারছিল। গানের সুরটা অদ্ভুত মিষ্টি অথচ কেমন কান্না-কান্না গলায় মেয়েটি গাইছে। ওকে চোখে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না বটে কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হয় না যে গাইছে তার খুব দুঃখ। আর এই সময় অন্য কেউ হাসাহাসি করছে না আগের মতন। শুধু ছলাৎ ছলাৎ জলের শব্দ যেন সেই গানের সঙ্গে আবহ-সঙ্গীতের মত বেজে যাচ্ছিল। ভাল করে কান পাতল অনি, মেয়েটি গাইছে—

'এথে অঙ্গে এথে সঙ্গে
ওহে পরভু মুই
নাই রহিম মুই ঘরেরে পরভু,
হামু না যামু অরণ্যে জঙ্গলেরে।'

মণ্টু ফিসফিসিয়ে বলল, 'মেয়েটা ঘরে থাকবে না বলছে, জঙ্গলে চলে যাবে রে।'

হঠাৎ তপন বাঁ দিকে সরে গিয়ে জঙ্গলটা ফাঁক করল। করেই খুব উত্তেজিত হয়ে ওদের ডাকল। অনিমেষ নড়বার আগেই মণ্টু ঝাঁপিয়ে পড়ে জায়গা করে নিয়েছে। ফুটোতে চোখ রেখে অনিমেষ দেখতে পেল প্রায় আট-দশজন মেয়ে ছোট ছোট কাঠ জল থেকে পাড়ে টেনে তুলছে। দুজন সাঁতরে নদীর মধ্যে চলে গেল। আর একটু দূরে বালির ওপর বসে জলে পা ডুবিয়ে একটি প্রৌঢ়া চোখ বন্ধ করে গান গাইছে যা ওরা এতক্ষণ শুনতে পাচ্ছিল।

মণ্টু বলল, 'কি রে, কেমন দেখছিস ?'

আর তখনই ওর নজরে পড়ল, মেয়েগুলোর কেউ শাড়ি জামা পরে নেই। কোমর থেকে একটা কাপড় গোল করে জড়িয়ে রেখেছে সবাই। ওপরে কাশ-গাছের গায়ে অনেকগুলো জামাকাপড় স্তূপ করে রাখা আছে। বোধ হয় জলে ভিজে যাবে বলে এই পোশাকে সবাই জলে নেমেছে। ওদের নিশ্চয়ই বেশী জামাকাপড় নেই। কিন্তু ওদের দিকে তাকিয়ে অনির কেমন লজ্জা লজ্জা করতে লাগল। এখন এই নির্জন নদীর তীরে এতগুলো নারীর বিভিন্ন আকারের বুক দেখতে দেখতে ওর শরীরে অদ্ভুত একটা সিরসিরানি জন্ম নিল। তাকিয়ে থাকতে ওর ক্রমশ কষ্ট হতে লাগল, আর তখনি ওর কানে এল মণ্টু বলছে, 'কিরে অনি, তোর মুখ এত লাল হয়ে গেল কি করে ?'

তপন বলল, 'বেদিং বিউটি একেই বলে, আহা। থ্যাঙ্ক ইউ মণ্টু।'

দূরে তিস্তার মধ্যিখানে সেই মেয়ে দুটো কিছু বলে চেঁচিয়ে উঠতে টপাটপ এরা কয়েকজন জলে ঝাঁপ দিল। অনি দেখল তিস্তার ঠিক মাঝ বরাবর একটা বিরাট গাছের গুঁড়ি ভেসে যাচ্ছে। গুঁড়িটার অনেকখানি জলের নিচে ডোবা কিন্তু যেটুকু দেখা যাচ্ছে তা থেকে এর আকৃতিটা বোঝা যায়, এটাকে দেখতে পেয়েই মেয়েগুলোর মধ্যে দারুণ উল্লাস ছড়িয়ে পড়েছে। এতক্ষণ যে গান গাইছিল সে এখন উঠে দাঁড়িয়ে দুটো হাত মুখের দুপাশে আড়াল করে সাঁতরে যাওয়া মেয়েগুলোকে নির্দেশ দিচ্ছিল। আগের মেয়ে দুটো যে লম্বা লম্বা দড়ি কোমরে বেঁধে নিয়ে গিয়েছে অনি তা ত্যাখেনি। এখন সেগুলোর ডগা চটপট ভেসে যাওয়া গুঁড়িটার গায়ে গিঁট দিয়ে বেঁধে ফেলে ওরা নিশ্চিন্ত হল। গুঁড়িটা কিন্তু ভেসেই যাচ্ছে। ততক্ষণে অন্য মেয়েরা গিয়ে সেই দড়িগুলোর প্রান্ত ধরে ফেলেছে। হঠাৎ একটা অদ্ভুত সুরেলা চিৎকার থেমে থেমে ভেসে আসতে লাগল। গুঁড়িটা এত বড় যে মেয়েদের সরাসরি টেনে আনার সাধ্যি নেই। তাই ওরা ওটাকে

স্রোতের টানে চলে যেতে দিয়ে মাঝে মাঝে হেঁচকা টানে একটু একটু করে তীরের দিকে সরিয়ে আনছে। আর টানবার সময় সেই সুরেলা চিৎকারটা বোধ হয় ওদের শক্তি যোগাচ্ছে বেশী করে। মগ্ন হয়ে ওদের পরিশ্রম দেখছিল অনি। মেয়েগুলোর শক্তি ওদের শরীর দেখে আঁচ করা যায় না।

নতুন স্যার কয়েক দিন আগে ওদের কয়েকজনকে নিয়ে শিকারপুর চা বাগানের কাছে একটা জঙ্গলে গিয়েছিলেন। সেখানে একটা পড়ো মন্দির আছে। জলপাইগুড়ি থেকে যেতে খুব বেশী সময় লাগে না। মন্দিরটা তিস্তা থেকে খুব দূরে নয়। লোকে বলে ওটা নাকি দেবীচৌধুরানীর প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দির। ডাকাতি করার আগে এ অঞ্চলে এলে পূজো দিয়ে যেতেন। এই তিস্তার ওপর দিয়ে দেবীচৌধুরানীর বজরা ভেসে যেত কল্পনা করতেও রোমাঞ্চ হয়। এখন ওর মনে হল এই সব মেয়েরা পরিশ্রমের দিক দিয়ে দেবীচৌধুরানীর চেয়ে একটুও কম নয়। গাছের গুঁড়িটা স্রোতের টানে ক্রমশ চোখের আড়ালে চলে গেলেও অনি বুঝতে পারল সেটা তীরের দিকে চলে এসেছে। এবার মেয়েগুলো যদি তীরের ওপর উঠে গুণ-টানার মত করে গুঁড়িটাকে এখানে টেনে নিয়ে আসে তাহলে ওদের নির্ঘাৎ দেখতে পাবে। বানিশ-কিং সাহেবের ঘাটের গুণ-টানা দেখছে ও। এখান থেকে সরে যাওয়া দরকার। অনি পাশ ফিরে তাকিয়ে বন্ধুদের দেখতে পেল না। একটু আগেও ওরা এখানে ছিল, এত সন্তর্পণে এখান থেকে সরে গিয়েছে যে সে টের পায়নি। এদিকে মেয়েগুলোর চিৎকার বেশ দ্রুত এগিয়ে আসছে, বোঝা যাচ্ছে পাড়ে উঠে পড়েছে ওরা, এবার গুণ-টানা শুরু হবে।

মাথা নীচু করে ভেঙে-যাওয়া কাশবনের চিহ্ন দেখে ও জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ল। খানিক দূর আসার পর ও বন্ধুদের দেখতে পেল। অনি যে পা টিপে টিপে ওদের পেছনে এসেছে তা যেন ওরা টের পেল না। দুজনেই হাঁটু গেড়ে বসে কিছু দেখছে। অনি তপনের পিঠের ওপর হাত রাখতেই ভীষণ চমকে উঠে ওকে দেখতে পেয়ে নিঃশ্বাস ফেলল সে, 'উঃ, চমকে দিয়েছিলি।' কথাটা একটু জোরে হয়ে যেতেই পাশ থেকে মন্টু ওর পেটে জোরে চিমটি কাটল। তপনের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে ব্যথা লেগেছে খুব কিন্তু সেটা ও হজম করে নিল। কি দেখছে ওরা বোঝার জন্য অনি কাশবনের মধ্যে মাথা গলিয়ে দিল। প্রথমে বুঝতে পারেনি, পরে স্পষ্ট হল, সামনের একচিলতে খোলা বালির ওপর দুটো শরীর প্রচণ্ড আক্রোশে কুস্তি লড়ছে। অনেকক্ষণ ধরে লড়াইটা হচ্ছিল। অনি দেখতে আসার সময়টায় একজনকে প্রায় কব্জা করে ফেলেছে প্রতিদ্বন্দ্বী। এরকম এক নির্জন জঙ্গলের মধ্যে ওরা কুস্তি করছে কেন বুঝতে না পেরে অনি হাঁ হয়ে দেখল বিজয়ী

উঠে দাঁড়াল, বিজিত শুয়ে আছে চিৎ হয়ে বালিতে। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল অনি। এরা দুজনেই মেয়েমানুষ। যে শুয়ে আছে অসহায়ের ভঙ্গীতে, একটা হাত চোখের ওপর আড়াল করে, তার বয়স হয়েছে, শরীরটা কেমন ঢলঢলে। যে জিতল, তার উঠে দাঁড়ানোতে একটা গর্ব ফেটে পড়ছিল যা তার অল্প বয়সের সঙ্গে দারুণ মানিয়ে যাচ্ছিল। তার দিকে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। খুব গর্বিত ভঙ্গিমায় সে ছেড়ে রাখা জামাকাপড় পরতে লাগল। হঠাৎ ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনির মনে হল শরীরে যেন অনেক জ্বর এসে গেছে। গলা, জিভ শুকনো। একটু একটু করে কপালে ঘাম জমছে। পায়ে কোন সাড নেই। যুবতী যাবার সময় থুক করে শুয়ে থাকা প্রৌঢ়ার দিকে একদলা থুতু ফেলে চলে গেল, প্রৌঢ়া সেই ভঙ্গীতেই পড়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎ উপুড় হয়ে চাপা গলায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। মণ্টু ফিসফিস করে বলল, 'বেচারা বরটাকে হারাল।' এর আগে কি কথা হয়েছে মেয়ে দুটোর মধ্যে অনি শোনেনি তাই মণ্টু কথাটা বলতে ও ঠিক বুঝতে পারল না। কিন্তু ওর শরীর এরকম করছে কেন?

মানুষের শরীরের মধ্যে যে আর একটা শরীর আছে এই প্রথম অনিমেষ অনুভব করল। ওর সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। হঠাৎ কি একটা বোধ ওর মেরুদণ্ডে টোকা মারতেই ও তীরের মত জঙ্গল ভেদ করে দৌড়াতে লাগল। পেছনে মণ্টুর চাপা গলার ডাক পড়ে থাকল। ওর হাত পা ছড়ে যাচ্ছিল কাশগাছে, কিন্তু তরমুজের খেত পেরিয়ে বালিতে না আসা অবধি ও থামল না।

এই শরীরটা ওর চেনা ছিল না। আশ্চর্য, এই সময় ও আর কানের কাছে সেই গলাটা শুনতে পাচ্ছিল না যে তাকে মাঝে মাঝে সঠিক পথ বলে দেয়।

পেছন ফিরে তাকিয়ে ও কাউকে দেখতে পেল না। এই বিরাট ফাঁকা বালির চরে দাঁড়িয়ে ওর মনে হল আজ সে যে কাজটা করে ফেলেছে তা কাউকে বলা যাবে না। দাদু পিসীমাকে একথা বলাই যায় না। তা ছাড়া দাদু পিসীমার সঙ্গে ক্রমশ যে ব্যবধান হয়ে যাচ্ছে সেটা প্রতিদিন ও টের পাচ্ছে। বাবার সঙ্গে যোগাযোগের প্রশ্নই ওঠে না। সেই ঘটনার পর বাবা নাকি খুব চুপচাপ হয়ে গেছেন। জলপাইগুড়িতে যখন আসেন তখন গম্ভীর হয়ে থাকেন। এমন কি ছোট মাও যেন অন্য রকম হয়ে গেছে। সেই ঘটনার কথা ভুলেও তোলে না, প্রয়োজন ছাড়া কথা বলে না।

না, কেউ নেই। মা বলতেন কোন কথা লুকোবি না অনি, আমার কাছে সব কথা খুলে বললে কোন পাপ হবে না। অনেক দিন পর অনির বুকটা টনটন

করতে লাগল মায়ের জন্য। যত দিন যাচ্ছে রাত্তিরবেলায় আকাশের দিকে তাকালে তারাগুলো তারাই থেকে যাচ্ছে, স্বর্গের মত সেগুলো এক-একটা নক্ষত্র জানার পর এখন আর মা ওর সঙ্গে মনে মনে কথা বলেন না।

অল্পবয়সী মেয়েটার শরীরটা যেন চোখের সামনে থেকে সরানো যাচ্ছে না। সেই অনেক দিন আগে দেখা কামিনটার কথা চট করে মনে পড়ে গেল আজ। তখন তো এমন হয়নি। তখন তো মাকে স্বচ্ছন্দে সব কথা খুলে বলতে পেরেছিল। চকিতে ও কপালে মা শব্দটা লিখে কয়েক বছর আগে শেখা রামকৃষ্ণের প্রণাম-মন্ত্রটা উচ্চারণ করল। এবং এবার আশ্চর্যভাবে কোন কাজ হল না। কি একটা আক্রোশে ও লাথি মেরে একগাদা বালি ছড়িয়ে নিজের অজান্তে জেলা স্কুলের দিকে দৌড়তে লাগল।

॥ ৭ ॥

জেলা স্কুলের পাশে তিস্তার কিনারে একটা নৌকো বালিতে আটক হয়ে আছে জল শুকিয়ে যাওয়া থেকে। অনেকটা পথ দৌড়ে অনিমেষ সেখানে এসে থামল। এখন সমস্ত শরীরে কুলকুল করে ঘাম নামছে, জোর ওঠানামা করছে বুকটা। ও নৌকোর গায়ে ঠেস দিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। মন্টু বা তপনকে এখনও দেখা যাচ্ছে না। মন্টুটা এখানে প্রায়ই আসে। কেন আসে তা এতদিন জানতো না সে, আজ জানতে পেরে নিজেকে আরো ছেলেমানুষ বলে মনে হচ্ছিল। ইদানীং স্বাস্থ্য ভাল হচ্ছে বুঝতে পারছে ও। রোজ সকাল বিকেল ফ্রি-হ্যাণ্ড এক্সারসাইজ করে বেশ খিদে পায়। হাত ভাঁজ করলে বাইসেপগুলো চমৎকার ফুলে ওঠে। নতুন স্যার বলেছেন যে জাতির স্বাস্থ্য নেই তাদের কিছুই নেই। তাই প্রতিটি কিশোর নাগরিকের উচিত নিজের শরীরের প্রতি যত্ন নেওয়া। স্কুল-জিমনাসিয়ামে বিকেলবেলায় খুব ভিড় হচ্ছে আজকাল। তা মাথায় ও পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি ছুঁয়ে ফেলেছে। পড়ার ঘরে স্কেল দিয়ে দেওয়ালে ছোট ছোট করে মাপ দিয়ে মাঝে মাঝেই উচ্চতাটা জরিপ করে নেয় অনিমেষ। বন্ধুদের মধ্যে অনেকেরই গোঁফের রেখা দেখা গেছে, কিন্তু ওর মুখ একদম পরিষ্কার। পিসীমা বলেন মাকুন্দদের নাকি গোঁফদাড়ি হয় না, তাই ভোরবেলায় তাদের মুখ দর্শন করলে অযাত্রা হয়। কি করে হয় ওর মাথায় ঢোকে না। বাচ্চা ছেলের মুখ দেখলে যদি অযাত্রা না হবে তো বয়স্ক মানুষের গোঁফ ছাড়া মুখ দেখলে তা হবে কেন? তাহলে যাদের মাথা জুড়ে টাক, একটাও চুল নেই, তাদের দেখলেও অযাত্রা হবে? পিসীমার সঙ্গে ও প্রাণপণে এসব তর্ক চালিয়েও জিততে পারে না শেষ

পর্যন্ত। পিসীমার শেষ অস্ত্র, তুই এখনও ছোট—এসব বুঝবি না। হঠাৎ হেসে ফেলল অনিমেষ, তারপর মনে মনে বলল, আজ থেকে আমি আর ছোট নই, আমি এখন বড় হয়ে গেছি। একদিন মন্টু বলেছিল পেন্সিলের মুখটা ব্লেডের গোল গর্তে টাইট করে ঢুকিয়ে চমৎকার গোঁফ কামানো যায়। অনিমেষ ঠিক করল এবার মাঝে মাঝে ও এই কায়দাটা করবে, তাহলে গোঁফ বেরুতে দেরি হবে না মোটেই। আর হ্যাঁ, ওর জমানো চার টাকা ছয় আনা দিয়ে একটা জাঙ্গিয়া কিনতে হবে। একা যেতে পারবে না সে, মন্টুকে নিয়ে যেতে হবে দিন-বাজারে। জাঙ্গিয়া না পরলে পুরুষমানুষ হওয়া যায় না।

চুপচাপ ও জেলা স্কুলের পাশের রাস্তাটায় উঠে এল। এখন প্রায় বিকেল। আকাশ সামান্য মেঘলা বলে রোদটা মোটেই গায়ে লাগেনি এতক্ষণ। মাঠের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে অনিমেষ দেখতে পেল নতুন স্যার ওকে হাত নেড়ে ডাকছেন। এইসময় নতুন স্যারকে এখানে দেখতে পাবে ভাবেনি অনিমেষ। এতদিন হয়ে গেল নিশীথবাবু এখানে আছেন, তবু নতুন স্যার নামটা আংটির মত ওঁর অঙ্গে এঁটে আছে। আর একটা মজার ব্যাপার এই যে, অনিমেষ এতটা বড় হল তবু নতুন স্যার একই রকম আছেন। চেহারায় একটুও বুড়ো হননি। অনিমেষ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে চোখ দিয়ে মেপে দেখেছে যে তার আর নতুন স্যারের উচ্চতায় পার্থক্য খুব বেশী নয়।

কাছাকাছি হতে নতুন স্যার বললেন, 'কোথায় গিয়েছিলে অনিমেষ?'

অনিমেষ বলল, 'তিস্তার চরে বেড়াতে।'

নতুন স্যার যেন অবাক হলেন প্রথমটায়, তারপর হাসলেন, 'ও, তরমুজ খেয়ে এলে বুঝি, ওরা প্রায়ই কম্প্লেন করে স্কুলের ছেলেরা নাকি চুরি করে তরমুজ নিয়ে আসে।'

অনিমেষ বলল, 'না, আমি তরমুজ খাইনি।'

নতুন স্যার কথাটা শুনে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বোধ হয় এ ব্যাপারে আর কথা বাড়াতে চাইলেন না, 'ও, গুড! হ্যাঁ শোন, তোমাকে একটা কথা বলার আছে। তুমি তো এখন বড় হয়েছ, তোমার সঙ্গে আমি ফ্র্যাঙ্কলি সব কথা বলে আসছি এতকাল তাই এই ব্যাপারটা বলতে কোন সঙ্কোচ অবশ্য আমি বোধ করছি না। কিন্তু তোমাকে আশ্বাস দিতে হবে, এটা কাউকে বলবে না।'

নতুন স্যার ওর মুখের দিকে চেয়ে কথা শেষ করতে অনিমেষ অবাক হয়ে গেল। সেই ক্লাস থি থেকে আজ অবধি কোনদিন নতুন স্যার ওর সঙ্গে এমনভাবে কথা বলেন নি। অনিমেষ খুব বিচলিত গলায় বলল, 'না, না, স্যার। আমি

কাউকে বলব না, আপনি যা বলেন তা আমি কখনো অমান্য করি না।'

শেষ কথাটা বলতে গিয়ে অনিমেষ হঠাৎ আবিষ্কার করল ওর গলাটা কেমন অদ্ভুত শোনাল নিজের কাছেই। খুব খুশী হয়ে নতুন স্যার ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, 'আমি জানি। এই স্কুলে তুমিই একমাত্র আমার তৈরী। আমি বিরামদাকে বলেছি তোমার কথা।' ওর সঙ্গে কয়েক পা হেঁটে হঠাৎ গলার স্বর পাল্টে নতুন স্যার বললেন, 'আচ্ছা মণ্টু ছেলেটা কেমন?'

আচম্বিতে প্রশ্নটা আসায় থতমত হয়ে গেল অনিমেষ। ওর চট করে মণ্টুর সেই জাঙ্গিয়াপরা পোজটা মনে পড়ল। পড়তেই ওর মুখ-চোখ গরম হয়ে গেল। 'কেন?' কোনরকমে বলল সে।

নতুন স্যার বললেন, 'ওর সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বলে। এই এত অল্প বয়সে ও দেশের কথা না ভেবে নোংরা আলোচনা করে শুনতে পাই। তুমি তো ওর সঙ্গে মেশো, তাই জিজ্ঞাসা করছি।'

কোনরকমেই অনিমেষ মিথ্যে কথা বলতে পারছিল না। আবার আশ্চর্য, সত্যি কথাটা বলতে ওর একটুও ইচ্ছা করছে না। আসলে মণ্টু যা বলে এবং আজ একটু আগেও ও যা দেখিয়েছে তার মধ্যে এমন একটা সরলতা থাকে যে ব্যাপারটা খারাপ হলেও অনিমেষের মনে হয় না যে খারাপ। এখন মণ্টুর বিরুদ্ধে কিছু বললে নতুন স্যার নিশ্চয়ই তা হেডস্যারকে বলবেন এবং তাহলে মণ্টুর কাছে ও মুখ দেখাবে কি করে? এই সময় নতুন স্যার আবার বললেন, 'আমার সন্দেহ হচ্ছে বিরামদার বাড়ির সামনে অশ্লীল অক্ষরটা মণ্টুই লেখে।'

সঙ্গে সঙ্গে সজোরে ঘাড় নাড়ল অনিমেষ, 'না না, এ একদম মিথ্যে কথা, মণ্টু কখনো লিখতে পারে না।'

ওকে আপাদমস্তক দেখে নতুন স্যার বললেন, 'তুমি বলছ?'

বেশ আত্মপ্রত্যয় নিয়ে অনিমেষ জবাব দিল, 'হ্যাঁ।'

এই কথাটা ওকে মিথ্যে বলতে হচ্ছে না। কথা বলতে বলতে ওরা বিরামবাবুর গেটের সামনে এসে গিয়েছিল। সেদিকে তাকিয়ে বিরক্তিতে মুখটা বেঁকালেন নতুন স্যার। অনিমেষ দেখল এখন বিরামবাবুর নামের আগে কাঠ-কয়লা দিয়ে অ অক্ষরটা লেখা আছে। বেশ উত্তেজিত গলায় নতুন স্যার বললেন, 'দেখেছ, কি রুচি স্বাধীন ভারতের ছেলেদের! ছি ছি ছি! বিরামদার মত একজন রেসপেক্টব্‌ল কংগ্রেসী কি এখনকার ছেলেদের কাছে একটু সৌজন্য আশা করতে পারেন না? আচ্ছা লেখাটা কি তোমার পরিচিত মনে হচ্ছে অনিমেষ?'

অনিমেষ কিছুক্ষণ দেখে ঠাওর করতে পারল না। অ অক্ষরটা তো এইরকমই

হয়। তাকে লিখতে বললেও সে এইরকম লিখত। সরলভাবে ঘাড় নাড়ল সে। নতুন স্যার কয়েক পা হেঁটে হাত দিয়ে অ-কে মুছতে চেষ্টা করতে সেটা কেমন ঝাপসা হয়ে ধেবড়ে গেল। তারপর রুমালে হাত মুছতে মুছতে বললেন, 'এই ব্যাপারটা আর বেশীদিন চলতে দেওয়া যায় না। যে করছে তাকে ধরতে হবে। এ ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য চাই অনিমেষ।'

কি সাহায্য করবে বুঝতে না পেরেও ঘাড় নাড়ল অনিমেষ। আর এই সময় ও দেখল গেটের ভেতরে বাগানে একটা ছোট্ট কুকুরকে চেনে বেঁধে মুভিং ক্যাসেল হেঁটে আসছেন। মুভিং ক্যাসেলের তুলনায় কুকুরটা এত ছোট যে ব্যাপারটা মানাচ্ছিল না। টকটকে লাল শাড়ি পরেছেন মুভিং ক্যাসেল, চোখ টেনে নেয়। হঠাৎ গেটের কাছে ওদের দেখতে পেয়ে দ্রুত এগিয়ে এলেন তিনি, 'ওমা, নিশীথ! কখন এলে? সারাদিন তোমার কথা ভাবছিলাম। ওখানে দাঁড়িয়ে কেন ভাই, ভেতরে এস।'

গলার স্বরটা এত মিহি এবং মোলায়েম এবং কাঁপা-কাঁপা যে অনিমেষ আজ অবধি কাউকে এভাবে কথা বলতে শোনেনি। ও অবাক হয়ে শুনল নতুন স্যার এতক্ষণ যে গলায় কথা বলছিলেন তা যেন মুহূর্তেই উধাও হয়ে গেল। কেমন বিগলিত ভঙ্গীতে নতুন স্যার বললেন, 'একটু দেরি হয়ে গেল, বিরামদা আছেন?'

অদ্ভুত একটা ভঙ্গিমায় মুভিং ক্যাসেল বললেন, 'আঃ, বিরামদা আর বিরামদা, আমার কাছে বুঝি আসতে নেই? আমি না থাকলে তোমাদের বিরামদা বিরামদা হতো? আরে, ভেতরে এসো না।'

চট করে গেট খুলে ভেতরে গিয়ে অনিমেষের কথা মনে পড়তে নতুন স্যার ঘুরে দাঁড়ালেন। মুভিং ক্যাসেল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ছেলেটি কে?'

নতুন স্যার বললেন, 'আমার ছাত্র। অনিমেষ।'

'ও। তুমি একদিন এর কথা বলেছিলে, না? বেশ বেশ। খুব মিষ্টি দেখতে তো। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? এসো না আমাদের বাড়িতে।' মুভিং ক্যাসেল মাথা নেড়ে অনিমেষকে ডাকলেন।

কি করবে বুঝতে পারছিল না অনিমেষ। ওর মনে হল্ এখন চলে যাওয়াই উচিত, নাহলে নতুন স্যার হয়তো বিরক্ত হবেন। কিন্তু ও কিছু বলার আগেই নতুন স্যার ওকে ডাকলেন, 'এসো অনিমেষ।'

অনিমেষ ভেতরে এসে গেটটা বন্ধ করতেই মুভিং ক্যাসেলের কুকুরটা ওর পায়ের কাছে শরীর ঘষতে লাগল। একরত্তি কুকুরটার কাণ্ড দেখে ও অবাক। মুভিং ক্যাসেল শরীর দুলিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'আমার জিমির দেখছি পছন্দ খুব।

তোমাকে ওর খুব ভাল লেগেছে।' বলে চেনটা অনিমেষের হাতে দিয়ে দিলেন।

নতুন স্যার মুভিং ক্যাসেলের পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছেন বারান্দার দিকে, পেছন পেছন কুকুর নিয়ে অনিমেষ। কয়েক পা হেঁটে হঠাৎ প্রকৃতির ডাক শুনতে পেল জিমি। পেছনের দুই পা ভেঙে বসে জলবিয়োগ করতে লাগল সে। চেন হাতে দাঁড়িয়ে খুব অস্বস্তিতে পড়ল অনিমেষ। এখানেই মানুষের সঙ্গে পশুর তফাৎ, মনে মনে ভাবল সে, যতই আদর করুন মুভিং ক্যাসেল একে সময় অসময় জ্ঞানটা শেখাতে পারবেন না। কুকুরটা আনন্দে গুট গুট করে চলতে শুরু করলে অনিমেষ বারান্দার দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল। লম্বা বারান্দার তিন দিক মানিপ্লাণ্টে ঢাকা তবে ভেতরে দাঁড়ালে সামনের রাস্তা এমন কি ওদের স্কুলের বারান্দা স্পষ্ট দেখা যায়। একটা বেতের চেয়ার এক কোণে খালি পড়ে আছে। মুভিং ক্যাসেল অনিমেষের হাত থেকে চেনটা নিয়ে জিমির গলা থেকে খুলে সেটাকে চেয়ারের গায়ে ঝুলিয়ে রেখে দিলেন। জিমি এখন তাঁর বুকের ওপর গুটিসুটি মেরে বসে আছে। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে মুভিং ক্যাসেল ঘাড় নেড়ে ডাকলেন, 'এসো।'

দেওয়াল জুড়ে গান্ধীজীর ছবি। বাবু হয়ে বসে চরকা কাটছেন। মুখে এমন একটা প্রশান্তি আছে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। বিরাট ফ্রেমে হাতে আঁকা এরকম জীবন্ত ছবি এর আগে দ্যাখেনি অনিমেষ। এ'দিকের দেওয়ালে আলমারি আর তাতে মোটা বই ঠাসা। আলমারির সামনে সাদা রঙের বেতের সোফাসেট। তার একটিতে একজন প্রৌঢ় বসে আছেন। মাথার চুলে সামান্য পাক ধরেছে, খুব রোগা এবং বেঁটে মানুষ। গায়ে ফিনফিনে আদ্দির গিলেকরা পাঞ্জাবি। ওদের দেখে সোজা হয়ে বসলেন, 'আরে নিশীথ যে, এস এস, তোমার কথাই ভাবছিলাম।'

গলার স্বত এত সরু যে চোখ বন্ধ করে শুনলে বোঝা যাবে না যে কোন পুরুষমানুষ কথা বলছে। কিন্তু সরু হলেও এঁর বলার ধরনে এমন একটা সুর আছে যে সহজেই আকৃষ্ট করে। নতুন স্যার সামনের সোফাটায় বসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'শরীর কেমন আছে বিরামদা?'

বিরামবাবু বললেন, 'আমার তো চিরকেলে হাঁপানী রোগ, বাতাস চললেই বাড়ে। ভাল আছি, বেশ আছি—যতটা থাকা যায়। কিন্তু কিছু ব্যবস্থা হল?'

নতুন স্যার বললেন, 'এখনও হয়নি, তবে অ্যাদ্দিন তো তেমন চেষ্টাও হয়নি। আপনি কিছু চিন্তা করবেন না, কয়েকদিনের মধ্যে এটা যাতে বন্ধ হয় তার ব্যবস্থা করবো। আমার সঙ্গে মনবিহারীবাবুর কথা হয়ে গেছে, তাছাড়া হোস্টেলের ছেলেদের গ্রুপ করে ওয়াচ রাখতে বলেছি।'

বিরামবাবু সুর করে বললেন, 'স্ট্রেঞ্জ! কাদের জন্য কাজ করব বল? এই তো সব চেহারা। অবশ্য যারা খ্রীষ্টকে হত্যা করেছিল, গান্ধীকে গুলি করেছে, তারা যে আমার বাড়ির সামনে অশ্লীল অক্ষর লিখবে এটাই তো স্বাভাবিক, না?'

এই সময় মুভিং ক্যাসেল অনিমেষের পাশে দাঁড়িয়ে কেমন গলায় বলে উঠলেন, 'তোমার ঠাকুর্দার আর খেয়েদেয়ে কাজ ছিল না যে এরকম হতচ্ছাড়া নাম রাখল। বিরাম যে কারো নাম হয় জীবনে শুনিনি।'

বিরামবাবু হাসলেন, 'আসলে আমাদের সংসারে অনেক ছেলেমেয়ে আসছিল বলেই বোধ হয় ঠাকুর্দা আমার নামকরণের মাধ্যমে সবাইকে সতর্ক করে দিতে চেয়েছিলেন। তা এই ছেলেটি কে?'

নতুন স্যার কিছু বলার আগেই মুভিং ক্যাসেল বলে উঠলেন, 'নিশীথের ছাত্র। ভারী সুন্দর দেখতে, চিবুকটা দেখেছ?'

কথাগুলো তার মুখের দিকে তাকিয়ে এমন ভঙ্গিমায় বললেন উনি যে মুহূর্তে লাল হয়ে গেল অনিমেষ। কিন্তু ততক্ষণে নতুন স্যার বলতে শুরু করেছেন, 'ভীষণ সিরিয়স ছেলে এ, প্র্যাকটিক্যালি এই স্কুলে অনিমেষই আমার নিজের হাতের তৈরী। ও দেশের কথা ভাবে, কংগ্রেসকে ভালবাসে। ওকে নিয়ে এলাম আপনার কাছে, কারণ এই ইলেকশনে আমি চাই ও কাজ করুক। একটু প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা হোক।'

মুভিং ক্যাসেল বলে উঠলেন, 'কিন্তু এ যে একদম বাচ্চা ছেলে।'

বিরামবাবু হাসলেন, 'তুমি অবশ্য রান্নাঘরে ঢোক না, তাই বলে যে রাঁধে সে চুল বাঁধে না? আমরা কবে পলিটিক্স শুরু করি? আরে এসব কি তোমার এম-এ পাস করে চাকরি নেবার মত ব্যাপার?'

নতুন স্যার হাসলেন, তারপর অনিমেষের দিকে ফিরে বললেন, 'ব্যাস, তোমার সঙ্গে বিরামদার আলাপ হয়ে গেল।'

অনিমেষ বুঝতে পারছিল প্রণাম করলেই ভাল হয় কিন্তু সেটা করতে ওর একদম ইচ্ছে করেছিল না। হাত জোড় করে নমস্কার করতেই বিরামবাবু মাথা দুলিয়ে বললেন, 'খুশী হলাম, বড় খুশী হলাম। আমাদের পার্টি-অফিসে যাওয়া-আসা আরম্ভ কর।'

মুভিং-ক্যাসেল জিম্মিকে নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে অনিমেষের হাত ধরলেন, 'ব্যাস দীক্ষা হয়ে গেল তো, এবার তুমি আমার হেফাজতে। প্রথম দিন এলে, একটু মিষ্টিমুখ করে যাও, এস।' মুভিং ক্যাসেল ওর হাত ধরে অন্দরমহলে নিয়ে এলেন।

ভেতরে একটা প্যাসেজ, প্যাসেজের পাশ দিয়ে ঘরগুলো। অনিমেষের মনে হল ওরা ভেতরে আসার আগে কেউ কেউ এখানে ছিল, ওদের আসতে দেখে দ্রুত সরে গেল। জিমি এখন যেন ঘুমিয়ে আছে, এমন ভঙ্গিমায় মুভিং ক্যাসেলের বুকে পড়ে আছে। ডানপাশের প্রথম ঘরটায় ওকে বসতে বলে মুভিং ক্যাসেল ভেতরে চলে গেলেন। অনিমেষ দেখল একটা সুন্দর খাট আর তাতে বিরাট বেডকভার জুড়ে নীল রঙের ময়ূর কাজ করা আছে। ঠিক সামনেই একটা হাতলহীন সোফা, ইচ্ছে করলে শোওয়াও যায়, অনিমেষ সেটায় বসল। সামনেই একটি অল্পবয়সী মেয়ের ছবি, ভীষণ সুন্দর দেখতে, তাকানোর ভঙ্গীটায় এমন অদ্ভুত আদুরেপনা আছে যে ভাল না লেগে যায় না। খুব চেনা চেনা মনে হতে ও বুঝে ফেলল ইনিই মুভিং ক্যাসেল, নিশ্চয়ই অনেক কালের ছবি, এখনকার চেহারার সঙ্গে মিল বলতে শুধু চোখে।

ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মুভিং ক্যাসেল ভিতরে এলেন, 'কি দেখছ?'

অনিমেষ মুখ নামিয়ে বলল, 'আপনার ছবি।'

খুব অবাক এবং খুশী হলেন মহিলা, 'ওমা, ছেলের দেখছি একদম জহুরীর চোখ। অনেকেই চিনতে পারে না। আমার মেজ মেয়ে বলে, মা কি ছিলেন আর কি হয়েছেন!' কথাটা শেষ করতে করতে বাচ্চা মেয়ের মত খিলখিল করে হেসে উঠলেন উনি। আর বোধ হয় চমকে গিয়ে জিমি চোখ মেলে ওঁর বুকের মধ্যিখানের খোলা উঁচু সাদা চামড়ায় চট করে জিভটা বুলিয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপে গেলেন মুভিং ক্যাসেল, 'আঃ, কি অসভ্য কুকুর রে বাবা, যা পছন্দ করি না তাই করবে! নাম তুই, কোল থেকে নাম।' ধমকে ওকে বিছানায় নামিয়ে দিতে কুকুরটা সুড়সুড় করে ময়ূরের পেটের ওপর গিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। যেন খুব পরিশ্রম হয়েছে এমন ভঙ্গিমায় মুভিং ক্যাসেল বিছানায় ধপ করে বসে পড়লেন, তারপর আঁচল দিয়ে জিমির লালা বুক থেকে মুছে বললেন, 'তোমরা কোথায় থাক?'

'টাউন ক্লাবের কাছে।' অনিমেষ বলল।

'ওমা তাই নাকি। একই পাড়ায় আছি অথচ এতদিন তোমাকে দেখিনি! তোমরা কয় ভাই বোন?'

'আমার ভাই বোন নেই, দাদু পিসীমার কাছে থাকি।'

'কেন, তোমার বাবা মা?'

'বাবা স্বর্গছেঁড়া চা-বাগানে আছেন।' অনিমেষ মায়ের কথাটা বলতে গিয়েও

বলল না। ও দেখল পাশের দরজা দিয়ে একটি মেয়ে হাতে ছোট ডিশ নিয়ে ঘরে এল। মেয়েটি বেশ বড়, শাড়ি পরা, গায়ের রং ফরসা তবে খুব সুন্দরী নয়। একে অনিমেষ দেখেছে রিকশা করে বই নিয়ে আনন্দচন্দ্র কলেজে যেতে। মেয়েটির নাম নিশ্চয়ই মেনকা। কারণ বিরাম করের তিন মেয়ের মধ্যে একজনই শাড়ি পরে এবং তার নাম তো এই। মেনকার হাতের ডিশে চারটে সন্দেশ।

মুভিং ক্যাসেল বললেন, 'মানু, এই ছেলেটির নাম অনিমেষ, আমাদের নিশীথের প্রিয় ছাত্র। বেশ মিষ্টি চেহারা, না?'

মেনকা হাসল, তারপর অনিমেষকে বলল, 'এটা খেয়ে নাও তো লক্ষ্মী ছেলের মত।'

খিদে ছিল কিন্তু কেমন সংকোচ হচ্ছিল ওর, 'না, আমি এত খেতে পারব না।'

কপট রাগের ভঙ্গি করল মেনকা, 'ইস, এটুকখানি ছেলে, আবার না না বলা হচ্ছে। দেখি হাঁ করো তো, আমি খাইয়ে দিচ্ছি।' একটা সন্দেশ হাতে তুলে অনিমেষের মুখের কাছে নিয়ে এল মেনকা। ব্যাপার সুবিধের নয় দেখে অগত্যা অনিমেষ ওর হাত থেকে ডিশটা নিয়ে নিল।

মুভিং ক্যাসেল এতক্ষণ ব্যাপারটা হাসি-হাসি মুখ করে দেখছিলেন, এবার বললেন, 'তা তুমি আমাকে কি বলে ডাকবে বল তো?'

সন্দেশটা গিলতে গিলতে অনিমেষ বলতে গেল মাসীমা, কিন্তু তার আগেই মেনকা বলে উঠল, 'দাঁড়াও, তোমাকে আমি হেল্প করছি। আচ্ছা বাপীকে তোমার নিশীথদা কি বলে, দাদা তো? বেশ, তাহলে মা হল তার বউদি। তুমি যদি বাপীকে বিরামদা বল, তাহলে মা তোমার বউদি হয়ে গেল।' হাসি-হাসি মুখটার দিকে তাকিয়ে অনিমেষ কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, এত বড় মহিলাকে বউদি কি করে বলা যায়। তাছাড়া নতুন স্যারকে তো ও দাদা বলে ডাকে না। মেনকা বোধ হয় ওর সমস্যাটা বুঝেই বলল, 'এদিকে নিশীথদা আমাদেরও দাদা, কিন্তু তুমি আমাকে মেনকাদি বলবে। আসলে আমরা সবাই দাদা বউদি দিদি। মাসীমা মেসোমশাই বলা এ বাড়িতে অচল।'

এই সময় অনিমেষ অনুভব করল দরজায় আরো কেউ দাঁড়িয়ে। মুখ ফিরিয়ে দেখতে ওর লজ্জা করছিল। মুভিং ক্যাসেল সেদিকে তাকিয়ে বললেন, 'আয়, জলটা দিয়ে যা, ছেলেটার গলা শুকিয়ে গেল বোধ হয়।' তারপর ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অনিমেষ এই ছাখো, আমার আর দুই মেয়ে, উর্বশী আর রম্ভা।'

খুব অবাক হয়ে গেল অনিমেষ। কাচের গ্লাসে যে জল নিয়ে এসেছে তাকে দেখে ওর মনে হল দেওয়ালে টাঙানো ছবিটা থেকে যেন সে সটান নেমে এসেছে।

হুবহু একরকম দেখতে। ছিপছিপে, পান পাতার মুখ, গায়ের রঙ কচি কলাপাতার মত, আর টানা টানা কি আদুরে চোখ দুটো। শুধু চুলগুলো ঘাড় অবধি ছাঁটা। কোঁকড়া কোঁকড়া চুল ফেঁপে ফুলে রয়েছে। সঙ্গের মেয়েটি ওর চেয়ে ছোট, কিন্তু কেমন যেন! চাহনিটা বড়দের মত আর তার মাথার চুল হাঁটু অবধি সটান নেমে এসেছে। বোঝাই যায় এটাই ওর গর্ব।

মেনকা ওর মুখ দেখে খিলখিল করে হেসে উঠতে ছোটটিও গলা মেলাল। শুধু ছবির মত মেয়েটি শব্দ না করে হাসল। অনিমেষ দেখল হাসলে ওর গজদাঁত দেখা যায়। সেটা যেন আরো সুন্দর। গজদাঁত তো বাবারও আছে, কিন্তু বাবাকে তো এমন দেখায় না। মেনকা বলল, 'কি, খুব ঘাবড়ে গেলে বুঝি। একদম অপ্সরাদের মধ্যে এসে পড়েছ! আমি মেনকা, ও উর্বশী আর এ রম্ভা।'

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে মুভিং ক্যাসেল বলল, 'বুঝতে পেরেছি। আমার ছবির সঙ্গে খুব মিল, না? উর্বশী আমার অতীত, কি বল?'

লজ্জায় লাল হয়ে অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

উর্বশী বলল, 'জল।'

এত মিষ্টি গলার আওয়াজ যে অনিমেষ চট করে হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা ধরল। কাচের গায়ে উর্বশীর লাল আভা ছড়ানো আঙুলগুলো আস্তে আস্তে আলগা হতে অনিমেষ ঢকঢক করে জলটা খেয়ে নিল। ঠিক এমন সময় দরজায় কেউ এসে দাঁড়াতে মেনকাদি দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অনিমেষ দেখল দরজায় এখন কেউ নেই এবং সেদিকে তাকিয়ে রম্ভার ঠোঁটের কোণটা কৌতুকে নেচে উঠল।

মুভিং ক্যাসেল এবার বললেন, 'অনিমেষ, তুমি তো আমাদের ঘরের ছেলে হয়ে গেলে, তোমার ওপর আমি দায়িত্ব দিলাম, স্কুলের কোন্ ছেলে গেটে লিখে যায় তা তোমাকে বের করতে হবে। কি লজ্জা বল তো! আবার ইদানীং নিশীথের সঙ্গে মাস্টার নাম এক করে দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা হচ্ছে! সত্যি, এই শহরটার যা অবস্থা হচ্ছে ক্রমশ আর থাকা যাবে না।'

অনিমেষের মনে পড়ে গেল শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে এখন নিশীথ+মেনকা লেখা আছে।

মুভিং ক্যাসেল উঠলেন, 'তোমরা গল্প করো আমি একটু কাজ সেরে নিই।' যাবার সময় বিছানা থেকে জিম্মিকে কোলে তুলে নিয়ে অনিমেষের চিবুক ডান হাতে নেড়ে দিয়ে গেলেন। হাতটা যখন নাকের কাছে এসেছিল অনিমেষ চাঁপা ফুলের গন্ধ পেল। উনি চলে গেলে রম্ভা বিছানায় ধপ করে বসে পড়ল। সেদিকে তাকিয়ে অনিমেষ চোখ সরিয়ে নিল। এই মেয়েটা ওর চেয়ে বয়সে ছোট কিন্তু

পা দুটো কি মোটা-মোটা, তাকালে কেমন লাগে। ওর চট করে মনে পড়ে গেল একটু আগে রম্ভাকে নিয়ে মন্টু আর তপনের ঝগড়াটার কথা। ইস, ওরা যদি জানতো এখন অনিমেষ কোথায় আছে। রম্ভার দিকে তাকালেই শরীরটা কেমন করে ওঠে।

উর্বশী ওর দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'গ্লাসটা!'

এতক্ষণ যে এটা হাতেই ধরা ছিল খেয়াল করেনি অনিমেষ, উর্বশীর বাড়ানো হাতে সেটা দিয়ে বলল, 'আমি যাই।'

সঙ্গে সঙ্গে রম্ভা বলে উঠল, 'সে কি, যাই মানে? নিশীথদা তো এখন দিদির ঘরে গল্প করছে। একসঙ্গে এসেছ একসঙ্গে যাবে।'

অনিমেষের ভাল লাগছিল কিন্তু এই মেয়েটার বলার ধরনটা ওর পছন্দ হচ্ছিল না। ও দেখল উর্বশী ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হতে বলল, 'কাজ আছে?'

মাথা নাড়ল অনিমেষ, না।

রম্ভা বলল, 'তুমি কোন্ ক্লাসে পড়?'

অনিমেষ বলল, 'নাইন।'

রম্ভা ছড়া কাটল, 'নাইন ফাইন। আমি হেভেনে, আর ও টাইট।' বলে ও পা দোলাতে লাগল।

উর্বশী বলে উঠল, 'এই, পা দোলাস না, মা বারণ করেছে না!'

রম্ভা পা নাচানো বন্ধ করে বলল, 'দেখছ তো, তোমরা পা নাচালে দোষ নেই, যত দোষ মেয়েদের বেলায়।'

অনিমেষ বুঝল ওরা সেভেন আর এইটে পড়ে। কিন্তু ও যেন উঁচু ক্লাসে পড়েও ঠিক পাত্তা পাচ্ছে না।

রম্ভা বলল, 'এই, কথা বলছ না কেন?'

অনিমেষ বলল, 'তোমরা কোন্ স্কুলে পড়?'

'তিস্তা গার্লস স্কুলে।'

'ওখানে তপুদি পড়ায়?'

'তপুদি? ওরে বাবা, খুব স্ট্রিক্ট। চেন নাকি?'

ঘাড় নাড়ল অনিমেষ, 'চিনি।'

রম্ভা বলল, 'তোমার সঙ্গে একটা ছেলে দুপুরবেলায় তিস্তার দিকে গেল, তার নাম কি?'

অনিমেষ অবাক হল, 'তুমি দেখেছ?'

'হু। লম্বা মত, কোঁকড়া চুল, খুব ডাঁট মেরে আমাকে ছাখে।' রম্ভা হাসল।

'ও, মণ্টুর কথা বলছ?' অনিমেষ বুঝল মণ্টু ঠিকই বলে যে রম্ভা ওকে দেখেছে।

'মণ্টু ফণ্টু জানি না, ছেলেটা কেমন?' অবেহেলাভরে কথাটা বলল রম্ভা।

'ভাল।' ঘাড় নাড়ল অনিমেষ।

'তোমার চেয়েও?' বলে খিলখিল করে হেসে উঠল রম্ভা।

সঙ্গে সঙ্গে অনিমেষের মনটা বিশ্রী হয়ে গেল। এই মেয়েটার কথাবার্তা খুব খারাপ, কেমন গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

'আমি ভাল না।' বেশ রেগে গিয়ে অনিমেষ জবাব দিল।

'কে বলল?' এবার প্রশ্নটা উর্বশীর।

হাসিটা যেন থামছিল না রম্ভার, দিদির গায়ে ঠেলা দিয়ে বলল, 'বোঝ।' আর ঠিক তখনি বাইরে সাইকেলের বেল খুব দ্রুত বাজতে বাজতে চলে গেল। অনিমেষ দেখল রম্ভা খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সাইকেলটা আবার বেল বাজিয়ে ঘুরে আসতে ও উঠে দাঁড়াল। তারপর যেন কোন কাজ মনে পড়ে গেছে এরকম ভঙ্গীমায় বলল, 'আমি আসছি।'

এই বলে আস্তে আস্তে যেন কিছুই জানে না এইভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অনিমেষ দেখল উর্বশীর মুখ থমথমে। রম্ভা চলে যেতে ও খাটের ওপর আলতো করে বসে বলল, 'তুমি কিছু মনে করো না, রম্ভাটা এই রকম। মায়ের কাছে এত বকুনি খায় তবু ঠিক হয় না। আমার এসব একদম পছন্দ হয় না।'

অনিমেষ কি বলবে বুঝতে পারছিল না। ও মনে মনে উর্বশীর কথার সঙ্গে যে একমত এটা জানাবার জন্যই যেন চুপ করে থাকল। দুজনে ঘরে বসে আছে অথচ কেউ কথা বলছে না এখন। অদ্ভুত নিঃশব্দ এই পরিবেশটা ওর খুব ভাল লাগছিল। বাইরের রাস্তায় যে এতক্ষণ সাইকেলের বেল বাজাচ্ছিল সে বোধ হয় চুপ করে গেছে, কারণ এখন কোথাও কোন শব্দ নেই।

হঠাৎ উর্বশীর দিকে মুখ তুলে তাকাতে ও দেখতে পেল যে ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে, যেন বেশ মজা পেয়ে গেছে, 'কি ভাবছিলে এতক্ষণ?'

'আমি? কই কিছু না তো?' অনিমেষ অবাক হল।

'আমি দেখলাম তোমার মন অন্য কোথাও চলে গেছে। আচ্ছা, তুমি সবচেয়ে কাকে বেশী ভালবাস? দেখি আমার সঙ্গে মেলে কি না।' উর্বশী বলল।

অনিমেষ এখন এই উত্তরটা দেবার জন্য আর ভাবে না। কিন্তু এই কয় বছর আগে অবধি ও চেঁচিয়ে বলতে পারত দেশকে ভালবাসি। কিন্তু এখন বুঝে নিয়েছে

সত্যি সত্যি যে ভালবাসে সে চেঁচিয়ে কথাটা সবাইকে জানায় না। এগুলো নিজের কাছে রেখে দিলে সুখ, বিলিয়ে দিলে বড় খেলো হয়ে যায়।

অনিমেষ চুপ করে আছে দেখে উর্বশী বলল, 'বলতে লজ্জা করছে বুঝি? সব ছেলেমেয়েই মাকে ভালবাসে, তাই মাকে বাদ দিয়ে—'

ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে অনিমেষ বলল, 'না। আমার তো মা নেই।'

'মা নেই?' খুব অবাক হল উর্বশী, ওর গলাটা যেন কেমন হয়ে গেল।

'আমাকে খুব ছোট রেখে মা চলে গিয়েছেন।' অনিমেষ বলল।

'তোমার খুব কষ্ট, না?' উর্বশীর মুখের দিকে তাকিয়ে অনিমেষের মনে হল, সত্যি সত্যি বেচারার মন খারাপ হয়ে গিয়েছে। ব্যাপারটা সহজ ক'তে ও বলল, 'প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হতো, এখন ঠিক হয়ে গেছে। তাছাড়া নতুন স্যার বলেছেন, গর্ভধারিণী মা না থাকলে কি হয়, জন্মভূমি-মা আছেন, তাঁকে ভালবাসলেই সব পাওয়া হয়ে যাবে।'

ভ্রূ কুঁচকে উর্বশী বলল, 'কে বলেছেন এ কথা?'

অনিমেষ বলল, 'নতুন স্যার, মানে নিশীথদা।'

সঙ্গে সঙ্গে খিলখিল করে হেসে উঠল উর্বশী, 'তুমি এসব বিশ্বাস কর! নিশীথদা এসব বলে বাবার মন ভেজায়, নইলে দিদির সঙ্গে লভ্ করতে পারবে না। এখন আমাদের পাশের ঘরে যাওয়া বারণ, জানো?'

ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ল অনিমেষ, উর্বশী খারাপ শব্দ কিছু বলেনি কিন্তু নতুন স্যার সম্বন্ধে শোনা কথাটা ও এমনভাবে সত্যি করে দিল! তবু অনিমেষ বলল, 'কেন?'

'আহা! বোঝ না যেন কিছু! ক্লাস নাইনে পড় না তুমি?' তারপর গম্ভীর গলায় বলল, 'নিশীথদা এখন দিদিকে বাংলা পড়াচ্ছে।'

'ও।' খুব ঘাবড়ে গেল সে।

'ওসব চিন্তা ছাড়ো, বুঝলে। দেশ-ফেশ কিছু নয়। নিজের মায়ের চেয়ে বড় কেউ নেই। সেসব ইংরেজ আমলে ছিল, তখন সবাই দেশকে স্বাধীন করতে চেষ্টা করত, এখন এসব চলে না।' উর্বশী বলল।

'যাঃ!' হাসল অনিমেষ, 'স্বাধীন হয়েছে বলে দেশ আর মা থাকবে না?'

উর্বশী মাথা নাড়ল, 'তুমি যদি এ কথা পাঁচজনকে বল তারা তোমাকে বোকা ভাববে। এই ছ্যাখো, আমার বাবা নাকি বিয়াল্লিশের আন্দোলন না কি করেছিল। এখন এই শহরের নেতা, গান্ধীজীর শিষ্য, সবাই সম্মান করে অনেস্ট লোক বলে।' তারপর হঠাৎ গলা পাল্টে বলল, 'অথচ আমার মায়ের গায়ে দেখেছ কি বিলিতি সেন্টের গন্ধ, আমার জামাকাপড় কি দেখছ, দিদির যা আছে না, তোমার চোখ

খারাপ হয়ে যাবে। বাবার অমত থাকলে এসব হতো ?'

হাঁ করে কথাগুলো শুনছিল অনিমেষ। উর্বশী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজ থেকে একশ বছর আগে আমার মত মেয়ের বিয়ে হয়ে কত কি হয়ে যেত। এখন কেউ সেটা ভাবতে পারে ? তেমনি দেশকে মা বলে পুজো করাটা তখনকার আমলে ছিল, বুঝলে ?'

এত তাড়াতাড়ি অনিমেষ কথাটাকে হজম করতে পারছিল না, 'কিন্তু নতুন স্যার—'

ঠোঁট বেঁকাল উর্বশী, 'তোমার নতুন স্যারের কথা বলো না। মা ইয়ার্কি করে না, কান লাল হয়ে যায়। তুমি খুব বোকা ছেলে।'

এবার অনিমেষ উঠে দাঁড়াল।

এতদিন ধরে মণ্টুরা যেসব কথা ওকে বলে বোঝাতে পারেনি, আজ এই মেয়েটা সে কথাই বলে তাকে কেমন করে দিচ্ছে।

ওকে দাঁড়াতে দেখে খাট থেকে নেমে এল উর্বশী, 'কি হল, যাচ্ছ ?'

'হ্যাঁ যাই, সন্ধ্যে হয়ে আসছে।' অনিমেষ বলল।

'কিন্তু তোমার নতুন স্যার—'

'থাক, আমি একাই যাই।'

হঠাৎ চট করে উর্বশী ওর হাত ধরল, 'এই, আমাকে ছুঁয়ে বল, আজ আমি যেসব কথা বললাম তা তুমি কাউকে বলবে না ?'

তুলোর মতন নরম স্পর্শ হাতের ওপর পেয়ে অনিমেষ চমকে ওর দিকে তাকাল। উর্বশীর চোখ দুটো কি আদুরে ভঙ্গীতে ওর দিকে চেয়ে আছে। অনিমেষ আস্তে আস্তে বলল, 'কেন ?'

'এসব কথা কাউকে বলতে নেই। বাবা শুনলে আমাকে মেরে ফেলবে।' খুব চাপা গলায় উর্বশী বলল।

'তাহলে তুমি বললে কেন ?' অনিমেষ ওর চোখ থেকে চোখ সরাচ্ছিল না।

'জানি না।' তারপর হেসে বলল, 'তুমি খুব বোকা বলে তোমাকে বন্ধু বলে ভাবতে ইচ্ছে করছে, তাই। কথা দাও।'

অনিমেষের বুকের ভেতরটা কেমন করতে লাগল, 'কিন্তু আমি যে—।'

ওকে থামিয়ে দিল উর্বশী, 'তুমি কি খুব দুঃখ পেয়েছ ?'

নিজের মনের কথাটা উর্বশীর মুখে শুনে ও মুখ তুলে তাকাতে দেখল পাশের দরজায় রম্ভা দাঁড়িয়ে ওদের দেখছে। চোখাচোখি হতে নিজের ঠোঁট কামড়ে সে দ্রুত সরে গেল।

গেট খুলে বাইরে এসে দাঁড়াতেই তিস্তার দিকে নজর গেল অনিমেষের। ছোট জটলা হচ্ছে একটা সাইকেলকে ঘিরে। উর্বশীর ঘর থেকে বেরিয়ে বিরামবাবুকে নমস্কার করে অনিমেষ একটা ঘোরের মধ্যে হেঁটে আসছিল। আসার সময় মুভিং ক্যাসেলকে দেখতে পায়নি ও। উর্বশীর কথাগুলো মনের মধ্যে যে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে সেটা ও ঠিক সামলাতে পারছিল না। নতুন স্যার সম্পর্কে ওর কথাগুলো অনিমেষের এতদিনের সমস্ত ধারণাকে নড়বড়ে করে দিয়েছে। নতুন স্যার মেনকাদিকে ভালোবাসেন, তাকে বাংলা পড়ান, আবার দেশকেও ভালবাসেন, অনিমেষকে জননীর মত তাঁকে গ্রহণ করতে বলেন। অনিমেষের মনে হল এর মধ্যে দোষের কিছু থাকতে পারে না। এটা ও মেনে নিতে পারছিল। কিন্তু বিরামবাবু, যিনি এখানকার কংগ্রেসের নেতা, মিউনিসিপ্যালিটির কর্তা, তিনি মুভিং ক্যাসেলের বিলিতি সেণ্ট, শাড়ির টাকা যোগান কি করে—। নতুন স্যার এসব কথা জেনে, জানাটাই স্বাভাবিক, এই বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছেন—এই ব্যাপারটি ও সহ্য করতে পারছিল না। ও বেশ বুঝতে পারছিল সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটা বিরাট ফাঁকি আছে। উর্বশী বলল, বিরামবাবুর মন ভিজিয়ে নতুন স্যার এ বাড়িতে আসার সুযোগ পান। অনিমেষের ভেতরটা টলমল করছিল।

আবার উর্বশী যে এত সব কথা বলল তার জন্য ওকে ওর একটুও খারাপ লাগছিল না। কি সহজে উর্বশী বাবা-মায়ের কথা ওকে বলে দিল। কেন? রম্ভা এমন কি মেনকাদিকেও ওর ঠিক পছন্দ হয়নি। উর্বশীর চোখ, লালচে আঙুল, গজদাঁত—অনিমেষ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল। বুকের মধ্যে একটা গভীর আরাম ক্রমশ জায়গা জুড়ে নিচ্ছিল।

এই সব ভাবতে ভাবতে অনিমেষ গেট খুলে বাইরে এল এবং তখনই জটলাটা ওর নজরে পড়ল। কয়েক পা এগোতেই মণ্টুর গলা শুনতে পেল. মণ্টু খুব চেঁচাচ্ছে। এক দৌড়ে ও কাছে গিয়ে দেখল, মণ্টু একটা সুন্দর মত ছেলের জামার কলার মুঠোয় নিয়ে ঝাঁকাচ্ছে আর তপন একটা সাইকেল ধরে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত শাসিয়ে যাচ্ছে। ওদের ঘিরে পাঁচ-ছয়জন পথচলতি লোকের ভিড়, তবে সবার মুখ হাসি হাসি। বোঝা যায় ওরা একটা মজার ব্যাপার দেখছে। যে ছেলেটিকে মণ্টুরা ধরেছে তার বয়স ওদেরই মত বা সামান্য বেশী হতে পারে। ফরসা, ফুলপ্যাণ্ট পরা, কোমরে বেল্ট আছে আর মাথা জুড়ে একটা বিরাট সিঁথি। মণ্টুর কথার জবাবে একটা কিছু বলতেই সে সপাটে একটা চড় মারল ছেলেটার গালে, 'শালা, বেপাড়ায় লগ্‌গি মারতে এসেছিস আবার রোয়াবি মারা হচ্ছে! মেরে বাপের বাসি বিয়ে

দেখিয়ে দেব, বুঝলি।'

ছেলেটার জামাপ্যাণ্ট বেশ দামী, বোঝা যায় বড়লোকের ছেলে এবং এ ধরনের আক্রমণে অভ্যস্ত নয়। সে বলল, 'মিছিমিছি মারছ, আমি এদিকে বেড়াতে এসেছিলাম।'

তপন দু হাতে ধরা সাইকেলটাকে ঝাঁকিয়ে বলল, 'আবার মিথ্যে কথা! আমরা স্পষ্ট দেখলাম তিন-চারবার বেল বাজিয়ে বাড়ির সামনে ঘুরঘুর করা হচ্ছিল। জানলায় ও আসতেই বেল থেমে গেল। কোন্ পাড়ায় থাকিস, বল?'

কোনরকমে ছেলেটা বলল, 'বাবুপাড়ায়।'

মণ্টু বলল, 'কেন এসেছিস এখানে?'

অনিমেষ একটা ব্যাপারে অবাক হচ্ছিল। এই ছেলেটির শরীর দেখে বোঝা যায় যে এর গায়ের জোর কম নয় মণ্টুর থেকে। অথচ ও কেমন অসহায় হয়ে মণ্টুর হাতের মুঠোয় নিজের জামার কলার ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এর আগেও বোধ হয় চড় ঘুঁষি পড়েছে, কারণ ওর গালে লাল দাগ ফুটে উঠেছে। ইচ্ছে করলে ও লড়ে পালিয়ে যেতে পারে, কিন্তু যাচ্ছে না কেন? ছেলেটাকে চুপ করে থাকতে দেখে মণ্টু বাঁ হাত দিয়ে ওর চুলের সিঙাড়া খপ করে ধরে হ্যাঁচকা টান দিল। যন্ত্রণায় মাথা নোয়াতে নোয়াতে ছেলেটা বলে উঠল, 'আমাকে আসতে বলেছিল।'

মণ্টু চট করে বাঁ হাতটা ছেড়ে দিয়ে বোকার মত উচ্চারণ করল, 'আসতে বলেছিল।'

'হ্যাঁ। আমার বোন ওর সঙ্গে পড়ে। বোনকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিল।' ছেলেটি সোজা হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে কথাগুলো বলল।

ফ্যাসফেসে গলায় মণ্টু বলল, 'মিথ্যে কথা, একদম বিশ্বাস করি না। কোন প্রমাণ আছে?'

এতক্ষণে যেন একটু জোর পেয়েছে ছেলেটি পায়ের তলায়, দু হাত দিয়ে মণ্টুর মুঠো থেকে নিজের জামাটা ছাড়িয়ে বলল, 'এসব ব্যাপারে কি কোন প্রমাণ থাকে? তবে যদি বিশ্বাস না কর ওকে ডেকে আনো, আমি তোমাদের সামনে জিজ্ঞাসা করব।'

সঙ্গে সঙ্গে মণ্টু একটা ঘুঁষি মারল ছেলেটার মুখে, কিন্তু দ্রুত মুখটা সরিয়ে নেওয়ায় ঘুঁষিটা কাঁধে গিয়ে লাগল। যন্ত্রণায় ছেলেটা দু'হাতে কাঁধ চেপে ধরল। মণ্টু বলছিল, 'শালা, ভদ্রলোকের মেয়েকে নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভজাতে চাও? কোন প্রমাণ-ক্রমাণ নেই। আমি একদম বিশ্বাস করি না।'

হঠাৎ ছেলেটা রুখে দাঁড়াল, 'আমি এখানে আসি না আসি তাতে তোমাদের কি? তোমরা ওর কেউ হও?'

মণ্টু বলল, 'আবার কথা হচ্ছে! আমি কেউ হই না হই সে জবাব তোকে দেব? আজ প্রথম দিন বলে ছেড়ে দিলাম, আবারযদি কোনদিন দেখি এইখানে টাঙ্কি মারতে তাহলে ছাল ছাড়িয়ে নেব। যাঃ।'

ছেলেটা ঘুরে সাইকেলটা ধরতে যেতে তপন বলল, 'লেগেছে তোর?'

একটু অবাক হয়ে কি বলবে বুঝতে না পেরে ছেলেটা বলল, 'না।' বোধ হয় নিজের কষ্টের কথা স্বীকার করতে চাইছিল না।

তপন হাসল, 'গুড। তাহলে ক্ষমা চা, বল, আর কোনদিন এসব করব না।'

ছেলেটা বলল, 'তোমরা আজ সুযোগ পেয়ে যা ইচ্ছে করে নিচ্ছ! বেশ, আমি ক্ষমা চাইছি।' তপন ওকে সাইকেলটা দিয়ে দিতে সে দৌড়ে লাফিয়ে তাতে উঠে পড়ে একটু নাগালের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, 'এই শালারা শোন, এর বদলা আমি নেব। পাণ্ডাপাড়ার সাধন মৃধার পার্টিকে আজই বলছি।' কথাটা শেষ করেই জোরে প্যাডেল চালিয়ে বেরিয়ে গেল।

কয়েক পা ছুটে গিয়ে থমকে দাঁড়াল মণ্টু, 'যা যা, বল শালা সাধনকে। আমি যদি রায়কতপাড়ার অশোকদাকে বলি তোর সাধন লেজ গুটিয়ে নেবে।'

কিন্তু কথাগুলো ছেলেটার কান অবধি পৌঁছাল না। আর কোন মজার দৃশ্য দেখা যাবে না বুঝে ভিড়টা পলকে হালকা হয়ে গেল। অনিমেষ ওদের কাছে এগিয়ে গেল। তপন প্রথমে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলি?'

অনিমেষ বলল, 'এখানে। কি হয়েছে রে?'

মণ্টু বলল, 'আরে তোকে খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে দেখি এই মালটা সাইকেলে পাক খাচ্ছে আর বেল বাজাচ্ছে। টাঙ্কি মারার আর জায়গা পায়নি! আবার সাধন মৃধার ভয় দেখাচ্ছে!' মণ্টু যেন তখনও ফুঁসছিল।

অনিমেষ বলল, 'মারতে গেলি কেন মিছিমিছি?'

মণ্টু বলল, 'বেশ করেছি মেরেছি। প্রেমের জন্য জীবন দেয় সবাই, তা জানিস?'

তারপর টেনে টেনে বলল, 'আই লাভ রম্ভা।'

হঠাৎ মুখ ফসকে অনিমেষ বলে ফেলল, 'রম্ভা তোর কথা জিজ্ঞাসা করছিল।'

সঙ্গে সঙ্গে হাঁ হয়ে গেল মণ্টু। ও যেন বিশ্বাস করতেই পারছে না কথাটা। তারপর কোনরকমে বলল, 'তোকে জিজ্ঞাসা করেছে?'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল।

বেশী কার্যকর। ভারতবর্ষের প্রচুর মানুষ যে নিরামিষ আহার করে তাতে তাদের কার্যক্ষমতা বিন্দুমাত্র কমে না। বরং অনুসন্ধানে জানা গেছে যে নিরামিষহারী মানুষ দীর্ঘজীবী হয়। কাগজটা তিনি অনিকে পড়তে দিয়েছিলেন। যদিও মাঝে মাঝে তাঁর এই নাতির মুখে এক টুকরো মাছ দিতে পারছেন না বলে মনে মনে আক্ষেপ হয়, কাউকে বলেন না।

বাজার-দর হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। গ্রাম অঞ্চল থেকে মানুষের মিছিল কাজের আশায় শহরে ভিড় করছে। এমনিতেই তাঁদের শহর পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বেশী খরচের জায়গা, কারণ এখানে ধনীদের প্রাধান্য বেশী। সরিৎশেখরের মাথার ঠিক থাকছে না, হেমলতার সঙ্গে ঝগড়া বেড়ে যাচ্ছে। তাঁর মনে হচ্ছে সবাই ঠকাচ্ছে তাঁকে। যে গয়লাটা দুধ দিয়ে যায় তার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল অতিরিক্ত জল মেশাচ্ছে বলে। কয়লাওয়ালা কাঁচা কয়লা দিয়ে টাকা লুঠছে। পর পর কয়েক বছর বন্যা এসে পলিমাটি ফেলে বাগানটার যে চেহারা হয়েছে তাতে লোক দিয়ে শাকসবজি লাগালে কোন কাজ হবে না। মহীতোষ যে টাকা পাঠায় তা বাড়ছে না। এদিকে বাজার-দর যে থেমে থাকছে না। ছেলের কাছে টাকা চাইতে এখন আর কুণ্ঠা নেই কিন্তু মহীতোষের সাধ্যের সীমাটা তিনি জানেন। যে টাকাটা সে পাঠাচ্ছে তাতে অনিমেষ হোস্টেলে আরামে থাকতে পারত।

মাস শেষ হতে আর দু দিন আছে। সরিৎশেখর কিং সাহেবের ঘাট থেকে বেড়িয়ে ফিরছিলেন। আজ ছুটির দিন, কোর্টকাছারি বন্ধ। স্বর্গছেঁড়া থেকে কোন লোক তাই শহরে আসেনি। অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিলেন তিনি। আজ সকালে বাজার করার পর ওঁর কাছে তিনটে আধুলি পড়ে আছে। সামনে আরো দুটো দিন, তারপর স্বর্গছেঁড়া থেকে টাকা আসবে। কি করে এই দু দিন চলবে? চাকরি করার সময় স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি তাঁকে কোনদিন এই অবস্থায় পড়তে হবে। হঠাৎ ওঁর মনে হল রিটায়ার করার পর বেশী দিন বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না। দীর্ঘজীবী অকর্মণ্য হয়ে থাকলে এই সব সমস্যার সামনে দাঁড়াতেই হবে।

আজকাল জোরে হাঁটলে ভাঙা পা-টা টনটন করে। খুব আস্তে আস্তে তিনি পি ডব্লু ডি অফিসের সামনে দিয়ে হেঁটে আসছিলেন। ওদিকে তিস্তার পাশের রাস্তা দিয়ে হাঁটা যায় না। এতদিন পর তিস্তা বাঁধ প্রকল্প হয়েছে। প্রতি বছরের বন্যা থেকে বাঁচবার জন্য জলপাইগুড়ি শহরের গা ঘেঁষে বাঁধ দেওয়া হচ্ছে। জোর তোড়জোড় চলছে ওখানে। পি ডব্লু ডির অফিসটা পেরোতেই একটা জিপ গাড়ি সজোরে ওঁর পাশে ব্রেক কষে দাঁড়াল। এখন খুব সতর্ক হয়ে রাস্তার বাঁ পাশ

ঘেঁষে হাঁটেন সরিৎশেখর। চোখ তুলে দেখলেন দুই-তিনজন লোক জিপ থেকে নেমে তাঁর দিকে আসছেন।

ধুতিপরা এক ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ স্যার, আমার ভুল হয়নি, ইনিই সরিৎশেখরবাবু।' মাথা নেড়ে একজন লম্বাচওড়া টাই-পরা ভদ্রলোক সরিৎশেখরের সামনে এসে হাত জোড় করে নমস্কার করলেন, 'আপনি সরিৎশেখরবাবু?'

একটু অবাক হয়ে ঘাড় নাড়লেন সরিৎশেখর।

'ভালই হল পথে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে। আমরা আপনার বাড়িতে যাচ্ছিলাম। আমি তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের অ্যাসিস্টেন্ট একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার।'

সরিৎশেখর নমস্কার করে উদ্দেশ্যটা শুনবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

সঙ্গের ভদ্রলোক বললেন, 'স্যার, বাড়িতে গিয়ে কথা বললে ভাল হয় না?'

ইঞ্জিনিয়ার বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভাল। আপনি বোধ হয় বাড়িতেই যাচ্ছিলেন, তা আসুন আমার গাড়িতেই যাওয়া যাক।'

তাঁর জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে ভদ্রলোক জিপের দিকে এগিয়ে গেলেন। এক একজন মানুষ আছেন যাঁরা কথা বললেই একটা কর্তৃত্বের আবহাওয়া তৈরী হয়ে যায়। যেন তিনি যা বলছেন তার পর আর কোন কথা থাকতে পারে না। সরিৎশেখর বুঝতে পারছিলেন না যে তাঁর সঙ্গে তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের কি সম্পর্ক থাকতে পারে! ইঞ্জিনিয়ার জিপে বসে আবার ডাকলেন, 'কই, আসুন?'

অগত্যা সরিৎশেখরকে জিপে উঠতে হল। ধারের দিকে জায়গা করে দিলেও সরিৎশেখরের বসতে অসুবিধে হচ্ছিল। শক্ত হাতে সামনের রড আঁকড়ে বসে ছিলেন তিনি, জিপটা হু হু করে টাউন ক্লাবের পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। ইঞ্জিনিয়ার বললেন, 'আপনার ফ্যামিলি মেম্বার কত, মানে এই বাড়িতে?'

সরিৎশেখর বললেন, 'তিনজন। কেন?'

ইঞ্জিনিয়ার অবাক হলেন, 'সে কি! আপনার বাড়ি তো শুনেছি বিরাট বড়। তা এত বড় বাড়িতে তিনজন মানুষ কি করেন?'

সরিৎশেখর এবার ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলেন, 'ব্যবহার হয় না ঠিক নয়, আত্মীয়স্বজনরা এলে থাকবে তাই করা।'

ততক্ষণে জিপটা বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছে। রাস্তাটা আগে বড় ছিল। কিন্তু যেহেতু জমিটা পি ডব্লু ডির, সরিৎশেখর অনেক চেষ্টা করেও তাদের স্টাফদের কোয়ার্টার বানাবার ব্যাপারে বাধা দিতে পারেননি। এখন জমি ঘিরে রাস্তাটা এত সরু হয়ে গেছে যে রিকশা অথবা একটা জিপ কোনক্রমে ঢুকতে পারে। এই নিয়ে বহু চিঠি লিখেছেন তিনি, কোন কাজ হয়নি।

ইঞ্জিনিয়ার বললেন, 'বাবাঃ, এত সরু রাস্তা ! মিউনিসিপ্যালিটি অ্যালাউ করল ?'

সরিৎশেখর বললেন, 'আপনাদের সরকার বাহাদুরের ব্যাপার, আমরা বললে তো হবে না।'

ভদ্রলোক যেন বিরক্ত হয়েছেন খুব, 'না না, এ খুব অন্যায়। বাড়ি করতে দিলে তাকে যাতায়াতের রাইট দিতে হবে। ঠিক আছে, আমি ব্যাপারটা দেখছি।'

গেট খুলে বাড়িতে ঢুকে সরিৎশেখর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার বলুন তো, আপনাদের আসবার উদ্দেশ্যটা আমি ঠিক ধরতে পারছি না।'

ইঞ্জিনিয়ার তখন কোমরে হাত রেখে বাড়িটা দেখছিলেন। এখন ভর-বিকেল, রোদ গাছের মাথায়। নতুন বাড়িটা খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। সরিৎশেখরের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'আমরা শহরে ভাল বাড়ি খালি পাচ্ছি না। আজ আপনার বাড়ির খবরটা পেয়ে চলে এলাম। তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের ব্যাপারে এ বাড়িটা আমরা চাই।'

'চাই মানে ?' হতভম্ব হয়ে গেলেন সরিৎশেখর।

'অবশ্যই ভাড়া চাই। তবে ভেতরটা দেখে নিতে হবে আগে।'

'আপনি বাড়ি ভাড়া নিতে এসেছেন ?'

'আমি নয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।'

সরিৎশেখর কি করবেন বুঝতে পারছিলেন না। বাড়িটা ভাড়া দেবার কথা হেমলতা প্রায়ই বলে থাকেন তাঁকে। যেভাবে বাজার-দর বাড়ছে তাতে সামলে ওঠা যাচ্ছে না। এই তো আজই তাঁর পকেটে কয়েকটা আধুলি পড়ে আছে। আগে গল্পচ্ছলে বলতেন এই বাড়ি তাঁর ছেলের মতন, অসময়ে দেখবে। কিন্তু যাকে তাকে ভাড়া দিতে একদম নারাজ তিনি, বিশেষ করে ফ্যামিলিম্যানকে। এর আগে অনেকেই এসেছে তাঁর কাছে। কিন্তু হেগে-মুতে একাকার হয়ে যাবে বলে মুখের ওপর না বলে দিয়েছেন সবাইকে। এখন সরকার যদি তাঁর বাড়ি ভাড়া নেন তা হলে তো ঝামেলার কিছু থাকে না। মাস গেলে ভাড়াটা নিশ্চিত। তা ছাড়া জলপাইগুড়িতে এখন বাড়িভাড়া হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। খালি পড়ে থাকলে বাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে। ভাড়া দিলে প্রতি মাসের টাকাটায় কি উপকার হবে ভাবলে পায়ে জোর এসে যায়। কিন্তু, তবু একটা কিন্তু এসে যাচ্ছে যে মনে! যারা এসে থাকবে তারা লোক কেমন হবে! সরকারী অফিস তো, পাঁচ ভূতের ব্যাপার, বাড়ির ওপর কারো দয়ামায়া থাকবে না।

ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক ততক্ষণে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেছেন। সরিৎশেখর ওঁর পেছন পেছন উঠতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ভাবছেন আপনি ?'

সরিৎশেখর সত্যি কথাটা একটু অন্যভাবে বললেন, 'এ বাড়ি ভাড়া দেব কি না আমি তো এখনও ঠিক করিনি। তা ছাড়া ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

ভদ্রলোক এবার গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না। আমাদের ওপর নির্দেশ আছে যে কোন খালি বাড়ি আমরা প্রয়োজন বোধ করলে রিকুইজিশন করে নিতে পারি। যে কয় বছর ইচ্ছে আমরা থাকব—আপনার কিছু বলার থাকবে না। তাই আপনি আমার সাজেশনটা নিন, ভাড়া দিতে রাজী হয়ে যান, নইলে পরে আফসোস করবেন।'

এদিকটা জানতেন না সরিৎশেখর। সঙ্গে সঙ্গে ওঁর মাথা গরম হয়ে গেল। এরা কি ভয় দেখিয়ে তাঁর বাড়ি দখল করতে চায়? সরকারের কি এ ক্ষমতা আছে? ওঁর মনে পড়ল সেই পঞ্চাশ সালে কংগ্রেস থেকে তাঁর বাড়িতে অফিস করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তখন কেউ ভয় দেখায়নি। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালেন তিনি। তারপর হেমলতাকে ডেকে দরজা খুলতে বললেন। অনিমেষ বাড়িতে নেই। খুব বিরক্ত হলেন কথাটা শুনে। আজকাল সে কোথায় কোথায় ঘোরে টের পান না তিনি। মাথায় লম্বা হয়েছে, গালে দু-একটা ব্রণ বের হয়েছে। এই সময় মন চঞ্চল হয়।

সরিৎশেখর ইঞ্জিনিয়ারকে বাড়িটা দেখালেন। দুটো ঘর তাঁর চাই। বাকী ঘরগুলো ওঁরা নিতে পারেন। বাড়ি দেখে খুব খুশী ইঞ্জিনিয়ার। সরিৎশেখরের থাকার ঘর দুটো আলাদা করে দিলে সামনের দিকে সমস্ত বাড়িটাই ওঁদের হাতে আসবে। একদম সাহেবী বন্দোবস্ত, অফিস কাম রেসিডেন্স করতে কোন অসুবিধে নেই। ঘুরে ঘুরে খুব প্রশংসা করলেন সরিৎশেখরের বাড়ি বানাবার দক্ষতার। দেখলেই বোঝা যায় নিজে দাঁড়িয়ে থেকে করানো, কোন কণ্ট্রাক্টরের ওপর ছেড়ে দেওয়া নয়।

শেষ পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ার বললেন, 'কাল আমার অফিসে আসুন, ভাড়াটা ঠিক করে নেওয়া যাবে।'

সরিৎশেখর এতক্ষণ মনে মনে আঁচ করছিলেন কি রকম ভাড়া পাওয়া যেতে পারে!

এখন বললেন, 'সরকার কত ভাড়া দেবেন মনে হয়?'

ইঞ্জিনিয়ার বললেন, 'আমি এখনই বলতে পারছি না। ওপরতলার সঙ্গে কথা বলতে হবে। সাধারণত সরকার বাড়িভাড়া ঠিক করেন ভ্যালুয়ার দিয়ে, স্কোয়ারফিট মেপে। কিন্তু এখন তার সময় নেই। আমাদের ইমিডিয়েটলি বাড়ি দরকার তাই এমার্জেন্সি ব্যাপার বলে আমরা নিজেরাই ঠিক করে অ্যাপ্রুভ করে নেব।'

সরিৎশেখর বললেন, 'তবু যদি আভাস দেন।'

ভদ্রলোক হাসলেন, 'দেখুন, এসব কথাবার্তা তো এভাবে হয় না। আপনি চাইবেন ভাড়াটা বেশী হোক, আমরা চাইব কম হোক। ভ্যালুয়ার অবশ্যই বেসরকারী ভাড়া থেকে অনেক কম রেট দেবে। তাই মাঝামাঝি একটা ব্যবস্থা করতে হবে।'

সরিৎশেখর নিজের অজান্তে কেমন বিগলিত গলায় বললেন, 'আপনাকে আর কি বলব, এই বাড়িটাই আমার ভরসা। এখন শহরে বাড়িভাড়া হু-হু করে বাড়ছে কিন্তু কোন ফ্যামিলিকে ভাড়া দিতে চাই না। আপনি একটু দেখবেন।'

ভদ্রলোক হেসে গেটের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালেন। সরিৎশেখর ওঁর পিছু পিছু আসছিলেন। এখন একটু খাতির করা উচিত। মনে হচ্ছে এই ভদ্রলোকের হাতেই সব নির্ভর করছে। সরিৎশেখর বললেন, 'একটু চা খেয়ে যদি যান!'

দ্রুত মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক, 'না, না। সন্ধ্যে হয়ে গেলে আমার চা চলে না। তা ছাড়া পাবলিক অন্যভাবে নেবে। তা হলে কাল ঠিক দশটায় আমার অফিসে আসুন। আমি কাগজপত্র রেডি করে রাখব। পয়লা তারিখ থেকেই আমরা ভাড়া নেব। আমার অফিসটা চেনেন তো?'

সরিৎশেখর ঘাড় নাড়লেন। এই শহরে কোন কিছুই অচেনা থাকে না। হঠাৎ ইঞ্জিনিয়ার ওঁর দিকে এগিয়ে এলেন, 'সরিৎশেখরবাবু, আপনার ভাড়াটা যাতে রিজনেব্‌ল হয় আমি নিশ্চয়ই দেখব কিন্তু দেখাটা যেন পারস্পরিক হয়। বুঝতে পারছেন আশা করি। কাল একটু সকাল সকাল আসুন অ্যাণ্ড কিপ ইট এ সিক্রেট।' হন হন করে হেঁটে গিয়ে ভদ্রলোক জিপে উঠলেন।

জিপটি চলে গেলেও সরিৎশেখর পাথরের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন, এমন সময় হেমলতার ডাকে তাঁর চেতনা এল। বাবা যে এঁদের বাড়িটা দেখাচ্ছেন কি জন্যে তা তিনি অনুমান করতে পারছিলেন। এতদিনে বাবার যে হুঁশ হয়েছে তাতে তিনি খুশী। এইভাবে বুড়ো মানুষটার অর্থকষ্ট তিনি দেখতে পারছিলেন না। তবু খানিকটা দূরত্ব রেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবা, বাড়ি ভাড়া দিচ্ছেন নাকি?'

সরিৎশেখর ঘুরে মেয়েকে দেখলেন, তারপর হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন, 'সেদিনের একটা পুঁচকে ছেলে আমার কাছে ঘুষ চাইল, বুঝলে, ঘুষ!'

ভাড়ার সঙ্গে ঘুষের কি সম্পর্ক আছে বুঝতে পারলেন না হেমলতা। সরিৎশেখর তখন বলছিলেন, 'ভাড়া না দিলে সরকার জোর করে বাড়ি নিয়ে

নেবে। আমি ন্যায্য ভাড়া চাইলাম তো বলল ওকে দেখতে হবে আমাকে। চা খেতে চায় না ঘুষ খেতে চায়। ভগবান! স্বাধীন হয়ে আমরা কোথায় এলাম! নেহেরুর পোষ্যপুত্রদের চেহারা দেখলে!'

হেমলতা বললেন, 'যে যুগ সেরকম তো চলতে হবে। তা যদি বেশী ভাড়া দেয় তাহলে আর আপত্তি করবেন না!'

'আপত্তি!' সরিৎশেখর হাঁ হাঁ করে উঠলেন, 'আমার পকেটে মাত্র দেড টাকা পড়ে আছে, আমি আপত্তি করব কেন? কোন মানে হয় না। আপত্তি করা তো বোকামি। চাকরি করার সময় যে ঘুষ নিইনি সে বোকামিটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। এখন কাল সকালে দর কষাকষিটা কিভাবে করব তা চিন্তা করতে হবে।'

হেমলতা একটু ভেবে বললেন, 'সাধুবাবুর কাছে একবার যান না, ওঁর তো এসব রাস্তা ভাল জানা আছে।'

সরিৎশেখর মেয়ের ওপর খুশী হলেন। সত্যি, সাধুচরণই ভাল পথ বাৎলাতে পারে। খুব ধূর্ত লোক। আর দাঁড়ালেন না তিনি, 'দরজাটা বন্ধ করে দাও, আমি এখনই ঘুরে আসি।' গেট খুলে বাইরে আসতেই নজরে পড়ল অনিমেষ বাড়ির দিকে দৌড়ে আসছে।

কাছাকাছি হতেই সরিৎশেখর চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় গিয়েছিলে? তোমার এখন সিরিয়স হওয়া উচিত, সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ছ, এভাবে চললে রেজাল্ট ভাল হবে না।'

দাদুর মুখে হঠাৎ এই ধরনের কথা শুনে একটু ঘাবড়ে গেল অনিমেষ। ইদানীং ওর পড়াশুনার ব্যাপারে দাদু কোন কথা বলেন না। নিশ্চয়ই বাড়িতে কোন ঘটনা ঘটেছে। ও ব্যাপারটাকে চাপা দেবার জন্য তাড়াতাড়ি ডান হাতে ধরা খামটাকে এগিয়ে দিল। 'কি ওটা?' সরিৎশেখর খামটার দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকালেন।

'টেলিগ্রাম। টাউন স্কুলের সামনে পোস্ট অফিসের লোকটার সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে ও দিয়ে দিল।' আজ অবধি অনিমেষ কখনো এ বাড়িতে টেলিগ্রাম আসতে ছাখেনি। পিয়নের কাছ থেকে প্রায় আবদার করেই ও খামটা এনেছে।

হঠাৎ কেমন নার্ভাস হয়ে গেলেন সরিৎশেখর। খামটা হাতে নিয়ে ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললেন, 'আবার কার কি হল!'

তারপর এক নিঃশ্বাসে টেলিগ্রামটা পড়ে ফেলে চিৎকার করে হেমলতাকে ডাকলেন, 'হেম, প্রিয় টেলিগ্রাম করেছে, আগামীকাল প্লেনে করে আসছে।'

হেমলতা হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, 'কে আসছে বললেন? প্রিয়—মানে

আমাদের প্রিয়তোষ ?'

জলপাইগুড়ি শহরের কাছাকাছি বড় এয়ারপোর্ট বাগডোগড়া—শিলিগুড়ি ছাড়িয়ে যেতে হয়। কিন্তু চা-বাগান এবং ব্যবসায়ীদের সুবিধের জন্য কোলকাতা থেকে বেসরকারী কোম্পানী জলপাইগুড়ি শহরের কাছাকাছি একটা প্লেন নামার জায়গা করে নিয়েছিল। জায়গাটাকে কখনোই এয়ারপোর্ট বলা যায় না তবু যেহেতু অন্য নাম মাথায় চট করে আসে না তাই প্লেনে করে কোলকাতায় যেতে হলে লোকে বলে এয়ারপোর্টে যাচ্ছি। ঠিক এ ধরনের বেসরকারী প্লেন নামার জায়গা ছিল স্বর্গছেঁড়ার কাছাকাছি তেলিপাড়ায় এবং কুচবিহারে। মালবাহী প্লেনগুলো যাত্রী নিত খুব কম ভাড়ায়। তবু সাধারণ মানুষ কেউ প্লেনে আসছে শুনলে লোকে বুঝত তাঁর পয়সা আছে বেশ। প্রিয়তোষের প্লেনে করে জলপাইগুড়ি আসার টেলিগ্রাম পেয়ে খুব নার্ভাস হয়ে গেলেন সরিৎশেখর।

যে ছেলেটা কম্যুনিস্ট হওয়ায় পুলিসের ভয়ে এক রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেল আচমকা এবং এতগুলো বছরে যার কোন খোঁজখবর পাওয়া গেল না, সে হঠাৎ প্লেনে করে ফিরে আসে কিভাবে ? প্রিয়তোষ যদি হঠাৎ বড়লোক হয়ে গিয়ে থাকে (কম্যুনিস্টদের সঙ্গে বড়লোক কথাটা কিছুতেই জুড়তে পারেন না সরিৎশেখর) আলাদা কথা, তাহলে এর মধ্যে তো সে তাঁকে চিঠি দিতে পারত! এতদিন ডুব দিয়ে হঠাৎ এত জানান দিয়ে আসছে সে—সরিৎশেখর খুব অস্বস্তিতে পড়লেন। ওকে আনতে যাওয়ার কথা লেখেনি প্রিয়তোষ, কিন্তু সরিৎশেখরের অভিজ্ঞতায় প্লেনে করে কেউ আসছে জানলেই রিসিভ করতে যেতে হয়।

বাড়ি ভাড়া এবং প্রিয়তোষ এই দুটো চিন্তা কাল রাত্রে তাঁকে ঘুমোতে দেয়নি। আজ ভোরে উঠেই মনে পড়ল সকাল সকাল তিস্তা বাঁধ প্রকল্প অফিসে তাঁকে যেতে হবে। শেষ পর্যন্ত তিনি ঠিক করলেন প্রিয়তোষকে আনতে অনিমেষকে পাঠাবেন। একবার ভেবেছিলেন, যে ছেলে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেছে তাকে বরণ করে আনার দরকার নেই। কিন্তু হেমলতা তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন, এই বংশে কেউ কখনো প্লেনে চাপেনি, প্রিয়তোষ যখন সেই দুর্লভ সম্মান অর্জন করেছে তখন সেই পালিয়ে যাওয়া প্রিয়তোষের সঙ্গে এই প্রিয়তোষের নিশ্চয়ই অনেক পার্থক্য। কথাটা চট করে মনে ধরেছিল সরিৎশেখরের। এই বংশে কেউ যদি সম্মানজনক বিরল দৃষ্টান্ত দেখায় তাকে তিনি ক্ষমা করে দিতে পারেন, তার জন্য গর্ব হয় তাঁর। এই রকম একটা গর্ব নিয়ে তিনি সযত্নে লালন করছেন যে, অনিমেষ একদিন এম-এ.

পাস করবে—এই বংশে যা কোনোদিন হয়নি।

অতএব স্থির হল অনিমেষ তার ছোটকাকাকে আনতে এয়ারপোর্টে যাবে।

আজ অবধি শিলিগুড়িতে কখনো যায় নি অনিমেষ। শিলিগুড়ির বাসে চেপে ওর খুব রোমাঞ্চ হচ্ছিল। তাছাড়া এয়ারপোর্টে প্লেন ওঠানামা দেখার কৌতূহলটা ক্রমশ ওকে অস্থির করছিল। আজ স্কুল খোলা অথচ ও যাচ্ছে না—এ রকম ঘটনাও কখনো ঘটেনি। আসবার সময় দাদু ওকে একটা টাকা দিয়েছেন, দুটো আধুলি। বাস বদল করে যেতে আট আনা লাগে। ও যখন এয়ারপোর্টে পৌঁছাল তখন বেলা দশটা, শুনল কোলকাতার প্লেন আসতে দেরি আছে। জায়গাটা দেখে খুব হতাশ হল অনিমেষ। মাঠের একপাশে কিছু ঘর-বাড়ি, মাঝে মাঝে বিভিন্ন রঙের কাপড় উড়ছে মাঠের এখানে সেখানে। একটাও প্লেন নেই ধারেকাছে। যে জায়গাটায় প্লেন নামে সেটাও খোলামেলা। একটি টি স্টল দেখতে পেল সে। বয়ামে কেক রাখা আছে। ওর খুব লোভ হচ্ছিল কেক খেতে কিন্তু সাহস পাচ্ছিল না। যদি ছোটকাকা না আসে তাহলে ফেরার বাসভাড়া থাকবে না। দাদু এত টায়-টায় পয়সা দেয়! অনির মনে পড়ল আজ সকালে পিসীমা বাজারে যাওয়ার কথা বলতে দাদু রেগে গিয়েছিলেন। বাড়িতে যা আছে তাই খেতে হবে ওঁকে বলে ধমক দিয়েছিলেন। পিসীমা অনিমেষকে আসবার সময় বলে দিয়েছিলেন, ফরেস্ট বাংলোর চৌকিদারকে ডেকে দিতে। ও জানে চৌকিদার বাড়িতে মুরগী পুষে ডিম বিক্রী করে। ডেকে দিয়েছিল অনিমেষ। আজ দুপুরে নিশ্চয়ই ডিমের ডালনা হবে—ছোট কাকা আসছে বলে অনেকদিন বাদে ডিম খাওয়া যাবে।

প্লেন আসছে না। অনেকেই গাড়ি নিয়ে এয়ারপোর্টে এসেছে। তিন-চারটে ট্যাক্সি সামনে দাঁড়িয়ে। কোলকাতায় বৃষ্টি হয়েছে বলে প্লেন ছাড়তে দেরি হচ্ছে। অনিমেষ ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কিছু সুবেশা মহিলা ওর পাশ দিয়ে চলে গেল। ওর মনে হল এবার জোর করে ফুলপ্যান্ট বানাতে হবে। মেয়েদের সামনে হাফ প্যান্ট পরে হাঁটতে আজকাল বিশ্রী লাগে। দাদু যে কেন ছাই বোঝে না!

ছোটকাকাকে সে চিনতে পারবে তো? পিসীমা জিজ্ঞাসা করেছিলেন সকালে। যদি জেঠামশাইকে অ্যাদ্দিন পর চিনতে পারে, তাহলে ছোটকাকাকে পারবে না? আপন মনে হাসল অনিমেষ। ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়—মনে রাখিস অনি! হঠাৎ ওর মনে হল, এই ভারতবর্ষ বিরাট দেশ। সেই পাঞ্জাব থেকে কন্যাকুমারিকা—ম্যাপে যে ভারতবর্ষ মুখ বুঁজে পড়ে থাকে, ছোটকাকা বোধ হয় সেই ভারতবর্ষের মানুষকে এই কথাটা শুনিয়ে এল—ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়। কিন্তু ছোটকাকাকে সে এবার জিজ্ঞাসা করবে, এই কথাটা সত্যি কিনা। আজাদী যদি মিথ্যে হত,

তাহলে ছোটকাকারা সব কথা এত খোলাখুলি বলছে কিন্তু কই পুলিস তো তাদের অ্যারেস্ট করছে না! ইংরেজ আমলে সে রকম ব্যাপার কি হত? নিশীথবাবু বলেন (অনিমেষ ওঁকে আজকাল আর নতুন স্যার বলে ডাকে না), ভারতবর্ষ স্বাধীন, সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে প্রত্যেক মানুষ তাঁর ইচ্ছেমতন কথা বলতে পারেন, যেখানে ইচ্ছে যেতে পারেন, শুধু তাঁর আচরণের দ্বারা অন্যের অথবা দেশের যেন ক্ষতি না হয়। কংগ্রেস সরকার এই মহৎ অধিকার দেশবাসীর হাতে তুলে দিয়েছেন। দীর্ঘ সংগ্রামের পর কংগ্রেস যে অধিকার অর্জন করেছে তা সে নিজের মুঠোয় লুকিয়ে রাখেনি। সেক্ষেত্রে কম্যুনিস্ট পার্টির ইতিহাস কি বলে? দেশ বিভাগের আগে এরা নেতাজীর নামে নোংরা ছিটোয় নি? যুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষের সঙ্গে হাত মেলায় নি? স্বাধীতার পর তারা এমন বাড়াবাড়ি করেছিল যে দেশের স্বার্থে তাদের দলকে ব্যান্ করে না দিলে চলত না। কিন্তু সে কটা দিন? নির্বাচনের আগে সমস্ত দেশ সমান জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল। নির্বাচন কি বলল? দেশের মানুষ কম্যুনিস্টদের ছুঁড়ে ফেলে দিল। কথাটা ভীষণ সত্যি—অধিকার কেউ হাতে তুলে দেয় না, তাকে অর্জন করতে হয়। কম্যুনিস্টরা সেটা পারেনি, এটা তাদের ত্রুটি। আর এই যে ওরা কংগ্রেস সরকারকে যা-তা বলতে পারছে, তা আমাদের এই স্বাধীনতা সত্যি বলেই পারছে।

নিশীথবাবুর এই কথাগুলো আজ ছোটকাকাকে জিজ্ঞাসা করবে অনিমেষ। মণ্টুর কথাটা চট করে মনে পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। মণ্টু বলে, 'কংগ্রেস হল চোরের সরকার। যে যেখান থেকে পারে চুরি করে যাচ্ছে। অবশ্য এসব কথা আমি বিরাম করকে উদ্দেশ করে বলছি না। উনি যে রম্ভার বাবা।'

কংগ্রেসের সব ভাল, ইতিহাস ভাল, নেতারাও ভাল। কিন্তু কেন যে সবাই ওদের চোর বলে কে জানে! আচ্ছা চোর যদি বলবে তবে ভোট দিয়েছে কেন?

হঠাৎ মাইকে কে যেন কি বলে উঠতে অনিমেষ দেখল সবাই ছোটাছুটি শুরু করে দিল। খুব জড়ানো ইংরেজি হলে ও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু এখন তো সবাই বুঝতে পারছে যে কোলকাতার প্লেন এখনই নামবে।

আর কয়েক মিনিট বাদে ডানায় রূপোলী রোদ মেখে একটা মাঝারি চকচকে পাখি এয়ারপোর্টের ওপর দুবার পাক খেয়ে অনেক দূর থেকে নিচে নেমে আসতে লাগল। এক সময় তার বুক থেকে চাকা বেরিয়ে মাটির ওপর গড়িয়ে যেতে লাগল যতক্ষণ না সেটা নিরীহ মুখ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর ওর বুকের ঘর খুলে গিয়ে সিঁড়ি জুড়ে গেল। আর লোকগুলো কেমন গম্ভীর পায়ে নেমে আসতে লাগল মাটিতে। অনিমেষ দেখল রেল স্টেশনে অথবা বাসে প্যাসেঞ্জাররা যে রকম

জামাকাপড় পরে যায় এঁরা তার চেয়ে দামী-দামী জামাকাপড় পরেছেন। একজন খুব মোটা ভীষণ কালো গোঁফওয়ালা মানুষ—ধুতি, ভুঁড়িসামলানো পাঞ্জাবি আর মাথায় ইয়া বড় গান্ধী টুপি, নামতেই অনেকে মালা নিয়ে ছুটে গেল তাঁর দিকে। চার-পাঁচজন পুলিস অফিসার তাঁকে স্যালুট করে ঘিরে দাঁড়াল। ওপাশ থেকে কে যেন বলে উঠল, 'মিনিস্টার আয়া মিনিস্টার।'

এই প্রথম মন্ত্রী দেখল সে। রাজা ভারতবর্ষের মানুষরা, আর মন্ত্রী মাত্র কয়েকজন। তাঁদের একজনকে দেখতে পেয়ে অনিমেষের খুব গর্ব হচ্ছিল। কেমন বিনয়ী হয়ে হাত জোড় করে এগিয়ে আসছেন। ও যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তার পাশ দিয়ে ওঁকে যেতে হবে, অনিমেষ যন্ত্রচালিতের মত দুটো হাত জোড় করে নমস্কার জানাল। আর সেই সময় ওর নজরে পড়ল মন্ত্রীর পেছন পেছন যে হেঁটে আসছে তার দিকে। ছোটকাকা। একদম চেনা যাচ্ছে না, অ্যাস কালারের স্যুট, লম্বা সরু নীল টাই, চোখে চশমা, হাতে বড় অ্যাটাচী ব্যাগ। এই পোশাকে অনিমেষ ছোটকাকাকে কখনো দেখেনি। চট করে চেনা অসম্ভব। কিন্তু ছোটকাকার মুখচোখ এবং হাঁটার ভঙ্গি একই রকম আছে। ও দেখল মন্ত্রী ঘুরে দাঁড়িয়ে ছোটকাকাকে কিছু বলতেই ছোটকাকা হেসে জবাব দিয়ে নমস্কার করে এবার একা এগিয়ে আসতে লাগল লম্বা লম্বা পা ফেলে। তার মানে মন্ত্রীর সঙ্গে ছোটকাকার ভাব আছে। অনিমেষ কেমন হতভম্ব হয়ে পড়ল। কংগ্রেসী মন্ত্রীর সঙ্গে ছোটকাকার ভাব হল কি করে? আর সেই ছোটকাকার সঙ্গে এই ছোটকাকার পোশাকে একদম মিল নেই কেন?

ভীষণ নার্ভাস হয়ে ছোটকাকার দিকে এগিয়ে গেল সে।

চোখাচোখি হলেও প্রিয়তোষ অন্যমনস্ক হয়ে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর ঘুরে অনিমেষের দিকে ভাল করে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'আরে, অনি না?'

অনিমেষের ভাল লাগল বলার ধরনটা। ও হেসে সামনে এগিয়ে এসে নিচু হল প্রণাম করতে। সঙ্গে সঙ্গে ওকে এক হাতে জড়িয়ে বুকে চেপে ধরল প্রিয়তোষ, 'আরে কি আশ্চর্য, তুই যে দেখছি ভেরি গুড বয়, প্রণাম-ট্রনাম করিস! আমি তো তোকে প্রথমে চিনতেই পারিনি—কি লম্বা হয়ে গেছিস! তা তুই কি আমাকে রিসিভ করতে এসেছিস?'

ঘাড় নাড়ল সে, 'দাদু আসতে বললেন।'

'আমি ভাবছিলাম টেলিগ্রামটা আমার আগে আসবে কি-না। যাক, বাবা এখন কেমন আছেন?' প্রশ্ন করল প্রিয়তোষ। অনিমেষ দেখল ছোটকাকার

মাথা ওর চেয়ে সামান্য ওপরে।

অনিমেষ বলল, 'দাদু ভাল আছেন।' এই সময় ও দেখল পাঁচ-ছয়জনের একটা দল এগিয়ে আসছে। দলের সামনে বিরাট মোটা একটা ফুলের মালা হাতে বিরাম কর মহাশয়। বিরামবাবুর ছোট্ট শরীরটার পেছনে মুভিং ক্যাসেল। বিরামবাবু এগিয়ে গিয়ে মন্ত্রী মশাই-এর গলায় মালা পরিয়ে দিলেন। একটা হাততালির ঝড় উঠল। বিরাম কর কিছু বলতেই মন্ত্রীমশাই মুভিং ক্যাসেলকে নমস্কার করলেন। অনিমেষের মনে হল এই মুহূর্তে মুভিং ক্যাসেলকে একদম বাচ্চা মেয়ে বলে মনে হচ্ছে। এই দলের মধ্যে নিশীথবাবুকে দেখতে পেল না সে।

প্রিয়তোষ বলল, 'এঁদের চিনিস ?'

'যিনি মন্ত্রীকে মালা পরালেন তিনি বিরাম কর, এখানকার কংগ্রেস নেতা আর পাশে ওঁর স্ত্রী।' মুভিং ক্যাসেল শব্দটা কোন রকমে গিলে ফেলল সে।

'কোন্ পাড়ায় থাকে ?'

'আমাদের পাড়ায়। আমার সঙ্গে আলাপ আছে।' অনিমেষ বেশ গর্বের সঙ্গে কথাটা বলল। বাইরে তখন গাড়িগুলো নড়াচড়া করছিল।

প্রিয়তোষ বলল, 'একটা ট্যাক্সি দেখ, সোজা বাড়ি যাব।'

ছোটকাকা যে বাসে যাবে না এটা ও অনুমান করতে পারছিল। এখান থেকে পুরো ট্যাক্সি রিজার্ভ করে যাওয়া যায়। অনির খেয়াল হল ওর আট আনা পয়সা বেঁচে যাচ্ছে। দাদু যদি ফেরত না চান তাহলে কি ভালই না হয়।

মন্ত্রীর জন্য সরকারী গাড়ি এসেছিল। তিনি তাতে চলে গেলেন। অনিমেষ ট্যাক্সিওয়ালাদের সঙ্গে কথা বলে হতাশ হচ্ছিল। সবাই আজ রিজার্ভড হয়ে আছে। দূর থেকে দাঁড়িয়ে প্রিয়তোষ ব্যাপারটা দেখছিল। শেষ পর্যন্ত এগিয়ে এসে অনিমেষকে বলল, 'তুই এখনো নাবালক আছিস। দাঁড়া আমি দেখছি।'

প্রিয়তোষ গিয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভারদের সঙ্গে যখন কথা বলছিল তখন অনিমেষ দেখল বিরামবাবুরা সদলে ফিরে যাচ্ছেন। মুভিং ক্যাসেল ওকে দেখতে পেয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে দ্রুত এগিয়ে এলেন কাছে, 'ওমা তুমি! একদম দেখতে পাইনি গো! কখন এলে ?'

অনিমেষ বলল, 'অনেকক্ষণ।'

মুভিং ক্যাসেল বললেন, 'কালই নিশীথকে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম, ছেলের দেখা নেই কেন ? তা মিনিস্টারকে দেখতে এসেছ বুঝি ?'

ঘাড় নাড়ল অনিমেষ, 'না। আমার ছোটকাকা এসেছেন ওই প্লেনে।' ও ইশারা করে প্রিয়তোষকে দেখালে।

ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে কথা শেষ করে প্রিয়তোষ তখন এদিকে আসছিল। তাকে এক পলক দেখে নিয়ে একটু উত্তেজিত গলায় মুভিং ক্যাসেল বললেন, 'ওমা, ইনি বুঝি তোমার কাকা! মিনিস্টারের সঙ্গে কথা বলছিলেন না প্লেন থেকে নেমে?' অনিমেষ ঘাড় নাড়তেই ফিসফিস করে বললেন, 'খুব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোক মনে হচ্ছে। কলকাতায় থাকেন?'

প্রিয়তোষ কোথায় থাকে জানে না অনিমেষ। কিন্তু জলপাইগুড়ির বাইরে সভ্য জায়গা বলতে চট করে কলকাতার নামই প্রথমে মনে আসে। ও দ্বিধা না করে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। প্রিয়তোষ তখন প্রায় কাছে এসে পড়েছে, মুভিং ক্যাসেল ফিসফিসিয়ে বললেন, 'আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও।'

প্রিয়তোষ বলল, 'চল, ট্যাক্সিটা পাওয়া গেছে। এই কয় বছরে জলপাইগুড়ির হাল কি হয়েছে রে, ট্যাক্সির রেট দিল্লীর থেকেও বেশী!'

মুভিং ক্যাসেলকে প্রিয়তোষ যেন দেখেও দেখল না, অনিমেষের হাতে ধরানো এট্যাচীটা নিয়ে ট্যাক্সির দিকে ফিরল। মহা ফাঁপরে পড়ে গেল অনিমেষ। মুভিং ক্যাসেলের ভাল নাম তো জানা নেই, কি বলে পরিচয় করিয়ে দেবে ও! প্রিয়তোষকে ফিরতে দেখে মুভিং ক্যাসেল ভ্রূকুটি করে আলতো চিমটি কাটলেন অনিমেষের হাতে। তৎক্ষণাৎ অনিমেষ বলল, 'ছোটকাকা, ইনি—মানে ইনি না আমাদের মাস্টার মশাই—মানে এখানকার কংগ্রেসের···', কিভাবে কথাটা শেষ করবে বুঝতে না পেরে চট করে শেষ করে দিল, 'শ্রীবিরাম করের স্ত্রী।'

খুব অবাক হয়ে প্রিয়তোষ ভাইপোকে একবার দেখল, তারপর হাত জোড় করে মুভিং ক্যাসেলকে নমস্কার করল। অনিমেষ শুরু করা থেকেই মুভিং ক্যাসেল যুক্তহস্তে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এখন হাত নামিয়ে সলজ্জ মিষ্টি হাসলেন, 'আমি সামান্য কংগ্রেস করি, কোন ইতিহাস নেই আর ভূগোল তো দেখছেন।'

এইভাবে নিজের পরিচয় দিতে বোধ করি প্রিয়তোষ কাউকে শোনেনি। খুব অবাক হয়েও সেটাকে দ্রুত কাটিয়ে নিয়ে বলল, 'আমি তো অনেকদিন জলপাইগুড়ি ছাড়া, তাই আপনার সঙ্গে আলাপ হয়নি। আমি প্রিয়তোষ।'

মুভিং ক্যাসেল বললেন, 'আপনারা তো বাড়ি ফিরবেন, তা আমাদের গাড়িতে আসতে পারেন, কোন অসুবিধে হবে না।'

প্রিয়তোষ বলল, 'না না, অনেক ধন্যবাদ। ট্যাক্সিওয়ালাটাকে আমি কথা দিয়ে ফেলেছি। মুভিং ক্যাসেল খুব ছোট একটা ভাঁজ দুই ভুরুর মাঝখানে এনে বললেন, 'আপনি বুঝি কথা দিলে কখনো খেলাপ করেন না?'

প্রিয়তোষ হাসল, 'ঠিক উল্টো। এত বেশী খেলাপ করি যে মাঝে মাঝে রাখবার

জন্য বদখেয়াল হয়। শহরে আশা করি আপনার দেখা পাব।'

মুভিং ক্যাসেল হঠাৎ কেমন নিস্তেজ গলায় বললেন, 'বাঃ, নিশ্চয়ই।' তারপর এক হাতে অনিমেষের চিবুক নেড়ে দিয়ে বললেন, 'এই ছেলে, কাকাকে নিয়ে আমার বাড়িতে আসবে।'

প্রিয়তোষের সঙ্গে ট্যাক্সির দিকে হাঁটতে হাঁটতে অনিমেষের মনে হল এতক্ষণ সেয়ানে সেয়ানে কক ঠোকাঠুকি হচ্ছিল। কার্তিকদা যখন অন্য কারোর সঙ্গে ব্যাডমিণ্টন খেলেন তখন ককটা বেশীক্ষণ শূন্যে থাকে না, কিন্তু প্রতুলদার সঙ্গে ম্যাচ হলে শুধু ছটফটিয়ে এপার ওপার করতে থাকে, মাটিতে পড়তে চায় না। নিশীথবাবু বা তার কাছে মুভিং ক্যাসেল যত কথা সহজভাবে বলতে পেরেছে, আজ ছোটকাকার সঙ্গে যেন তা একদমই পারেনি। খুব মজা লাগছিল ওর।

ট্যাক্সির পেছন-সিটে ওরা দুজন, ছোটকাকা পকেট থেকে একটা চকচকে সিগারেটের টিন বের করে সিগারেট ধরাল, 'তারপর, খবরাখবর বল।'

অনেকক্ষণ থেকে যে প্রশ্নটা অনিমেষের মুখে আসছিল সেটা ফস করে বলে ফেলল এবার, 'ছোটকাকা, তুমি একদম বদলে গিয়েছ।'

'অ্যাঁ?' বলে চমকে ওর দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে উঠল প্রিয়তোষ, তারপর বলল, 'আমার কথা পরে হচ্ছে। আমি চলে যাবার পর কি হয়েছিল বল!'

চট করে অনিমেষ সে সব দিনের কথা মনে করতে পারল না। একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'পুলিস এসে খোঁজ করেছিল, দাদু খুব রেগে গিয়েছিলেন তোমার ওপর।'

সিগারেট খেতে খেতে প্রিয়তোষ বলল, 'তারপর?'

অনিমেষ বলল, 'দাদু অনেক জায়গায় খোঁজ নিয়েছিলেন কিন্তু কোন খবর পাননি। তারপর এতদিন আর কোন কথা হত না তোমাকে নিয়ে।'

'দিদি কেমন আছে?'

পিসীমার শরীর খারাপ।' অনিমেষ একটু ভেবে নিয়ে আবার বলল, 'আজ দাদু বাড়ি ভাড়া দেবার জন্য সরকারের সঙ্গে কথা বলতে গেছেন।'

'বাড়ি ভাড়া? কেন?'

অনিমেষ ছোটকাকার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি কাউকে বলো না। দাদুর হাতে একদম পয়সা নেই। আমরা অনেকদিন মাছ খাই না।'

'সে কি!' চমকে সোজা হয়ে বলল প্রিয়তোষ, 'তোর বাবা টাকা পাঠায় না? আমি জানি তোর বাবা আবার বিয়ে করেছে, আমি এখানকার সব খবর রাখি

কিন্তু বাবা যে অর্থকষ্টে আছে তা তো কেউ বলেনি !'

অবাক হয়ে ছোটকাকাকে দেখল অনিমেষ। এখানকার সব খবর রাখে ছোটকাকা! কি আশ্চর্য! ও বলল, 'বাবা টাকা পাঠান, কিন্তু তাতে চলে না। জলপাইগুড়িতে জিনিসপত্রের দাম নাকি খুব বেশী।'

ছোটকাকা অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে অনিমেষ দেখল জলপাইগুড়ি এসে যাচ্ছে।

ও হঠাৎ সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'ছোটকাকা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?' প্রিয়তোষ অলস চোখে বাইরে তাকিয়ে ছিল, ঘাড় নাড়ল। বোধ হয় কিছু ভাবছিল।

'তুমি আর কম্যুনিস্ট পার্টি করো না, না ?'

খুব ধীরে মুখ ঘুরিয়ে অনিমেষকে দেখল প্রিয়তোষ, তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'কার কাছে শুনলি ?'

দ্রুত ঘাড় নাড়ল অনিমেষ, 'কারো কাছে না !'

খুব ঠাণ্ডা গলায় প্রিয়তোষ জিজ্ঞাসা করল, 'হঠাৎ তোর একথা মনে হল কেন ?'

প্রিয়তোষের বলার ধরনে এমন একটা অস্বাভাবিক স্বর ছিল যে, অনিমেষ বুঝতে পারছিল প্রশ্নটা করা ভীষণ ভুল হয়ে গেছে। ও তাকিয়ে দেখল ছোটকাকা ওর দিক থেকে দৃষ্টি সরায়নি। খুব অস্বস্তি নিয়ে অনিমেষ বলল, 'এখানে যাঁরা কম্যুনিস্ট তাদের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়।'

প্রিয়তোষ যেন এ উত্তরটা আশা করেনি, 'মানে ?'

'এখানকার কম্যুনিস্টদের চুলটুল উস্কোখুস্কো হয়, বেশীর ভাগ গেরুয়া পাঞ্জাবি পাজামা পরে আর কাঁধে একটা কাপড়ের ঝোলা থাকে। দেখলেই বোঝা যায় খুব গরীব-গরীব।' তারপর যেন মনে করতে পেরে বলল, 'আগে তুমি ওই রকম পোশাক পরতে।'

হো হো করে হেসে উঠল প্রিয়তোষ। হাসি যেন আর থামতেই চায় না। তা দেখে অনিমেষ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। শেষ পর্যন্ত প্রিয়তোষ জিজ্ঞাসা করল, 'আর কংগ্রেসীরা ? তাঁদের কি দেখে বোঝা যায় ? ফিনফিনে ধুতি, খদ্দরের ধোপদুরস্ত পাঞ্জাবি আর মাথায় সাদা ধবধবে গান্ধীটুপি—তাই তো ?'

এটা অবশ্যই কংগ্রেসীদের পোশাক। এই তো মন্ত্রীকে সে এই রকমই দেখল, তবু সবাই তো এরকম নয়। নিশীথবাবু, নবীনবাবু, শশধরবাবু তো একদম অন্য রকম। আবার মুভিং ক্যাসেল—তিনিও তো কংগ্রেস করেন।

ওর দিকে তাকিয়ে প্রিয়তোষ বলল, 'তা আমার পোশাক দেখে নিশ্চয়ই

কম্যুনিস্ট মনে হচ্ছে না, কিন্তু কংগ্রেসীও মনে হচ্ছে না তো ? তাহলে আমি কি ?' হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে প্রিয়তোষ ড্রাইভারকে বলল, 'একটু বাজারের দিকটায় যাব ভাই, দিনবাজারের পুলটা দিয়ে না হয় ঘুরে যাবেন।'

তারপর জানলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি আর কোন পার্টি করি না।'

এ কথাটাই এতক্ষণ মনে হচ্ছিল অনিমেষের, সে অবাক গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি বুঝি অফিসার ?'

মাথা নাড়ল প্রিয়তোষ, 'না রে। আমি চাকরি করি কিন্তু ঠিক সে রকম চাকরি নয়। তুই এখন এসব কথা বুঝবি না। বাঃ, শহরটার তো অনেক উন্নতি হয়েছে। ওটা কি সিনেমা হল, আলোছায়া ? দীপ্তি টকীজ আছে না ?'

প্রসঙ্গটা এমন সহজে ঘুরে গেল যে অনিমেষ ধরতে পারল না, 'হ্যাঁ। আর একটা সিনেমা হল হয়েছে।' ও মুখ বের করে দেখল আলোছায়াতে দস্যু মোহন হচ্ছে। এই সিনেমাটার কথা মণ্টু খুব বলছিল। ও চট করে পকেটে পড়ে থাকা আধুলিকে স্পর্শ করে নিল।

'তুই সিগারেট খাস ?'

প্রশ্নটা শুনে চমকে ছোটকাকার দিকে তাকিয়ে দ্রুত মাথা নাড়ল অনিমেষ। এ রকম প্রশ্ন বড়রা কেউ করবে ও ভাবেনি। ছোটকাকা নির্বিকার। ওদের ক্লাসের অনেকেই এখন সিগারেট খায়। মণ্টু ওকে একবার জোর করে সিগারেট টানিয়েছিল, কি বিচ্ছিরি তেতো-তেতো। কি আরাম যে লোকে পায়!

'তুই পার্টি করিস ?'

এই প্রশ্নটার অর্থ এখন অনিমেষের জানা হয়ে গেছে। পার্টি করা বলতে এখানে সবাই কম্যুনিস্ট পার্টি করার কথাই বোঝায়। যেন কংগ্রেসীরা পার্টি করে না। নিশীথবাবু ওকে নিয়ে কংগ্রেস অফিসে কয়েকবার গিয়েছিলেন। সামনের নির্বাচনে ওকে কংগ্রেসের হয়ে যে কাজ করতে হবে সেটা নিশ্চিত। সেদিন একটা মজার বক্তৃতা শুনেছিল ও। জেলা থেকে নির্বাচিত একজন কংগ্রেসী বলছিলেন, 'ওরা বলে আমরা চোর, ভাল কথা। কিন্তু গদীতে যেই যাবে সে সাধু থাকতে পারে না। এখন কথা হল আমরা খেয়ে খেয়ে এমন অবস্থায় এসেছি যে আর খাওয়ার ক্ষমতা নেই। এখন ইচ্ছে না থাকলেও আমরা সাধারণ মানুষের জন্য দু-একটা কাজ করব। কিন্তু ওরা তো উপোসী ছারপোকা হয়ে আছে, গদীতে গেলে তো দশ বছর লুটেপুটে খাবে। তার বেলা ?' কথাটা অনিমেষের ঠিক মনঃপূত না হলেও বিকল্প কোন চিন্তা মাথায় আসেনি। তাই ঘাড় নেড়ে এখন সে বলল, 'আমি কংগ্রেসকে সাপোর্ট করি।'

একটু অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে প্রিয়তোষ মনে করতে পারল, 'ও, তুই সেই বন্দেমাতরম বলতিস, না? স্বাধীনতা দিবসে ফ্ল্যাগ তুলেছিলি, না?'

ঘাড় নাড়ল অনিমেষ। এটা ওর গর্ব।

হঠাৎ অনিমেষের জ্যাঠামশাই-এর কথা মনে পড়ে গেল, 'জানো জ্যাঠামশাই একদিন জেঠিমা আর ছেলেকে নিয়ে বাড়িতে এসেছিল। দাদু ছিল না তখন।'

'তাই নাকি? তারপর?'

'খাওয়া-দাওয়া করে দাদু আসার আগেই চলে গেল। এ খবর তুমি জানো?' অনিমেষ সন্দেহের চোখে ছোটকাকার দিকে তাকাল। প্রিয়তোষ হেসে ঘাড় নাড়ল, না।

'জ্যাঠামশাই তোমাকে কম্যুনিস্ট পার্টি করো বলে বোকা বলছিল। আখের গোছাতে হলে নাকি কংগ্রেসী হতে হয়। আমার খুব রাগ হয়েছিল। বল কথাটা কি ঠিক? হাতের সব আঙুল কি সমান?' অনিমেষ বেশ উত্তেজিত গলায় বলল।

প্রিয়তোষ দিনবাজারের সামনে গাড়িটা দাঁড় করাতে বলে পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল, 'কেন, তুই একটু আগে বললি না চেহারা দেখে বোঝা যায় কে কম্যুনিস্ট আর কংগ্রেসী! তা সুখে থাকতে গেলে তো কংগ্রেসী হতে হবে। ভালই করেছিস।'

ব্যাগ থেকে একটা একশ' টাকার নোট বের করে অনিমেষের সামনে ধরল প্রিয়তোষ, 'যা, চট করে এক সের ভাল কাটা পোনা, এক সের রাবড়ি আর কিছু মিষ্টি কিনে আন। আমি আবার মাছ ছাড়া খেতে পারি না। তাছাড়া বাবার এসব অনেকদিন পর খেতে ভাল লাগবে।'

অনিমেষ দেখল ছোটকাকার ব্যাগটা একশ'টাকার নোটে ফুলে ঢাউস হয়ে আছে। কত টাকা। বাড়ানো টাকাটা হাতে নিয়ে ওর খেয়াল হল পিসীমা আজকাল একদম মাছ ছোঁন না, ও একটু ইতস্তত করে বলল, 'কিন্তু পিসীমা যে মাছ রান্না করেন না!'

'সে কি!' প্রিয়তোষ যেন কথাটা ঠিক বিশ্বাস করল না, 'ঠিক আছে, সে আমি দেখব। হ্যাঁ, এক কাজ কর, আসার সময় এক পোয়া ছানার জিলিপী আনবি। দিদি ছানার জিলিপী পেলে কোন কিছুতেই না বলবে না।'

প্রিয়তোষ যেন বাড়িতে একটা উৎসবের মেজাজ নিয়ে এল। এতদিন ধরে সরিৎশেখরের এই সংসার যে বদ্ধ জলার মধ্যে পাক খাচ্ছিল তার যেন অনেক মুখ খুলে গেল আচম্বিতে। হেমলতা প্রিয়তোষকে জড়িয়ে ধরে খানিকক্ষণ মন খুলে

কেঁদে নিয়ে মাছ কুটতে বসে গেলেন। কান্নায় সময় অনিমেষ দূরে দাঁড়িয়ে অনেক-গুলো নাম শুনতে পেল যাঁদের মধ্যে সেই অদেখা শচীন পিসেমশাইও ছিলেন। হেমলতার কান্নায় আক্ষেপটাই বড় হয়ে উঠছিল, প্রিয়তোষ অ্যাদ্দিন কোথায় ছিল—এদিকে যে সংসার ভেসে যায়—আর কতদিন এই পোড়া বোঝা বইতে হবে ইত্যাদি। কান্নার মাঝখানে একবার সরিৎশেখরের বিরুদ্ধেও কিছু বলা হল। তারপর কান্না থামলে প্রিয়তোষের আনা মিষ্টি তাকে খেতে দিয়ে গল্প করতে করতে মাছ কুটতে বসে গেলেন। যেন যন্ত্রের মত ব্যাপার হচ্ছে, অনিমেষ অবাক হয়ে দেখছিল। খুব শোক বা খুব আনন্দ মানুষকে তাঁর সংস্কার ভুলিয়ে দিতে পারে সহজেই।

একটু বেলা বাড়লে একমাথা রোদ ভেঙে সরিৎশেখর বাড়ি ফিরলেন। এই দৃশ্যটা দেখার জন্য আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল অনিমেষ। সরিৎশেখর আসছেন, এক হাতে বিবর্ণ ছাতি অন্য হাতে লাঠি। কোরা ধুতি হাঁটুর নিচ অবধি, পাঞ্জাবি লালচে। বেশ দ্রুত হাঁটছিলেন প্রথমটায়, গেটের কাছাকাছি এসে মুখ তুলে ঠাওর করতে চাইলেন বাড়িতে নতুন কোন ঘটনা ঘটেছে কিনা। অনিমেষ দেখছিল দাদু ঠিক বুঝতে পারছেন না, তাই গেটটা বন্ধ করার সময় শব্দ করলেন খুব জোরে। তারপর যেন হাঁটতে পারছেন না আর, এইরকম ভঙ্গিতে লাঠিতে শরীরের ভর দিয়ে এগোতে লাগলেন। কয়েক পা হেঁটে থমকে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন কোন আওয়াজ পান কিনা। দাদুর এইরকম ব্যাপারস্যাপার কোনদিন দেখেনি অনিমেষ। গেট বন্ধের আওয়াজ ভেতরে হেমলতার কানে গিয়েছিল। পিসীমাকে হুড়মুড় করে বাইরে বেরিয়ে আসতে দেখল ও। দাদুকে দেখে পিসীমা চিৎকার করে উঠলেন, 'ও বাবা, দেখুন কে এসেছে—প্রিয়—প্রিয়তোষ, একদম সাহেব হয়ে এসেছে—আপনার জন্য মাছ মিষ্টি এনেছে।' অনিমেষ দেখল দাদু যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব করে হাঁটছেন। তাঁর শরীরের কষ্ট যেন ছোটকাকার ফিরে আসার চেয়ে অনেক বেশী জরুরী।

বারান্দায় উঠে চেয়ারে গা এলিয়ে দিতে দিতে সরিৎশেখর বললেন, 'এক গেলাস জল দাও।'

হেমলতা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এই রোদে পুড়ে এলেন, এখনই জল খাবেন কি!'

অনিমেষ দেখল ছোটকাকা ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে গম্ভীর মুখে দাদুকে প্রণাম করল। ছোটকাকার পরনে এখন ধোপভাঙা পায়জামা আর গেঞ্জি। দাদু একটা হাত উঁচু করে কি যেন বললেন, তারপর ছোটকাকা উঠে দাঁড়ালে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কখন এলে?'

একদম হাঁ হয়ে গেল অনিমেষ। এত বছর পর এভাবে বাড়ি ফিরল যে, তাকে

দাদু এমনভাবে প্রশ্ন করলেন যেন কদিন বেড়িয়ে কেউ বাড়ি ফিরেছে। ছোটকাকাও বলল, 'এই তো খানিক আগে। আপনি কেমন আছেন?'

ততক্ষণে পিসীমা ভেতর থেকে একটা তালপাতার পাখা এনে জোরে জোরে দাদুকে বাতাস করতে আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। সে বাতাস খানিকক্ষণ নিয়ে দাদু বললেন, 'বড় অর্থকষ্ট, এ ছাড়া ভালই আছি। আজ বাড়িটা ভাড়া দিয়ে এলাম।'

পিসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত টাকায় ঠিক হল?'

'আড়াইশো। তাতে আমার চলে যাবে।' কথাটা বলে দাদু ছোটকাকাকে আর একবার দেখলেন, 'তোমার শরীর দেখছি আগের থেকে ভাল হয়েছে। বিয়ে-থা করেছ?'

'না, না, কি আশ্চর্য আপনাকে না বলে বিয়ে করব কেন?' কেমন বোকার মত মুখ করল ছোটকাকা।

পিসীমা বললেন, 'মহী আবার বিয়ে করেছে, জানিস? আর পরি একটা কোত্থেকে মেয়ে ধরে বিয়ে করেছে, একটা বাচ্চাও হয়েছে।'

হঠাৎ খুব জোরে ধমকে উঠলেন দাদু, 'থামো তো, তখন থেকে ভড়ভড় করছ।'

পিসীমা চুপ করতেই খুব আস্তে বলে ফেললেন, 'তুমি অ্যাদ্দিন কোথায় ছিলে জানতে চাই না, মনে হচ্ছে সুখেই আছ। চাকরিবাকরি করো?'

'হ্যাঁ।' খুব সংক্ষিপ্ত জবাব দিল ছোটকাকা।

পিসীমা আবার বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ বাবা, প্রিয় যখন এল আমি তো অবাক। কি দামী কোটপ্যান্ট আবার সাহেবদের মত টাই! খুব বড় অফিসার আমাদের প্রিয়। আপনার আর কোন কষ্ট হবে না।'

হঠাৎ দাদু জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি আজকাল কম্যুনিস্ট পার্টি করো না?'

মাথা নাড়ল ছোটকাকা, 'না। আমি কোন দলে নেই।'

'সে কি! যে পার্টির জন্য বাড়ি ছাড়লে সেই পার্টি ছেড়ে বড়লোক হয়ে গেলে! আমার আজকাল প্রায়ই মনে হয় তোমার বন্ধুরা ঠিক কথাই বলে। আমি অবশ্য তোমার বন্ধুদের বেশী চিনি না।' সরিৎশেখর মেয়ের দিকে তাকালেন, 'হেম, প্রিয়তোষ মিষ্টি এনেছে বলছিলে না, দাও খাই, অনেকদিন মিষ্টি খাই না।'

সরিৎশেখরের এই মিষ্টি খেতে চাওয়াটা থেকেই বাড়িতে বেশ উৎসব-উৎসব

আমেজ শুরু হয়ে গেল। কিন্তু অনিমেষ দেখছিল দাদু যখন ছোটকাকাকে বন্ধুদের নাম করে কি সব শোনার কথাটা বললেন এবং বলে কথাটা ঘুরিয়ে নিলেন তখন ছোটকাকা ভ্রূ কুঁচকে দাদুকে এমন ভঙ্গীতে দেখল যেটা মোটেই ভাল নয়। তারপর থেকে এ বাড়িটা একদম পাল্টে গেল। ছোটকাকা যা বলছে পিসীমা দাদু তাতেই হ্যাঁ বলছেন। দাদুর পরিবর্তনটা সবার আগে চোখে পড়ছে। এত বয়স হয়ে গেলেও এখনও কি শক্ত উনি, একাই দিনবাজার থেকে বাজারের বোঝা এক হাতে বয়ে আনেন। সেই দাদু এখন যেন হঠাৎই অথর্ব হয়ে যাচ্ছেন। কথা বলছেন আস্তে আস্তে। খেয়েদেয়ে দুপুরে ছোটকাকা ঘুমুলে পিসীমা শব্দ করে বাসন মাজছিলেন বলে চাপা গলায় ধমকে উঠলেন, 'যেমন তোমার গলার শব্দ তেমনি হাতের আওয়াজ। ছেলেটাকে ঘুমুতে দেবে না?'

বিকেলে চা খেয়ে বেরুবার সময় ছোটকাকা দাদুকে দশটা একশ' টাকার নোট দিল। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে অনিমেষ দেখল টাকাটা নেবার সময় দাদু একটুও উত্তেজিত হলেন না। যেন গচ্ছিত টাকা ফেরত নিচ্ছেন এমন ভাব। বাড়ি থেকে বের হবার আগে ছোটকাকা অনিমেষকে ডাকল, 'কি করছিস তুই?'

এখন ভর-বিকেল। তিস্তার পাড়ে মণ্টুরা এসে গেছে। অনিমেষ ওদের কাছে আজকের এয়ারপোর্টের অভিজ্ঞতাটা বলবার জন্য ছটফট করছিল। মুখে বলল, 'কিছু না।'

'তাহলে চল, আমার সঙ্গে ঘুরে আসবি।' তারপর পিসীমাকে ডেকে বলল, 'তোমরা কখন শুয়ে পড?'

পিসীমার সময়ের হিসেব ঠিক থাকে না, 'নটা দশটা হবে, বাংলা খবর শেষ হলেই বাবা শুয়ে পড়েন।'

ছোটকাকা বললেন, 'আমাদের ফিরতে দেরি হবে।'

ছোটকাকার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে টাউন ক্লাবের রাস্তায় আসতে আসতে অনিমেষের মনে হল আজ অবধি ও কাউকে এভাবে হুকুম করে এ বাড়ি থেকে বের হতে দেখেনি। ক্রমশ ও বুঝতে পারছিল ছোটকাকা ওদের থেকে একদম আলাদা। এই যে সিল্কের সার্ট-প্যাণ্ট পরা শরীরটা ওর পাশে পাশে হেঁটে যাচ্ছে তাকে ও ঠিক চেনে না। এই শরীরটা থেকে যে বুক ভরে যাওয়া সুগন্ধ বেরুচ্ছে সেটাই যেন একটা আড়াল তৈরি করে ফেলেছে। এত সুন্দর গন্ধ মুভিং ক্যাসেলের শরীর থেকেও বের হয় না। বিলিতি সেণ্ট বোধ হয়।

মোড়ের মাথায় এসে একটা রিকশা নিল ছোটকাকা। কোন দরকষাকষি করল না বলল, 'ঘণ্টা চারেক থাকতে হবে, দশ টাকা পাবে।'

রিকশাওয়ালাটা বোধ হয় এরকম খদ্দের আগে পায়নি, অবাক হয়ে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি ঘাড় নাড়ল। ছোটকাকার পাশে রিকশায় বসতে অনিমেষের মনে হল ওর জামা-কাপড়ও গন্ধে ভুরভুর করছে এখন। হাওয়া কেটে ছুটছে রিকশাটা টাউন ক্লাবের পাশ দিয়ে। ছোটকাকা বলল, 'আগে পোস্ট অফিসের দিকে চল।' ঘাড় নেড়ে রিকশাওয়ালা পি ডব্লু ডি অফিস ছাড়িয়ে করলা নদীর পুলের ওপর উঠল। করলা নদীর এদিকটায় কচুরিপানা কম। আরো একটু বাঁদিকে তাকালে তিস্তা দেখা যায়—করলা তিস্তার সঙ্গমটায় কিংসাহেবের ঘাট।

করলা নদীর দিকে তাকাতেই চট করে অনির সেই ব্যাপারটা মনে পড়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে ও সোজা হয়ে বসল। অলসভাবে শরীরটা রিকশায় রেখে প্রিয়তোষ শহর দেখছিল। এই কয় বছরে একটুও বদলায়নি জলপাইগুড়ি, শুধু নতুন নতুন কিছু বাড়ি তৈরি হয়েছে এদিকটায়। করলার পারে বিরাট জায়গা জুড়ে হলঘর মতন কিছু হচ্ছে। হঠাৎ ও লক্ষ্য করল অনিমেষ কেমন সিটিয়ে বসে আছে।

'কি হল তোর?' প্রিয়তোষ পকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে জিজ্ঞাসা করল। মনে পড়ে যাওয়া থেকে অনিমেষ চুপচাপ ভাবছিল কথাটা বলবে কি না! ও ঠিক বুঝে উঠছিল না যে ছোটকাকা ব্যাপারটা কি ভাবে নেবে। ও নিজে অবশ্য আর গার্লস স্কুলে যায়নি কিন্তু তপুপিসী যে এখনও এখানে আছে এ খবর সে জানে। আর আশ্চর্য, এতদিন জলপাইগুড়ি শহরে থেকে তপুপিসী একদিনের জন্যও ওদের বাড়িতে আসেনি। তপুপিসীর কথা ছোটকাকুকে কি ভাবে বলবে মনে মনে গোছাচ্ছিল সে। প্রিয়তোষ অবাক হচ্ছিল ওর মুখ দেখে। নরম গলায় বলল, 'কিছু বলবি?'

ঘাড় নাড়ল অনিমেষ। তারপর উলটো দিকের কারখানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার একটা চিঠি আমি পুলিসকে নিতে দিইনি। চিঠিটা দাদুর বড় আলমারিতে আছে।'

প্রিয়তোষ ব্যাপারটা ধরতে পারল না একবিন্দু, 'আমার চিঠি? কি বলছিস, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!'

হঠাৎ খুব রাগ হয়ে গেল অনিমেষের। এত বড় গুরুত্বপূর্ণ একটা চিঠি স্যুটকেসে রেখে গেল ছোটকাকু, অথচ এখন কিছুই মনে পড়ছে না! চিঠির সমস্ত লাইনগুলো অবশ্য অনিমেষের নিজের মনে নেই কিন্তু সব মিলিয়ে এই বোধটা ওর মনে আছে যে তপুপিসী খুব দুঃখ পেয়েছিল আর চিঠিটা পেলে পুলিস নিশ্চয়ই তপুপিসীর ওপর অত্যাচার করত। অথচ ছোটকাকা কিছু বুঝতে

পারছে না !

'তপুপিসীর লেখা একটি চিঠি তোমার স্যুটকেসে পেয়েছিলাম আমি। পুলিস তোমাকে খুঁজতে আসার আগেই লুকিয়ে ফেলেছিলাম। চিঠিটা দাদুর কাছে আছে।' অনিমেষ আস্তে আস্তে কথাগুলো বলল।

ব্যাপারটা বুঝতে যেন একটু সময় লাগল ছোটকাকার। তারপর নিজের মনেই যেন বলল, 'ও, আচ্ছা ! আমার একদম খেয়াল ছিল না চিঠিটার কথা। তারপর অনিমেষের দিকে ফিরে বলল, 'তুই পড়েছিস ?'

মাথা নাড়ল অনিমেষ, 'আনি জানতাম না ওটা কার চিঠি।' কথাটা বলেই ও বুঝতে পারল যে ঠিক বলা হল না। কারণ ছোটকাকুর স্যুটকেসে অন্য কার চিঠি থাকতে যাবে ! আর চিঠিটা খুলেই ও তপুপিসীর নাম দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু চিঠিটা তখন না পড়ে উপায় ছিল না—এটা মনে পড়ছে।

রিকশাওয়ালা পোস্ট অফিসের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ছোটকাকা এফ ডি আই স্কুলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কদমতলা দিয়ে মাসকলাইবাড়ি চল।...বাবা কি বলল ?'

শেষ প্রশ্নটা ওকে করছে বুঝতে পেরে অনিমেষ বলল, 'দাদু কিছু বলেননি, শুধু আলমারিতে তুলে রেখে দিলেন।'

বাবুতবাড়ির তলাটা জমজমাট। এখনও সন্ধ্যে হয়নি, আশেপাশে প্রচুর সাইকেলরিকশা ছুটে যাচ্ছে। প্রিয়তোষ চুপচাপ সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে। অনিমেষ বুঝতে পারছিল না ছোটকাকা তাকে নিয়ে কেন বের হয়েছে। শুধু রিকশা করে শহরটা ঘুরতে ? ওর কেমন মন-খারাপ করতে লাগল। ছোটকাকা একবারও কিন্তু তপুপিসীর কথা জিজ্ঞাসা করল না। নাকি এখানকার সব খবর যেমন ছোটকাকা জানে তপুপিসীর কথাও অজানা নয়। তপুপিসী ওকে খবরটা দিয়ে নিজে থেকেই বলেছিল তাই ছোটকাকাকে বলা ওর কর্তব্য।

'ছোটকাকা, তপুপিসী তোমাকে দেখা করতে বলেছে।'

'তপু তোকে বলেছে ?'

'হ্যাঁ।'

'তোর সঙ্গে কোথায় দেখা হল ? স্বর্গছেঁড়ায় ?'

'না। তপুপিসী স্বর্গছেঁড়ায় নেই এখন। এখানে গার্লস স্কুলে কাজ করে তপুপিসী। তোমার খবর নিতে আমি একদিন ওঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম।'

'আমার খবর নিতে ? আমার খবর ওর কাছে পাবি কি করে মনে হল ?'

অনেক কষ্টে অনিমেষ বলতে পারল, 'তোমার চিঠিটা পড়ে আমার মনে

হয়েছিল।'

প্রিয়তোষ কোন কথা বলল না। থানার পাশ দিয়ে রুবি বোর্ডিং ছাড়িয়ে কদমতলার রাস্তায় যাচ্ছিল রিকশাটা। অনিমেষ দেখল রূপশ্রী সিনেমার সামনেটা একদম ফাঁকা, সামান্য কয়েকটা রিকশা দাঁড়িয়ে। আর ওপরে বিরাট সাইনবোর্ডে একটা ছোট ছেলে তার চেয়ে বড় একটা মেয়ের সঙ্গে দৌড়ে যাচ্ছে। সামনে একটা গাড়ি রাস্তা জুড়ে থাকায় ওদের রিকশাটা দাঁড়িয়ে গেল। অনিমেষ সিনেমার হোর্ডিং-এ ছবির নামটা পড়ল, পথের পাঁচালী। কি রকম ছবি এটা, একদম ভিড় নেই কেন ? ওর মনে পড়ল আলোছায়াতে 'দস্যু মোহন' হচ্ছে, মণ্টু বলছিল ভীষণ ভিড় হচ্ছে। আর তখনি অনিমেষ সিনেমা হলের গেটের দিকে তাকিয়ে প্রায় উঠে দাঁড়াল। প্রিয়তোষ চমকে গিয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল ?'

চেঁচিয়ে উঠল অনিমেষ, 'তপুপিসী !'

প্রিয়তোষের কপালে সঙ্গে সঙ্গে তিন-চারটে ভাঁজ আঁকা হয়ে গেল। মুখ ঘুরিয়ে অনিমেষের দৃষ্টি অনুসরণ করে ও সিনেমা হলের সামনেটা ভাল করে দেখল। আট-দশজন স্কুলের মেয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের সামনে নীলপাড় সাদা শাড়ি পরে তপু টিকিট গুনছে। কিছু বলার আগেই অনিমেষ লাফ দিয়ে নেমে দ্রুত হেঁটে তপুপিসীর কাছে গিয়ে হাজির হল।

ওকে দেখতে পায়নি তপুপিসী, অনিমেষ কাছে গিয়ে ডাকল। ঘুরে দাঁড়িয়ে অনিমেষকে দেখতে পেয়ে তপুপিসী ভীষণ অবাক হল, 'ওমা অনি, তুই কোথা থেকে এলি ? সিনেমা দেখছিস ?'

চটপট ঘাড় নাড়ল অনিমেষ, 'না। তুমি দেখছ ?'

খুশী খুশী মুখে তপুপিসী বলল, 'হ্যাঁ। হোস্টেলের ওপর ক্লাসের মেয়েদের নিয়ে এসেছি। এত ভাল ছবি বাংলাভাষায় এর আগে হয়নি। তুই অবশ্যই দেখবি কিন্তু।'

এসব কথা এখন কানে যাচ্ছিল না অনিমেষের। ও একটু অসহিষ্ণু গলায় বলল, 'জানো তপুপিসী, ছোটকাকা এসেছে !'

'ছোটকাকা ?' তপুপিসী যেন কথাটা মনের মধ্যে দু-একবার আওড়ে নিলেন, 'কবে এসেছে ?'

'এই তো, আজ সকালে।' অনিমেষ রিকশার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওই তো রিকশায় বসে আছে। একটু আগে আমরা তোমার কথা বলছিলাম, তুমি অনেকদিন বাঁচবে, দেখো।'

রিকশায় বসে প্রিয়তোষ দেখল তপু মুখ তুলে ওকে দেখছে। ও ধীরেসুস্থে

রিকশা থেকে নেমে দূরত্বটা হেঁটে এল। তপু চশমা নিয়েছে মোটা কালো ফ্রেমের। খুব ভারিক্কি দেখাচ্ছে। স্কুলের মেয়েগুলো বড় বড় চোখ করে ব্যাপারটা দেখছিল। অনিমেষের দিকে কেউ কেউ চোরা চাহনি দিচ্ছে, কেউ মুখ টিপে হাসছে। বোঝা যায় তপুপিসীকে এরা ভয় করে, কারণ কেউ কোন শব্দ করছে না। অনিমেষ ছোটকাকাকে বলতে শুনল, 'কেমন আছ তপু ?'

তপুপিসী বার বার ছোটকাকাকে দেখছিল। যেন সামনে দাঁড়ানো মানুষটাকে দেখে ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। প্রশ্নটা শুনতেই একটু নড়ে উঠল শরীরটা, তারপর বলল, 'ভাল। তুমি কেমন আছ ?'

হাসল ছোটকাকু, 'কেমন দেখছ ?'

'বেশ আছ মনে হচ্ছে। কবে এলে ?'

'আজ সকালে।'

'কদিন থাকবে ?'

'কালই চলে যাব।'

উত্তরটা শুনে অনিমেষ অবাক হয়ে গেল। ছোটকাকা যে কালই চলে যাবে একথা তো আগে একবারও বলেনি ! এমন কি দাদু-পিসীমাও জানেন না !

'কেন এলে ?'

'এলাম। অনেকদিন এদিকে আসিনি, ভাবলাম দেখে যাই। তাছাড়া এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে সেটা সারতে হবে। এখন সেখানেই যাচ্ছি।

'ও। ঠিক আছে, তোমাকে আর আটকাব না, কাজ সারো গিয়ে। আমাদেরও সিনেমা শুরু হল বলে।' তপুপিসী আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল।

অনিমেষ ফ্যালফ্যাল করে এদের দেখছিল। এতদিন পর দেখা হল অথচ ওরা কিভাবে কথা বলছে। তপুপিসীর সঙ্গে ওর যেদিন শেষ দেখা হয়েছিল সেদিন তপুপিসী কত ব্যাকুলভাবে ছোটকাকার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। অথচ আজ সেই মানুষটাকে সামনে পেয়ে কেমন দায়সারা কথা বলছে। আবার ছোটকাকা যেভাবে কথা বলছে তার উত্তর আর কিভাবেই বা দেওয়া যায় ? না, তপুপিসীকে সে কোন দোষ দিতে পারছে না।

হঠাৎ যেন প্রিয়তোষের গলাটা অন্য রকম শোনাল, 'ঠিক আছে, তোমরা সিনেমা ভাখো, আমরা চলি।'

'আচ্ছা। শোন, এই সিনেমা দেখাটা আমার যতটা আনন্দ করার জন্য, তার চেয়ে কর্তব্য করা কিন্তু একবিন্দু কম নয়।' তপুপিসী মেয়েদের এগোতে নির্দেশ দিল হাত নেড়ে। সঙ্গে সঙ্গে লাইনটা সাপের মত নড়ে এগোতে লাগল।

প্রিয়তোষ বলল, 'তপু, কাল সকালে কি তোমার সঙ্গে দেখা হতে পারে?'

খুব দ্রুত ঘাড় নেড়ে না বলে তপুপিসী মেয়েদের নিয়ে সিনেমা হলের ভেতরে চলে গেল। সেদিকে কিছুক্ষণ চুপচাপ চেয়ে থেকে প্রিয়তোষ খুব দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'তুই পথের পাঁচালী দেখেছিস?'

অনিমেষ আর যেন অবাক হতে পারছিল না, কোন রকমে বলল, 'না, আমি সিনেমা দেখি না খুব একটা।'

'ও। কিন্তু এই ছবিটা দেখিস।' বলে রিকশার দিকে হাঁটতে লাগল।

আরো খানিক বাদে যখন রিকশাটা কদমতলার মোড় ঘুরে শিল্প-সমিতিপাড়া হয়ে মাসকলাইবাড়ির দিকে যাচ্ছিল, যখন শহরটার বুক জুড়ে ছুঁড়ে দেওয়া হাতজালের মত অন্ধকার আকাশ থেকে নেমে আসছিল তখন অনিমেষের মনে হচ্ছিল ও একদম বড় হতে পারেনি। এখনো অনেক অজানা ইংরেজী শব্দের মত এই পৃথিবীর চেনা চৌহদ্দিতে অনেক কিছু অজানা হয়ে আছে। তপুপিসী আর ছোটকাকু যে কথা সহজ গলায় বলে গেল ও কিছুতেই তা পারত না। কিন্তু ওর কাছে এই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে আসছে যে তপুপিসী আজ খুব দুঃখ পেল, সেই কতদিন আগে লেখা চিঠিতে যে দুঃখটা ছিল আজ একদম কিছু না বলে তার চেয়ে অনেক বড় দুঃখ নিয়ে তপুপিসী সিনেমা হলের ভেতর চলে গেল। ওর মনে একটুও সংশয় নেই, এখন এই মুহূর্তে তপুপিসী একটুও সিনেমা দেখছে না। অনিমেষের ইচ্ছে হচ্ছিল এখন চুপচাপ হেঁটে বাড়ি ফিরে যেতে। ছোটকাকুর পাশাপাশি বিলিতি সেন্টের গন্ধ নাকে নিয়ে রিকশায় যেতে একদম ভাল লাগছে না।

মাসকলাইবাড়িতে পৌঁছতে সন্ধ্যেটা গাঢ় হয়ে গেল। বড় রাস্তা ছেড়ে বাঁদিকের মাটির পথটায় রিকশাওয়ালাকে যেতে বলল ছোটকাকু। অনিমেষ এর আগে এই সব জায়গায় কখনো আসেনি। বাড়িঘরদোর দেখলেই বোঝা যায় সদ্য গজিয়ে ওঠা একটা কলোনি এটা। প্রিয়তোষ একটু অসুবিধেতে পড়েছিল প্রথমটা। খুব তড়িঘড়ি জায়গাটার চেহারা বদলেছে। কিন্তু একটা টিনের চালওয়ালা একতলা বাড়িটাকে খুঁজে বের করল শেষ অবধি। কাঁচা রাস্তাটায় মিউনিসিপ্যালিটির আলো আসেনি। কেমন অন্ধকার হয়ে আছে চারধার। দু-পাশের বাড়িগুলো থেকে চুঁইয়ে আসা হ্যারিকেনের আলোটুকুই এতক্ষণ রিকশাওয়ালার সম্বল ছিল। বাড়িটার সামনে এসে রিকশা থেকে নেমে পড়ল প্রিয়তোষ, তারপর অনিমেষের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে কি ভেবে নিয়ে বলল, 'নেমে আয়। আমি ইশারা করলে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসবি।'

ব্যাপারটা খুব রহস্যময় লাগছিল অনিমেষের কাছে। এই অন্ধকার এমন অপরিচিত পরিবেশে আসা, বোধ হয় সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজটা যার জন্য ছোটকাকা এসেছে তা এখানেই এবং ইশারা করলেই বেরিয়ে আসতে হবে—ও কি করবে ঠাওর করতে পারছিল না। ও বলতে গেল যে সে রিকশাতেই বসে আছে, ছোটকাকা কাজ শেষ করে আসুক। কিন্তু ততক্ষণে ছোটকাকা রাস্তা ছেড়ে সেই বাড়িটার বারান্দায় উঠে পড়েছে। অগত্যা অনিমেষ রিকশা থেকে নেমে অন্ধকারে কোন রকমে বারান্দায় চলে এল। প্রথমবার কড়া নাড়ার সময় ভেতর থেকে কোন শব্দ হয়নি, এবার কেউ খুব গম্ভীর গলায় 'কে' বলে উঠল। অনিমেষ অস্পষ্ট দেখল প্রিয়তোষ গলাটা শুনেই পকেট থেকে রুমাল বের করে চট করে মুখ মুছে নিয়ে জবাব দিল, 'আমি প্রিয়তোষ।'

দরজা খুলতে একটুও দেরি হল না এবার। প্রিয়তোষ এগিয়ে যেতে অনিমেষ পিছু নিল। খোলা দরজার ওপাশে যিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁর মাথায় ঘোমটা, বাঁ হাতে শাঁখা-নোয়া নেই। দেখলেই বোঝা যায় বিয়ে-থা হয়নি। মুখে এবং কাপড় পরার ধরনে এমন একটা ব্যাপার আছে যে তাঁকে পরিচিত বিবাহিত বা অবিবাহিত মেয়েদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করা যায়। ঘরে আসবাব বলতে একটা তক্তপোশ আর দুটো কাঠের চেয়ার। তক্তপোশের ওপর বাবু হয়ে একজন মাঝবয়সী মানুষ বসে আছেন। বোঝাই যায় এককালে স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল। মাথায় চুল আছে যথেষ্ট কিন্তু সেগুলো অগোছালো আর ঘরের ভেতর যেটুকু আলো হ্যারিকেন দিচ্ছিল তাতেই চুলগুলোর অর্ধেক যে পাকা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না। একটা ফতুয়া আর লুঙ্গি পরেছেন ভদ্রলোক, নাকটা ভীষণ টিকালো। অনিমেষ দেখল ভদ্রলোকের ডান হাতটা ফতুয়ার হাতা থেকে বেরোয়নি। লতপত করছে সেটা। এই প্রথম ও আবিষ্কার করল মানুষটার একটা হাত নেই।

প্রিয়তোষ ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়েছিল। অনিমেষ দেখল ওঁরা দুজন একদৃষ্টে ছোটকাকার দিকে তাকিয়ে আছেন। ভদ্রমহিলার চোখের বিস্ময় মুখেও ছড়িয়ে পড়েছে।

ছোটকাকা বলল, 'তেজেনদা, আমার চিঠি পেয়েছেন?'

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলা কাঠ-কাঠ গলায় বলে উঠলেন, 'ঠিকানা যখন ঠিক লেখা হয়েছে তখন না পাওয়ার কোন কারণ নেই।'

ছোটকাকা বলল, 'এভাবে কথা বলছ কেন রমলাদি?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'তোমার সঙ্গে আর কিভাবে কথা বলা যায়!'

ছোটকাকা কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় ভদ্রলোক কথা বললেন। অনিমেষ

শুনল ওঁর গলার স্বর বেশ গম্ভীর, 'এই ছেলেটি কে?'

ছোটকাকা বলল, 'আমার ভাইপো।'

'একে সঙ্গে এনেছ কেন?'

ছোটকাকা একটু সময় নিলেন উত্তরটা দিতে, 'ওকে নিয়ে শহরটা দেখতে বেরিয়েছিলাম, সেই থেকে সঙ্গে আছে।'

'তুমি কি পলিটিক্যাল আলোচনা অ্যাভয়েড করতে চাও?'

এবার ছোটকাকা ঘুরে দাঁড়াল, 'অনি, তুই বাইরে গিয়ে অপেক্ষা কর।'

দরজাটা ভেজানো ছিল। অনিমেষ আস্তে আস্তে সেটা খুলে বাইরে এল। ওর মনে হচ্ছিল এই ঘরে একটা দারুণ কোন ব্যাপার হবে—চলে গেলে সেটা দেখতে পাবে না ও। অথচ এর পর চলে না যাওয়া অসম্ভব। দরজাটা ভেজিয়ে ও বারান্দায় দাঁড়ালো। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। রিকশাওলাকে দেখা যাচ্ছে না। শুধু রাস্তার এক পাশে রিকশার তলায় ছোট একটা লাল আলো একচক্ষু রাক্ষসের মত ঘাপটি মেরে বসে আছে। বারান্দা দিয়ে কয়েক পা হেঁটে অনিমেষ একটা বন্ধ জানলার পাশে এসে দাঁড়াল। আশ্চর্য, ঘর থেকে কোন শব্দ বাইরে আসছে না। ওরা কি খুব চাপাগলায় কথা বলছে? কি কথা? হঠাৎ অনিমেষের মনে হল ছোটকাকার সেই হঠাৎ করে চলে যাওয়া, এতদিন উধাও হয়ে থেকে এভাবে বড়লোক হয়ে ফিরে আসা—এত সব রহস্যের কথা এই বন্ধ ঘরের আলোচনা থেকে জানা যাবে। ওই হাতকাটা ভদ্রলোক তো বললেন পলিটিক্যাল আলোচনা হবে। অনিমেষ বুঝতে পারছিল এঁরা কম্যুনিস্ট, ছোটকাকাও তখন কম্যুনিস্ট ছিল। ক্রমশ ওঁদের আলোচনাটা শুনবার কৌতূহল ওকে এমন পেয়ে বসল যে ও নিঃশব্দে বারান্দা থেকে নেমে বাড়ির এপাশটায় চলে এল। এধারের মাটি কোপানো, বোধ হয় শাকসবজির গাছ লাগানো হয়েছে। অন্ধকারে পায়ে হাতড়ে ও ঘরটার একপাশেচলে এল। এদিকের জানলাটা আধ-ভেজানো, একটা পর্দা ঝুলছে। ও চুপটি করে জানলার নিচে গিয়ে দাঁড়াল। পাশেই একটা ঝাপড় গাছে বসে একটা পাখি ডানা ঝাপটে উঠল। অনিমেষ শুনল ছোটকাকা বলছে, 'এভাবে কথাবার্তা বলার জন্য আমি নিশ্চয়ই এতদিন পর আপনাকে চিঠি দিইনি তেজেনদা!'

সঙ্গে সঙ্গে সেই মহিলা, যাঁকে ছোটকাকা রমলাদি বলেছেন, হিসহিস করে বলে উঠলেন, 'একজন বিশ্বাসঘাতক দালালের সঙ্গে এর চেয়ে ভদ্রভাবে কথা বলা যায় না।'

ছোটকাকা উত্তেজিত গলায় বলল, 'তেজেনদা আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে

এসেছি, এই ভদ্রমহিলাকে আপনি চুপ করতে বলুন।'

তেজেনদার গলা পেল অনিমেষ, 'প্রিয়তোষ, তুমি হঠাৎ এলে কেন? আমি তো তোমার সঙ্গে কোন যোগাযোগ করিনি।'

'আপনি কি জানতেন আমি কোথায় আছি?'

'গত তিন বছর ধরে তোমার সব খবর আমি পেয়েছি। দিল্লীতে—'

গলাটা হঠাৎ থেমে গেল। তারপরই ছোটকাকার গলা ভেসে এল, 'বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, আমি যা বলব আপনাকেই বলব, এই মহিলাকে এই ঘর থেকে যেতে বলুন।'

'কেন, আমাকে কেন প্রিয়তোষ?'

'আশ্চর্য, আপনি আমাকে এই প্রশ্নটা করলেন!'

'হ্যাঁ।'

'আপনি আমাকে কম্যুনিজমে দীক্ষা দিয়েছিলেন, আপনাকে আমি গুরু বলে মেনেছি।'

'সে তো এককালে। সেই কোন্ কালে। এখন তো তুমি কম্যুনিস্ট নও। আমার সঙ্গে তোমার তো কোন সম্পর্ক নেই, তুমিই রাখোনি। তাহলে এসব কথা কেন?'

ছোটকাকার গলাটা কেমন শোনাল, 'মাঝে মাঝে তেজেনদা আমি ভাবি। ইদানীং প্রায়ই মনে হচ্ছে আপনার সঙ্গে একটু আলোচনা করলে মনটা পরিষ্কার হবে। কোন মানে নেই জানি, কিন্তু এককালে আমি আর আপনি দিনরাত একসঙ্গে কিভাবে কাটিয়েছি—সেগুলো আমাকে হন্ট করে। এ ফিলিংস শুধু আপনার আমার ব্যক্তিগত রিলেশন নিয়ে, তেজেনদা। তাই কথাগুলো শুধু আপনাকেই বলতে চাই।'

'হুঁ। কিন্তু প্রিয়তোষ, তোমার চিঠি পাওয়ার পর আমরা পার্টি থেকে ডিসিসন নিয়েছি যে, কোন ব্যক্তিগত আলোচনা তোমার সঙ্গে অসম্ভব। ইন ফ্যাক্ট, তোমাকে অভিযুক্ত করার জন্য রমলাকে পার্টি থেকে এখানে থাকতে বলেছে। তুমি কাল মিনিস্টারের সঙ্গে প্লেন থেকে নামার পরই আমরা মিটিং করি।'

কয়েক সেকেণ্ড সব চুপচাপ, তারপর ছোটকাকা বলে উঠল, 'আমি কোন পার্টির কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নই। তেজেনদা, ব্যক্তিগত ব্যাপার পার্টির লেভেলে নিয়ে যাওয়ার যে প্রবণতা আপনার আছে সেটাকে আমি ঘৃণা করি। বেশ, আমি উঠছি।'

সঙ্গে সঙ্গে রমলাদি বললেন, 'না। উঠি বললেই এখন ওঠা সম্ভব নয়। সত্যি কথা বলতে কি, তেজেনদার একটা অস্বস্তি থাকায় আমরা কিছু করিনি এতদিন।

কিন্তু তোমার সাহস যখন এতটা বেড়ে গেছে তখন আর স্পেয়ার করা যায় না। তুমি জলপাইগুড়িতে ঢোকার পর থেকে আমাদের ছেলেরা তোমাকে ওয়াচ করছে এবং এই মুহূর্তেও।'

প্রিয়তোষের কি প্রতিক্রিয়া হল অনিমেষ দেখতে পেল না, কিন্তু ওর নিজের শরীর কেমন ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগছিল এবার। ও চকিতে মুখ ঘুরিয়ে চারপাশে তাকাল। আশেপাশের বাড়িগুলো থেকে যে আলো আসছে তাতে কোন কিছুই ভাল করে দেখা যায় না। এই বাড়িতে কেউ কি আছে যে ওদের ওয়াচ করছে! ছোটকাকা যদি এই শহরে আসা অবধি কেউ বা কারা ফলো করে থাকে, তবে তারা এখানেও আছে। অনিমেষের খুব অস্বস্তি হচ্ছিল, ও অন্ধকারে ঠাহর করেও কিছু দেখতে পেল না। এই যে ও এখানে দাঁড়িয়ে আছে, তাও নিশ্চয়ই ওদের নজরে পড়েছে। নাকি পড়েনি?

হঠাৎ রমলাদির গলা শুনতে পেল অনিমেষ, 'প্রিয়তোষ, তোমার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ, পার্টির বিপর্যয়ের সময় তুমি যখন অন্যান্যদের মত গা-ঢাকা দিয়েছিলে তখন তোমার হদিস কোন কমরেড জানতো না।'

ছোটকাকার গলা পাওয়া গেল না। রমলা বললেন, 'চুপ করে থেকে সময় নষ্ট করছ। আমরা এখানে আড্ডা মারতে আসিনি।' তবু কোন উত্তর এল না ছোটকাকার কাছ থেকে। রমলাদি আবার বললেন, 'যাবার আগে তুমি পার্টি ফাণ্ড ভিল করতে, আমরা পরে হিসাব মেলাতে পারিনি। কেন?'

এবারে ছোটকাকা বলে উঠলেন, 'চমৎকার। যেহেতু আমি আর পার্টির সদস্য নই, তাই এই সব আজেবাজে প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য নই। তবু যখন শুনতে চাইছ তখন বলছি, আমি যা কিছু করেছি সবই তেজেনদার আদেশে করেছি। লোকাল কমিটির ফাণ্ডে লাখ লাখ টাকা থাকে না। যা গরমিল হচ্ছে তা তেজেনদার আদেশেই হয়েছে। ব্যাস।'

সঙ্গে সঙ্গে তেজেনদার চিৎকার কানে এল ওর, 'কি, কি বললি প্রিয়? আমি তোকে বলিছি চুরি করতে? তুই পারলি বলতে এসব কথা? তোকে আমি হাতে করে গড়েছিলাম এই জন্যে?'

রমলাদি বললো, 'তুমি যে কথা বলছ তা কি দায়িত্ব নিয়ে বলছ?'

হঠাৎ প্রিয়তোষ চেঁচিয়ে উঠল, 'আমার কি দরকার দায়িত্ব নেবার! তোমরা যা অভিযোগ করছ তা কি প্রমাণ করতে পারবে? কখনই না। অতএব আমি যদি বলি তেজেনদাই সব কিছু করেছেন তোমাদের সেটা শুনতে হবে। কি করেছ তোমরা? ফিফটি টু'র ইলেকশনের পর কোথায় দাঁড়িয়েছ এসে! সাধারণ

মানুষকে তোমরা কখনই কাছে আনতে পারোনি, তাদের আস্থা পাওয়া তো দূরের কথা। কংগ্রেস সুইপ করে বেরিয়ে গেছে এটা তাদের ক্রেডিট, তোমাদের লজ্জার। পার্টির যখন এই হাল করেছ তখন তোমাদের কোন কথা বলার অধিকার নেই। আমি চললাম।'

তেজেনদা বললেন, 'তোর মত কিছু বিশ্বাসঘাতকের জন্য আজ আমাদের এই অবস্থা। আমরা যতদিন তোদের ঝেড়ে না ফেলতে পারি ততদিন এক পা-ও এগোতে পারব না। কিন্তু মনে রাখিস, কম্যুনিস্ট পার্টি চিরকাল এইভাবে পড়ে পড়ে মার খাবে না। তুই বলতিস এককালে, তেজেনদা, আপনার একটা হাত ইংরেজদের দিয়েও আপনি এত অ্যাকটিভ? হ্যাঁ, এই পার্টি যখন মিলিট্যান্ট হবে, যখন কোন আপস করবে না, তখন এই দেশের মানুষ আমাদের পাশে আসবেই। হয়তো আমি তখন থাকব না কিন্তু পার্টি ক্ষমতায় আসবেই।'

রমলাদির তীক্ষ্ণ গলা ভেসে এল, 'তেজেনদা, আপনি সেন্টিমেন্টাল হয়ে যাচ্ছেন।'

এবার ছোটকাকার গলার স্বর পালটে গেল আচমকা, 'তেজেনদা, ঝগড়া করে কোন লাভ নেই। আমি কাদের হয়ে কাজ করছি সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় কিন্তু যেজন্য আমি আপনার কাছে এলাম তা আলোচনা করার সুযোগ দিলে ভাল করতেন।'

রমলাদি বললো, 'কি জন্যে তুমি এসেছ?'

আস্তে আস্তে ছোটকাকা বলল, 'আমরা চাই উত্তরবঙ্গের এই অঞ্চলে অ্যান্টি-কংগ্রেস মুভমেন্ট শুরু হোক, টাকার জন্য তোমরা চিন্তা করো না। তেজেনদা, আন্দোলন না করলে কোন পার্টি জনতার আস্থা অর্জন করতে পারে না।'

'আমাদের টাকা দেবে কে? তোরা মানে কারা? কি লাভ তোদের?' তেজেনদার গলাটা কাঁপছিল।

ছোটকাকা বলল, 'মাপ করো, এর উত্তর আমি দিতে অক্ষম। তবে তোমাদের, সঙ্গে যোগাযোগের দায়িত্ব আমার ওপর দেওয়া হয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গে রমলাদি শক্ত গলায় বলে উঠলেন, 'তুমি কাদের হয়ে টোপ ফেলছ প্রিয়তোষ? আমাদের পার্টি ঘুষ খেয়ে কাজ করে না। তোমার সম্পর্কে যা শুনেছিলাম সেটা সত্যি তাহলে! ছি ছি ছি!'

দরজা খোলার শব্দ পেল অনিমেষ, 'রমলাদি, তোমাদের পার্টির নিয়ম হল কোন প্রশ্ন না করা। ওপরতলা থেকে যখন আদেশ আসবে তখন দেখব তুমি কি করে অস্বীকার কর!'

হঠাৎ রমলা বললেন, 'তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে না, প্রিয়তোষ।'

হাসল ছোটকাকা, 'ভুলে যাচ্ছ কেন, এটা রাশিয়া নয়। আর এটা দেখছ! তোমার সঙ্গীদের কেউ সাহস দেখাতে এলে আমাকে এটা ব্যবহার করতে হবে।'

খুব ফ্যাসফেসে গলায় তেজেনদা বললেন, 'প্রিয়তোষ!'

ছোটকাকা বলল, 'আমি কাল সকাল অবধি আছি। আমার প্রস্তাব যদি ভাল লাগে খবর দিও। এবং খবরটা, রমলাদি, তুমি নিজে গিয়ে দিও। আন-অফিসিয়ালি একটা কথা বলি, ফালতু গোঁড়ামি বাদ দিলে যদি আখেরে কাজ হয় তাই করাটাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ।'

দরজা খুলে গেল। তেজেনদা বললেন, 'ওর হাতে রিভলবার আছে, বোকামি করো না রমলা। ছেলেদের নির্দেশ দেবার দরকার নেই। ও যেমন এসেছিল তেমনি চলে যাক।'

ঠিক এই সময় অনিমেষ ছোটকাকাকে ওর নাম ধরে ডাকতে শুনল। দুবার ডাকবার পর ছোটকাকা রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করল ওর কথা। অনিমেষের এখন একটুও ইচ্ছে করছিল না ছোটকাকার সঙ্গে যেতে। ছোটকাকা কি? কংগ্রেসের মিনিস্টারের সঙ্গে ভাব আছে, কিন্তু কংগ্রেসী নয়। আবার কম্যুনিস্ট না হয়েও কম্যুনিস্টদের বলে গেল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে। ছোট কাকার সঙ্গে রিভলবার আছে ও এতক্ষণ জানতই না!

বন্দেমাতরম বা ইনকিলাব জিন্দাবাদের বাইরে কি কোন দল আছে? তারা কারা? তাদের কি অনেক টাকা আছে? অনিমেষের মনে হল তারা যেই হোক এই দেশকে এক ফোঁটাও ভালবাসে না। তারা শুধু দু'পক্ষের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দিতে চায়। দাদুকে দেওয়া ছোটকাকার টাকাগুলো মনে করে ও যেন কিছু হদিস খুঁজে পাচ্ছিল না। ছোটকাকা আবার ওর নাম ধরে ডেকে উঠতে অনিমেষ নিজের অজান্তেই একটা ঘৃণা মনে লালন করতে করতে রিকশার দিকে এগিয়ে গেল।

আজ দুপুরের প্লেনে প্রিয়তোষ চলে যাবে। অনিমেষ ভেবেছিল এতদিন পর বাড়ি এসে এইভাবে হঠাৎ চলে যাওয়ায় দাদু নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু কার্যত দেখা গেল হেমলতাই একটু চেঁচামেচি করলেন, ভাইকে অভিমানে দু'কথা শুনিয়ে দিলেন এবং খবরটা সরিৎশেখরের কাছে পৌঁছে দিয়ে অনুযোগ করতে লাগলেন। সরিৎশেখর তখন সবে বাজার থেকে ফিরে হাতপাখা নিয়ে বসেছেন, শুনে বললেন,

সরিৎশেখর মনে মনে বিড়বিড় করলেন, 'আমার কাছে তো মোটেই সাধারণ নয়।' তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় তিনি উঠে দাঁড়ালেন, 'তুমি কি এখন বাইরে যাচ্ছ ?'

'হ্যাঁ।' প্রিয়তোষ ঘাড় নাড়ল।

'দাঁড়াও।' সরিৎশেখর দ্রুত ঘরের ভেতর চলে গেলেন। অনিমেষ ওর পড়ার ঘর থেকে বাইরের বারান্দাটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। প্রিয়তোষ কাল রাত্রের পোশাকটাই পরেছে এখন। দাদু ভেতরে গেলে একা দাঁড়িয়ে এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছে। এই লোকটাকে ওর একবিন্দু পছন্দ হচ্ছে না এখন। কাল রাত্রে বাড়িতে ফেরার পর অনিমেষ ভেবেছিল কেউ হয়তো এসে ছোটকাকার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। এমন কি আজ সকালে দুবার ছোটকাকাঅনিকে বলেছে কেউ এলে যেন ডেকে দেয়। কিন্তু কেউ আসেনি। অনিমেষের মনে হল তেজেনদাদের কেউ নিশ্চয়ই আসবে না। আজ একটু আগে ছোটকাকা অনিমেষকে একটু ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল কাল রাত্রের কোন কিছু সে শুনেছে কিনা। এখন চট করে সত্যি কথা না বলতে কোন অসুবিধে হয় না। বিশেষ করে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশটা পড়ার পর থেকে। ছোটকাকা আশ্বস্ত হয়ে ওকে হঠাৎ গিরাম করের বাড়ির পজিশনটা জানাতে বলল। অনিমেষ ভাবছিল ছোটকাকা নিশ্চয়ই তাকে সঙ্গে যেতে বলবে। কিন্তু প্রিয়তোষ ঠিকানা জেনে নিয়ে এ বিষয়ে কোন কথা বলল না। অবশ্য কাল স্কুল কামাই হয়েছে, আজ না গেলে দাদু খুশী হবে না। কিন্তু মুভিং ক্যাসেলের বাড়িতে ছোটকাকা কি জন্য যাচ্ছে জানবার জন্য ওর ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল। অথচ কোন উপায় নেই। ওর মনে হল একটু পরেই উর্বশীরা রিকশা করে স্কুলে চলে যাবে। ছোটকাকার সঙ্গে কি ওদের দেখা হবে ?

সরিৎশেখর বাইরে এলেন হাতে একটা কাগজ নিয়ে, 'এটা তোমার জিনিস, নিয়ে যাও।'

অনিমেষ দেখল ছোটকাকা খুব অবাক হয়ে দাদুর হাত থেকে কাগজটা তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি এটা ?'

দাদু কোন উত্তর দিলেন না, একটা হাত শূন্যে কিভাবে নেড়ে আবার ঘরে ঢুকে গেলেন। ছোটকাকা কাগজটা টানটান করে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মুঠোয় পুরে মুচড়ে ফেলল। তারপর তাকে কয়েক টুকরো করে ছিঁড়ে টান দিয়ে উঠোনের একপাশে ফেলে দিল।

ছোটকাকা বেরিয়ে গেলে অনিমেষ উঠোনে নেমে এল। দাদু ঘরের মধ্যে

বসে হাতপাখা চালাচ্ছেন, পিসীমা রান্নাঘরে। ও প্রায় পা টিপে টিপে ছোটকাকার ছুঁড়ে ফেলা কাগজের মোড়কটা তুলে নিল। টুকরোগুলো দেখেই ওর পা-দুটো কেমন ভারী হয়ে গেল। একটা টুকরোয় অনিমেষ পড়ল, 'কি বোকা আমি।' 'আমি দায় তুলে নিলাম। তপু।' আর একটা টুকরোর প্রথমেই, 'পৃথিবীতে চিরকাল মেয়েরাই ঠকবে, এটাই নিয়ম।'

তপুপিসীর সেই চিঠিটা যেটাকে সে পুলিসের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল, যেটাকে দাদু এতদিন যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন সেটার এখন এই অবস্থা হওয়ায় অনিমেষের বুকটা কেমন করে উঠল। গতকাল সন্ধ্যায় দেখা পাথরের মত মুখটা মনে পড়তেই অনিমেষ বুঝতে পারল, তপুপিসী অনেক বুদ্ধিমতী। ও হঠাৎ দ্রুত হাতে কাগজগুলো কুটিকুটি করে ছিঁড়তে লাগল। এর একটা শব্দও যেন কেউ পড়তে না পারে। তপুপিসীর এই চিঠির প্রতিটি অক্ষরে যে দুঃখটা ছিল সেটা যেন এখন ওর লজ্জা হয়ে পড়েছে। অনিমেষ তপুপিসীকে সেই লজ্জার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য অক্ষরগুলো নষ্ট করে ফেলছিল।

সেদিন স্কুলে নিশীথবাবু এলেন না। প্রথম পিরিয়ডেই ওঁর ক্লাস ছিল। প্রেয়ারের পর ক্লাসরুমে গিয়ে ওরা গল্পগুজব করছিল। গতকাল এয়ারপোর্টে যা যা ঘটেছিল অনিমেষ যখন সবিস্তারে মণ্টুদের বলছিল, তখন স্কুলের দারোয়ান এসে ওর নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকল। সাধারণত এ রকম ঘটনা ঘটে না। হোস্টেলের ছাত্রদের কারো গার্জেন এলে হেড স্যার দারোয়ান দিয়ে ডাকান, অনিমেষের বেলায় আজ অবধি এ রকম হয়নি।

দারোয়ানের পিছু পিছু হেড স্যারের ঘরে গেল অনিমেষ। হেড স্যারের ঘরের সামনেই অফিস ক্লার্ক বসেন। তিনি অনিমেষকে দেখে বললেন, 'তোমার বাড়ি থেকে খবর দিয়েছে, এখনই বাড়ি চলে যাও।'

অবাক হয়ে অনিমেষ বলল, 'কেন?'

'নিশ্চয়ই কোন বিপদ-আপদ হয়েছে।'

'আমি কি বই-এর ব্যাগ নিয়ে যাব?'

ভদ্রলোক একটু দ্বিধা করে বললেন, 'না, তুমি যাও।' আমি দারোয়ানকে দিয়ে ক্লাস থেকে ব্যাগ আনিয়ে রাখছি, কাজ শেষ হলেই চলে এস।'

কোনদিন এত সকাল সকাল ও স্কুল থেকে বের হয়নি। স্কুলের বাগানটা এখন হরেক রকম ফুলে উপচে পড়ছে। এত প্রজাপতি আর মৌমাছি উড়ে বেড়ায় যে সাবধানে শান-বাঁধানো প্যাসেজটা দিয়ে হাঁটতে হয়। বাড়িতে কার কি হল? আসবার সময় তো তেমন কিছু দেখে আসেনি। দাদুর কি শরীর খারাপ

হয়েছে? কে এসে খবর দিল? ও হঠাৎ দৌড়াতে শুরু করল। স্কুলের গেট খুলে রাস্তায় পা দিতেই দেখল মেনকাদি ওদের বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই হাত নেড়ে কাছে ডাকল।

'এই, তোমায় জন্য ঠায় আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি। তাড়াতাড়ি এস।'

মেনকাদি একগাল হাসল। অনিমেষ বুঝতে পারল না মেনকাদি কেন তার জন্য অপেক্ষা করবে? ও বলল, 'আমাকে বাড়িতে যেতে হবে, খুব বিপদ কিছু একটা হয়েছে, খবর এসেছে।'

ঠোঁট ওলটালো মেনকাদি, 'তুমি একদম বুদ্ধু, আমরাই খবর দিয়েছি। প্রিয়দাই দিতে বললেন।' নিজের হাতে গেট খুলে দিলেন মেনকাদি।

এক এক সময় অনিমেষের নিজের ওপর খুব রাগ হয়। সব কথা অনেক সময় ও চট করে ধরতে পারে না। যেমন এই মুহূর্তে ও মেনকাদির কথার মানে বুঝতে পারছে না। ওর বাড়িতে বিপদ হলে মেনকাদিরা কি করে জানবেন! নাকি বিপদ-টিপদ কিছু নয়, শুধু শুধু মেনকাদিরা ওকে ডেকে আনল! কিন্তু কেন?

মেনকাদি গেট বন্ধ করতে করতে অনিমেষ দেখে নিল গেটের বাইরে বিরাম কর শব্দটার আগে আজ 'অ' অক্ষরটা লেখা নেই। মেনকাদি ওর চোখ দেখে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল, হেসে বলল, 'আজ বাবার নামটা ঠিক আছে, না। আচ্ছা, যারা দেওয়ালে এসব লেখে তারা কি আনন্দ পায় বল তো?'

অনিমেষ বলল, 'জানি না, আমি কখনো লিখিনি।'

মেনকাদি বলল, 'ওমা, আমি কি তাই বলছি?' তারপর অনিমেষকে নিয়ে বারান্দার দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'আচ্ছা আমাদের বাড়িতে তো তুমি সেদিন এলে, কাকে তোমার সব চেয়ে ভাল লাগল? বাবা, মা, আমি, উর্বশী আর রম্ভা—চট্‌পট ভেবে নাও, কাকে খুব ভাল লেগেছে তোমার?'

এরকম বোকা বোকা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব মুশকিল। অনিমেষ হাসল, 'সবাইকে।'

'মিথ্যে কথা। একদম মিথ্যে কথা। রম্ভা আমাকে বলেছে।' হাসতে হাসতে মেনকাদি বারান্দায় উঠে পড়লেন। রম্ভা আবার কি বলল মেনকাদিকে? রম্ভার সঙ্গে তো ওর তেমন কোন কথা হয়নি। কিন্তু এ ব্যাপারে মেনকাদি ইতি টেনে দিয়ে ঘরে ঢুকে বলল, 'এই নিন, আপনার ভাইপোকে এনে দিলাম।'

অনিমেষ দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল ঘরে বেশ একটা মিটিং মত ব্যাপার চলেছে। বিরাম কর তেমনি গিলে করা দুধ-রঙা পাঞ্জাবি পরে বসে আছেন, তাঁর একপাশে

নিশীথবাবু একটা লম্বা কাগজে কি সব লিখছেন। উল্টো দিকে ছোটকাকা গম্ভীর মুখে বসে সিগারেট খাচ্ছে। ছোটকাকার পাশে মুভিং ক্যাসেল বসে। মুভিং ক্যাসেলের দিকে নজর যেতেই অনিমেষ চোখ সরিয়ে নিল। অসাবধানে আঁচল সরে যাওয়ায় মুভিং ক্যাসেলের বড় গলার জামার অনেকটা উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে। বেশীক্ষণ চেয়ে থাকা যায় না, কেমন অস্বস্তি হয়।

প্রিয়তোষ বলল, 'আয়। আজ আর স্কুল করতে হবে না। তোর মাস্টারমশাই অনুমতি দিয়েছেন।'

অনিমেষ নিশীথবাবুকে আর একবার দেখল। এর আগে অসুখ-বিসুখ ছাড়া নিশীথবাবু কোনদিন স্কুল কামাই করেননি। নিশীথবাবু বললেন, 'ফার্স্ট পিরিয়ড কেউ নিল?'

ঘাড় নাড়ল অনিমেষ।

প্রিয়তোষ বলল, 'মোটামুটি এইভাবেই কাজ হলে কিছু আটকাবে না। নিশীথবাবু, আপনি তাহলে জেলার সব কটা স্কুলের প্রথম চারজন ছেলের একটা লিস্ট করে ফেলুন। ক্লাস এইট আর নাইন। টেন দরকার নেই, ওদের ইনফ্লুয়েন্স করার সময় পাবেন না। এইট নাইনের মেরিটোরিয়াস ছাত্রদের জন্য স্কলারশিপ দিলে কাজ হবে। কটা বাজল?'

বিরাম কর সরু গলায় বললেন, 'দেরি আছে। আমি গাড়ির ব্যবস্থা করেছি।'

মুভিং ক্যাসেল বললেন, 'তা হোক, গরিবের বাড়িতে একটু খেয়ে যেতে হবে ভাই।'

প্রিয়তোষ বলল, 'কি দরকার! দুপুরের মধ্যে কোলকাতায় পৌঁছে যাব।'

মুভিং ক্যাসেল ছেলেমানুষের মত মুখভঙ্গী করলেন, 'আহা! না খেয়ে গেলে আমার মেয়েদের বিয়ে হবে না, সেটা খেয়াল আছে?'

যেন বাধ্য হয়েই কথাটা মেনে নিল ছোটকাকা, মাথা নাড়ানো দেখে অনিমেষের তাই মনে হল। নিশীথবাবু বললেন, 'আমরা কি সবাই এয়ারপোর্টে যাব?'

মাথা নাড়ল ছোটকাকা, 'না, না, আপনারা পরিচিত লোক, ওদের দৃষ্টি এড়াতে পারবেন না। বেশী লোক যাবার দরকার নেই।' তারপর অনিমেষের দিকে তাকিয়ে বলল, 'অনি, তুই এক কাজ কর, বাড়িতে গিয়ে আমার ব্যাগটা চট করে নিয়ে আয়। দিদিকে বলবি না এখানে আমি আছি, বলবি জরুরী দরকারে এখনই চলে যেতে হল। পরে চিঠি দেব। আর, কেউ যদি তোকে

কিছু জিজ্ঞাসা করে আমি কোথায় আছি না-আছি তুই কোন উত্তর দিবি না। যা।'

অনিমেশ অবাক হয়ে কথাগুলো শুনছিল। ছোটকাকা এখন বাড়ি ফিরবে না। তার মানে যাবার আগে দাদু পিসীমার সঙ্গে দেখাও করবে না। এখানে এইভাবে ছোটকাকা বসে আছে কেন? অনিমেষের মনে হচ্ছিল ছোটকাকা নিশ্চয়ই কোন অন্যায় করেছে। ওর মুখ দেখে বিরাম কর বললেন, 'এখানে খেয়েদেয়ে বাড়ি গেলে ওঁর প্লেন ধরতে দেরি হয়ে যাবে বলে তোমাকে ব্যাগটা এনে দিতে বলছেন।'

মাথা নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল অনিমেষ। বারান্দা থেকে নামতেই পেছনে ছোটকাকার গলা পেল, 'অনি!'

অনিমেষ ঘুরে তাকাল। ছোটকাকা কাছে এসে বলল, 'রাজনীতিতে অনেক সময় অনেক কিছু করতে হয়, তুই আর একটু বড় হলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবি। যদি দেখিস বাড়ির সামনে লোকজন আছে, পেছন দরজা দিয়ে লুকিয়ে ব্যাগটা নিয়ে আসবি। তুই তো কংগ্রেসকে ভালবাসিস। আজ তুই যা করছিস তা কংগ্রেসের জন্যে। কেউ যেন না জানতে পারে আমি এখানে আছি। যা।'

আচ্ছন্নের মত সমস্তটা পথ অনিমেষ হেঁটে এল। ছোটকাকা কি শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসী হয়ে গেল? ধ্যাৎ, তা কি করে হবে! কাল রাত্রেই তো দেবেনদাকে বলল অ্যান্টি-কংগ্রেস মুভমেণ্ট করতে, টাকার চিন্তা নেই। অথচ আজ যেভাবে বিরামবাবুদের সঙ্গে বসে মিটিং করছে তাতে তো কালকের রাত্রের ঘটনাটা বিশ্বাস করাই যায় না। বাড়ির সামনে এসে ও দেখল পাঁচ-ছয়জন ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। বেশির ভাগই পাজামা-পাঞ্জাবি পরা, একজনের দাড়ি আছে। সরু গলি দিয়ে যেতে গেলে ওদের পাশ কাটাতে হবেই। এক নজরেই অনিমেষ বুঝতে পারল এরা এপাড়ার ছেলে নয়। চুপচাপ গলি জুড়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। কাছাকাছি হতেই ওরা অনিমেষকে ঘিরে ধরল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

অনিমেষ দেখল দাড়িওয়ালা লোকটা ওর সঙ্গে কথা বলছে। প্রথমে একটু নার্ভাস নার্ভাস লাগছিল ওর, কিন্তু চট করে ভেবে নিল নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করলে বোকামি হবে। আর দেশের কাজ করতে গেলে এর চেয়ে বড় বিপদে পড়তে হয়! ও গম্ভীর মুখে বলল, 'কেন? বাড়িতে যাচ্ছি।'

ওদের মধ্যে কে যেন বলল, 'হ্যাঁ, এই বাড়িতেই থাকে।'

'প্রিয়তোষবাবু তোমার কে হন?' দাড়িওয়ালা জিজ্ঞাসা করল।

'কাকা।'

'এখন বাড়ি যাচ্ছ যে, স্কুল নেই ?'

এই প্রশ্নটার সামনে পড়তেই একটু হকচকিয়ে গেল অনিমেষ। সত্যিই তো, এখন ওর স্কুলে থাকার কথা। কি উত্তর দেওয়া যায় বুঝতে না পেরে ও খিঁচিয়ে উঠল, 'তাতে আপনার কি দরকার ?' আর বলামাত্র ওর নাভির কাছটা চিনচিন করে গেল।

'দরকার আছে বলেই বলেছি।'

দাড়িওয়ালার গলার স্বরে এমন একটা গম্ভীর ব্যাপার ছিল যে অনিমেষ মুখ ফিরিয়ে এবার সত্যি সত্যি একটা কারণ খুঁজতে গিয়ে ব্যথাটাকে সম্বল করল, 'আমি ল্যাট্রিনে যাচ্ছি।'

দাড়িওয়ালা যেন এ রকম উত্তর আশা করেনি, চোখ কুঁচকে বলল, 'সত্যি ?'

ঘাড় নাড়ল অনিমেষ।

'তোমার কাকা কোথায় গেছে জানো ?'

'কেন ?'

'বড় প্রশ্ন করে তো! শোন, তোমার কাকাকে আমাদের দরকার। প্রিয়তোষ-বাবুর বাবা বললেন যে বাড়িতে নেই, কোথায় গেছে জানেন না। তুমি জানো ?'

এমন সরাসরি মিথ্যে কথা বলতে অস্বস্তি হচ্ছিল ওর। যতই শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের গল্প পড়া থাক এই মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে হল এরা একদম খারাপ লোক নয়। ওকে চুপ করে থাকতে দেখে দাড়িওয়ালা আরো কাছে এগিয়ে এল, 'শোন ভাই, তুমি জলপাইগুড়ির ছেলে, আমাদেরই মতন, তুমি নিশ্চয়ই জান না তোমার ছোট কাকা এতদিন পর এখানে এসে কি বিষ ছড়াচ্ছে। তাকে আমরা মারব না, কিছু বলব না, শুধু চাইব এই মুহূর্তে সে যেন জলপাইগুড়ি ছেড়ে চলে যায়। দালালরা এসে আমাদের সর্বনাশ করুক তা আমরা চাই না। তুমি চাও ?'

আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ল অনিমেষ, না। কিন্তু ওর মনে হল পেটের চিনচিনে ব্যথাটা ক্রমশ পাক খেতে শুরু করেছে। ছোটকাকা বলল, দেশের কাজ করতে। এরা নিশ্চয়ই কংগ্রেসী নয়। যাই হোক, এরা যদি ছোটকাকার চলে যাওয়া চায় তো ছোটকাকা তো একটু বাদেই চলে যাচ্ছে। ছোটকাকার যাওয়াটা যদি কাম্য হয় তাহলে তার ঠিকানা না বললেও তো এদের কাজ হচ্ছে।

অনিমেষ বলল, 'আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।'

খুব হতাশ হল দাড়িওয়ালা। একটু সরে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঠিক আছে, বাড়িতে গিয়ে যদি জানতে পার কিছু আমাদের বলবে, বলবে তো ?'

অনিমেষ সত্যি আর দাঁড়াতে পারছিল না। ওর কপালে ঘাম, আর দুটো হাঁটু হঠাৎ দুর্বল হয়ে শিরসির করছিল। পেটের মধ্যে সব ওলোটপালোট হয়ে যাচ্ছে কোনদিকে না তাকিয়ে ও আড়ষ্ট পা জোরে জোরে জোরে ফেলে বাড়িতে চলে এল। বাইরের দরজা বন্ধ। কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছে এখন। সমস্ত শরীর দিয়ে প্রচণ্ড জোরে অনিমেষ দরজায় ধাক্কা মারতে লাগল। ভেতর থেকে সরিৎশেখর 'কে কে' বলে চিৎকার করতে করতে এসে দরজা খুলতেই অনিমেষ তীরের মত তাঁর পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল। আচমকা ছেলেটাকে ছুটে যেতে দেখে হকচকিয়ে গেলেন সরিৎশেখর, মেয়ের নাম ধরে চিৎকার করতে লাগলেন, হেম, ও হেম, ছাখ অনিকে বোধ হয় ওরা মেরেছে। ছেলেটা ছুটে গেল কেন, ও হেম!'

মহীতোষ অনেকদিন আগে স্বর্গছেঁড়া থেকে ভাল কালামোনিয়া চাল এনে দিয়েছিল। হেমলতা রান্নাঘরে বসে কুলোয় করে সেই চাল বাছছিলেন। প্রিয়তোষের জন্য আজ স্পেশাল ভাত। বাবার ডাকে তিনি হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়িয়ে তারস্বরে চিৎকার শুরু করে দিলেন, 'কে মেরেছে, কে ছুটে গেল, ও বাবা, কার কথা বলছেন, ও বাবা!'

সরিৎশেখর ভেতরে এসে তেমনি গলায় বললেন, 'অনি ছুটে গেল, কোথায় গেল ছাখো, আঃ, আমি আর পারি না।'

সঙ্গে সঙ্গে হেমলতা রান্নাঘরের বাইরে এসে চিৎকার করে অনিকে ডাকতে লাগলেন, 'ও অনি, অনিবাবা, তোকে মারল কে?' এ-ঘর সে-ঘর উঠোন বাথরুম কোথাও না পেয়ে হেমলতা থমকে দাঁড়ালেন, 'ও বাবা, আপনি ঠিক দেখেছেন তো, অনি না অন্য কেউ!'

সরিৎশেখর বিরক্ত হয়ে খিঁচিয়ে উঠলেন, 'আঃ, আমি অনিকে চিনি না?'

'কি জানি, ও হলে তো বাড়িতেই থাকতো। মা-মরা ছেলেটাকে মারবেই বা কেন? না, আপনাকে ঠিক বাহাত্তুরে ধরেছে, কি দেখতে কি দেখেছেন।'

পেছনে দাঁড়ানো বাবার দিকে চেয়ে হেমলতা এই প্রথম দুঃসাহসিক সিদ্ধান্তটা যা তিনি কিছুদিন হল মনে মনে বিশ্বাস করছিলেন অকপটে ঘোষণা করলেন। সরিৎশেখর নিজের কানকে সঠিক ভাবতে পারলেন না। এবং এই প্রথম তাঁর মনে হল অনিমেষকে দেখাটা মিথ্যে হয়ে গেলে হেমলতার অভিযোগটা সত্যি হয়ে যাবে। তিনি ভেবে রাখলেন যে মেয়েকে এই ব্যাপারে পরে আচ্ছা করে কথা শোনাবেন, কিন্তু এই মুহূর্তে ছেলেটাকে খুঁজে বের করা প্রয়োজন।

পৃথিবীতে এর চেয়ে মূল্যবান আনন্দ আর কি থাকতে পারে? সমস্ত শরীরে অদ্ভুত তৃপ্তি, জমে থাকা ঘামগুলোয় বাতাস লেগে একটা শীতল আমেজ—অনিমেষ

উঠোনের আর এক প্রান্তের পুরোনো পায়খানার দরজা খুলে বাইরে এল। প্যান্টের বোতাম আঁটতে আঁটতে ওর নজরে পড়ল, দুটো মুখ অপার বিস্ময় মুখে-চোখে এঁটে তার দিকে চেয়ে আছে। ওর চট করে মনে পড়ল যে, পায়খানায় ঢোকার সময় আজ একদম সময় ছিল না স্কুলের জামাকাপড় ছেড়ে যাবার। আক্রমণটা বোধ হয় এদিক দিয়েই আসবে। অবশ্য নির্ভয় হতে হতে ও দাদু পিসীমার উত্তেজিত কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছিল কিন্তু সূত্রটা ধরতে পারছিল না।

হেমলতাই প্রথম কথা বললেন, 'তুই! পায়খানায় গিয়েছিলি?'

খুব দ্রুত ঘাড় নাড়ল অনিমেষ, 'হুঁ।'

পেছন থেকে সরিৎশেখর হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'হবে না! দিনরাত গাণ্ডেপিণ্ডে খাওয়াচ্ছ, পেটের আর দোষ কি? হ্যাঁ, আমায় বাহাত্তুরে ধরেছে, না? চোখে কম দেখি! দেখ হেম, তোমার দিন দিন জিভ বেড়ে যাচ্ছে, যা নয় তাই বলছ। হবে না কেন, যেমন ভাই তেমনই তো বোন হবে।'

একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন হেমলতা, সত্যি সত্যি অনি এসেছে, বাবা ভুল দেখেননি। কিন্তু শেষ কথাটায় ওঁর গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিল, 'কি বললেন, যেমন ভাই তেমন বোন, না? তা আমরা কার ছেলেমেয়ে? আমি যদি না থাকতাম তবে এই শেষ বয়সে আপনাকে আর ভাত মুখে দিতে হতো না।'

'কি বললে! তুমি খাওয়া নিয়ে খোঁটা দিলে?' সরিৎশেখর চিৎকার করে উঠলেন।

'আপনি কি কম দিচ্ছেন! আপনার কফ্ ফেলা থেকে শুরু করে কি না আমি করেছি। বিনাপয়সার চাকরানী। আর কেউ এক বেলার বেশী আপনার সেবা করতে ঘেঁষত না। থাকত যদি সে—' চট করে পালটে গেল হেমলতার গলার স্বর, 'আমার পোড়া কপাল যে!'

এবার সরিৎশেখর চাপা গলায় বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

অনিমেষ দাদু-পিসীমার এই রাগারাগি মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। হঠাৎ দেখল পিসীমা তার দিকে কেমন চোখে তাকাচ্ছেন, 'কপালের আর দোষ কি! বাড়িসুদ্ধ সবাই উচ্ছন্নে গেলেও এই ছেলেটা আমার কথা শুনত। মাধুরী চলে যাবার পর বুকের আড়াল দিয়ে রাখলাম, সে এমন হেনস্তা করল আমাকে!'

সরিৎশেখর অবাক হয়ে বললেন, 'কি করল ও?'

অনিমেষ এতক্ষণে আক্রমণটাকে এভাবে আসতে দেখে দৌড়ে বাথরুমে যেতে যেতে শুনল পিসীমা বলছেন, 'বাইরের জামাকাপড় পরে পায়খানায় ঢুকছে, সাহস দেখেছেন!'

জামাকাপড় পালটে অনিমেষ বাইরে এসে দেখল সরিৎশেখর চেয়ারে চুপচাপ বসে আছেন। ওকে দেখে আঙুল তুলে কাছে ডাকলেন। দাদুর এরকম ভঙ্গী এর আগে দেখেনি ও। কাছে গিয়ে দাঁড়াতে সরিৎশেখর জিজ্ঞাসা করলেন, 'তিনি চলে গেছেন?'

কার কথা জিজ্ঞাসা করছেন বুঝতে অসুবিধে হল না অনিমেষের, সে নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল।

'কোথায় আছে জান?' সরিৎশেখর চাপা গলায় প্রশ্ন করছিলেন।

'হুঁ।' দাদুর সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যে কথা বলা যায় না।

'কোথায়?'

'বিরাম করের বাড়িতে।' অনিমেষ এমন গলায় কথা বলল যেন তৃতীয় ব্যক্তি শুনতে না পায়।

'বিরাম কর! কংগ্রেসের বিরাম কর? তোমাদের স্কুলের সামনে যার বাড়ি?'

'হ্যাঁ।'

'ওখানে সে কি করছে! সেই মুটকী মেয়েছেলেটার খপ্পরে পড়েছে নিশ্চয়ই। যাক, আমার কি। কিন্তু ওর সঙ্গে আলাপ হল কবে?' নিজের মনেই সরিৎশেখর কথাগুলো বলছিলেন।

মুটকী মেয়েছেলেটা! সামলাতে সময় লাগল অনিমেষের। দাদুর মুখে এ ধরনের কথা এর আগে শোনেনি ও। আর খপ্পরে বললেন কেন, উনি কি রাক্ষসী না' ছেলেধরা যে তাঁর খপ্পরে পড়েছে বলতে হবে। অনিমেষ নির্লিপ্ত হয়ে বলতে চেষ্টা করল, 'কাল এয়ারপোর্টে আলাপ হয়েছিল। ওঁরা কংগ্রেসের নেতা।'

'কংগ্রেস! ওদের তুমি কংগ্রেসী বলছ? চোরের আবার ভাল নাম! কংগ্রেসের নাম করে এখানে বসে রক্ত চুষে চুষে খাচ্ছে। কংগ্রেস যাঁরা করতেন তাঁরা স্বাধীনতার আগেই মারা গিয়েছেন। শেষ মানুষ ওই গান্ধীবুড়ো। এসব চোখে দেখতে হবে বলে ঈশ্বর তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিলেন। তোমার কাকা কার দালাল?' সরিৎশেখর ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন।

'দালাল!'

'হ্যাঁ, বাইরে দাঁড়ানো ছেলেগুলোকে দেখনি? ওরা বলল তোমার কাকার ঠিকানা চায়। সে নাকি দালাল। টাকা দিয়ে সব কিনতে চায়। আমাকে তো মাত্র হাজার টাকা দিল, দিয়ে কিনে নিল। কার দালাল ও?'

'জানি না।'

'করত কম্যুনিজম, এখন দেখছি কংগ্রেসীদের বাড়িতে আড্ডা মারছে। আর

বেছে বেছে তাঁর বাড়িতে যাঁর বউ মেয়ের নাম শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা আছে। সাবাস।'

হঠাৎ হেমলতার গলা পাওয়া গেল। তিনি যে কখন রান্নাঘরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন টের পায়নি অনি। হেমলতা বললেন, 'প্রিয়তোষ যা-ই করুক সে বুঝবে, এই বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো ছেলেগুলোর তাতে মাথা ঘামানোর কি দরকার?'

সরিৎশেখর সোজা হয়ে বসলেন, 'আছ তো রাতদিন রান্নাঘরে বসে, কিছু টের পাও না। পিল্ পিল করে পাকিস্তানের লোক এসে জুটেছে এদেশে, জিনিসপত্রের দাম বাড়তে বাড়তে কোথায় গিয়েছে খবর রাখ? কিন্তু কংগ্রেস সরকারের সেদিকে খেয়াল আছে? মানুষ কি খাবে তাদের সে সব ভাববার সময় কোথায়? এই ছেলেগুলো অন্ততঃ দিনরাত চেঁচাচ্ছে দ্রব্যমূল্য কমাও, এটা চাই সেটা চাই বলে। পরজন্মে বিশ্বাস কর? আমার মনে হয় এইসব ছেলেগুলো এককালে খাঁটি কংগ্রেসী ছিল। মরে গিয়ে এ জন্মে কংগ্রেসের হালচাল দেখে সব কম্যুনিস্ট হয়ে গেছে।'

হেমলতা বললেন, 'কি যে আবোলতাবোল কথা বলেন। জিজ্ঞাস করলাম প্রিয়তোষের কথা, আর আপনি সাত কাহন শুনিয়ে দিলেন।'

সরিৎশেখর আরো উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'তোমার ভাই হলো দুমুখো সাপ। এর কথা তাকে বলে, ওর কথা একে। জনসাধারণের উপকার হোক এ ইচ্ছে নেই। কি চাকরি করে সে যে অত টাকা পায়? বিস্তে তো জানা আছে। নিশ্চয়ই কেউ দিচ্ছে কোন অপকর্ম করার জন্য। তা এই ছেলেগুলো ওকে দালাল বলে ছিঁড়ে খাবে না?'

এতক্ষণে একটু ফুরসত পেল অনিমেষ, 'ছোটকাকা আমাকে ব্যাগটা নিয়ে যেতে বলেছে, আজকের প্লেনেই চলে যাবে।'

ফ্যাসফেসে গলায় হেমলতা জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে খাবে না?'

'না। মিসেস রায় খেতে বলেছেন।' অনিমেষ টের পেল কাকাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ওর বেশ আনন্দ হচ্ছে।

'সে কি! আমি যে এত রান্না করলাম।' পিসীমার আর্তনাদ অনিমেষকে নাড়া দিল।

সরিৎশেখর গম্ভীর গলায় বললেন, 'হেম, পাখী যখন ডানায় জোর পায় তখন তার মা-বাপ আর একফোঁটা চিন্তা করে না। বিরাম করের বাড়িতে অনেক সুন্দরী মেয়ে আছে, তোমার ভাই সেসব ছেড়ে দিদির রান্না খেতে আসবে কেন? বরং চৌকিদারের ছেলেমেয়েকে ডেকে দিয়ে দাও, ওরা খেয়ে সুখ পাবে।'

হেমলতা কেঁদে ফেললেন। অনিমেষ আর দাঁড়াল না। এক দৌড়ে ঘরে গিয়ে ছোটকাকার ব্যাগটা আলমারির ওপর থেকে নামিয়ে আনল। টেবিলে টুকিটাকি জিনিস ছড়ানো ছিল, সেগুলো জড়ো করে ব্যাগে রাখতে ওটাকে খুলতে হল। একটা সুন্দর গন্ধ ভক করে নাকে লাগল। ব্যাগটার মুখে চাবি নেই। ওর হঠাৎ মনে হল একবার দেখে সেই রিভলবারটা ব্যাগের মধ্যে আছে কিনা। না নেই। অনিমেষ পেল না সেটা। তার মানে ছোটকাকা রিভলবার পকেটে নিয়ে বসে আছে বিরাম করের বাড়িতে। গা-টা সিরসির করে উঠল অনিমেষের।

ব্যাগ নিয়ে বাইরে এল সে। চড়চড়ে রোদ উঠেছে। ও দেখল, দাদু পিসীমা উঠোনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। ও একবার সদর দরজার দিকে তাকাল। ওখান দিয়ে গেলে ছেলেগুলো নিশ্চয়ই তাকে ধরবে। এ পাশের মাঠ পেরিয়ে গেলে নিশ্চয়ই কোন বাধা পাবে না। ও চলতে শুরু করতেই সরিৎশেখর বললেন, 'শোন, প্রিয়তোষকে বলে দিও, আমার কোন উপকার করতে হবে না, আর এ বাড়িতে যেন সে কখনও না আসে, বুঝলে ?'

সঙ্গে সঙ্গে হেমলতা বলে উঠলেন, 'আপনি ওর টাকা ফেরত দিয়ে দিন বাবা। ও টাকা ছোঁবেন না। কাল থেকে ভাড়াটে এসে যাচ্ছে, এ মাসটা আমার বালা বিক্রি করে চালান।'

প্রথমে যেন একটু দ্বিধায় পড়েছিলন সরিৎশেখর, তারপর মাথা নেড়ে বললেন, 'কেন নেব না টাকা ? আমার এক-একটা ছেলের পেছনে আমি কত খরচ করেছি সে খেয়াল আছে ? আমি সব হিসেব করে রেখেছি। সেগুলো আগে শোধ করুক তারপর অন্য কথা।'

হেমলতা বললেন, 'আপনাকে আমি বুঝতে পারি না বাবা। ওর টাকা ছুঁতে আমার ঘেন্না হচ্ছে।'

হাসলেন সরিৎশেখর, 'তা হলে বোঝ, ওই ছেলেগুলো কেন এত রেগে গেছে।'

হঠাৎ কি হল অনিমেষের, ও পেছনের মাঠের দিকে না গিয়ে সদর দরজার দিকে হাঁটতে লাগলো। সরিৎশেখর সেটা লক্ষ্য করে কিছু বলতে গিয়েও বললেন না। অনিমেষ যখন দরজা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন চেঁচিয়ে বললেন, 'অনিমেষ, বিনা কারণে এইভাবে তোমার স্কুল কামাই করা—আমি একদম পছন্দ করছি না।'

মাথা নিচু করে ব্যাগটা নিয়ে হাঁটছিল অনিমেষ। ও নিজে থেকে স্কুল কামাই করেনি, দাদু কি জানেন না ? দাদু যেন কেমন হয়ে গেছেন ! বিরামবাবুর মেয়েদের নিয়ে ছোটকাকার সঙ্গে ইঙ্গিত করে কি সব বললেন ! ধাঃ, হতেই পারে না। হঠাৎ ওর উর্বশীর কথা মনে পড়ল। উর্বশী আজ স্কুলে গেছে। মেনকাদির

সঙ্গে তো নিশীথবাবুর লাভ, দাদু এসব কথা জানেন না। না জেনে কথা বলা ওদের বাড়ির স্বভাব।

কিন্তু দাদু ছোটকাকুকে এ বাড়িতে আসতে নিষেধ করেছেন। জ্যাঠামশাই-এর মত ত্যাজ্যপুত্র করলেন না অবশ্য, কিন্তু আসতে না বলা মানে সম্পর্ক ছিন্ন করা। ওর মনে হল, একটু একটু করে দাদু কেমন নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছেন ইচ্ছে করে। কেন?

ছোটকাকার ওপর ওর কাল সন্ধ্যে থেকে জমা রাগটা আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছিল। তপুপিসী, তেজেনদা—সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে ওর মনের মধ্যে একটা আক্রোশ তৈরী হয়ে গেল। ও ঠিক করল দাড়িওয়ালা ছেলেটাকে গিয়ে সব কথা বলে দেবে, ব্যাগটা দেখাবে। যা হোক ছোটকাকার, ওর কিছু এসে যায় না। দোষী মানুষের শাস্তি হওয়া দরকার। ছোটকাকা তো কখনই কংগ্রেসী নয়। কাল রাত্রে অ্যান্টি-কংগ্রেস মুভমেণ্টের কথা বলেছে। অতএব ছোটকাকাকে ধরিয়ে দিলে কোন অন্যায় হবে না।

বড় বড় পা ফেলে ও সরু গলিটায় চলে এল। ক্রমশ ওর গতি কমে গেল এবং অবাক হয়ে চারধারে চেয়ে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। গলিটা একদম ফাঁকা। যেখানে ছেলেগুলো দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে একটা গরু নিশ্চিন্তে ঘাস খাচ্ছে। খুব হতাশ হয়ে পড়ল অনিমেষ। ওরা গেল কোথায়? একটু একটু করে গলিটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে ও ভীষণভাবে আশা করছিল ছেলেগুলোর দেখা পাবে। অথচ এই দুপুরবেলায় গলি এবং বড় রাস্তা ঠা-ঠা রোদ্দুর মেখে চুপচাপ পড়ে আছে। ওরা কি খোঁজ পাবে না ভেবে চলে গেল!

ব্যাগটার ওজন যেম ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল। কোন উপায় নেই, অনিমেষ সেটাকে টেনে টেনে বিরাম করের বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল।

॥ ৯ ॥

ছোটকাকা চলে যাবার পর বিরাম করের বাড়িতে অনিমেষের খাতির যেন বেড়ে গেল। মুভিং ক্যাসেল পরদিন স্কুল ছুটি হতেই ওকে ধরলেন। গেটে দাঁড়িয়ে ছিলেন ভদ্রমহিলা, জেলা স্কুলের ছেলেরা ছুটির পর পিলপিল করে বেরিয়ে ওঁকে দেখতে দেখতে যাচ্ছিল। স্কুলের গেট পার হবার আগেই তপন ওঁকে দেখতে পেয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে কোমরে একটা খোঁচা খেল অনিমেষ, 'ওই ছাখ, হোলি মাদার দাঁড়িয়ে আছেন। উইদাউট ডগ।'

অনিমেষ বলল, 'কি হচ্ছে কি?'

তপন থামল না, 'মাইরি, জলপাইগুড়িতে কোন মেয়ের এরকম ব্লাউজ পরার হিম্মত নেই। শালা নিশীথবাবুটা বহুৎ চালু মাল।'

অনিমেষ এবার রেগে গেল, 'তপন, তুই যদি ভদ্রভাবে কথা না বলতে পারিস তাহলে আমার সঙ্গে আসিস না।'

মন্টু এতক্ষণ শুনছিল চুপচাপ, এবার অনিমেষের পক্ষ নিল, 'সত্যি কথা। সব ব্যাপারে ইয়ার্কি মারা ঠিক নয়।' তারপর ফিসফিস করে বলল, 'মাসীমার সঙ্গে একটু আলাপ করিয়ে দে না ভাই।'

ততক্ষণে ওরা রাস্তায় এসে পড়েছে। চোখাচোখি হতে মুভিং ক্যাসেল ঠোঁট টিপে মাথা সামান্য কাত করে হাসলেন। অনিমেষ দেখল সেই হাসির মধ্যেই কি সহজে উনি ওঁকে ইশারা করে ডাকলেন। অনিমেষ বলল, 'তোরা দাঁড়া, আমি আসছি।' কাছাকাছি হতেই মুভিং ক্যাসেল অদ্ভুত মিষ্টি গলায় বললেন, 'বাবাঃ, ছুটি আর যেন হয় না, সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি! আমাদের বাড়িতে একটু আসবে না?'

অনিমেষ দেখল স্কুলের অন্যান্য ছেলেরা যেতে যেতে ওদের দেখছে। মন্টু আর তপন চুপচাপ রাস্তায় দাঁড়িয়ে। অনিমেষ বলল, 'আমার সঙ্গে যে বন্ধুর আছে।'

'ও।' চোখ বড় বড় করলেন মুভিং ক্যাসেল, 'ওরাও কংগ্রেসকে সাপোর্ট করে?'

অনিমেষ চটপট ঘাড় নাড়ল, না।

মুভিং ক্যাসেল তাতে একটুও দুঃখিত হলেন না, 'আচ্ছা! তোমার বন্ধু যখন তখন ওরা নিশ্চয়ই ভাল ছেলে, কি বল? তা ওদের ডাক না, ওরাও আসুক, বেশ আড্ডা দেওয়া যাবে'খন। তোমার দাদা আবার আজকে প্লেনে কোলকাতায় গেলেন। ছোটকুটার শরীর খারাপ বলে আমি থেকে গেলাম।'

অনিমেষ হাত নেড়ে বন্ধুদের ডাকল। মন্টু বোধ হয় এতটা আশা করতে পারেনি, ও তপনকে ঘাড় ঘুড়িয়ে কিছু বলল, তারপর দুজনে আড়ষ্ট পায়ে এদিকে আসতে লাগল। মুভিং ক্যাসেল গেটটা খুলে ওদের ভেতরে ঢুকতে দিলেন, 'এসো এসো, তোমরা তো অনিমেষের বন্ধু, এক ক্লাসেই পড় বুঝি?'

মন্টু ঘাড় নাড়ল, 'হ্যাঁ।' তারপর ঝুঁকে পড়ে ওঁকে প্রণাম করতে গেল। প্রথমে বুঝতে পারেননি মুভিং ক্যাসেল, তারপর সাপ দেখার মত যতদূর সম্ভব শরীরটাকে সরিয়ে নিলেন, 'ওমা, এর যে দেখছি দারুণ ভক্তি। দিদি বউদিকে কি কেউ প্রণাম করে, বোকা ছেলে! এসো।'

মুভিং ক্যাসেলের পেছন পেছন যেতে যেতে অনিমেষ মণ্টুর মুখের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে ফেলল। আজকাল কথায় কথায় মুভিং ক্যাসেলের প্রসঙ্গ উঠলে মণ্টু মাসীমা বলে, বেচারার প্রথম চালটাই নষ্ট হয়ে গেল।

বারান্দার বেতের চেয়ারে ওরা বসল। মুভিং ক্যাসেলের বসবার সময় চেয়ারটার মচমচ শব্দ হতেই তিনি বললেন, 'খুব মোটা হয়ে গেছি, না ?'

অনিমেষ কোন কথা বলল না। উত্তরটা দিতে কারো স্বস্তি হবে না। মুভিং ক্যাসেলও বোধ হয় চাননি জবাব, 'কি গরম পড়েছে, বাবা! পুজো এসে গেল কিন্তু ঠাণ্ডার নাম নেই।' কথা বলতে বলতে বুকের আঁচল দিয়ে একটু হাওয়া খেয়ে নিলেন উনি, 'এবার তোমাদের দুজনের নাম জানা যাক।'

অনিমেষ বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে দেখল দুজনেই মুখ নিচু করে নাম বলল। কারণটা বুঝতে পেরে চট করে অনিমেষের কান লাল হয়ে গেল। আঁচলে হাওয়া খাওয়ার পর ওটা এমনভাবে কাঁধের ওপর রয়েছে যে মুভিং ক্যাসেলের বুকের গভীর ভাঁজটা একদম ওঁর মুখের মত উন্মুক্ত। মুভিং ক্যাসেলের কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই, নাম শুনে বললেন, 'বাঃ! সামনের বছর তো তোমরা সব কলেজ স্টুডেন্ট। এখন বল তো, তোমরা কংগ্রেসকে কেন সাপোর্ট করো না ?'

মণ্টু সঙ্গে সঙ্গে অনিমেষের দিকে তাকাল। তপন বলল, 'আমি এসব ভাবি না।'

মুভিং ক্যাসেল বললেন, 'তুমি ?'

মণ্টু আস্তে আস্তে বলল, 'আমি কংগ্রেসকে পছন্দ করি না।'

'গুড।' হাততালি দিয়ে উঠলেন মুভিং ক্যাসেল, 'আজ বেশ জমবে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তার আগে একটু চা হলে ভাল হয়, না ? চা খাও তো সবাই!'

অনিমেষ বাড়িতে চা খায় না। কখনো-সখনো সর্দিকাশি হলে পিসীমা আদা দিয়ে চা তৈরি করে দেন। কিন্তু আজ বন্ধুরা কেউ আপত্তি না করাতে ও চুপ করে থাকল। মুভিং ক্যাসেল চেয়ার ছেড়ে উঠতে চেষ্টা করে আবার বসে পড়লেন, 'আর পারি না। অনিমেষ ভাই তুমি একটু যাও না, ভেতরের রান্নাঘরে দেখবে আমদের মেইড-সার্ভেন্ট আছে, ওকে বলবে চার কাপ চা আর খাবার দিতে। তুমি তো আমাদের ঘরের ছেলে।' আদুরে মুখভঙ্গী করলেন উনি।

বই-এর ব্যাগটা রেখে অনিমেষ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ওর খুব ইচ্ছে হচ্ছিল মণ্টু আর মুভিং ক্যাসেলের আলোচনাটা শোনে। মণ্টু ইদানীং খুব কংগ্রেসকে গালাগালি দেয়। অনিমেষকে ঠাট্টা করে বলে, 'কবে ঘি খেয়েছিস এখন হাত চেটে গন্ধ নে।' ও চটপট ফিরে আসবার জন্য ভেতরে পা বাড়াল।

ড্রইংরুমটায় কেউ নেই। বিরাম কর যেখানটায় বসেন সে জায়গাটা চোখে ফাঁকা ঠেকল। সেদিন যে ঘরটায় ওরা বসেছিল তার দরজায় এল ও, কেউ নেই এখানে। উর্বশীদের স্কুল এত দেরিতে ছুটি হয় কেন? মেনকাদিও বাড়িতে নেই! ও গম্ভীর মুখে একদম শেষপ্রান্তে এসে একটা বড় উঠোন দেখতে পেল। উঠোনের এক কোণায় কুয়োর ধারে বসে একজন মাঝবয়সী বউ কি সব ধুচ্ছে। অনুমান করে অনিমেষ তাকেই মুভিং ক্যাসেলের হুকুমটা শোনাল। ও দেখল মুখ ঘুরিয়ে বউটা তাকে দেখে নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল। ভেতরটা বেশ ছিমছাম, সুন্দর। অনিমেষ দেখল উঠানের এপাশে আর একটা ঘর, তাতে পর্দা ঝুলছে। ওটা কার ঘর? এই সময় ওর মনে পড়ল বাড়িতে ঢোকার সময় মুভিং ক্যাসেল বলেছিলেন, ওঁর বিরাম করের সঙ্গে কোলকাতায় যাওয়া হল না ছোটকুটার অসুখের জন্য। ছোটকু কে? বাড়ির সবচেয়ে ছোট তো রম্ভা, নাকি আর কেউ আছে? ওর মন বলল যেই হোক সে অসুস্থ হয়ে ওই ঘরে শুয়ে আছে। মুভিং ক্যাসেল বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর কেউ একজন অসুস্থ হয়ে ঘরে শুয়ে আছে ভাবতে খারাপ লাগল অনিমেষের। ওর ইচ্ছে হল একবার ঘরটা দেখে যাবার। কুয়োর ধারে বসে কাজ করে যাওয়া বউটার দিকে তাকিয়ে ওর একটু সঙ্কোচ হচ্ছিল, ফট করে একটা পর্দা ফেলা ঘরে উঁকি দিলে কিছু ভাববে না তো! তারপর সেটা ঝেড়ে ফেলে পায়ে পায়ে উঠোনটা পেরিয়ে পর্দাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। আশ্চর্য, বউটা একবারও ঘাড় ঘুরিয়ে ওকে দেখল না, কিন্তু দাঁড়ানো মাত্র ভেতর থেকে মেয়েলি গলায় কেউ বলে উঠল, 'কে?' অনিমেষের আর সন্দেহ রইল না ছোটকু মানে রম্ভাই। ওই অসুস্থ। কি হয়েছে রম্ভার? এখন এই মুহূর্তে আর এখান থেকে চলে যাওয়া সম্ভব নয়। ও মন্টুর কথা ভাবল। মন্টু এখন বাইরে মুভিং ক্যাসেলের সঙ্গে পলিটিক্স আলোচনা করার সময় ঘুণাক্ষরে ভাবতে পারছে না রম্ভা এখানে অসুস্থ হয়ে রয়েছে। এক হাতে পর্দাটা সরাল অনিমেষ।

ভেতরটা আবছায়া, খাটের ওপর রম্ভাকে দেখতে পেল ও। পর্দা তোলা মাত্র রম্ভা চট করে কি যেন সরিয়ে ফেলতে গিয়ে ওকে দেখে সেটা নিয়েই অবাক হয়ে উঠে বসল, 'আরে! কি আশ্চর্য ব্যাপার!'

অনিমেষ সেখানে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে তোমার?'

হঠাৎ মুখটা গম্ভীর করে রম্ভা শুয়ে পড়ল, 'বলব না।'

এরকম ব্যাপার কখনো ছাখেনি অনিমেষ, 'কেন?'

'মায়ের কাছে জেনে নাও। দরজায় দাঁড়িয়ে কারো সঙ্গে কথা বলা ভদ্রতা নয়।' রম্ভা বলল।

অনিমেষ ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, 'এবার বল, কি হয়েছে ?'

'সর্দি জ্বর। কাছে এসেছ তোমারও হয়ে যাবে।' রম্ভা চাদরটা গলা অবধি টেনে নিল। অনিমেষ হাসল। মেয়েটা সত্যি অদ্ভুত। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে রম্ভা বলল, 'দিদির কাছে এসেছ ?'

চমকে উঠল অনিমেষ, 'না, না। আমাদের মাসীমা ডেকে এনেছেন।' দিদি বলতে উর্বশীর মুখ মনে পড়ে গেল ওর। এবং এখন ওর ইচ্ছে হচ্ছিল উর্বশী তাড়াতাড়ি ফিরে আসুক।

'আমাদের মানে ?' রম্ভা কথা ধরল।

এবার অনিমেষ একটু মজা করল, 'আমি আর আমার দুই বন্ধু। যার একজনের কথা তুমি সেদিন জিজ্ঞাসা করছিলে, তোমার কথাও ও আমাকে জিজ্ঞাসা করে।'

মুখ বেঁকাল রম্ভা, 'ও, সেই গুণ্ডাটা। ও আবার এল কেন ?'

'গুণ্ডা ?' হাঁ হয়ে গেল অনিমেষ।

'একটা ছেলে সাইকেলে চেপে এসেছিল, তাকে ও মারেনি ? বদমাস ইতর।' রম্ভার গলায় তীব্র ঝাঁঝ, 'কি সব বন্ধু তোমার ! আবার তাদের নিয়ে এসেছ ?'

অনিমেষ চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, 'আমি যাই।'

সঙ্গে সঙ্গে খিঁচিয়ে উঠল রম্ভা, 'যাই মানে ? ইয়ার্কি, না ? আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে এখন চলে যাওয়া হচ্ছে। বসো এখানে পাঁচ মিনিট।'

'তুমি ঘুমুচ্ছিলে কোথায় ? বই পড়েছিলে তো ?' অনিমেষ বালিশের পাশে উপুড় করে রাখা বইটা দেখাল।

রম্ভা বলল, 'আচ্ছা আচ্ছা। একটু বসে যাও প্লিজ।'

'মাসীমা খোঁজ করবেন, আমি চা বলতে এসেছিলাম।' অনিমেষ ইতস্তত করছিল।

'মা এখন তোমার বন্ধুদের সঙ্গে বকবক করবে, খেয়াল করবে না। তাছাড়া তোমার কাকা হল মায়ের ফ্রেণ্ড!' কথাটা বলার ভঙ্গী অনিমেষের ভাল লাগল না। ঘরের এক কোণে টেবিলের গায়ে একটা চেয়ার সাঁটা আছে। ওখানে বসলে এদিকে মুখ ফেরানো যাবে না। এরকম চেয়ার টেবিল স্কুলে থাকে। নিশ্চয়ই পড়ার টেবিল। ও কোথায় বসবে বুঝতে পারছে না দেখে রম্ভা হাত বাড়িয়ে বিছানার একটা পাশ দেখিয়ে বলল, 'এখানে বসো, কথা বলতে সুবিধে হবে। অবশ্য তোমার যদি ছোঁয়া লেগে যাবার ভয় থাকে তো অন্য কথা।' এরপর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না, অনিমেষ সন্তর্পণে বিছানার একপাশে বসল। বসেই ও বইটার মলাট স্পষ্ট

আমরা কিন্তু শেষ করে ফেলেছি।'

জড়সড় হয়ে অনিমেষ চেয়ারে বসে দেখল প্লেটে একটা কেক ওর জন্যে পড়ে আছে। কিছু খেতে ইচ্ছে করছিল না, ও চায়ের কাপটা তুলে নিল। সত্যি ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগছে। মুভিং ক্যাসেল বললেন, 'ওমা, কেকটা খেলে না?'.

কাচুমাচু করে অনিমেষ বলল, 'খিদে নেই।'

'সে কি! এইটুকুনি ছেলের খিদে নেই কি গো! তোমাদের বয়সে আমি কত খেতাম।' বলেই খিলখিল করে হেসে উঠলেন। চা খেতে খেতে অনিমেষ বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে নিল। মন্টুর মুখটা বেশ গম্ভীর। ওদের খাওয়া হয়ে গিয়েছে, বইপত্তর নিয়ে উঠবার জন্যে তৈরী।

মুভিং ক্যাসেল বললেন, 'ছোটকুটার শরীর নিয়ে খুব চিন্তায় পড়েছি। কথা বলল তোমার সঙ্গে?

চমকে চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখল অনিমেষ। ও দেখল, মন্টু সোজা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। মুভিং ক্যাসেল কি কিছু বুঝতে পারছেন?

ও ঘাড় নাড়ল, 'হুঁ! খুব জ্বর আছে এখন।' যেন জ্বর হলে কেউ কোন বাজে কিছু করতে পারে না!

মুভিং ক্যাসেল বললেন, 'একটু আগে আমি দেখলাম নাইন্টি নাইন। তুমি ভুল করেছ। আর ও-মেয়ে সব সময় বাড়িয়ে বলে।'

অনিমেষ বই-এর ব্যাগটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল, 'আমরা যাই।'

ওকে উঠতে দেখে মন্টুরা উঠে দাঁড়াল। মুভিং ক্যাসেল চোখ বড় বড় করে বললেন, 'ওমা, তোমাদের অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি, না? কথা বলার লোক পেলে একদম খেয়াল থাকে না আমার। কথা বলতে এত ভালবাসি আমি।' কোন রকমে উঠে দাঁড়িয়ে উনি অনিমেষের কাঁধে হাত রেখে হাঁটতে লাগলেন গেটের দিকে। মন্টুরা আগে আগে যাচ্ছিল। না, অনিমেষ ফিরে আসার পর থেকে মন্টু একটাও কথা বলেনি। মুভিং ক্যাসেলের ধীরে চলার জন্য মন্টুদের সঙ্গে দূরত্বটা বেড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ উনি ফিসফিস করে বললেন, 'তোমার ওই বন্ধুটা কিন্তু মোটেই ভাল নয়। ওর দাদা পি এস পি করে?'

অনিমেষ বলল, 'জানি না।' মুভিং ক্যাসেলের নরম হাতের চাপ ক্রমশ ওর কাঁধের কাছে অসহ্য হয়ে আসছিল। সেই মিষ্টি গন্ধটা ওকে এখন ঘিরে ধরেছে।

মুভিং ক্যাসেল বললেন, 'তোমার মত ওর মন পরিষ্কার নয়। একটু-সর্তক হয়ে মিশো ওর সঙ্গে। আর হ্যাঁ, আমাদের যে স্টুডেন্টস সংগঠন আছে তাতে তোমার জয়েন করার দরকার নেই। তুমি,—তোমাকে দিয়ে অন্য কাজ করাবার প্ল্যান

আছে।'

অনিমেষ কিছু বলল না। ওরা গেটের কাছে এসে পড়তেই উনি দাঁড়িয়ে পড়ে অনিমেষের কাঁধ থেকে হাতটা নামাতে নামাতে ওর চিবুক ধরে নেড়ে দিলেন, 'ছেলের চিবুকটা এত সুন্দর যে কি বলব।' তারপর গেটটা বন্ধ করে বললেন, 'কালকে এসো।'

ওরা দেখল মুভিং ক্যাসেলের ফিরে যাওয়ার সময় সমস্ত শরীর নাচছে, শুধু কুকুরটা সঙ্গে নেই বলে যা মানাচ্ছে না। আচ্ছা, কুকুরটাকে সে সারা বাড়িতে দেখল না তো। মণ্টু মুভিং ক্যাসেলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বহুত খচ্চর মেয়েছেলে।'

তপন সঙ্গে তাল দিল, 'হোলি মাদার গোয়িং ব্যাক।'

অনিমেষ এখন আর কিছু বলতে পারল না ওদের। মণ্টু যদি জানতে পারে রম্ভা ওকে চুমু খেয়েছে তাহলে কি করবে? এই পৃথিবীর কাউকে কথনো এ কথা বলা যাবে না।

তপন বলল, 'এতবড মেয়েছেলে, এখনও কচি খুকি হয়ে আছে। মাসীমা বলো না—বউদি বলো! পেঁয়াজি!'

অনিমেষ ওদের এমন রাগের কারণ ঠিক বুঝতে পারছিল না।

মণ্টু বলল, 'আমাকে বলে কিনা তুমি ভুল পথে চলছ, তোমার দাদার কোন ভবিষ্যৎ নেই। কংগ্রেসে এলে তুমি কত সুযোগ সুবিধে পাবে—অনির মাথা চিবিয়েছে, এবার আমারটার দিকে লোভ।'

হঠাৎ তপন বলল, 'গুরু, এতক্ষণ কি খেলে এলে ভেতরে? বুকে হাত দিয়ে জ্বর দেখলে?'

অনিমেষ রাগতে গিয়েও পারল না, কোন রকমে বলল, 'কি হচ্ছে কি।'

তপন বলল, 'হোলি মাদারের একজিবিশন দেখলাম আমরা, এতক্ষণ হোলি ডটার কি তোমাকে গ্রামার পড়াল?'

অনিমেষ কোন উত্তর না দিয়ে হাঁটতে শুরু করতেই দেখল বাগান পেরিয়ে উর্বশীর ঘরের এদিকের জানলাটা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। তপন আর মণ্টু সেদিকে চেয়ে চাপা গলায় কি একটা কথা বলে এগোতে গিয়ে আবার থমকে দাঁড়াল। অনিমেষ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে দেখল, মণ্টু পকেট থেকে কালো মতন কি একটা বের করে চটপট গেটের গায়ে বিরাম করের নামটার আগে বিরাট 'অ' লিখে গম্ভীর মুখে হাঁটতে লাগল।

আচমকা ঘটনাটা ঘটে যাওয়ায় অনিমেষ পাথরের মত দাঁড়িয়ে পড়ল। ও

এগিয়ে আসা মন্টুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, একটু আগের সেই বিরক্তিটা আর একদম সেখানে নেই। অনিমেষ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

ভাড়াটে আসার পর তেরাত্তিরও কাটেনি সরিৎশেখর অস্থির হয়ে উঠলেন। তিস্তা বাঁধ প্রকল্প অফিস বাড়ি ভাড়া নিচ্ছে, সইসাবুদ চুক্তি হয়েছে, উনি ভেবেছিলেন আর পাঁচটা সরকারী অফিস যেমন হয় তেমনি দশটা-পাঁচটার ব্যাপার, সকাল সন্ধ্যে রাত নিশ্চিন্ত থাকা যাবে। অফিস হলেই গাড়ি আসবে ফলে সরিৎশেখর নিজে যা অনেক চেষ্টা করেও পারেননি সরকার নিজের প্রয়োজনেই বাড়ির দরজা অবধি রাস্তা বের করে নেবে। কিন্তু সে সব কিছুই হল না। প্রকল্পের দুজন ইঞ্জিনিয়র তাঁদের ফ্যামিলি নিয়ে এসে উঠলেন এ বাড়িতে। রেগেমেগে সরিৎশেখর চুক্তিপত্রটা খুলে দেখলেন তাঁর হাত-পা বাঁধা। তিনি শুধু সরকারকে বাড়ি ভাড়াই দিয়েছেন, কিন্তু কোথাও বলেন নি, যে পরিবার নিয়ে কেউ বসবাস করতে পারতে না। অথচ চুক্তিতে সই করার আগে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন যে, এর আগে অনেকের ফ্যামিলি নিয়ে থাকবার জন্য ভাড়ার প্রস্তাব তিনি নাকচ করেছেন। দিনে দিনেই বাড়ির মধ্যে কাঠের একটা পার্টিসন হয়ে গেল, দেওয়ালে পেরেকের শব্দ হতেই সরিৎশেখরের মনে হল ওঁর বুক ভেঙে যাচ্ছে। তড়িঘড়ি ছুটে গেলেন ঘটনাস্থলে, চিৎকার চেঁচামেচিতে কোন কাজ হল না, মিস্ত্রিগুলো বধিরের মত কাজ শেষ করে গেল। সেই বিকেলেই সাধুচরণের কাছে ছুটলেন সরিৎশেখর। সাধুচরণ এখন আর তেমন শক্ত নয়। মেয়ে মারা যাবার পর স্ত্রী একদম উদোম পাগল হয়ে গিয়েছিল, সম্প্রতি তিনিও গত হয়েছেন। দুই ছেলে বিয়ে করে আলাদা হয়ে গিয়েছে, পাগলের সংসারে তাঁরা থাকতে চাননি। ফলে সাধুচরণের কি অবস্থা তা জানতে বাকি ছিল না সরিৎশেখরের। তবু ওঁরই কাছে ছুটলেন তিনি, বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে লোকটার বুদ্ধি খেলে খুব। সাধুচরণ সব শুনে খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন?'

'উত্তেজিত হব না? কি বলছ তুমি! আমার বুকে বসে ওরা পেরেক ঠুকবে, সহ্য করব? ও বাড়ি আমার ছেলের চেয়েও আপন, বারো ভূতে লুটেপুটে খাবে, আমি দেখব?'

'আহা, আপনি বাড়ি ভাড়া দিয়েছেন কে থাকল বা না থাকল তাতে আপনার কি দরকার! শুধু যদি ওরা কিছু ড্যামেজ করে তাহলেই লিগ্যাল অ্যাকশন নেওয়া যেতে পারে।'

'তুমি বলছ আইন আমাকে সাহায্য করবে না?'

'ঠিক এই মুহূর্তে নয়। যারা আসছে তাদের সঙ্গে মানিয়ে গুছিয়ে যদি থাকা যায় তাহলে খারাপ কি। আপনারা একা একা থাকেন, বিপদেআপদে কাজ দেবে। তা ছাড়া, আপনার মেয়ে তো একদম নিঃসঙ্গ, ভাড়াটে মেয়েদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেলে দেখবেন ও খুশি হবে।'

সরিৎশেখর তবু মেনে নিতে পারছিলেন না, 'দিন রাত চ্যাঁ-ভ্যাঁ এই বয়সে সহ্য হবে না। দেওয়ালে থুতু ফেলবে, পেন্সিল দিয়ে লিখবে, আমার বিলিতি বেসিনগুলো ভাঙবে, ওঃ, কি দুর্মতি হয়েছিল তখন রাজী হয়ে গেলাম!'

হাসলো সাধুচরণ, 'উঁহু, রাজী না হলে বাড়ি ওরা জোর করে নিয়ে নিত। সরকার তা পারে। তখন আঙুল কামড়াতে হত।'

কথাটা খেয়াল ছিল না সরিৎশেখরের। সাধুচরণের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন তিনি। হঠাৎ ওঁর মনে হল, ছেলেদের মত এই বাড়িটাও বোধ হয় তাঁকে শেষ বয়সে জ্বালাবে। সাধুচরণ হঠাৎ ওঁর দিকে মুখ তুলে মিটিমিটি হাসতে লাগলেন।

ভ্রূ কুঁচকালেন সরিৎশেখর, 'হাসছ কেন?'

তেমনিভাবে সাধুচরণ বললেন, 'কথায় আছে রাজার মাও ভিখ মাগে।'

বুঝতে পারলেন না সরিৎশেখর, 'মানে?'

'বাঃ, আপনার ছোট ছেলে থাকতে কোন চিন্তার মানে হয় না।'

'ছোট ছেলে! প্রিয়তোষ?'

'হ্যাঁ, শুনেছি তার কথায় নাকি কংগ্রেসীরা ওঠে-বসে। মন্ত্রীর সঙ্গে খুব ভাব। ও আপনার বাড়িতে এসে থাকেনি?'

সরিৎশেখর ঘাড় নাড়লেন, 'কম্যুনিস্ট ছোঁড়ারা ওর খোঁজে এসেছিল।'

'তাই নাকি! আমি তো শুনে অবাক। কম্যুনিস্ট ছিল বলে ঘর ছেড়ে পালালো যে ছেলে তার এখন এত খাতির! জলঙ্করের পাঁজির বিজ্ঞাপনের মত ব্যাপার। যাক, তাকে আপনি বলুন এই সব কথা, সঙ্গে সঙ্গে কাজ হয়ে যাবে।'

ঘাড় নাড়লেন সরিৎশেখর, 'সে চলে গিয়েছে।'

'তাকে আসতে লিখুন।'

এতক্ষণ পর সরিৎশেখরের খেয়াল হল প্রিয়তোষকে ওর ঠিকানার কথা জিজ্ঞাসা করা হয়নি। এমন কি সে কোথায় গেল তাও বলে যায়নি। হয়তো তাড়াহুড়োয় সময় পায়নি, হয়তো পরে চিঠি দেবে কিন্তু সে কথা সাধুচরণকে বললে কাল সমস্ত শহর জেনে যাবে। হেমলতা প্রায়ই বলে যে, বাবা আপনার পেট বড় আলগা, সব কথা পাঁচজনকে বলা চাই। মেয়েকে অভিযুক্ত করে বলা তাঁরই কথা মেয়ে মাঝে মাঝে তাঁকে ফিরিয়ে দেয়। সরিৎশেখর এখন তাই ধীরে

ধীরে ঘাড় নাড়লেন, যেন সাধুচরণের এই প্রস্তাবটা তাঁর খুব মনঃপূত হয়েছে। কিন্তু রায়কতপাড়ার রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে কিছুতেই তিনি স্বস্তি পাচ্ছিলেন না।

অনিমেষ দাদুর ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিল না। সরকার বাড়ির ভাড়া দেবে, কে থাকল বা না থাকল তাতে কি এসে-যায়। ওর নিজের খুব মজা লাগছিল। ওদের বাড়িতে নতুন কিছু মানুষ এসে থাকছে, রেডিওতে হিন্দী গান বাজছে, এটা কল্পনায় ছিল না। সরিৎশেখর বাইরের বারান্দায় দাঁড়ানো একজন মহিলাকে ভদ্রভাবে বলতে গেলেন যে জোরে হিন্দী গান বাজলে হেমলতার পুজোআচ্চার অসুবিধে হবে, বরং শ্যামাসঙ্গীত কীর্তন আর খবর শুনলে মন ভাল থাকে। কথাটা শুনে মহিলা হেসেই বাঁচেন না, বললেন, 'দাদু আপনি কি কি পছন্দ করেন না তার একটা লিস্ট দিয়ে দেবেন। হিন্দী গান ভাল না, বুঝলাম। রবীন্দ্রসঙ্গীত?'

সরিৎশেখর সুরটা ধরতে পারেন নি, 'রবি ঠাকুরের গান? না মা, ও বড় প্যানপেনে। ওই এখন যা হয়েছে আধুনিক না ফাধুনিক—ওসব একই ব্যাপার!'

মহিলা এত জোরে হেসে উঠলেন যে, সরিৎশেখর আর দাঁড়ালেন না। কথাটা শুনে হেমলতা রাগ করতে লাগলেন, কি দরকার ছিল আপনার গায়ে পড়ে ওসব কথা বলার। নিজের সম্মান রাখতে পারেন না।'

সরিৎশেখর বললেন, 'তোমার পুজোর অসুবিধে হবে বলেই—'

ঝাঁঝিয়ে উঠলেন হেমলতা, 'আমার জন্যে চিন্তা করে যেন আপনার ঘুম হচ্ছে না। আমি কি কিছু বুঝতে পারি না? হিন্দী গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত, এসব তো আপনার চিরকালের কর্ণশূল। অনি পর্যন্ত রেডিওতে হাত দেয় না তাই।'

সরিৎশেখর শেষবার হুঙ্কার ছাড়ার চেষ্টা করলেন, 'আমার বাড়িতে মাইক বাজাবে আমি সেটা সহ্য করব?'

আকাশ থেকে পড়লেন হেমলতা, 'মাইক? বুড়ো বয়সে আপনার কথা-বার্তার যা ছিরি হয়েছে না! মেয়েটা কি ভালো। বেচারাকে মামারা বুড়ো বরের কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে, সাধ-আহ্লাদ করার সুযোগ পেল না।'

কথাটা শুনে তাজ্জব হয়ে গেলেন সরিৎশেখর, 'তুমি জানলে কি করে?'

'বাঃ আপনি যখন বাড়ি ছিলেন না তখন ও তো আলাপ করতে এসেছিল, আমার আমের আচার খেয়ে কি প্রশংসাটাই না করল।'

সরিৎশেখর মনে মনে বেশ দমে গেলেন। ওঁর আড়ালে বেশ একটা ষড়যন্ত্র চলছে এই বাড়িতে। অনেক দিন থেকেই তিনি হেমলতাকে সন্দেহ করেন। পরিতোষ বউকে নিয়ে এল এমন সময় যখন তিনি বাড়ি নেই। পরেও এসেছে

কিনা কে জানে। তিনি তো আর সব সময় বাড়িতে থাকেন না। মহীতোষ যখনই আসে তাঁর সঙ্গে দু'একটা কথা বলার পর রান্নাঘরে গিয়ে দিদির কাছে চুপ-চাপ বসে থাকে। কি কথা বলে কে জানে! ইদানীং নাতিটাও তাঁর কাছাকাছি ঘেঁষে না, নেহাত প্রয়োজনে দু'একটা কথা হয় অথচ দিনরাত পিসীর সঙ্গে ফুসফুস গুজগুজ চলছে। প্রিয়তোষ অ্যাদ্দিন পর বাড়ি ফিরল, তাঁর সঙ্গে আর কটা কথাই বা হল। হেমলতা অনেক রাত অবধি ছোট ভাই-এর সঙ্গে গল্প করেছে এটা টের পেয়েছেন তিনি। সাধুচরণের কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় বেশ শক্ত গলায় এখন সরিৎশেখর জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রিয়তোষ ওর ঠিকানা তোমাকে দিয়ে গেছে, না?'

চট করে প্রসঙ্গ পালটে বাবা এ কথা জিজ্ঞাসা করায় প্রথমে একটু অবাক হয়েছিলেন হেমলতা, তারপর বললেন, 'আমাকে দিয়েছে কে বলল?'

সরিৎশেখর জেরা করার ভঙ্গিতে বললেন, 'দেয় নি?'

আর সামলাতে পারলেন না হেমলতা, বাবার কূটচালটা ধরে ফেলে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আপনি আপনার ছেলেদের চেনেন না? এ বংশের ব্যাটাছেলেরা কোনদিন মেয়েদের সঙ্গে খোলা মনে কথা বলেছে? আমরা তো ঝি-গিরি করতে এসেছি আপনাদের বাড়িতে।' কথাটা বলে আর দাঁড়ালেন না হেমলতা, হনহন করে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন। সরিৎশেখর আর কিছু বললেন না। এই মেয়েকে তিনি চটাতে সাহস পান না। আজ সাধুচরণের যে দশা সেটা তাঁর হলে তেরাত্তিরও কাটবে না। তাঁর জন্য স্পেশাল ভাত তরকারী থেকে শুরু করে কফ্ ফেলার বাক্স পর্যন্ত ঠিক করে দেওয়া হেমলতা ছাড়া আর কেউ পারবে না। নিজের জন্যেই চুপচাপ সব হজম করে যেতে হবে। নিঃশব্দে লাঠি আর টর্চ নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন সরিৎশেখর। সন্ধ্যেবেলায় কালীবাড়ির বাঁধানো চাতালে বসে আরতি দেখলে মনটা খানিকক্ষণ চিন্তামুক্ত থাকে, ইদানীং এই সত্যটা আবিষ্কার করেছেন তিনি।

রাত হলেই বাড়িটা নিঝুম হয়ে যেত। এদিকটায় তিস্তার চর বেশী দূরে নয় বলেই সন্ধ্যের পর শেয়ালগুলো তারস্বরে ডাকাডাকি করে। নদী যখন টই-টম্বুর হয়ে যায়, এপার ওপার হাত মেলায়, তখন শেয়ালগুলো এসে এপারের কিছু ঝোপজঙ্গলে দিব্যি গর্ত খুঁড়ে লুকিয়ে থাকে। অনিমেষ দিনদুপুরে কয়েকটাকে বাগান থেকে তাড়িয়েছে, নেহাতই নেড়িকুত্তা-মার্কা নিরীহ চেহারা। পিসীমা তো সেই ভুলটাই করে ফেললেন। একদিন রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার

পর বাসন ধুতে গিয়ে দেখলেন, একটা কুকুর ধুঁকতে ধুঁকতে ওঁর দিকে তাকিয়ে উঠোনে বসে আছে। কি মনে হল, এঁটোকাঁটা ছুঁড়ে দিতে সেটা ভয়ে ভয়ে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে এসে খেয়ে গেল। পরদিনও একই ব্যাপার। আস্তে আস্তে জীবটার ভয় কমে গেল। উঠোনে আলো কম, ভোল্টেজ এত অল্প যে একশ পাওয়ার টিমটিম করে, তার ওপর হেমলতা চোখে খুবই কম দেখছেন, ঠাওর করতে পারেন নি। একদিন সরিৎশেখরকে বললেন কুকুরটার কথা, বাড়িতে রাত্রে আসে যখন তখন চোরটোর আসতে পারবে না। অনিমেষও শুনেছিল, সেদিন দেখল। খাওয়া-দাওয়ার পর পিসীমা এঁটোর সঙ্গে একটা আস্ত রুটি নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন, 'সিধু, ও সিধু, আয় বাবা, সিধু।' পিসীমা কুকুরটার নাম রেখেছেন সিধু। নিজের ঘরের কাঁচের জানলায় মুখ রেখে কৌতূহলী হয়ে অনিমেষ দেখল কয়েকবার ডাকার পর বাগানের জঙ্গলটায় ঝটপট শব্দ হল। তারপর একটা শেয়াল প্রায় দৌড়ে পিসীমার সামনে এসে দাঁড়াল। পিসীমা খাবারগুলো মাটিতে রেখে দিতেই সে চেটেপুটে খেতে লাগল। বিস্ময়ে থ হয়ে গেল অনিমেষ। সত্যিই শেয়ালটার চেহারার সঙ্গে কুকুরের যথেষ্ট মিল আছে, তাই বলে অত কাছে দাঁড়িয়ে পিসীমা ভুল করবেন? অনিমেষ ভাবতে পারেনি শেয়ালের এত সাহস হবে। তবে কুকুরটার রাত্তিরবেলায় শুধু চুপচাপ আসাটা কেমন ঠেকছিল। পরদিন যখন ও পিসীমাকে বলল পিসীমা তো প্রথমে বিশ্বাস করতেই চান না। পরে বললেন, 'বাড়িতে শেয়াল ঢোকা ভাল না খারাপ বুঝতে পারছি না। তুই আবার বাবাকে বলিস না। হাজার হোক কৃষ্ণের জীব তো, আর ডাকলেই কেমন আদুরে আদুরে মুখ করে চলে আসে।' পিসীমা নিজেই যেন স্বস্তি পাচ্ছিলেন না ওটা শেয়াল শোনার পর থেকে।

এইরকম একটা পরিবেশে নতুন মানুষজন এসে যাওয়ায় সন্ধ্যের পর আর নির্জন থাকল না। তবে যা কিছু আওয়াজ শোরগোল হচ্ছে তা বাড়ির ওদিকটায়। নতুন বাড়ির দুখানা ঘর সরিৎশেখর নিজেদের জন্য রেখে দিয়েছেন। তার আসা যাওয়ার পথ আলাদা। ভাড়াটেরা দুটো ফ্ল্যাট করে নিয়েছেন। একটাতে মহিলা আর তাঁর স্বামী, অন্যটায় যিনি থাকেন তাঁর বোধ হয় বেশী দিন চাকরি নেই, দেখতে বৃদ্ধ মনে হয়। তাঁর ছেলে আর চাকর আছে। ছেলেটি অনিমেষদের চেয়ে কয়েক বছরের বড়, সব সময় পাজামা আর গেরুয়া পাঞ্জাবি পরে। আনন্দচন্দ্র কলেজে পড়ে ও, মহিলা এসে পিসীমাকে বলে গিয়েছেন। পিসীমার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছে ওঁর। আজ বিকেলে অনিমেষের সঙ্গে আলাপ হতে উনি জোর করে ওকে ওঁদের ঘরে নিয়ে গেলেন।

মহিলার নাম জয়া, ঘরে ঢুকেই তিনি বললেন, 'আমাকে তুমি জয়াদি বলে ডাকবে ভাই। আমার কর্তার দিকে তাকালে অবশ্য আমাকে মাসীমা বলতে হয়, তোমার কি ইচ্ছে করছে ?'

অনিমেষ হেসে বলল, 'আমার কোন দিদি নেই, আমি দিদি বলব।'

বসবার ঘরে পা দিয়ে সত্যি মজা লাগছিল ওর। এই ঘরগুলো কদিনে জব্বর ভোল পাল্টেছে। সুন্দর বেতের চেয়ার দেওয়ালে একটা বিরাট ঝরনার ক্যালেণ্ডার আর মস্ত বড় একটা বুককেস্—তাতে ঠাসা বই।

জয়াদি বললেন, 'তুমি কোন্ ক্লাসে পড় ?'

অনিমেষ গর্বের সঙ্গে উত্তরটা দিল।

'ও বাবা, তাহলে তো তোমাকে খুব পড়তে হচ্ছে, আমি ডেকে আনলাম বলে পড়ার ক্ষতি হল না তো!'

'না, না। আমি বিকেলবেলায় পড়তে পারি না।'

'তুমি কারো কাছে প্রাইভেট পড় ?'

'আগে পড়তাম। টেস্টের পর কোচিং ক্লাসে ভর্তি হব।'

'তোমার বই পড়তে ভাল লাগে ?'

'বই,—পড়ার বই ?'

'হুঁ পড়ার বই, গল্পের বই, কবিতার বই।'

'পড়ার বই-এর মধ্যে অঙ্কটা আমার একদম ভাল লাগে না। আমি চার রকমের অঙ্ক খুব ভালভাবে শিখেছি, যে কোন প্রশ্নই আসুক শুধু তা দিয়েই চল্লিশ নম্বর পেয়ে যাই।'

'তাই নাকি! যাঃ!'

'সত্যি! সরল, চলিত নিয়ম, ল. সা. গু., গ. সা. গু. আর সুদের অঙ্ক।'

জয়াদি শুনে শব্দ করে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, 'আমি তোমার সব খবর জেনে নিচ্ছি বলে কিছু মনে করছ না তো ?'

'না।'

'আচ্ছা, এবার বল গল্পের বই কি কি পড়েছ ?'

অনিমেষ এক পলক চিন্তা করে নিল, 'বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, বিষবৃক্ষ, কপালকুণ্ডলা, সীতারাম। নীহাররঞ্জন গুপ্তের কালো ভ্রমর—'

সঙ্গে সঙ্গে আবার হাসি জয়াদির। হাসতে হাসতে বললেন, 'তুমি কালো ভ্রমর পড়েছো ? ওঃ, দারুণ না ? দস্যু মোহন ? ও বাবা, তাও পড়েছ! কিন্তু শোন, তোমাকে একটা কথা বলি, প্রায় একশ বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্র যে সব বই

লিখেছেন সেগুলোকে আমরা বলি অমর সাহিত্য। অমর মানে যা কোনদিন পুরোনো হয় না। আর কালো ভ্রমর হচ্ছে আইসক্রীম খাওয়ার মত, ফুরিয়ে গেলেই শেষ। তাই কখনো আনন্দমঠের সঙ্গে কালো ভ্রমরের নাম একসঙ্গে করো না। তাহলে বঙ্কিমচন্দ্রকে অশ্রদ্ধা করা হয়।'

এভাবে কেউ তাকে লেখকদের চিনিয়ে দেয়নি, অনিমেষ জয়াদিকে আরো পছন্দ করে ফেলল, 'আমাকে এখান থেকে বই পড়তে দেবেন?' আঙ্গুল দিয়ে ও বুককেসটাকে দেখাল।

'নিশ্চয়ই, কিন্তু আর কাউকে দেবে না। বই অন্যের হাতে গেলে তার পা গজিয়ে যায়। ঠিক আছে, আমি তোমাকে বই বেছে দেব। প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্রের সব বই তুমি পড়বে, তারপর শরৎচন্দ্র— ।'

'আমি শরৎচন্দ্রের রামের সুমতি পড়েছি।' অনিমেষ মনে করে বলল।

'আচ্ছা। তারপর রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ পড়া হয়ে গেলে তোমার সব পড়া হয়ে যাবে।'

'রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা আমার মুখস্থ। ভীষণ ভালো, না?'

'যত বড় হবে তত ভাল লাগবে। কিন্তু তুমি পড়বে কখন, তোমার তো স্কুলের পড়ার চাপ এখন।'

একটুও দেরি করল না অনিমেষ, 'বিকেলবেলায় পড়ব। এখন থেকে আর বিকেলে খেলতে যাব না, খেললে রাত্রে পড়ার সময় ঘুম আসে।'

'বেশ, তাহলে বিকেলে এখানে বসে আরাম করে পড়বে রোজ, বাড়িতে নিয়ে গেলে পড়ার বই-এর তলায় গল্পের বই লুকিয়ে রাখবে, পড়া হবে না।'

অনিমেষ হেসে ফেলল, 'আমি কাল একটা বই কিছুতেই ছাড়তে পারছিলাম না-বলে ওরকম করে পড়েছি। দাদু অল্পের জন্য ধরতে পারেননি।'

'কি বই সেটা?'

'পথের পাঁচালী। এখন যে সিনেমাটা হচ্ছে রূপশ্রীতে, সেই বইটা। ক্লাসের একটা ছেলের কাছ থেকে এনেছি। তুমি পড়েছ?'

হঠাৎ যে ও তুমি বলে ফেলেছে অনিমেষ নিজেই খেয়াল করেনি। জয়াদি আস্তে আস্তে বলল, 'দুর্গাকে তোমার কেমন লাগে?'

মুহূর্তে বুকটা ভার হয়ে গেল অনিমেষের, 'দুর্গার জন্য আমি কেঁদে ফেলেছিলাম, ওঃ, কি ভাল। আর জানো, পড়তে পড়তে নিজেকে অপু বলে মনে হয়।'

ওর দিকে তাকিয়ে জয়াদি বলল, 'আমারো নিজেকে দুর্গা বলে মনে হয়।'

অনিমেষ খুব দ্রুত প্রতিবাদ করতে গিয়ে চট করে থেমে গেল। ওর মনে

হল, মায়ের মুখের সঙ্গে জয়াদির মুখের ভীষণ মিল। ও মাথা নিচু করে বসে থাকল।

জয়াদির সঙ্গে না আলাপ হলে অনিমেষ জানতেই পারত না কি একটা অদ্ভুত জগৎ বইগুলোর মধ্যে আছে। গোগ্রাসে গিলে যাচ্ছে রোজ, অনেক কিছুই ও বুঝতে পারছে না। জয়াদিকে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা হয়। নরনারীর সম্পর্কের মধ্যে যে রহস্যটা একটু একটু করে ওর মনে গাঢ় হচ্ছিল, রম্ভা উর্বশী যাকে গভীর করে দিয়েছিল, এই বইগুলো যেন তার কিছু কিছু জায়গায় আলো ফেলছিল। এর মধ্যে কয়েকবার ওকে মুভিং ক্যাসেলের সঙ্গে কংগ্রেসের পার্টি অফিসে যেতে হয়েছে। সবাই খুব ব্যস্ত, সামনে ইলেকশন আসছে। রম্ভা দেখা হলে তেমনি হাসে, উর্বশী আশ্চর্যভাবে ওকে এড়িয়ে যায়। মাঝে মাঝে এজন্যে কষ্ট হয় অনিমেষের, কিন্তু জয়াদির কাছে এসে বই পড়লে সে কষ্টটা আর বুকের মধ্যে শেকড় গেড়ে থাকে না। এর মধ্যে এক শনিবার বাড়ি এসে শুনল জয়াদি ডেকেছে। পিসীমা বললেন, 'মেয়েটা সাধ করে সিনেমার টিকিট কেটেছিল, কিন্তু ওর বর আসতে পারছে না কাজের জন্য, তুই যা না ওর সঙ্গে।' অনিমেষ সিনেমা দেখতে খুব একটা উৎসাহী ছিল না, তাছাড়া দাদু কি বলবেন সেটাও একটা চিন্তার ব্যাপার ছিল। পিসীমা বললেন, 'বাবা জানতে পারবে না, সন্ধ্যের মধ্যে ফিরে এলেই তো হল।'

জয়াদির সঙ্গে রিকশায় যেতে যেতে অনিমেষ বইটা যে পথের পাঁচালী তা জানতে পারল। আজ শেষ শো, কাল রবিবার থেকে অন্য বই। শুক্রবার থেকে এখানে নতুন ছবি দেখানো হয়, কিন্তু এবার কিছু গোলমাল হয়ে যাওয়ায় পুরোনো ছবিটা থেকে গেছে। হলের সামনে এসে দাঁড়াতেই তপুপিসী আর ছোটকাকার কথা মনে পড়ে গেল ওর। তপুপিসীর সঙ্গে জয়াদির অনেক মিল আছে। জয়াদিও যেটুকু নইলে নয় তার বেশী সাজে না। অনিমেষ দেখেছে যাকে ভাল লেগে যায় তার সঙ্গে সব ভাল লাগা মানুষগুলোর অদ্ভুত একটা মিল পাওয়া যায়।

জয়াদি এবং অনিমেষ পাশাপাশি বসে ছবিটা দেখল। হলে আজকে একদম দর্শক নেই। অনেকদিন বাদে সিনেমা দেখতে এল অনিমেষ। মূল ছবির আগে গভর্মেন্টের ছবি দেখাল, তাতে জহরলাল নেহেরু, বিধানচন্দ্র রায়কে দেখতে পেল ও। একবার গান্ধীজীকে দেখাতেই হলের মুষ্টিমেয় মানুষ অদ্ভুত গলায় হইচই করে উঠল, চিৎকারটা আনন্দের নয় মোটেই। কেন?

ছবি শুরু হতেই অনিমেষের মনে হল ও যেন স্বর্গছেঁড়ায় চলে গেছে। দুর্গা

সুনীলদা বলল, 'স্বাধীনতার পর যে লক্ষ লক্ষ মানুষ পাকিস্তান থেকে এ দেশে চলে এল তাদের জন্মভূমি ওপারেই পড়ে রইল। এ দেশে এসে তারা দেশপ্রেম দেখাতে পারে না নিশ্চয়ই। পশ্চিম বাংলা তাদের জন্মভূমি নয়, যে মানুষগুলো নিজের জন্মভূমিতে লড়াই করে না থেকে পালিয়ে এল বাঁচার তাগিদে তুমি কি তাদের অশ্রদ্ধা করবে?'

অনিমেষ বলল, 'কিন্তু ওরা তো সবাই বাংলা দেশের লোক। তাহলে এটাও ওদের জন্মভূমি।'

সুনীলদা বলল, 'ঠিক তাই। আমরা আরো বড় করে ভাবি। আমাদের জন্মভূমি গোটা পৃথিবীটা।' তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তুমি যে সব কথা বলছ তা স্বাধীনতার অনেক আগে বলা হত। বঙ্কিমচন্দ্রের সে যুগে প্রয়োজন ছিল হয়তো, এখন তিনি ব্যাকডেটেড হয়ে গেছেন। এখন এত সংকীর্ণ হলে চলে না। তখন ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই, এখন নিজেদের সঙ্গে নিজেদের সংগ্রাম।'

জলপাইগুড়ি শহরে বামপন্থী আন্দোলনের পুরোধা হিসাবে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি এবং পি এস পির মধ্যে বেশ একটা রেষারেষি আছে। সুনীলদা এই দুটো দলের সঙ্গেই পরিচিত তবে অনিমেষের মনে হয়, ও কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গেই বেশী যুক্ত। খোলাখুলি কথা বলে না কখনো। মাঝে মাঝে বেশ কদিনের জন্য উধাও হয়ে যায়। এবার ফিরে এসে বলল, 'তোমাদের চা-বাগানের নাম স্বর্গছেঁড়া?'

অনিমেষ বলল, 'হ্যাঁ।'

সুনীলদা হেসে বলল, 'ওখানেই ছিলাম এই কয়দিন।'

বেশ অবাক হল অনিমেষ। স্বর্গছেঁড়ায় ওর কেউ থাকে সেটা বলেনি তো কখনো।

'কার বাড়িতে ছিলে?'

'একজন শ্রমিক নেতার।'

আরো অবাক হয়ে গেল অনিমেষ, স্বর্গছেঁড়ায় কখনো কোন শ্রমিক নেতা ছিল না। ও জিজ্ঞাসা করল, 'ওঁর নাম কি?'

'জুলিয়েন। বেশ শিক্ষিত ছেলে। চা-বাগানের কর্তৃপক্ষ ওকে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বাবুদের চাকরি দেয়নি। সেই মুলকরাজ আনন্দের যুগ এখনও চলে আসছে দেখলাম।'

মুলকরাজ আনন্দের নাম এর আগে শোনেনি অনিমেষ। কিন্তু বকু সর্দারের ছেলে মাংরা যে এখন শ্রমিক নেতা কল্পনা করতে ওর কষ্ট হচ্ছে।

সুনীলদা বলল, 'যা হোক, শ্রমিকরা খুব উত্তপ্ত। আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে।

কিছু কিছু দাবিদাওয়া নিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। এদের ঠিক মত গাইড করলে চা-বাগানের চেহারা পাল্টে যাবে।'

অনিমেষ বলল, 'দাবিদাওয়া ?'

সুনীলদা বলল, 'কি আশ্চর্য, তুমি বাগানে ছিলে আর ছাখনি ? বাগানের কুলিদের মানুষের মর্যাদা দেওয়া হয় ? গরু ছাগলের মত বাড়িতে কাজ করানো হয় না ? কি বেতন পায় ওরা ? থাকার জায়গা খোঁয়াড়ের চেয়ে অধম !'

কথাগুলো শুনতে শুনতে অনিমেষ আজ এতদিন পরে চোখে দেখে সয়ে যাওয়া সত্যটার অর্থ আবিষ্কার করল। সুনীলদা যা বলেছে তা মিথ্যে নয়, অথচ এতদিন ওখানে থেকে ওর কাছে এটা একটুও অন্যায় বলে মনে হয়নি।

অনিমেষ বলল, 'আন্দোলন হবে ?'

'নিশ্চয়ই।' সুনীলদা বলল। তারপর একটু বিষণ্ণ গলায় জুড়ে দিল, 'কিন্তু আমাদের এই বামপন্থী পার্টিগুলো যে রকম শম্বুক গতিতে চলছে তাতে কোন কাজ হবে না। এ দেশে এভাবে কোনদিন বিপ্লব আসবে না। ভিক্ষে করে অধিকার পাওয়া যায় না।'

অনিমেষের এতদিন বাদে খুব ইচ্ছে করছিল স্বর্গছেঁড়ায় গিয়ে ব্যাপারটা দেখতে। খুব দ্রুত একটা পরিবর্তন নিশ্চয়ই হয়ে গেছে ওখানে। একটা মজার ব্যাপার মনে পড়ে গেছে এরকম ভঙ্গিতে সুনীলদা বলল, 'জানো, আসবার সময় দেখলাম কিছু কংগ্রেসী ধ্বনি দিচ্ছে, বন্দে মাতরম্ মাতরম্। ঠিক ইনকিলাব জিন্দাবাদের নকল করে। ওদের আর নিজস্ব বলে কিছু থাকল না।'

জলপাইগুড়ি শহরের শরীরটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধবার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। ওধারের চাঁদমারি থেকে এধারে রায়কতপাড়া ছাড়িয়ে তিস্তার গা ঘেঁষে দিনরাত কাজ চলছে। প্রত্যেক বছর নিয়মিত বন্যার হাত থেকে শহর বাঁচবে, দল বেঁধে মানুষেরা আসত বাঁধ গড়া দেখতে। প্রচুর বোল্ডার পড়ছে, বড় বড় কাঠের বিমকে বালির ভেতরে ঠুকে ঢুকিয়ে দেওয়ার কাজ চলছে সারাদিন। মানুষেরা একটু নিশ্চিন্ত, যদিও গত দশ বছরের মধ্যে একবারই শুধু বড়সড় বন্যা হয়েছিল তবু তিস্তাকে কেউ বিশ্বাস করে না।

বাঁধের কাজ শুরু হবার পর জলপাইগুড়ির ছেলেমেয়েদের একটা বেড়াবার জায়গা জুটে গেল। এমনিতে কোন পার্ক নেই বা শহরের মধ্যে যে খেলার মাঠগুলো সেখানে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা সাহস করে বসতে পারে না। কারণ এই শহরের মানুষ পরস্পরকে এত চেনে যে, শোভনতার বেড়া ডিঙানো অসম্ভব।

তবু রায়কতপাড়ার ছেলে সাহস করে বাবুপাড়ার মেয়ের সঙ্গে মাসকলাইবাড়ির রাস্তায় পাঁচ মিনিট হেঁটে আসে কখনো-সখনো। কিন্তু তাই নিয়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড শুরু হয়ে যায়। দেখা যায় মোটামুটি একটি সুন্দরী বালিকার প্রতি শহরের একাধিক কিশোর আকৃষ্ট। এবং তারা প্রয়োজনমত দুটো শিবিরে বিভক্ত। এই দুটো শিবির পরিচালনা করে থাকে শহরের দুই মাস্তান, রায়কতপাড়ার অনিল দত্ত আর পাণ্ডাপাড়ার সাধন। এরা অবশ্য কদাচিৎই মুখোমুখি হয়, কিন্তু যখন হয় তখন শহরের পুলিসবাহিনীর হৃৎকম্প শুরু হয়ে যায়। বিরাট দুটো বাহিনী হাতে হাণ্টার, গুপ্তি এবং লাঠি নিয়ে বীরদর্পে রাস্তা দিয়ে প্রায় মিছিল করে এগিয়ে যায়। আগ্নেয়াস্ত্র বা বোমার ব্যবহার হয় না। তবে এটা খুব আশ্চর্যের ব্যাপার এই, দুই মাস্তান এবং তাদের প্রথম সারির শিষ্যরা রাজনৈতিক সংস্পর্শ থেকে দূরে দূরে থাকে। তাদের এখন অবধি কোন রাজনৈতিক দলের হয়ে মারামারি করতে দেখা যায়নি। বাঁধ তৈরী হওয়ার পর থেকে এরা প্রায়ই তিস্তার পাড় ঘেঁষে টহল দিচ্ছে সন্ধ্যে নাগাদ। কারণ যেহেতু এই অঞ্চলটা শহরের বাইরে অপেক্ষাকৃত নির্জন জায়গায় এবং অজস্র কাঠ ও বোল্ডারে বোঝাই হয়ে থাকে, পরস্পরের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য প্রেমিক-প্রেমিকারা নদীর শীতল বাতাস পাথরের আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে রেখে উপভোগ করতে পছন্দ করছে।

কংগ্রেস অফিসে এই নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে। নাগরিকরা স্বচ্ছন্দে পছন্দমত জায়গায় ঘোরাফেরা করতে পারছে না—এটা চলতে দেওয়া যায় না। অবশ্য সাধন এবং অনিল কখনো ঘটনাস্থলে যায়নি। এরা কয়েকবার জেলে কাটিয়ে এসেছে এবং এখন বেশী ঝামেলা পছন্দও করছে না। থানার বড়বাবু তিস্তার পাড়ে সেপাই মোতায়েন করেছেন কিন্তু সন্ধ্যার পর সেই বিস্তীর্ণ এলাকায় তাদের খোঁজ পাওয়া মুশকিল। ফলে নিত্যনতুন হাঙ্গামা লেগেই আছে। শহর প্রতিদিন নতুন কেচ্ছার খবর পেয়ে জমজমাট হয়ে থাকে।

বাঁধ তৈরী আরম্ভ হওয়ায় সবচেয়ে অসুবিধে হচ্ছে সরিৎশেখরের। সেই কাকভোরে লাঠি দুলিয়ে তিস্তার নির্মল বাতাসে তিনি হনহন করে হেঁটে যেতে পারছেন না। প্রাতঃভ্রমণ বন্ধ হলে আয়ু সংক্ষিপ্ত হবে, এরকম একটা ধারণা থাকায় তিনি এলোপাতাড়ি শহরের পথে ঘুরে আসেন। ইদানীং অর্থচিন্তা বেড়েছে তাঁর। বাড়িভাড়া দিয়েছেন। দুই মাস হয়ে গেল অথচ পয়সা পাচ্ছেন না। সরকারের হাজার রকম নিয়মকানুনের জট ছাড়িয়ে তাঁর কাছে পয়সা আসতে দেরি হচ্ছে। হেমলতার নামে জমানো টাকা প্রায় শেষ। এদিকে মিউনিসিপ্যালিটি জলের প্রেসার কমিয়ে দেওয়ায় ওপরের ট্যাঙ্কে জল উঠছে না। ফলে হেমলতা

তো বটেই, ভাড়াটেরাও অনুযোগ করছে। জয়ার স্বামী তো সেদিন বলে দিলেন, 'একটা কিছু ব্যবস্থা করুন।' ব্যবস্থা করা যায়, টাকা দিলে জলের চাপ বাড়ানো যায়। কিন্তু দেবার মত টাকা তিনি পাবেন কোথায়। একটু একটু করে ধার করতে হচ্ছে তাঁকে। ধার নেবার জন্য তিনি একজনের কাছেই যান, তিনি সাধুচরণ। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন তাঁর নামে একটা ইনসিওর্ড টাকা এল। খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন সরিৎশেখর, কারণ মহীতোষের পাঠানো টাকা কদিন আগে পেয়ে গেছেন, এখন আবার টাকা পাঠাল কে? সরকার তো ইনসিওর করে ভাড়া পাঠাবে না। বন্ধ খামটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন, প্রেরকের ঠিকানায় আবার চোখ বোলালেন। হঠাৎ অনেক দিন আগের একটা মানুষ তাঁর মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। খুব দৃঢ় হাতে তিনি খামটা পিয়নকে দিলেন, 'না, এ টাকা আমি নিতে পারছি না। আপনি যে পাঠিয়েছে তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিন।' পিয়ন অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাঁর পাথরের মত মুখের দিকে তাকিয়ে ফিরে গেল। সরিৎশেখর চটিতে শব্দ করে ভেতরে এসে চিৎকার করে হেমলতাকে ডাকলেন, 'হেম, হেম। তোমার ছোট ভাই আমাকে ভিক্ষা দিতে চেয়েছিল, টাকা পাঠিয়েছে, পাঁচশো টাকা।'

হেমলতা অনিকে স্কুলের ভাত দিচ্ছিলেন, হন্তদন্ত হয়ে বারান্দায় এসে বললেন, 'কে টাকা পাঠিয়েছে, প্রিয়? আপনি নিলেন?'

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়লেন সরিৎশেখর, 'মাথা খারাপ! আমি কি ভিখিরি!'

হেমলতা বললেন, 'ঠিক করেছেন। 'বাবা, আপনার ছেলেরা কোনোদিন আপনাকে শান্তি দেবে না।' সরিৎশেখর আর দাঁড়াতে পারছিলেন না, বারান্দায় বেতের চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লেন। হঠাৎ তাঁর সব কিছু ফাঁকা বলে মনে হতে লাগল। শুধু আলোচাল খেয়ে হেমলতা অম্বল থেকে পেটের যাবতীয় রোগ পেয়েছে বলে তিনি জানতেন, কিন্তু এরকম মনের জোর পায় কি করে! হেমলতার এই মুখভঙ্গী দেখে তিনি ঠিক স্বস্তি পাচ্ছিলেন না।

বিকেলের দিকে আজকাল আর খেলার মাঠে যায় না অনিমেষরা। উঁচু ক্লাসে ওঠার পর থেকেই খেলাধুলা কমে এসেছিল। ইদানীং বিরাম করের বাড়িতেও যাওয়া কমে গেছে। রম্ভার সঙ্গে সেই ঘটনাটা ঘটে যাবার পর থেকে ওর ওখানে যেতে সঙ্কোচ হচ্ছিল। অবশ্য মুভিং ক্যাসেল কয়েকবার ধরে নিয়ে গিয়েছেন ওকে, আদর করে বসিয়েছেন, কিন্তু উর্বশীর দেখা পায়নি। মেনকাদি কলকাতায় চলে গিয়েছে। এখানকার কলেজে পড়াশুনা ভাল হচ্ছে না, হোস্টেলে থেকে

কলকাতার কলেজে ভর্তি হয়েছে মেনকাদি। মণ্টু বলে, নিশীথবাবু নাকি জব্বর ল্যাং খেয়েছেন। তবে ভেঙে পড়েননি কারণ এখনও উর্বশী রম্ভা রয়েছে। সেদিনের ঘটনার পর থেকে আশ্চর্যভাবে বদলে গেছে মণ্টু। আর একবারও ও মুভিং ক্যাসেলের বাড়িতে যায়নি এবং তপন রম্ভাকে নিয়ে দু-একবার ঠাট্টা করার চেষ্টা করলেও ও চুপচাপ থেকেছে। রম্ভার প্রতি মণ্টুর যেন আর আকর্ষণ নেই। বিকেলে সেনপাড়া ছাড়িয়ে বাঁধের বোল্ডারের ওপর বসে থাকে ওরা। ওদের ক্লাসে যে নতুন ছেলেটি টাকি থেকে এসেছে সে খুব মেধাবী এবং দাবা খেলায় হারে না সহজে। এসেই অরূপকে ডিঙিয়ে ফার্স্ট হয়েছে এবার। ছেলেটির নামটাও অদ্ভুত, অর্ক। অর্ককে দেখে অবাক হয়ে যায় অনিমেষ। ওদের সঙ্গে বিকেলবেলায় তিস্তার পাড়ে বসে যখন সে কথা বলে তখন অনর্গল মুখ খারাপ করে যায়। নিজেই বলে, 'খিস্তিতে কোন শালা আমার সঙ্গে পারবে না।' এমন কি মণ্টুকেও নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে অর্ক আসার পর থেকে। যে ছেলে প্রত্যেকটা সাবজেক্টে লেটার মার্ক পায় সে কি করে খিস্তি করে বলে, 'এটা একটা রেয়ার কলেকশন। আর কারও কাছে শুনবি না।' এই সময় অনিমেষ না শোনার ভান করে নির্লিপ্ত মুখে তিস্তার দিকে চেয়ে থাকে। অর্কর ইংরেজী খাতা দেখে হেডমাস্টারমশাই নাকি এত মুগ্ধ হয়েছেন যে নিজে গিয়ে ওর বাবার সঙ্গে আলাপ করে এসেছেন। ও যে এবার স্কুলফাইন্যালে স্ট্যাণ্ড করবে তা সবাই জানে। সেই অর্ক আজ বিকেলে এসে গম্ভীর ভঙ্গীতে বলল, 'বল তো আমরা জন্মেছি কেন?'

উত্তরটা দেবে কিনা অনিমেষ বুঝতে পারছিল না। মণ্টু বলল, 'শহীদ হতে।'

তপন বলল, 'হাফসোল খেতে।'

খুব বিরক্ত হয়েছে এমন ভঙ্গীতে অর্ক বলল, 'তোদের সঙ্গে সিরিয়স আলোচনা করে সুখ পাওয়া যায় না। উত্তরবঙ্গের মানুষগুলোর মাথা মোটা হয়। তোর একবার মনেও হয় না কেন জন্মেছি জানতে?'

প্রশ্নটা ওর দিকে তাকিয়ে, তাই অনিমেষ বলল, 'আমি উত্তরটা জানি এবং তা খুব সোজা। আগের জন্মের কর্মফল অনুযায়ী আমরা জন্মগ্রহণ করি।'

অর্ক বলল, 'বুকিশ! জন্মগ্রহণ করি! যেন তুই চাইলেই জন্মাতে পারবি! জন্মগ্রহণ পাণিগ্রহণ করার মত ব্যাপার, না? কোন প্রাক্টিক্যাল নলেজ নেই!'

মণ্টু বলল, 'কি রকম?'

পকেট থেকে একটা গোটা সিগারেট বের করে অর্ক ধরাল। আগে ও দেশলাই রাখত না, আজ এনেছে। অর্ক আসার পর মণ্টুদের এই নতুন অভ্যাসটা

হয়েছে। একটা সিগারেট ঘুরে ঘুরে দু-এক টান দিয়ে শেষ করে। শহরের বাইরে এরকম নির্জন জায়গায় ধরা পড়ার কোন ভয় নেই। চাপে পড়ে অনিমেষ একদিন একটা টান দিয়েছিল, দম বন্ধ হবার যোগাড়। বিশ্রী টেস্ট, কেন যে লোকে সিগারেট খায় কে জানে।

গলগল করে দুই নাক দিয়ে ধোঁয়া বের করে অর্ক বলল, 'জন্মাবার পেছনে আমাদের কোন কৃতিত্ব নেই।'

অনিমেষ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। মণ্টু বলল, 'উঠলি যে!'

অনিমেষ বলল, 'এই সব কথা শুনতে আমার ঘেন্না করে।'

বেশ রাগের মাথায় ও দপদপিয়ে এগিয়ে গেল সামনে। অর্ক চেঁচিয়ে বলল, 'সত্য খুব ন্যাংটো রে! তা সিগারেটে টান দিবি না, শেষ হয়ে গেল যে!'

অনিমেষ কোন কথা বলল না। সত্যি, ওদের আড্ডাটা ইদানীং খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে। চার-পাঁচজন এক হলেই মেয়েদের শরীর নিয়ে বিশ্রী আলোচনাটা আসবেই। তার চেয়ে কংগ্রেস অফিসে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকলেও এত খারাপ লাগে না। জয়াদি মামার বাড়ি গিয়েছেন প্রায় দিন দশেক, বিকেলে বই পড়া বন্ধ। সুনীলদাও কোনদিন মুখ খারাপ করেনি। ওর সঙ্গে থাকতে খুব ভাল লাগে অনিমেষের। চা-বাগান অঞ্চলে কি-সব সংগঠনের কাজে সুনীলদা ডুব দিয়েছে। সুনীলদার সঙ্গে ওর যেসব কথাবার্তা হয়েছে তা একদিন কংগ্রেস অফিসে বসে নিশীথবাবুকে বলেছিল ও। নিশীথবাবু নির্দেশ দিয়েছেন, সুনীলের সঙ্গে একদম মেলামেশা নয়। কথাটা একদম সমর্থন করতে পারছে না অমিমেষ। অবশ্য সুনীলদা তো সেই গেছে, এখনও ফেরেনি। চিন্তাটা ঘুরেফিরে অর্কের দিকে চলে এল। অর্কটা নিজে ফার্স্ট হবে, রাত জেগে পড়বে, টিচারদের কাছে মেধাবী বলে নাম কিনবে আর ওদের যত খারাপ খারাপ কথা শোনাবে। অরূপ তো এরকম নয়, খুব ঠাণ্ডা, নিরীহ টাইপের ভাল ছেলে সে। অর্ক আসার পর অরূপ বেচারা খুব মুষড়ে পড়েছে। এই সব ভাবতে ভাবতে কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিল অনিমেষ, এমন সময় চিৎকারটা শুনতে পেল। তিন-চারজন খুব হইচই করছে, সেই সঙ্গে একটি মেয়ে জোরে জোরে কাঁদছে। অনিমেষ একবার পেছনে তাকিয়ে দূরে বসে থাকা বন্ধুদের দেখল। ওরা নির্ঘাত শুনতে পায়নি। পলকে অর্কের ওপর সদ্য গজানো অভিমানটা ভুলে গেল। চিৎকার করে বলল, 'মণ্টু, শিগগীর আয়, কেস আছে।' বলে দৌড়াতে লাগল সামনে। তিস্তার বাঁধে মেয়ে সংক্রান্ত ঘটনা ঘটলে মণ্টু কেস বলে তাকে চিহ্নিত করে।

বিরাট একটা পাথরের স্তূপের আড়াল থেকে চিৎকারটা আসছিল। একটা

গলা খুব ধমকাচ্ছে আর মেয়েটি 'না না, পায়ে পড়ি আপনার' বলে মিনতি করছে। অনিমেষ নিঃশব্দে পাথরগুলোর আড়াল রেখে কাছে যেতেই কি করবে বুঝতে পারল না চট করে। চারটে ওদের বয়সী ছেলে এই সন্ধ্যে হয়ে আসা অন্ধকারে গুণ্ডার মত মুখ করে হাসছিল। ওদের সামনে যে ছেলেটি শুধুমাত্র জাঙ্গিয়া পরে দাঁড়িয়ে আছে তাকে অনেক কষ্টে চিনতে পারল ও। তার জামা প্যান্ট মাটিতে পড়ে রয়েছে। চারজনের যে নেতা সে বলছিল, 'ওটুকু আবার কার জন্য রাখলে চাঁদ, খুলে ফেল। তোমাকে মারব না, কিছু বলব না। তিস্তার পাড়ে লুকিয়ে প্রেম করতে এসেছ যখন তখন তুমি তো হীরো, একদম ন্যাংটো হয়ে বাড়ি চলে যাও। খোল।' শেষ কথাটা ধমকের মত শোনাল।

ছেলেটি, যাকে একদিন মণ্টু মেরেছিল, কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'প্লিজ, আমি এটা পরেই যাই, আর কোনদিন করব না, আপনারা যা চান তাই দেব।'

অনিমেষ রম্ভার মত মুখটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। ওদের দিকে পেছন ফিরে রম্ভা দু হাতে চোখ ঢেকে অনিমেষ যেদিকে দাঁড়িয়ে সেদিকে ফিরে রয়েছে। ওর শরীরটা ফোঁপানির তালে কাঁপছে। এই সময় চারজনের একজন রম্ভার দিকে এগিয়ে গেল, 'তোমার নাম কি ?

রম্ভা কোন জবাব দিল না। তেমনি ফোঁপাতে লাগল।

'বাড়ি কোথায় ?' তাও জবাব নেই। ছেলেটি বোধ হয় একটু রেগে গেল, 'আবার ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ হচ্ছে। শালা লুকিয়ে এখানে এসে হামু খাবার বেলায় মনে ছিল না। আমরা যে সামনে এসেছি তা খেয়াল হচ্ছিল না। যাক, জামাটামা খুলে ন্যাংটো হয়ে বাড়ি যাও খুকী।'

রম্ভা সজোরে ঘাড় নাড়ল। ওদের মধ্যে একজন ছেলেটির চিবুক নেড়ে দিয়ে বলল, 'জম্পেশ মাল পটিয়েছ বাবা। একা খাওয়া কি ভাল !'

প্রথম ছেলেটি এবার চট করে রম্ভার পিঠের জামার ওপরটা খপ করে ধরে বলল, 'অ্যাই খোল, নইলে বাপের নাম ভুলিয়ে দেব।'

সঙ্গে সঙ্গে অনিমেষের মাথা গরম হয়ে গেল। একছুটে সে দলটার মধ্যে গিয়ে পড়ল এবং কেউ কিছু বোঝার আগেই ছেলেটার হাত মুচড়ে ধরল, 'কি আরম্ভ করেছ তোমরা, এটা কি গুণ্ডামির জায়গা ?'

ব্যাপারটা এত দ্রুত হয়ে গিয়েছিল যে ছেলেটি ভীষণ ঘাবড়ে গেল। রম্ভা ঘুরে অনিমেষকে দেখতে পেয়ে কি করবে বুঝতে না পেরে শেষ পর্যন্ত দৌড়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল, 'অনিমেষ, ছাখো ওরা আমার ওপর অত্যাচার করছে। আমি এমনি কথা বলতে এসেছিলাম—আর আমাকে অপমান করছে।'

বোধ হয় রম্ভার গলার স্বরেই বাকী তিনজনের সম্বিৎ ফিরে এসেছিল। ওরা এক লাফে সামনে এসে প্রথম ছেলেটিকে ছাড়িয়ে নিল। রম্ভার হাতের বাঁধন শরীরে থাকায় অনিমেষ নড়তে পারছে না। প্রথম ছেলেটি এবার ক্ষেপে গিয়ে বলল, 'এ শালা আবার কে ? তুজনের সঙ্গে এসেছিল নাকি ?'

হঠাৎ অনিমেষ দেখল একটা ঘুষি ওর মুখ লক্ষ্য করে দ্রুত এগিয়ে আসছে। কিছু বোঝার আগেই ও মাথা নিচু করে রম্ভাকে নিয়ে বসে পড়ল। তাল সামলাতে না পেরে রম্ভা পড়ে যেতে ওর হাত অনিমেষের শরীর থেকে খুলে গেল। অনিমেষ নিজেকে বাঁচাতে প্রাণপণে ছেলেটার উদ্দেশে একটা লাথি ঝাড়ল ওই অবস্থায়। ককিয়ে ওঠা একটা শব্দ কানে যেতেই অনিমেষ দেখল ওর চারপাশে পাগুলো ঘিরে ফেলেছে। কোন রকমে মাটি থেকে লাথি খাওয়া ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এবার বুঝবে আমার গায়ে হাত তুললে কেমন লাগে। শালাকে শেষ করে ফেলব।' অনিমেষ মাটিতে হাঁটু মুড়ে বসেছিল। রম্ভা খানিক পেছনে উঠে দাঁড়িয়েছে। অনিমেষ বুঝতে পারছিল, ও যদি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে তাহলে সব দিক দিয়ে আক্রমণ শুরু হবে। ও স্থির করল যদি মরতে হয় একজনকে মেরে মরবে।

ঠিক এই সময় মণ্টুর গলা শুনতে পেল অনিমেষ, 'কি হচ্ছে কি ?'

সঙ্গে সঙ্গে চারটে ছেলেই ঘুরে দাঁড়াল। অনিমেষ ওদের পায়ের ফাঁক দিয়ে দেখল মণ্টু অর্ক আর তপন পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এতক্ষণ বুকের মধ্যে যে টিপটিপানিটা শব্দ তুলছিল সেটা চট করে থেমে গেল। এখন ওরা সমান সমান, ও আর একা নয়। এই সময় এক নম্বর ছেলেটি বলে উঠল, 'আরে মণ্টু, তুই এখানে ?'

মণ্টু বলল, 'তোরা কি করছিস ?' ওর গলার স্বর খুব গম্ভীর।

ছেলেটি বলল, 'আরে শালা এখানে লায়লামজনুর জোর পেয়ার চলছিল। কি হাম খাওয়ার শব্দ। আমরা কেসটা হাতে নিতেই এই মাল ছুটে এল। আবার আমার গায়ে লাথি মারে, বোঝ। জানে না তো আমি কার শিষ্য।'

মণ্টু এগিয়ে এল, 'সেমসাইড হয়ে যাচ্ছে। ও আমার বন্ধু। চিৎকার শুনে ছুটে এসেছে।'

ছেলেটা যেন ভীষণ হতাশ হল, বলল, 'যাঃ শালা !' তারপর অনিমেষের হাত ধরে তুলে বলল, 'খুব বেঁচে গেলে ভাই। কিন্তু ফিউচারে এরকম করলে ছাড়বো না।'

এতক্ষণে মণ্টু রম্ভাকে ভাল করে লক্ষ্য করেছে, জাঙ্গিয়া পরা ছেলেটাকে ও

আগেই দেখেছিল। ও অনিমেষের কাছে এসে দাঁড়াল, 'খুব সাহস তো!'

রম্ভা কাঁদো কাঁদো গলায় বলে উঠল এই সময়, 'আমি কিছু জানি না।'

এক নম্বর চাপা গলায় বলল, 'বহুৎ হারামী মেয়েছেলে মাইরি। একদম বিশ্বাস করবি না। ওর কীর্তি আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

মণ্টু অনিমেষকে বলল, 'কি করা যায় রে?'

অনিমেষ কিছু বলার আগেই অর্ক বলল, 'ছেড়ে দে, বালিকা জানে না ও মরে গেছে।'

হঠাৎ মণ্টু ঘুরে দাঁড়িয়ে ছেলেটাকে খুব জোরে চড় মারল। বেচারা এমনিই দাঁড়িয়ে কাঁপছিল, চড় খেয়ে পাথরের ওপর উল্টে পড়ল। মণ্টু এগিয়ে গিয়ে ওকে আবার তুলে ধরল, 'এই তোকে বলেছিলাম না যে এ পাড়ায় আসবি না। আবার সাইকেলে কেষ্টর বাঁশি বাজিয়েছ!'

কোন রকমে ছেলেটো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি আসতে চাইনি, ও জোর করে এনেছে।'

চাপা গলায় মণ্টু বলল, 'কি করে দেখা হল?'

ছেলেটা গড়গড় করে বলে গেল, 'আমার বোন ওর সঙ্গে পড়ে। বোনের হাত দিয়ে চিঠি পাঠিয়ে দেখা করতে বলেছিল।'

একটু চিন্তা করল মণ্টু, 'ঠিক আছে। তুই ওকে বিয়ে করবি?'

একটুও দ্বিধা করল না ছেলেটা, 'না।'

'কেন? প্রেম করছ আর বিয়ের বেলা না কেন?' ধমক দিল মণ্টু।

'ও মিথ্যেবাদী। নিজেই সব কাজ করে এখন ভান করছে।'

অর্ক বলল, 'মেয়েছেলে মানেই তাই। এই সত্যটা চিরকাল মনে রেখো চাঁদ। এখন কেটে পড়। রেডি, ওয়ান টু থ্রি—।' অর্কর শেষ হতেই ছেলেটা তীরের মত দৌড়াতে লাগল সেনপাড়ার দিকে।

এক নম্বর ছেলেটি সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'যা চলে, পাখি উড়ে গেল। কিছু আমদানি হত।' তারপর ঝুঁকে মাটি থেকে ছেলেটার শার্ট প্যান্ট তুলে তার পকেট থেকে একটা মানিব্যাগ বের করল। অনিমেষ দেখল তার মধ্যে বেশ কিছু টাকা আছে। অন্ধকারে ছেলেটার ছুটন্ত জাঙ্গিয়া পরা শরীরটা আর দেখা যাচ্ছে না। এই সময় তিস্তার ওপাড়টায় চমৎকার একটা চাঁদ উঠে পা ঝুলিয়ে বসে ওদের দিকে চেয়ে রইল। এক নম্বর ছেলেটি টাকাগুলোর পর একটা কাগজ বের করে সামনে ধরে বলল, 'আরে, এ যে লাভ-লেটার। আমার প্রাণ-পাপিয়া, আজ বিকেলে বাঁধের পেছনে জেলা স্কুলের শেষে আমায় দেখতে পাবে। তোমাকে

বুকভরে আদর না করতে পারলে আমার শান্তি নেই।'

চাঁদের আলোয় চিঠিটা পড়ে ফেলল সে।

পড়া শেষ হতেই মণ্টু হাত বাড়িয়ে খপ করে চিঠিটা কেড়ে নিল, 'এটা আমাকে দে।'

এক নম্বর তাতে একটুও অখুশী হল না। টাকাগুলো পকেটে পুরে ছেলেটার ফেলে যাওয়া জামা প্যান্ট আর মানিব্যাগ টান মেরে তিস্তার জলে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেসটা তোদের দিয়ে দিলাম। চলি।' ওর সঙ্গীদের নিয়ে সেনপাড়ার দিকে চলে গেল সে।

এবার মণ্টু অনিমেষকে বলল, 'চল, আমরা বিরাম করের সঙ্গে দেখা করি।'

সঙ্গে সঙ্গে রম্ভা চেঁচিয়ে উঠল, 'না।'

মণ্টু বলল, 'কেন? বিখ্যাত কংগ্রেসী নেতার কন্যা তিস্তার ধারে প্রেম করছে —এটা তাঁকে জানাতে হবে না?'

রম্ভা বলল, 'আমি অন্যায় করলে আমিই শাস্তি পাব। বাবা তার জন্য দায়ী নয়।'

অর্ক বলল, 'বয়স কত খুকী? তেরো না চোদ্দ?'

রম্ভা বলল, 'আপনার তাতে কি?'

অর্ক হাসল, 'আমরা জন্মেছি বাপ-মায়ের প্লেজার থেকে। অতএব বাপ-মাকে না জানিয়ে কিছু করা কি ভাল?'

হঠাৎ রম্ভা মরীয়া হয়ে গেল, 'আমার চিঠি ফেরত দিন।'

মণ্টু বলল, 'ফেরত পাবার জন্য লিখেছ?'

রম্ভা বলল, 'যাকে লিখেছি তাকে লিখেছি। আপনাকে লিখতে যাইনি।'

মণ্টু বলল, 'তা লিখবে কেন? আমি তো তোমার বাবাকে তেল দিয়ে কংগ্রেসী হয়নি। আর আমার বাপের জমিদারীও নেই।'

রম্ভা বলল, 'নিশ্চয়ই। আপনি তো একটা গুণ্ডা। রোজ দুবেলা ড্যাবড্যাব করে রাস্তা দিয়ে যেতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন, আমি দেখিনি? এই চিঠি যদি আপনাকে লিখতাম তা হলে আপনার জীবন ধন্য হয়ে যেত।'

মণ্টু চেঁচিয়ে বলল, 'মুখ সামলে কথা বল, এক চড়ে দাঁত ফেলে দেব, বদমাস মেয়েছেলে। বাপ কংগ্রেসের নাম করে ঘুষ খাচ্ছে, মা দিনরাত ছেলে ধরছে আর মেয়ে তিস্তার পাড়ে প্রেম করতে গিয়ে ধরা পড়ে চোখ রাঙাচ্ছে। আমি ছিলাম বলে বেঁচে গেলি, বুঝলি! নইলে ওরা তোকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেত। আমি গুণ্ডা, না?' থুঃ থুঃ করে একরাশ থুতু মাটিতে ফেলে ও অনিমেষকে বলল, 'অনিমেষ,

এটাকে বাড়ি পৌঁছে দে, নইলে তোর মুভিং ক্যাসেল কান্নাকাটি করবে।' কথাটা শেষ করে ও দাঁড়াল না। অনিমেষ দেখল অর্ক আর তপন ওর সঙ্গে ফিরে যাচ্ছে। কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, 'সচিত্র প্রেমপত্র আমিও পড়েছি।' বলে মুঠো পাকানো রম্ভার চিঠিটা ওদের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাঁটতে লাগল। অনিমেষ দেখল কাগজটা শূন্যে ভাসতে ভাসতে তিস্তার জলে গিয়ে পড়ল। জ্যোৎস্না সমস্ত শরীরে মেখে জলেরা দ্রুত ওটাকে টেনে নিয়ে গেল মণ্ডলঘাটের দিকে।

হঠাৎই যেন সমস্ত চরাচর শব্দহীন হয়ে গেল। মণ্টুদের শরীরগুলো দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে, তিস্তার চর থেকে উৎখাত হওয়া শেয়ালগুলো আজ আর ডাকাডাকি করছে না। শরতে পা দেওয়া আকাশটা নবীন জ্যোৎস্নায় সুখী কিশোরীর মত আদুরে হয়ে আছে। এমন কি তিস্তার ঢেউগুলো অবধি নতুন বউ-এর লজ্জা রপ্ত করেছে। অনিমেষ রম্ভার দিকে তাকাল। তিস্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে সে দাঁড়িয়ে, তার দীর্ঘ কেশ নিতম্ব ছাড়িয়ে নেমে এক মায়াময় ছবি হয়ে রয়েছে। রম্ভা এখনও মহিলা হয়নি, কিন্তু ঈশ্বর ওকে অনেক কিছুই অগ্রিম দান করে বসে আছেন। এই রম্ভা ওকে চুম্বন করেছিল। তিক্ত সেই স্বাদটা অনিমেষ এখনও বেশ অনুভব করতে পারে। আজকের এই ছেলেটিকে রম্ভা কি সেই স্বাদ দিয়েছে? একাধিক ছেলের সঙ্গে এই রকম সম্পর্ক যে করে সে কখনই সৎ নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে পড়ল রম্ভা তার কাছে এগিয়ে এলেও সে সায় দেয়নি। বেচারা ভালবাসা পেতে নিশ্চয় এই ছেলেটির শরণাপন্ন হয়েছে। এতে ঠিক ওকে দোষী করা যাচ্ছে না। কিন্তু ছেলেটি তো ওদের বাড়িতে যেতে পারত। বিশেষ করে যে তিস্তা বাঁধের এত দুর্নাম সেখানে আসার ঝুঁকি ওরা কেন নিল? রম্ভার বয়সের মেয়েরা কখনই এত সাহসী হয় না। অন্তত সীতা বা উর্বশীকে ও এই শ্রেণীতে ফেলতে পারবে না কিছুতেই। হয়তো কোন কোন মেয়ে এমন অকালে যৌবন পেয়ে যায় যে কাউকে ভালবাসতে না পারলে সব কিছু বৃথা হয়ে যায় তাদের কাছে। কিন্তু মণ্টুর বেলায়? ওর মনে হল মণ্টু আজ বেশ এক হাত নিয়ে গেল রম্ভাকে। রম্ভার জন্য মণ্টু ছটফট করত, একবার দেখবার জন্য চারবার সামনের রাস্তা দিয়ে আসা-যাওয়া করত। কিন্তু সেই যে ওর সঙ্গে মুভিং ক্যাসেলের বাড়িতে গিয়ে চা খেল, ব্যাস, তারপর থেকেই ও যেন রম্ভাকে আর চেনে না। আর আজ এই অবস্থায় পেয়ে রম্ভাকে নিয়ে ও যা ইচ্ছে করতে পারত। বিশেষ করে মাস্তানগুলো ওর পরিচিত এবং রম্ভার চিঠিটা হাতে পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেসব কিছুই না করে ও থুতু ফেলে চলে গেল। অনিমেষ এরকম আচরণের

কারণটা ঠিক ধরতে পারছিল না। আবার মন্টুর ওপর সব নির্ভর করছে জেনেও রম্ভা কিন্তু ওর কাছে মাথা নোয়ায়নি। সমানে তর্ক করে গিয়েছে। এমন কি এরকম জায়গায় দাঁড়িয়ে মন্টুর মুখের ওপর ওকে গুণ্ডা বলে গালাগালি দিয়েছে। কেন? রম্ভা যদি পুরুষ-ঘেঁষা হত তাহলে নিশ্চয়ই এরকম করত না এবং বিশেষ করে ওর লেখা চিঠিটা যখন মন্টুর মুঠোয় তখনও ধরা ছিল। ভাবতে ভাবতে কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল অনিমেষের। কি করে যে সব কি রকম হয়ে যায়। ও মুখ তুলে দেখল রম্ভা পায়ে পায়ে তিস্তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এখানটায় পাথর রয়েছে ছড়ানো। কাঠের বিমগুলো নদীর গায়ে এখনও পোঁতা হয়নি। ফলে জলে নামা অসুবিধের নয়। পাথরের গা বাঁচিয়ে স্বচ্ছন্দে যাওয়া যায়। অনিমেষ দ্রুত গিয়ে রম্ভার পাশে দাঁড়াল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

রম্ভা মুখ ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল। পাথরের মত মুখ, কোন অভিব্যক্তি নেই, শুধু দু চোখ উপচে মোটা জলের রেখা গালের ওপর দিয়ে নিচে নেমে গেছে। অনিমেষ চোখ সরিয়ে নিল। কেউ কাঁদলে ও সহ্য করতে পারে না। কারো জল-টলমল চোখের দিকে তাকালেই মায়ের মুখটা চট করে মনে এসে যায়। অনিমেষ আবার বলল, 'বাড়ি চল, রাত হচ্ছে।'

রম্ভা কি রকম উদাস গলায় বলল, 'আমি খারাপ, না?'

অনিমেষ মাথা নাড়ল, 'জানি না। তবে তোমার এখানে আসা উচিত হয়নি।'

রম্ভা বলল, 'কি করব। ওদের বাড়ি খুব কড়া। আর আমাদের বাড়িতে দিদির জন্য আজকাল কারো সঙ্গে ভাল করে কথা বলা যায় না। কিন্তু এখানে এসে কি লাভ হল।'

অনিমেষ বলল, 'লাভ তো দূরের কথা, তোমার বাবার সম্মান নষ্ট হয়ে যেত একটু হলে।'

রম্ভা মুখ তুলে চাঁদের দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে অনিমেষের মনে হল ওর গালের ওপর কয়েকটা মুক্তো যেন টলটল করছে। রম্ভা বলল- সে যা হোক হোত, কিন্তু ও সবার সামনে আমাকে অপমান করে গেল, আমাকে বিয়ে করতে পারবে না। তার মানে সমস্ত সম্পর্ক এখানেই শেষ। অথচ প্রথমে এখানে এসে বসতেই ও-ই হাঘরের মত করছিল। কত আবদার।' হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল রম্ভা, ওর চোখ-মুখ পলকেই হিংস্র হয়ে উঠল। অনিমেষ কিছু বোঝার আগেই ওর জামা দু হাতের মুঠোয় ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে চিৎকার করে উঠল, 'তোমরা, তোমরা ছেলেরা সবাই সমান। স্বার্থপর, বিশ্বাসঘাতক। চুরি করে মধু খেতে চাও,

স্বীকার করার সাহস নেই।' বলতে বলতে হু-হু করে কেঁদে ফেলল ও। কান্নার দমকে ওর মুখ বিকৃত হয়ে যাচ্ছে, সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপছে। অনিমেষ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ওকে দেখছিল। ওর বলতে ইচ্ছে করছিল, আমি তো তোমার কোন ক্ষতি করিনি; তোমার কাছে চুরি করে কিছু নিতে চাইনি। কিন্তু ও কিছু না বলে রম্ভাকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করল।

অনিমেষ বলল, 'অনেক রাত হয়েছে। আমাকে বাড়ি যেতে হবে। চল।'

আর এই সময় সেই উৎখাত হওয়া শেয়ালগুলো তারস্বরে ডেকে উঠল। বাঁধের আশপাশ থেকেই ডাকগুলো আসছিল। সেই কর্কশ শব্দে ভীষণ রকম চমকে গিয়ে রম্ভা অনিমেষের হাত ধরল।

ধীর পায়ে ওরা হাকিমপাড়ার দিকে হেঁটে আসছিল। এখন এ অঞ্চলটায় লোকজন নেই। শুধু কোন বিরহী রাজবংশী বাঁধের জন্য ফেলে রাখা পাথরের ওপর বসে বাঁশিতে একলা কেঁদে যাচ্ছে। জ্যোৎস্নায় চারধার বড় কোমল, মোলায়েম লাগছে। খুব নীচু গলায় রম্ভা বলল, 'তুমি আমাদের বাড়িতে বলে দেবে না তো?'

অনিমেষ হাসল, 'মাথা খারাপ, এসব কথা কেউ কাউকে বলে?'

রম্ভা বলল, 'তোমার বন্ধুরা তো সবাই বলবে।'

অনিমেষ এটা অস্বীকার করতে পারল না। কাল বিকেলের মধ্যে সমস্ত শহর নিশ্চয়ই ঘটনাটা জেনে যাবে। ওর রম্ভার জন্য কষ্ট হচ্ছিল।

হঠাৎ রম্ভা বলল, 'একটা উপকার করবে?'

'কি?' অনিমেষ জানতে চাইল।

'তুমি আমার সঙ্গে বাড়িতে গিয়ে বল যে আমরা এখানে বেড়াতে এসেছিলাম, এমন সময় কয়েকজন ছেলে আমাদের অপমান করেছে।' রম্ভা সাগ্রহে ওর হাত ধরল।

'সে কি! কেন?' অনিমেষের সমস্ত শরীর চট করে অবশ হয়ে গেল।

'তাহলে পরে যার কাছ থেকেই বাবা-মা শুনুক বিশ্বাস করবে না। তোমাকে মা খুব ভালবাসে। প্লিজ, এই উপকারটা করো।'

'কিন্তু তা তো সত্যি নয়। আর খামকা তোমার সঙ্গে আমি বেড়াতে যাব কেন?'

অনিমেষ ওর হাতটা ছাড়াতে চেষ্টা করল। কিন্তু রম্ভা যেন একটা অবলম্বন পেয়ে গেছে, 'দিদি সেদিন তোমার আমার ব্যাপারটা দেখে ভেবেছে যে আমরা লাভার। এ কথা ও দিদিভাইকে বলেছে। তাই আমরা বেড়াতে গিয়েছি শুনলে

ওরা সহজেই বিশ্বাস করবে।'

অনিমেষ বলল, 'রম্ভা, আমি মিথ্যে কথা বলতে পারব না।'

রম্ভা বলল, 'কেন? আমার জন্য বল। তুমি যা চাও সব পাবে।'

অনিমেষ মাথা নাড়ল, 'না, সত্যি হলে আমি যেতাম তোমাদের বাড়ি।'

রম্ভা বলল, 'বেশ, সত্যি করে নাও।'

অনিমেষ বলল, 'তা হয় না।'

সঙ্গে সঙ্গে রম্ভা ক্ষেপে উঠল, 'ও, তুমি খুব সত্যবাদী যুধিষ্ঠির, না?'

অনিমেষ কোন জবাব দিল না। কথা বলতে বলতে ওরা জেলা স্কুলের পাশে এসে পড়েছিল। নিজের বাড়ির দিকে তাকিয়ে রম্ভা আচমকা দৌড়াতে আরম্ভ করল। অনিমেষ প্রথমটা বুঝতে পারেনি, ওর ভয় হল রম্ভা বুঝি কিছু একটা করে ফেলবে। নিজের অজান্তেই সে রম্ভার পেছন পেছন ছুটতে লাগলো। খানিকটা যেতে যেতে হঠাৎ ওর মাথায় একটা ছবি হুড়মুড় করে জুড়ে এসে বসল। এলো চুল বাতাসে উড়িয়ে দুর্গা ছুটছে, পেছনে অপু।

চট করে থেমে গেল অনিমেষ। রম্ভার ছুটন্ত শরীরটা ওদের বাড়ির গেটের কাছে চলে গেছে। গেট খুলে রম্ভা ভেতরে চলে গেল।

রাত হয়ে গেছে। সন্ধ্যের মধ্যে বাড়িতে না ঢুকলে দাদু রাগ করেন। আজকে যে কি সব ব্যাপার হয়ে গেল। দ্রুত পা চালাল অনিমেষ। কিছুদূর যেতেই ওর মনে হল কেউ যেন ওর পেছনে আসছে। চট করে ঘাড় ফিরিয়ে ও হাঁ হয়ে গেল। প্রথমে ওর মনে হল বোধ হয় ভূত দেখছে সে। তারপর ছেলেটা কথা বলল, 'আমাকে একটা কাপড় বা যাহোক কিছু দাও, আমি এভাবে শহরের মধ্যে ঢুকতে পারছি না।' কেঁদে ফেলল সে। এই জ্যোৎস্নায় জাঙ্গিয়া পরা শরীরটার দিকে তাকিয়ে অনিমেষের ক্রমশ কষ্ট হতে লাগল। বেচারা বোধ হয় এতক্ষণ ওদের কাছাকাছি ছিল, সাহস করেনি কাছে আসতে। এভাবে শহরের মধ্যে দিয়ে হাঁটা যায় না।

অনিমেষ কোন কথা না বলে ইঙ্গিতে ছেলেটাকে ওর সঙ্গে আসতে বলল। ও হেঁটে যাচ্ছে আর ওর হাত ছয়েক দূরে একটি জাঙ্গিয়া পরা শরীর লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়ে হাঁটছে। দৃশ্যটা আর একবার দেখেই অনিমেষ আর পারল না। ওকে সেখানেই দাঁড়াতে বলে একটা কিছু এনে দিতে ও জীবনের সবচেয়ে দ্রুত দৌড়টা দৌড়াল। বাড়ির কাছাকাছি হতে অনেক মানুষের কথাবার্তা ও কান্নার শব্দ শুনতে পেল সে।

বাগানের গেট খুলে ভেতরে ঢুকে প্রথমে একটু থমকে দাঁড়াল অনিমেষ। কিছু

গুঞ্জন এবং একটি পুরুষকণ্ঠের কান্না ভেসে আসছে। ও খুব ত্রস্ত হয়ে চারপাশে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। কাঁদছে কে? না তো, কল্পনাতেও অনিমেষ সরিৎশেখর এই রকম গলায় কাঁদছেন ভাবতে পারে না। রান্নাঘরের ভেতর থেকে আলো আসছে। অনিমেষ শব্দ না করে বারান্দায় উঠে এল। ওকে দেখে পিসীমার শেয়ালটা যেন বিরক্ত হয়েই নেমে দাঁড়াল সিঁড়ি থেকে। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় বাগানের গাছপালাগুলো স্নান করে উঠে এইবার ফুরফুরে হাওয়ায় গা মুছে নিচ্ছে। অনিমেষ দেখল রান্নাঘরে কেউ নেই। এমন কি দরজাটা অবধি বাইরে থেকে টেনে দেওয়া, চোর এলে সব ফাঁক হয়ে যাবে। পিসীমা তো এত অসতর্ক হয়ে বাইরে যান না! দাদুর ঘরের দিকে যাবার সময় ওর মাথায় উঠোনের তারে ঝুলে থাকা একটা ময়লা গামছা ঠেকল। দাদুর ঘামমোছা এই গামছাটা এখনো শুকোচ্ছে—এই বাড়িতে এ রকম আগে হয়নি। নিশ্চয়ই গোল-মালটা খুব গুরুতর ধরনের। দেরি করে বাড়িতে আসার জন্য যে সঙ্কোচ এবং কিছুটা ভয় ওর মধ্যে ছিল, ক্রমশ সেটা কমে যাচ্ছিল।

গুঞ্জনটা হচ্ছে বাইরে, ভাড়াটেদের দিকে। কান্নাটা এখন একটু কমেছে, মাঝে মাঝে গোঙানির শব্দ হচ্ছে। অনিমেষ দ্রুত সেদিকে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। তারপর ফিরে এসে তারে ঝোলানো ভিজে গামছাটা একটানে নামিয়ে নিয়ে বাগান পেরিয়ে গেটের কাছে এসে দাঁড়াল। সুপুরি গাছের ছায়া থেকে চট করে ছেলেটা সামনে বেরিয়ে এল, 'কি হয়েছে?'

অনিমেষ মাথা নেড়ে বলল, 'জানি না। এটা ছাড়া কিছু পেলাম না।'

ছেলেটা বলল, 'কেউ মারা গেলে এই রকম করে কাঁদে।'

অনিমেষ কথাটা শুনে আরো ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'ঠিক আছে, এটা নিয়ে এবার কাটো।'

ছেলেটা হাত বাড়িয়ে ভিজে গামছাটা নিয়ে করুণ গলায় বলে উঠল, 'এ মা, এই ভেজা গামছা পরে আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটবো?'

অনিমেষের মাথায় তড়াক করে রক্ত উঠে গেল। ও জাঙ্গিয়া পরা শরীরটার দিকে একবার তাকাল, 'তাহলে যা পরে আছ তাতেই যাও। প্রেম করতে যাওয়ার সময় খেয়াল ছিল না। বসতে দিলেই শুতে চায়।' আর দাঁড়াল না সে। হনহন করে ফিরে এল একবারও পেছনে না তাকিয়ে।

নতুন বাড়ির বারান্দা দিয়ে এগোতে শব্দটা বাড়তে লাগল। বাইরের বারান্দায় যাবার মুখটায় পিসীমা দাঁড়িয়ে আছেন। আঁচলটা এক হাতে মুখে চাপা দেওয়া।

ঠিক তাঁর পাশে একটা মোড়ায় দাদু হাঁটুর ওপর দু হাত রেখে চুপচাপ বসে। আর সামনের ছোট লনটা লোকে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। খুব আস্তে সবাই কথা বলছে। কিন্তু সেটাই গুঞ্জন বলে ওর এতক্ষণ মনে হচ্ছিল। সবার মুখ ডানদিকের বারান্দার দিকে ফেরানো, অনিমেষ এখান থেকে সেদিকটা দেখতে পাচ্ছিল না। পিসীমার পাশে যেতেই খপ করে তিনি ওর হাত চেপে ধরলেন, তারপর অস্বাভাবিক চাপা গলায় বললেন, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলি ?' কি উত্তর দেবে ঠিক করার আগেই তিনি বললেন, 'চিন্তায় চিন্তায় আমার বুক ধড়ফড় করছিল। বাবা জিজ্ঞাসা করেছিল তোর কথা, আমি বলেছি অনেকক্ষণ এসেছিস।'

অনিমেষ খুব নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে, এত লোক কেন ?'

মুখ থেকে আঁচল না সরিয়ে তেমনি গলায় পিসীমা বললেন, 'সুনীল মরে গেছে।'

সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে গেল অনিমেষের। ও কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে পিসীমার মুখে তাকিয়ে থেকে বলল, 'কেন ?'

পিসীমা বলল, 'কি জানি, শুনছি মেরে ফেলেছে। প্রিয়র জন্যে ভীষণ ভয় হচ্ছে।'

আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না অনিমেষ, দৌড়ে ও লনে নেমে পড়তেই সুনীলদাকে দেখতে পেল। ওদের বারান্দায় প্রচুর মানুষ মাথা নীচু করে বসে আর তাদের ঠিক মাঝখানে একটা খাটিয়ায় সুনীলদা চুপচাপ শুয়ে আছে। বুক অবধি সাদা কাপড় টানা, হাত দুটো তার তলায়। মাথায় লাল ছোপ লাগা ব্যাণ্ডেজ। নাক চোখ ঠোঁট জ্যোৎস্নায় মাখামাখি হয়ে রয়েছে। সুনীলদার বাবা যাঁকে কোনদিন কথা বলতে দেখেনি অনিমেষ ছেলের মাথার কাছে বসে মাঝে মাঝে ডুকরে উঠছেন। জয়াদিদের দরজা বন্ধ, ওঁদের ফিরতে দেরি আছে।

অনিমেষ পায়ে পায়ে সিঁড়ি বেয়ে কয়েক ধাপ উঠে এল। সুনীলদার কাছে যাবার জন্য একটা সরু প্যাসেজ করে রেখেছে উপবিষ্ট মানুষেরা। একদৃষ্টে সুনীলদার বন্ধ চোখের পাতার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনিমেষ ভীষণ কাঁপুনি অনুভব করল। যেন প্রচণ্ড শীত করছে, হাতপায়ে সাড় নেই, একটা শীতল স্রোত ক্রমশ শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ছে। সুনীলদা মরে গেছে। যে সুনীলদা ওকে কত কথা বলত, ওর চেয়ে মাত্র কয়েক বছরের বড, সুন্দর চেহারার সুনীলদা ঠোঁটের কোণে আলতো হাসির ভাঁজ রেখে মরে গেছে। কিন্তু কেন ? কেন সুনীলদাকে মরতে হল ? স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ওকে কেউ হত্যা করেছে। অনিমেষ মুখ তুলে দেখল, অনেকেই ওর দিকে তাকিয়ে আছেন কিন্তু এখন এই

মুহূর্তে এখানে কোন কথা বললে সেটা বিচ্ছিরি লাগবে এটা অনুভব করতে পারল অনিমেষ। ও আস্তে আস্তে বাকি ধাপগুলো পেরিয়ে সুনীলদার খাটিয়ার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই সুনীলদার বাবা ওকে দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক দু হাত বাড়িয়ে অনিমেষকে জড়িয়ে ধরলেন, 'ছাখো ছাখো, আমার সুনীলকে তোমরা ছাখো।' চিৎকারটা শেষদিকে কান্নায় জড়িয়ে যেতে অনিমেষ এই প্রৌঢ়ের হাতের বাঁধনে দাঁড়িয়ে থেকে হু-হু করে কেঁদে ফেলল।

কেউ একজন পাশ থেকে এই প্রথম কথা বলল, 'মেসোমশাই, একটু শক্ত হন।'

'শক্ত হব ?' কান্নাটা তখনও শব্দগুলোকে নিয়ে খেলা করছিল, 'আমি তো শক্তই আছি। আমার ছেলে কম্যুনিস্ট পার্টি করে—আমি কিছু বলি না, কোলকাতা থেকে বই আনায়—আমি টাকা দিই, দশ-বারো দিন কোথায় গিয়ে সংগঠন করে—আমি চুপ করে থাকি। আমার চেয়ে শক্ত আর কোন বাবা থাকবে ?'

অনিমেষ ওঁর আলিঙ্গনে বন্দী হয়ে পাশে বসে পড়েছিল। সুনীলদার মুখ এখন ওর এক হাতের মধ্যে। সুনীলদা কোথায় গিয়েছিল ? স্বর্গছেঁড়ায় ? স্বর্গছেঁড়াতে কেউ সুনীলদাকে খুন করতে পারে ? কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না ওর। সুনীলদার কেউ শত্রু হতে পারে! পারে, সুনীলদা বলেছিলেন, শত্রু চারধারে। যারা ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে চায় তারাই আমাদের শত্রু। তাহলে স্বর্গছেঁড়ায় ক্ষমতা আগলে থাকবে এবং শত্রু হবে—এ রকমটা শুধু বাগানের ম্যানেজার ছাড়া আর কাউকে কল্পনা করা যায় না। কিন্তু সেক্ষেত্রে তো পুলিশ আছে। ওই ঠোঁট দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনিমেষ স্পষ্ট শুনতে পেল, এসেছে নতুন শিশু তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান, মৃত পৃথিবীর ভগ্ন ধ্বংসস্তূপ পিঠে চলে যেতে হবে আমাদের। চলে যাবো, তবু দেহে যতক্ষণ আছে প্রাণ, প্রাণপণে এ পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল। এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি। এই বারান্দায় এক সন্ধ্যেবেলায় পায়চারি করতে করতে অবৃত্তি করেছিল সুনীলদা। যখন এই জ্যোৎস্নায় ধোয়া সুনীলদার মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মনে হল সুনীলদা হয়তো সামান্য বড় ছিল বয়সে কিন্তু তার কোন কথাই ও স্পষ্ট বুঝতে পারেনি।

ঠিক এই সময় একটা রিকশা এসে গেটের কাছে থামল। দু-তিনজন লোক সেদিকে এগিয়ে যেতে অনিমেষ দেখল রিকশা থেকে একটা বিরাট ফুলের মালা নামিয়ে যিনি আসছেন তাঁকে সে চেনে। এক হাত কাটা অথচ কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। মালাটা নিয়ে দৃঢ় পায়ে নেমে এসে সিঁড়ি দিয়ে সোজা ওপরে চলে এলেন তিনি। সুনীলদার সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসে কয়েক মুহূর্ত ওর মুখের দিকে এক

দৃষ্টে তাকিয়ে থেকে মালাটা সুনীলদার বুকের ওপর এমন আলতো করে নামিয়ে রাখলেন যাতে একটুও না লাগে। তারপর খুব মৃদু স্বরে বললেন, 'সুনীল, আমরা আছি, তুই ভাবিস না।'

যেন সমবেত জনতা এই মানুষটির জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল, এবার সবাই উঠে দাঁড়াল। খুব দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'আর দেরি করো না।'

অনিমেষ ওঁর দিকে তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিল, না, চিনতে পারেন নি। সেই সন্ধ্যায় ছোট কাকার সঙ্গে ওঁর বাড়িতে সে যে গিয়েছিল নিশ্চয়ই খেয়াল করতে পারেন নি। এই মানুষটির হাঁটাচলা এবং কথা বলা তাকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। ছোটকাকা কি করে পকেট থেকে রিভলবার বের করে ওঁর মুখের ওপর ধরেছিল? তাহলে ছোটকাকাও কি ওঁর শত্রু! হ্যাঁ, ছোটকাকা তো ক্ষমতাবান মানুষদের একজন—ক্রমশ ঘোলা জলটা তিথিয়ে আসছিল।

প্রায় নিঃশব্দেই সুনীলদাকে ওরা ঠিকঠাক করে নিল। সুনীলদার বাবা হঠাৎ যেন একদম বোবা হয়ে গেছেন, কোন কথা বলছেন না। সেই কান্নাটাও যেন আর ওঁর গলায় নেই। এতক্ষণের নীরব মানুষগুলো এবার হেঁটে চলে কথা বলছে। তাদের পারস্পারিক কথাবার্তায় অনিমেষ ঘটনাটার নাগাল পেল। না, স্বর্গছেঁড়ায় নয়, ডুয়ার্সের অন্য এক চা-বাগানে দু'দল শ্রমিকের মধ্যে সরাসরি সংঘর্ষ থামাতে সুনীলদা ছুটে গিয়েছিল। আসন্ন হরতাল বানচাল হয়ে যেত তাতে। শেষ পর্যন্ত সফল হয়ে সংগঠনকে আরো মজবুত করে আজ সকালে জলপাইগুড়িতে ফিরে আসছিল সে। ভোরবেলায় বাস স্ট্যাণ্ডে আসবার সময় কেউ ওকে ভোজালি দিয়ে মাথায় আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে চা-বাগানের ডাক্তারখানায় নিয়ে যাওয়া হয়, সেখান থেকে গাড়িতে ময়নাগুড়ি হাসপাতালে। কিন্তু বাঁচানো যায়নি। সুনীলদা ডাক্তারদের কাছে কিছু বলতে পারেনি বলে শোনা যাচ্ছে, যেটা এই জনতা বিশ্বাস করছে না। পুলিস বিকেলবেলায় অনেক তদ্বির করার পর মৃতদেহ ছেড়েছে। কোন ধরপাকড়ের কথা শোনা যায়নি এখনও। জনতার ধারণা হরতাল হোক এটা যারা চায়নি তারাই সুনীলদাকে মেরেছে। সুনীল রায়ের মৃত্যুতে আগামীকাল সেই চা-বাগানে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে।

শেষ মুহূর্তে সুনীলদার বাবা ঘাড় নাড়লেন। না, তিনি শ্মশানে যাবেন না। অনেকের অনুরোধে তাঁর এক কথা, 'আমার স্ত্রীকে আমি দাহ করেছি, সুনীলকে আমার সঙ্গে সে রেখে গেছে বলে। সুনীলকে আমি দাহ করে কার জন্যে অপেক্ষা করব?'

শেষ পর্যন্ত সরিৎশেখর এগিয়ে এলেন। এতক্ষণ দূরে বসে তিনি চুপচাপ সব দেখছিলেন। ভদ্রলোক শ্মশানে যাবেন না শুনতে পেয়ে এগিয়ে এলেন হেমলতার নিষেধ সত্ত্বেও, 'মিঃ রায়, আপনি না গেলে যে ওর অমঙ্গল হবে।'

সুনীলদার বাবা বোধ হয় এখনও মানুষ চিনছিলেন না, 'না, ও এখন মঙ্গল অমঙ্গলের বাইরে।'

সরিৎশেখর বললেন, 'কিন্তু পিতা হিসেবে আপনার কর্তব্য তো শেষ হয়নি। আপনি ওকে জন্ম দিয়েছেন, পালন করেছেন, উপযুক্ত করেছেন, তাই তার শেষ যাওয়ার সময় আপনার উপস্থিতি ওকে মুক্তি দেবে।'

সঙ্গে সঙ্গে সজোরে ঘাড় নাড়তে লাগলেন তিনি, 'হল না, হল না, ও বলতো, মরে গেলেও আমি আবার কম্যুনিস্ট হব। আচ্ছা, আপনার আঙুল আগুনে পুড়ছে আপনি সহ্য করতে পারবেন? পারুন, আমি বড় দুর্বল পারব না।'

প্রায় নিঃশব্দে সুনীলদাকে বাড়ির গেট খুলে বের করা হল। ওরা যখন যাত্রা শুরু করছিল, অনিমেষ তখন দৌড়ে পিসীমার কাছে গেল। দাদু নেই বারান্দায়। সুনীলদার বাবা ঘরে ঢুকে যাওয়ার পর লনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। অনিমেষ পিসীমাকে বলল, 'আমি শ্মশানে যাব।'

ও ভেবেছিল পিসীমা নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন, তাই প্রশ্ন করেনি নিজের ইচ্ছাটা জানিয়েছিল। কিন্তু ও অবাক হয়ে দেখল পিসীমা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন। তারপর বললেন, 'জামা প্যান্ট পাল্টে একটা গামছা নিয়ে যা। কেউ চলে গেলে প্রতিবেশীর শ্মশানবন্ধু হওয়া উচিত।' এই প্রথম পিসীমা এ রকম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে দাদুর অনুমতির জন্য অপেক্ষা করলেন না।

গামছা নিয়ে একটা পুরানো শার্ট গায়ে চড়িয়ে অনি বারান্দায় এসে দাঁড়ানো দাদুর শরীরের পাশ দিয়ে দৌড়ে বাড়ির বাইরে চলে এল। সুনীলদাকে নিয়ে ওরা এতক্ষণ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। চিৎকার করে দাদু যেন কিছু বললেন পেছন থেকে, কিন্তু তা শোনার জন্য অনিমেষ অপেক্ষা করল না। টাউন ক্লাবের পাশের রাস্তায় ও শ্মশানযাত্রীদের ধরে ফেলল। ওরা তেরাস্তার মোড়ে আসতেই অনিমেষ খাটিয়ার পাশে চলে এল। ওপাশের হাসপাতাল পাড়ার রাস্তা দিয়ে কয়েকজন ফুল নিয়ে এদিকে আসছিল, তাদের দেখে শ্মশানযাত্রীরা থামল। যে চার-পাঁচজন এসেছিল তারা ফুলগুলো সুনীলদার বুকে ছড়িয়ে দিতেই একজন বলে উঠল, 'সুনীল রায়—তোমায় আমরা ভুলছি না, ভুলব না।'

চাপা গলায় অদ্ভুত অভিমান নিয়ে বলে ওঠা এই বাক্যটির জন্য যেন এতক্ষণ সবাই অপেক্ষা করছিল। প্রত্যেকটি মানুষের বুকের এই কথাটা একজনের মুখ থেকে

বেরিয়ে আসতে সবার মুখ খুলে গেল। চলতে চলতে একজন চাপা গলায় বলল, 'সুনীল রায়—তোমায় আমরা—' বাকি কণ্ঠগুলো দৃঢ় ভঙ্গীতে পূরণ করল, 'ভুলছি না, ভুলবো না।'

এই স্বপ্নের মত জ্যোৎস্নায় চুবানো শহরের পথ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে অনিমেষের বুকের মধ্যে অদ্ভুত শিহরণ জাগলো। আজ রাস্তায় মিউনিসিপ্যালিটির আলো জ্বলছে না। চন্দ্রদেব তাঁর সবটুকু সঞ্চয় উজাড় করে দিয়েছেন, কারণ সুনীলদা তার শেষ যাত্রায় চলেছে। শহরের পথে পথে যারা জানতো না এসবের কিছু তারাও উৎসুক হয়ে এবং কিছুটা শ্রদ্ধার সঙ্গে ওদের দেখছিল। শোকযাত্রা ক্রমশ মিছিলের আকার নিয়ে নিল। অনিমেষ গম্ভীর গলায় বলে যাচ্ছিল, 'ভুলব না, ভুলব না।' কেন সে ভুলবে না এই মুহূর্তে ভাববার অবকাশ তার নেই।

দিনবাজারের পুল পেরিয়ে বাজারের সামনে দিয়ে ওরা বেগুনটুলির রাস্তায় এসে পড়ল। এতক্ষণ অনিমেষ চুপচাপ হেঁটে আসছিল, এখন চলতে চলতে একজনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। একে ও সুনীলদার কাছে দু'একদিন যেতে দেখেছে। এতক্ষণ সুনীলদাকে কাঁধে নিয়েছিল বলে ওকে লক্ষ্য করেনি অনিমেষ। সুনীলদার সঙ্গে খুব ঝগড়া হয়েছিল এর সেদিন। সুনীলদা বলেছিল, 'পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র, বুর্জোয়া গণতন্ত্র, বড়লোকের গণতন্ত্র, সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পাল্টে বড়লোকদের বাঁচাবার জন্য তাদের প্রয়োজনেই এর সৃষ্টি।' ছেলেটি বলেছিল, 'তাহলে আমরা সেটা সমর্থন করছি কেন? কেন আপনি প্রকাশ্যে তা বলেন না?'

'বলার সময় এলে নিশ্চয়ই বলব। ফোড়া না পাকলে অপারেশন করা হয় না।' সুনীলদার এই কথা নিয়ে ওদের তর্ক উত্তপ্ত হয়েছিল। অনিমেষ তার সবটা মাথায় রাখতে পারেনি। এখন হাঁটতে হাঁটতে ছেলেটি নিজের মনে বলল, 'আশ্চর্য, রমলাদি আসেন নি!'

রমলাদি। অনিমেষ মহিলাকে মনে করতে পারল। ওই যে হাতকাটা প্রৌঢ় নরম চেহারার মানুষটি পেছন পেছন হেঁটে আসছেন, তাঁর চেয়ে রমলাদি অনেক বেশী শক্ত হয়ে ছোটকাকার সঙ্গে কথা বলেছিলেন সেই রাত্রে। দলের ছেলে কেউ নিহত হলে কর্মীরা সবাই আসবেই, অতএব স্বাভাবিক কারণেই রমলাদি না আসায় এই ছেলেটিকে ক্ষুণ্ণ হতে দেখল অনিমেষ।

না। একবারও হরিধ্বনি দেয়নি কেউ। এতক্ষণ দমবন্ধ-করা পরিবেশে ওকে না ভোলার অঙ্গীকার করা হচ্ছিল, হঠাৎ গলাগুলো পাল্টে গেল। কে যেন চেঁচাল, 'লং লিভ সুনীল রায়—লং লিভ লং লিভ।'

'সুনীল রায়ের হত্যাকারীর কালো হাত গুঁড়িয়ে দাও, ভেঙে দাও।'

'হত্যা করে আন্দোলন বন্ধ করা—যায় না, যাবে না।'

'সুনীল রায়কে মারল কারা— কংগ্রেসীরা জবাব দাও।'

শেষ স্লোগান কানে যেতে থমকে দাঁড়াল অনিমেষ। ওরা হঠাৎ কি বলতে আরম্ভ করেছে? এর মধ্যে কংগ্রেসীরা আসছে কি করে! সুনীলদাকে কি কংগ্রেসীরা মেরেছে? কংগ্রেসী মানে ভবানী মাস্টার, হরবিলাসবাবু, কংগ্রেসী মানে নিশীথবাবু, বিরাম কর। না, এঁরা কেউ কোন মানুষকে খুন করতে পারেন না। কংগ্রেসী মানে বন্দেমাতরম্। আবার চট করে ছোটকাকার মুখ মনে পড়ে গেল ওর, ছোটকাকা কি কংগ্রেসী এখন? ছোটকাকার কাছে রিভলবার থাকে যে।

মিছিলটা ওকে ফেলে রেখে এগিয়ে যাচ্ছে। অনেকদিন পরে হরবিলাসবাবুর নামটা মনে পড়তেই ওর মনটা কেমন করে উঠল। হরবিলাসবাবুকে সে শহরে আসার পর দেখেছে। এখন আর রাজনীতি করেন না তিনি। প্রথম নিশীথবাবু পর্যন্ত ওঁর খবর বলতে পারেন নি। কংগ্রেস অফিসে আসেন না। এককালের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই জেলায় সবচেয়ে যে মানুষ আলোড়ন তুলেছিলেন, স্বাধীনতাদিবসে যিনি নিজে পতাকা না তুলে আগামীকালের নাগরিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তাঁর কথা আজ আর কারো মনে নেই। অনিমেষ এক বিকেলে তাঁকে ডি সি অফিসের সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছিল। ভীষণ বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, শরীর ভেঙে পড়েছে আর দারিদ্র্যের ছাপ পোশাক থেকে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। ভীষণ লোভ হয়েছিল সেদিন, ছুটে গিয়ে প্রণাম করতে। কিন্তু যদি চিনতে না পারেন, যদি ভুলে গিয়ে থাকেন সাতচল্লিশ সালের পনেরই আগস্টের সকালে স্বর্গছেঁড়ার তিনি কোন্ বালককে কি দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তাহলে? হরবিলাসবাবু ওর সামনে দিয়ে ক্লান্ত পায়ে চলে গেলেন, দমবন্ধ করে অনিমেষ দেখল তিনি ওকে চিনতে পারলেন না।

চাপা আক্ষেপের মত দূরে মিলিয়ে যাওয়া মিছিলটা থেকে একটা শব্দ ভেসে আসছে। স্কুলের মাঠে একদিন সিনেমা দেখিয়েছিল ওদের। চেন বেঁধে বিরাট এক দুর্ধর্ষ জন্তুকে নিয়ে যাওয়ার একটা দৃশ্য ছিল তাতে। প্রচণ্ড আক্রোশে সে গজরাচ্ছিল অথচ বন্দী থাকায় সেই মুহূর্তে তার কিছুই করার ছিল না। অনিমেষের মনে হল এই মিছিলটা যেন সেই রকম।

এখন রাত ক'টা কে জানে। কিন্তু একটুও ক্লান্তি লাগছে না ওর। এদিকটায় দোকানপাট কম এবং সেগুলোর ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। চাঁদটা এখন হেলতে

ছুলতে মাথার ওপর এসে টুপির মত বসে আছে। এই নির্জন রাস্তায় একা একা দাঁড়িয়ে ওর কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল। দুপাশে লোকজন নেই, মাঝে মাঝে এক-আধটা সাইকেল-রিকশা দ্রুত চলে যাচ্ছে। সুনীলদাকে কংগ্রেসীরা মেরেছে? মাথা নাড়ল ও। কিন্তু অপঘাতে মারা গেলে আত্মারা শান্তি পায় না। ঝাড়িকাকুর মুখে শোনা হরিশের গল্পটা মনে পড়তেই ও সোজা হয়ে দাঁড়াল। এখন যদি সুনীলদা কাছে এসে বলে, হ্যাঁ অনিমেষ, তোমার কংগ্রেসীরা আমাকে মেরে ফেলেছে, তাহলে সে কি করবে? সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল ওর। মিছিলের ধ্বনিটা আর আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। নিজেকে এই মুহূর্তে ভীষণ একা বলে মনে হতে লাগল ওর। সুনীলদা বলেছিল, যারা কংগ্রেস করে তারা সবাই খুনী—এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। তবে তাদের নেতাদের মধ্যে কেউ দরিদ্র নয়। এই গরীব দেশে কিছু বড়লোক নেতা চিরকাল লাঠি ঘোরাতে পারে না। অনিমেষের খেয়াল হল, কথাটা প্রায় সত্যি। কংগ্রেস অফিসে গিয়ে সে দেখেছে সবাই হাজার রকম গল্প বলে, কণ্ট্রাক্টরদের আশ্বাস দেয়, মন্ত্রীর সুপারিশ চায়। কিন্তু এরা তো সেরকম কথা বলে না। যেন একই দেশে দু'রকমের মানুষ বাস করে। কি ধরনের ক্ষোভ থাকলে মানুষ এত রাত্রে এই রকম জেহাদ সারা শহরের মানুষকে শুনিয়ে যেতে পারে! আচ্ছা, এরা তো সবাই স্বচ্ছন্দে কংগ্রেসী হয়ে যেতে পারত। কেন হয়নি? হলে তো এরা সুখেই থাকত।

অনিমেষ পায়ে পায়ে হাঁটতে লাগল সামনের দিকে। একা থাকতে ওর ভীষণ ভয় করছিল। বেগুনটুলির পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে ও থমকে দাঁড়াল। বাঁদিকে একটু এগিয়ে গেলে ছোট মায়ের বাপের বাড়ি। আজ অবধি কখনো যায়নি সে ওখানে। কেউ তাকে যাওয়ার কথা বলেনি, আর আগ্রহও হয়নি তার। একমাত্র বাবার বিয়ের দিন—হাসি পেল অনিমেষের। কি মজাই না সেদিন হয়েছিল। অল্পের জন্য ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছিল ও। একছুটে পালিয়ে— অনিমেষের মনে পড়ে গেল গলিটার কথা। ওর পা কেটে গিয়েছিল, আনন্দমঠটা হারিয়ে গিয়েছিল। আর সেই মেয়েটি—কি যেন নাম তার, আঃ, অনেক করেও নামটা মনে করতে পারল না। পেটে আসছে তো মুখে আসছে না। এটুকু মনে আছে সে ছিল অন্য সবার থেকে একদম আলাদা ধরনের। তাকে বলেছিল এই গলিতে আর কখনো না আসতে। কেন বলেছিল সেটা অনেক পরে বুঝেছে সে। স্কুলের বন্ধুরা ইদানীং বেগুনটুলির এই গলিটার গল্প রসিয়ে রসিয়ে করে। এদিক দিয়ে শর্টকাটে সোনাউল্লা স্কুলের ফুটবল মাঠে যাওয়া যায়। ওরা দল বেঁধে শর্টকাট করার নাম করে এদের দেখতে দেখতে যায়। এখন ব্যাপারটা ওর কাছে ঘৃণ্য এবং

ভীতিকর হওয়া সত্ত্বেও যখনই মনে পড়ে সেই মেয়েটি কি মমতায় ওর পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছিল তখনই সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়। আচ্ছা, সেই মেয়েটি কি যেন তার নাম, এখনো সেই ঘরটায় আছে তো!

ওকে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একজন রিকশাওয়ালা ঠা-ঠা করে হেসে উঠল। লাইট পোস্টের পাশে রিকশা রেখে সে তাতে চেপে বসে আছে। চোখা-চোখি হতে খুব রাগ হয়ে গেল অনিমেষের। এমন সময় ও দেখল একটা মোটা মতন লোক টলতে টলতে গলি থেকে বেরিয়ে আসছে আর তার পেছন পেছন বিভিন্ন বয়েসের কুড়ি-পঁচিশজন ভিখিরি চেঁচামেচি করতে করতে আসছে। গলিটার মুখে এসে ওরা লোকটাকে ছেঁকে ধরতেই রিকশাওয়ালা চেঁচিয়ে উঠল। তারপর ছুটে গিয়ে লোকটাকে উদ্ধার করে রিকশায় বসিয়ে উধাও হয়ে গেল। ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটল যে ভিখিরিগুলো কিছু করার অবকাশ পেল না। হতাশ হয়ে এ ওকে গালাগালি দিতে গিয়ে প্রায় মারামারি বেধে গেল ওদের মধ্যে। এমন সময় কয়েকজনের নজর পড়ল অনিমেষের উপর। ওর দিকে তাকিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করতে আরম্ভ করতেই অনিমেষ প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেল। অবশ্য ওর কাছে কিছুই নেই যা ওরা কেড়ে নিতে পারবে। তবু এই এত রাত্রে মাতাল-ফসকে-ফেলা ক্রুদ্ধ ভিখিরিদের এই চাহনিকে ও সহ্য করতে পারছিল না। প্রায় প্রাণের ভয়ে অনিমেষ দৌড়াতে লাগল।

শিল্প সমিতি পাড়ার কাছাকাছি ও মিছিলটাকে ধরে ফেলল। এখন যেন অতটা দীর্ঘ নয়, মিছিলের আকার বেশ ছোট হয়ে গেছে। কোন হরিধ্বনি নেই, শুধু একটিই লাইন ঘুরে ঘুরে প্রতিটি মানুষের মুখে ফিরছে—'সুনীল রায়, আমরা তোমায় ভুলছি না ভুলব না। অমর শহীদ সুনীল রায়, মরছে না মরবে না।'

অনিমেষ মিছিলের পাশাপাশি চলতে চলতে শুনল, কে যেন গলা খুলে হাঁটতে হাঁটতে কবিতা আবৃত্তি করছে। কবিতাটা ওর চেনা, সুনীলদা ওকে পূর্বাভাস বলে একটা বই পড়তে দিয়েছিল, তাতে ওটা আছে। ও দেখল সেই ছেলেটি যার সঙ্গে সুনীলদার তর্ক হয়েছিল, সুনীলদার শরীরের পাশে হাঁটতে হাঁটতে আকাশের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত এক মায়াময় গলায় কবিতাটা বলে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিটা আস্তে হয়ে এল, যেন কবিতার কথাগুলো গান হয়ে গেল আর ধ্বনিটা তার সঙ্গে নম্র হয়ে সঙ্গত করে যেতে লাগল—'সময় যে হল বিন্ধ্যাচল, ছেঁড়ো আকাশের উঁচু ত্রিপল, দ্রুত বিদ্রোহে হানো উপল—শত শত। মাথা তোল তুমি বিন্ধ্যাচল, মোছ উদ্গত অশ্রুজল, যে গেলো সে গেলো, ভেবে কি ফল? ভোল ক্ষত।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ উঠল, ভুলছি না, ভুলব না। দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন চিন্তাধারা একটা শোকের

সুতোয় বাঁধা পড়ে ক্রমশঃ এক হয়ে যাচ্ছে—অনিমেষ অনুভব করছিল। ওর হঠাৎ ইচ্ছে করেছিল সুনীলদার খাটিয়াতে কাঁধ দিতে। আজ অবধি কোনদিন সে কাউকে কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে যায়নি। সত্যি বলতে কি, শ্মশানে সে গিয়েছিল একবারই। খুব অস্পষ্ট সেই যাওয়াটা মনে পড়ে। কিন্তু একটা লকলকে চিতার আগুন আর মা তাঁর মেঘের মত চুল ছড়িয়ে সেই আগুনে শুয়ে আছেন—বুকের মধ্যে জন্মটিকার মত এ দৃশ্য স্পষ্ট হয়ে আছে। আজ এতদিন বাদে শ্মশানে যাচ্ছে সে—অনিমেষ সুনীলদার পাশে চলে এল। যে চারজন ওকে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে তাদের দিকে তাকাল সে। প্রত্যেকের মুখ এত গম্ভীর এবং যেন মহান কোন কর্ম সম্পন্ন করার নিষ্ঠায় মগ্ন যে অনিমেষ চেষ্টা করেও তাদের নিজের ইচ্ছেটা জানাতে পারল না।

মাসকলাইবাড়ি ছাড়িয়ে ওরা শ্মশানে এসে গেল। ছোট্ট পুলটা পেরিয়ে শ্মশানচত্বরে ঢুকতেই অনিমেষের চট করে সমস্ত কিছু মনে পড়ে গেল। মাকে নিয়ে ওরা এখানে এসে ওই গাছটার তলায় বসেছিল। চিতা সাজানো হয়েছিল ওই নদীর ধারটায়। বুকের মধ্যে সেই ব্যথাটা তিরতির করে ফিরে আসছিল যেন, অনিমেষ অনেক অনেকদিন পর মায়ের জন্য কেঁদে ফেলল। কোন কোন সময় চোখের জল ফেলতে এত আরাম লাগে—এর আগে কখনো জানতো না সে। হঠাৎ একজন ওকে জিজ্ঞাসা করল, 'সুনীল আপনার কেউ হয়?' কথাটা বুঝতে না পেরে তার মুখের দিকে তাকাতেই সে প্রশ্নটা শুধরে নিল, 'আত্মীয়?'

এবার চট করে চোখের জলটা মুছে ফেলল অনিমেষ, 'আমরা এক বাড়িতে থাকি।'

ভদ্রলোক আর কথা বাড়ালেন না। দাহ করার তোড়জোড় চলছে। অনিমেষ ভাল করে নজর করে দেখল সুনীলদার জন্য কেউ কাঁদছে না। সবাই যেন গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে সুনীলদার শেষকৃত্য করে যাচ্ছে। এখন কেউ কোন ধ্বনি দিচ্ছে না।

খুব অস্বস্তি হচ্ছিল অনিমেষের। যেহেতু সুনীলদা হিন্দু, তাই অন্তত এই সময়ে হরিধ্বনি দেওয়া উচিত। এ কথাটা কারো মাথায় ঢুকছে না কেন? এই সময় হরিধ্বনি নেই, কান্না নেই—যদিও সে কখনো দাহ করতে শ্মশানে আসেনি তবু পিসীমার কাছ থেকে শুনে শুনে এটা একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে হচ্ছিল তার। শেষ সময়ে হরিনাম না করলে আত্মার শান্তি হয় না। কথাটা ও সেই ছেলেটিকে বলল। এতক্ষণ কবিতা আবৃত্তি করার পর শ্মশানে এসে সে চুপচাপ সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিল। কথাটা শুনে সে ম্লান হাসি হাসল 'সব মানুষের আত্মা কি এক নিয়মে চলে? কোটিপতি চোরাকারবারী আর সত্যিকারের একজন শহীদ

মরার পর হরিনাম শুনলেই যদি আত্মা শান্তি পায় তাহলে বলার কিছু নেই। সত্যিকারের কম্যুনিস্ট তার আত্মা যতক্ষণ দেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে ততক্ষণ শান্তি পাবে না।'

অনিমেষ হঠাৎ অনুভব করল, ও যেন কথাটা অস্বীকার করতে পারছে না। ক্ষুদিরাম বলেছিলেন, দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তিনি ফিরে জন্ম নেবেন। সত্যি একটা চোর আর শহীদের আত্মা সমান সম্মান এবং সুবিধে পেতে পারে না।

অনিমেষ অলসভাবে পায়চারি করতে লাগল। দূরে একটা চিতা প্রায় নিবে এসেছে। কাঠগুলো জ্বলে জ্বলে আগুন নিবু-নিবু। প্রচণ্ড কান্নায় কেউ ভেঙে পড়েছে সেখানে, তাকে সামলাচ্ছে অন্যরা। হরিবোল ধ্বনি দিতে দিতে আর একটি মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানের দিকে কিছু লোক আসছে। অনিমেষের এখন আর ভয় করছিল না। দুধেল জ্যোৎস্নায় এই শ্মশানের মাটি গাছ নদী ধবধব করছে। আকাশে এত নীল রঙ ছিল চোখ চেয়ে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। গোল আধুলির মত রূপোলি চাঁদ চুপচাপ সরে সরে যাচ্ছে। আশ্চর্য, ঠিক এ-রকম সময় কিছু মানুষকে পৃথিবী থেকে চলে যাবার পর শ্মশানে আনা হয়েছে পুড়িয়ে শেষ করে দেবার জন্য। ওর খুব মনখারাপ হয়ে গেল, কেন যে ছাই শ্মশানেও চাঁদের আলো পড়ে!

স্নান করিয়ে দাহ করার যে নিয়মটা এখানে চালু আছে তা সকলে মানেন না, সামান্য জল ছিটিয়ে শুদ্ধ করে নেয় অনেকে—অনিমেষ শুনতে পেল। যে ডোমটি তদারক করছিল তার দিকে তাকিয়ে অনিমেষ অবাক হয়ে গেল। এর মুখ দেখে মনে হয় না এই সব শোক দুঃখ একে স্পর্শ করে। কখনো কি ও মাথা তুলে আকাশ-ভাসানো চাঁদটাকে ভাল করে দেখেছে? মনে হয় না। সুনীলদার উলঙ্গ শরীরটাকে উপুড় করে শুইয়ে দিয়ে সে যে-ভাবে পা দুটো সোজা করে দিল তাতে পিসীমার উনুন ধরানোর ভঙ্গিটা মনে পড়ে গেল ওর। চিতার কাছাকাছি গোল হয়ে দাঁড়িয়েছিল সবাই। সুনীলদার কোমরের পেছনদিকটায় বিরাট জরুলটায় আলো পড়ে চোখ টেনে নিচ্ছে। মানুষ মরে গেলে তার কত গোপন জিনিস সবাই সহজে জেনে যায়—সুনীলদার এখন কিছু করার নেই। হঠাৎ ও মাকে দেখতে পেল। মা শুয়েছিল সমস্ত চিতা আলো করে—ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছিল সেই চুলগুলো। সুনীলদাকে এই মুহূর্তে খুব দুর্বল, অসহায় বলে মনে হচ্ছিল অনিমেষের।

কে যেন বলল, 'মুখাগ্নি করবে কে?'

সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। সুনীলদার বাবা আসেন নি, কোন আত্মীয়

এই শহরে থাকে না। সমস্যাটা চট করে সমাধান করতে পারছিল না শ্মশান-যাত্রীরা। এমন সময় অনিমেষ দেখল সেই ছেলেটি, যে আবৃত্তি করেছিল, যার সঙ্গে সুনীলদার খুব তর্ক হত, সে অলসভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে গেল, 'কই, কি করতে হবে বলুন ?'

একজন একটু দ্বিধা নিয়ে বলল, 'তুমি করবে ?'

'নিশ্চয়ই।' ছেলেটি জবাব দিল, 'সংগ্রাম শুরু কর মুক্তির, দিন নেই তর্ক ও যুক্তির। আমার চেয়ে বড় আত্মীয় আমার আর কে আছে! দিন।' হাত নেড়ে নেড়ে কথাটা বলে সে পাটকাঠির আগুনটা তুলে নিয়ে সুনীলদার বুকে ছুঁইয়ে মুখের ওপর বুলিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো হাত আগুন ছুঁইয়ে চিতাটাকে জাগিয়ে দিল। কেউ কোন কথা বলছে না, শুধু ফট ফট করে কাঠ ফাটার শব্দ আর আগুনের শিখাগুলো যেন হামাগুড়ি দিয়ে সুনীলদার দিকে এগিয়ে আসছে।

হঠাৎ ডোমটা চেঁচিয়ে উঠল, 'বল হরি হরিবোল!' তার সেই একক কণ্ঠ শ্মশানের আকাশে একবার পাক খেয়ে ফিরে এল আচমকা। অবাক হয়ে সে শ্মশানযাত্রীদের দিকে তাকাল, তার অভিজ্ঞতায় এইরকম নৈঃশব্দ্য সে বোধ হয় দেখেনি।

নীরবতা এতখানি বুকচাপা হয় এর আগে অনিমেষ এমন করে কখনো বোঝেনি। সেই বাড়ি থেকে বের হবার পর যে ধ্বনি দেওয়া চলছিল, যে মানুষগুলো সুনীলদাকে কেন্দ্র করে জেহাদ জানাচ্ছিল, এখন এই সময় তারা ছবির মত মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কতখানি ভালবাসা পেলে এরকমটা হয়—অনিমেষ আঁচ করতে পারছিল না। তবে সুনীলদা কিছু মানুষকে ভীষণ রকম আলোড়িত করেছিলেন, এখন অনিমেষ নিজেকে তার বাইরে ফেলতে পারল না। আগুন কাউকে ক্ষমা করে না, সুনীলদার শরীরটা ক্রমশ গলে গলে পড়ছে। মা'রও এরকমটা হয়েছিল ? হঠাৎ দু চোখ দু হাতে চাপা দিল অনিমেষ। এ দৃশ্য সে দেখতে পারছে না। কিন্তু চোখ বন্ধ করেও সে যে নিস্তার পাচ্ছে না। অজস্র ছোট ছোট চিতা চোখের পাতায় পাতায় জ্বলে যাচ্ছে। এটাকে নেভাতে গেলে অন্যটা জ্বলে ওঠে।

চোখ খুলতে সাহস হচ্ছে না, অথচ—। অনিমেষ এই অবস্থায় শুনতে পেল সেই ছেলেটা নিজের মনে কিছু আবৃত্তি করে যাচ্ছে। মনে হয় ঘোরের মধ্যে আছে সে। কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নেই, হঠাৎ সবাই কথা বলে উঠল। দুর্গাঠাকুর বিসর্জনের সময় সাতপাক ঘোরানো হয়ে গেলে জলে ফেলবার মুহূর্তটাতেই এই রকম ব্যস্ততা ভক্তদের মধ্যে হয়ে থাকে। অনিমেষ বন্ধ চোখে দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে শুনল, খুব চাপা এবং রুদ্ধ গলায় ছেলেটি বলছে, 'কমরেড, তোমায় আমি ভুলছি না, ভুলব না।' চোখ খুলল অনিমেষ, খুলে একটু একটু করে সাহস এনে চিতার দিকে তাকাল। না, সুনীলদা ওখানে নেই। একটা দলা-পাকানো কালো কিছু পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই পৃথিবীর কোথাও আর সুনীলদাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

একটু একটু করে মানুষজন ফিরে ফিরে যাচ্ছিল। সামান্য বাতাস দিচ্ছে। কোথা থেকে হালকা মেঘেরা এসে মাঝে মাঝে চাঁদের মুখ আড়াল করে যাচ্ছে। সেই মুহূর্তে সমস্ত চরাচরে একটা ছায়া দুলে দুলে যাচ্ছে। অনিমেষ দেখল সেই ছেলেটি আচ্ছন্নের মত হেঁটে যাচ্ছে তার সামনে দিয়ে। যেতে যেতে মুখ তুলে চাঁদকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, 'ঠিক ঠিক। কবিতা তোমায় আজকে দিলাম ছুটি, ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়—পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।'

অনিমেষ আর দাঁড়ালো না। ও দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ছেলেটির সঙ্গ নিল। ছেলেটি ওর দিকে তাকিয়ে হাসল, 'পথ অনেকটা, কিন্তু আমাকে একা হাঁটতে হচ্ছে না, তুমি আর আমি হাঁটলে পথ আর বেশী হবে না। কি বল?'

অনিমেষ কোন কথা বলল না। হাঁটতে হাঁটতে ব্রীজের ওপর এসে ওর খেয়াল হল, যাঃ, স্নান করা হয়নি। পিসীমা বলেন, শ্মশানে এলে স্নান করে যেতে হয়। তাই গামছা নিয়ে এসেছে সে। কিন্তু এই মুহূর্তে স্নান করার কথা ভাবতে পারছে না ও। শরীর নোংরা হলে লোকে স্নান করে। সুনীলদাকে দাহ করার পর স্নান করার কোন মানে হয়? এই সময় ছেলেটি হঠাৎ আকাশের দিকে বিরক্ত চোখে তাকিয়ে বলে উঠল, 'চাঁদটা আজ বড় জ্বালাচ্ছে, না?'

॥ দশ ॥

এবার জলপাইগুড়ি শহরে প্রচণ্ড শীত পড়েছে। প্রবীণেরা এর মধ্যেই বলতে আরম্ভ করেছেন, সেই চল্লিশ সালের পর এত মারাত্মক শীত নাকি তাঁরা দেখেননি। অনিমেষের এইসব কথা শুনলে বেশ মজা লাগে। লোকেরা যে কি করে সব কথা মনে রাখে! এই যেমন বর্ষাকালে ঝম ঝম করে তিন দিন ধরে আকাশ ফুটো হয়ে বৃষ্টি পড়ল, অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসে রাতদুপুরেও ঘেমে গিয়ে হাতপাখার বাতাস খেতে হল, ব্যাস, বৃদ্ধরা বলতে আরম্ভ করেন সেই অমুক সালের পর নাকি এবারের মতন বৃষ্টি বা গরম এর আগে দেখেননি।

তবে এবারের ঠাণ্ডাটা জব্বর কনকনে। ভোরবেলা বিছানা থেকে উঠে মেঝেতে পা রাখতে একদম ইচ্ছে হয় না। সকাল হচ্ছে দেরিতে, সেই আটটা

অবধি সামনের মাঠে কুয়াশারা চুপচাপ বসে থাকে। আবার সাড়ে চারটে বাজতে না বাজতেই অন্ধকার ডালপালা মেলে দেয়। এতদিন ওর কোন সোয়েটার ছিল না। তুষের চাদর গায়ে দিয়ে শীতটা দিব্যি কাটিয়ে দিত। সেই কোন ছেলে-বেলার ফুলহাতা পুলওভারটা এখনও সুটকেসে তোলা আছে। ওর বন্ধুবান্ধবরা কত রকমারি সোয়েটার পরে বিকেলে বাঁধের ওপর বেড়াতে বের হয়—অনিমেষের এতদিন ছিল না, পরার প্রশ্নও ওঠেনি। এবার জয়াদি ওকে নীল-সাদা-হলুদ মেশানো একটা সোয়েটার তৈরি করে দিয়েছেন, কথা ছিল টেস্টে অ্যালাউড হলেই ও সেটা পাবে। অনিমেষ জানতো টেস্টে সে কখনই ফেল করবে না, তবু এর আগে তো কখনো টেস্ট দেয়নি, চিরকাল এ সময় অ্যানুয়াল পরীক্ষাই দিয়ে এসেছে, এবার তাই উত্তেজনা ছিল আলাদা রকম। কাল ফল বেরিয়েছে, জেলা স্কুল থেকে এই বছর সবাই টেস্টে পাস করে ফাইন্যাল পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে। অনিমেষের স্থান চতুর্থ: অর্ক, অরূপ, মন্টু এবং অনিমেষ। মন্টুর অবশ্য এই প্রেস পাওয়াতে কিছু যায় আসে না। তবে ইদানীং পড়াশুনায় মনোযোগী হয়ে পড়েছে যেন ও। এবার একটাও প্রশ্ন ইচ্ছে করে ছেড়ে আসেনি।

তিন মাস পর ফাইন্যাল পরীক্ষা। এবার ফি জমা দিতে হবে। কাল বিকেলে যখন বাড়িতে এসে ও খবরটা দিল তখন জয়াদি পিসীমার কাছে বসেছিলেন। খবর শুনে পিসীমা তো চেঁচামেচি করে দাদুকে ডাকাডাকি করতে আরম্ভ করলেন। জয়াদির সামনে পিসীমার কাণ্ড দেখে অনিমেষের লজ্জা-লজ্জা লাগছিল। কিন্তু জয়াদি চট করে পিসীমার দলে ভিড়ে গেলেন, 'ও বাবা, তুমি ফোর্থ হয়েছ?' জেলা স্কুলের ফোর্থ বয় মানে তো ফার্স্ট ডিভিসন একদম বাঁধা—ইস, এট্টুসখানি ছেলে কলেজে পড়তে চলল!'

চটির শব্দ হতে জয়াদি দৌড়ে চলে গেলেন আচমকা। অনিমেষ দাদুকে দেখে সামনে গিয়ে দাঁড়াল। টেস্টে পাস করলে কি প্রণাম করা উচিত?

সরিৎশেখর নাতির মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাদের বংশে কেউ ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করেনি। তোমার এবারের মার্কস কেমন?'

অনিমেষ মাথা নীচু করে বলল, 'তিন নম্বর পেলে ফার্স্ট ডিভিসন হত।'

সরিৎশেখর মাথা নাড়লেন, 'তিন নম্বর কিছুই না, একটু পড়াশুনা করলে ওটা পেতে অসুবিধে হবে না। তুমি এখন বাইরের জগৎ থেকে মনটা সরিয়ে নাও। জীবনে বার বার ফাইন্যাল পরীক্ষা আসে না।' কথাটা বলে চট করে ঘুরে ঘরের ভেতরে চলে গেলেন। অনিমেষ দাদুর এই রকম নিরাসক্ত কথাবার্তায় অভ্যস্ত কিন্তু একটু পরেই চটির আওয়াজ ফিরে এল, 'এই নাও, রোজ খাওয়াদাওয়ার পর

দু চামচ করে খাবে।'

একটা বড় শিশিতে সিরাপ মতন কিছু তিনি অনিমেষের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। হতভম্বের মত সেটাকে হাতে নিয়ে অনিমেষ তার গায়ে কোন লেবেল দেখতে পেল না, 'এটা কি?'

সরিৎশেখর খুব নিশ্চিন্ত গলায় বললেন, 'ধীরেশ কবিরাজকে দিয়ে করিয়েছি, ব্রাহ্মী শাক থেকে তৈরী এই টনিকটা খেলে তোমার ব্রেন ভাল হবে, সব ব্যাপারে উৎসাহ আসবে। দেখবে তিন নম্বর পেতে কোন অসুবিধে হবে না।'

অনিমেষ বিহ্বল হয়ে পড়ল। কত আগে থেকে দাদু তার জন্য এত চিন্তা করেছেন। ও শিশিটাকে আঁকড়ে ধরল। সরিৎশেখর বললেন, 'তোমার ফাইন্যাল পরীক্ষার ফি কত, জানো?'

সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ল অনিমেষ, 'না।' টাকা-পয়সার কথা উঠলেই আজকাল ওর খুব অস্বস্তি হয়।

সরিৎশেখর বললেন, 'ঠিক আছে, আমি জেনে নেব। তোমাকে ফার্স্ট ডিভিসন পেতেই হবে অনিমেষ। তোমার মাকে আমি কথা দিয়েছিলাম।'

কথাটা শুনে দাদুর দিকে তাকাল অনিমেষ। সরিৎশেখর এখন অলস পায়ে ভেতরে চলে যাচ্ছেন। মাকে দাদু কবে কথা দিয়েছিলেন? এতদিন শোনেনি তো সে। স্বর্গছেঁড়া থেকে যখন এসেছিলেন, তখন তখনই কেউ দশ বছর বাদে কাউকে ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করানোর কথা দিতে পারে না। ওর মনে হল দাদু গুলিয়ে ফেলছেন। স্মৃতিতে কোন কিছু গোলমাল হয়ে গেলে মৃত ব্যক্তির নাম করে নিজের ইচ্ছেটা স্বচ্ছন্দে চালিয়ে দেওয়া যায়। ধরা পড়বার ভয় থাকে না এবং সেটা বেশ জোরদারও হয়। অনিমেষ হেসে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে জয়াদির গলা পেল ও, 'এ মা, একা একা দাঁড়িয়ে হাসছ যে, পাগল হয়ে গেলে নাকি!'

অনিমেষ ঘাড় ফিরিয়ে দেখল জয়াদি একটা প্যাকেট নিয়ে ফিরে এসেছেন, 'কি ওটা?'

ফস করে নীল-সাদা-হলুদ মেশানো সোয়েটারটা বের করে ওর সামনে ধরল, 'পরে ফেল।'

জয়াদি ওর জন্য সোয়েটার বানাচ্ছেন, মাঝে মাঝে বুক-পিঠের মাপ নিয়ে যান, এ কথা সবাই জানে। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে অনিমেষের ভীষণ আনন্দ হচ্ছিল। সে চিৎকার করে পিসীমাকে ডাকল, 'পিসীমা—তাড়াতাড়ি!'

সরিৎশেখর যখন কথা বলছিলেন তখন হেমলতা রান্নাঘরে ফিরে গিয়েছিলেন। চিৎকার শুনে ছুটে এলেন, 'ও মা, হয়ে গেছে! বলিসনি তো! কি সুন্দর! আর

জন্মে জয়া তোর কেউ ছিল অনি।'

জয়াদি হেসে বললেন, 'ও মা, এজন্মে আমি বুঝি কেউ নই ?'

অনিমেষ হাত বাড়িয়ে সোয়েটারটা নিল। কি নরম উল! পিসীমা আর জয়াদিতে মিলে ওকে সোয়েটারটা পরালেন। পিসীমা সমানে জয়াদির হাতের প্রশংসা করে যাচ্ছেন আর জয়াদি ওর চারপাশে ঘুরে ঘুরে সোয়েটারটা ঠিক করে দিচ্ছেন—অনিমেষের খুব লজ্জা করছিল। সুন্দর ফিট করেছে সোয়েটারটা, পিসীমা বললেন, 'তুই পাস করে কলকাতায় গিয়েও এই সোয়েটারটা পরতে পারবি তিন-চার বছর।'

জয়াদি বললেন, 'তখন দেখবেন এটা পছন্দই হবে না।'

পিসীমা বললেন, 'আমি তো বাবা এত ভাল সোয়েটার কাউকে পরতে দেখিনি ?'

কলকাতায় পড়তে যাচ্ছে। কথাটা ইদানীং এ-বাড়িতে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। মহীতোষ নাকি সরিৎশেখরকে বলেছেন সেকথা। অনি যদি ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করে তাহলে কলকাতায় পাঠাবেন। এখানকার এ সি কলেজে পড়াশুনা খুব একটা সুবিধের হবে না। কলকাতায় যাবার কথা শুনলেই দমবন্ধ হয়ে আসে আনন্দে। কলকাতা বাংলাদেশের প্রাণ—। বেশী ভাবতে গেলেই অনেক রকম চিন্তা মাথায় আসে। কলকাতার রাস্তায় সিনেমা-স্টাররা ঘুরে বেড়ায়, কবি, লেখকরা সেখানে আড্ডা দেন। মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর কলকাতার রাস্তায় হেঁটেছেন। অদ্ভুত একটা রোমান্টিক জগৎ তৈরী হয়ে যায় মনে মনে। ফার্স্ট ডিভিসন পেতেই হবে—যেমন করেই হোক। হাতের শিশি আর বুকের সোয়েটারটার দিকে তাকাল সে। সামান্য টেস্টে অ্যালাউড হয়ে যদি এতগুলো মানুষের ভালবাসা পাওয়া যায়, তাহলে ফাইন্যাল পরীক্ষায় সে কেন ডিভিসন পাবে না ? সোয়েটারের নরম ওমটা শরীরে জড়িয়ে অনিমেষ পিসীমা আর জয়াদির দিকে তাকিয়ে এই প্রথমবার আবিষ্কার করল, যারা খুব অল্পেই খুশী হয় তাদের জন্য সব কিছু করা যায়।

নতুন সোয়েটারটা পরে অনিমেষ বিকেলবেলায় বেরিয়েছিল। রাস্তা দিয়ে যে যাচ্ছে সেই একবার ঘুরে ওকে দেখছে। নতুন স্যার একবার খবর দিয়েছিলেন দেখা করার জন্য। নিশীথবাবুকে ও আজও মাঝে মাঝে পুরোনো নামে ভাবে। বোধ হয় সংস্কারের মধ্যে যেটা একবার ঢুকে যায় তাকে চট করে ছাড়ানো যায় না। জলপাইগুড়ি শহরে এবার নির্বাচনী প্রচার এখনও শুরু হয়নি। মাঝে মাঝে কংগ্রেসী অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাতে কিছু পোস্টার দেখা যাচ্ছে। কংগ্রেস থেকে তেমন গা করছে না এখন। জেলা থেকে যিনি মন্ত্রিত্ব পান তিনি হেরে

যাবেন অতি বড় সমালোচকও আশা করতে পারে না। তাঁকে কদিন আগে দেখেছে অনিমেষ, বেশ নধরকান্তি, দুধেআলতা রঙ, বয়স হয়েছে। এখন নড়েচড়ে বসতে অসুবিধে হয়। অথচ জেলার মানুষ, বিশেষ করে রাজবংশীরা ভদ্রলোককে ভীষণ সমর্থন করে। সেটাই ওঁর জোর। অবশ্য কংগ্রেসের জোড়া বলদ নিয়ে নামলেই হল—যে দাঁড়াবে সেই ভাববে আমাকেই সমর্থন করছে।

সুনীলদার সেই বন্ধু, যার সঙ্গে শ্মশানে আলাপ হয়েছিল, সে বলেছিল পার্টি অফিসে আসতেই হবে তার কোন মানে নেই। আগে মনটা তৈরী কর। কথাটা ভাল লেগেছিল অনিমেষের। কম্যুনিস্ট পার্টি, পি এস পি, ফরোয়ার্ড ব্লক—এই তিনটি বিরোধী দল এই শহরে বিক্ষোভ করে মাঝে মাঝে—কিন্তু কেমন যেন দানা বাঁধে না। খবরের কাগজে আজকাল কলকাতার খবর পড়ে অনিমেষ। সেখানে প্রায়ই মিছিল হয়—খাদ্য আন্দোলন হয়, তারপর সব চুপচাপ হয়ে যায়। যেন আগের দিন কিছুই গুরুতর ব্যাপার হয়নি। এখানেই কেমন খটকা লাগে অনিমেষের। নিশীথবাবুর সঙ্গে একদিন খোলাখুলি আলোচনা করেছিল অনিমেষ। নিশীথবাবু বলেছিলেন, 'কম্যুনিস্ট পার্টি গঠনের পরিবর্তে ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম করছে। সত্যি কথা বলতে গেলে, ওরা জানেই না ওরা কি চায়।' তারপর অনিমেষকে দমিয়ে দেবার জন্য বলেছেন, 'যারা কম্যুনিস্ট পার্টির মাথায় বসে সর্বহারাদের প্রতি দরদ দেখিয়ে গরম গরম কথা বলে, খোঁজ নিয়ে দ্যাখ, তারাই নিজস্ব প্রাসাদে বসে সেটা করে থাকে। যার পেটে খাবার নেই তাকে সহজেই উত্তেজিত করা যায় কিন্তু তার খিদে মেটানোর রাস্তাটা বলে দেওয়া সহজ নয়। কম্যুনিস্টরা সেটা জানে, তাই ও-পথে যায় না।'

অনিমেষ বলেছিল, 'কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ তো গরীব—গরীবের কথা কংগ্রেস ভাবে না কেন? গরীবদের জন্য কংগ্রেস কি করেছে?'

বিরক্ত হয়েছিলেন নিশীথবাবু, 'আট বছরেই একটা দেশকে বদলে দেওয়া যায় না। সময় লাগবে অনিমেষ। কম্যুনিস্টরা যখনই কোন কথা বলে, রাশিয়ার কথা আওড়ায়। বড় বড় বোলচাল ছাড়া কোন কম্যুনিস্টকে বক্তৃতা দিতে শুনবে না। তুমি কি ওদের দিকে ঝুঁকবে, অনিমেষ?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারেনি অনিমেষ। পরে বলেছিল, 'আমার যেন কেমন লাগে। কম্যুনিস্টরা যা চায় সেটা ভাল লাগে, কিন্তু যেভাবে চায় সেটা একদম ভাল লাগে না।'

নিশীথবাবুর মুখ দেখে অনিমেষ স্পষ্ট বুঝতে পারলে, উত্তরটা ওঁর একদম পছন্দ হয়নি। গম্ভীর মুখে বলেছিলেন, 'অনিমেষ, নিজের দেশকে নিজেদের মত করেই

সেবা করা উচিত। মানছি কংগ্রেসের সবাই ত্রুটিমুক্ত নয়, অনেকেই স্বার্থ নিয়ে আসে, তবু এদের নিয়েই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে। অভিজ্ঞতা যত বাড়ে কাজ করতে তত সুবিধা হয়।'

টাকা-পয়সা হাতে এলে সরিৎশেখর আবার আগের মত হয়ে যান। বাড়ি ভাড়া নিয়ে যে গোলমাল হয়েছিল সেটা এখন আর নেই, নিয়মিত টাকা পাচ্ছেন। কিন্তু বাজার দর যে রকম বাড়ছে, তাতে পাল্লা দেওয়া মুশকিল। চালের দাম হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে। প্রিয়তোষ মাঝে মাঝে চিঠি দেয়। টাকা-পয়সার দরকার হলেই যেন তাকে জানানো হয়—এই ইচ্ছে জানিয়ে সে ঠিকানাসহ চিঠি দিচ্ছে, সরিৎশেখরের মাঝে মাঝে লোভ হয় টাকা চাইতে কিন্তু শেষ সময়ে সামলে নিয়ে উত্তর দিচ্ছেন না। তাঁর সন্দেহ হেমলতার সঙ্গে প্রিয়তোষের যোগাযোগ আছে। তবে পরিতোষ একদম মাড়ায় না এদিকে। একটুও কষ্ট হয় না তার জন্য সরিৎশেখরের। মহীতোষ আসেন মাঝে মাঝে—নিয়মিত ছেলের নাম করে টাকা পাঠান। মহীতোষের একটা অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেছে এর মধ্যে। ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেছেন আর চেহারাটা হয়ে গিয়েছে বুড়োটে-বুড়োটে। এ-পক্ষে সন্তানাদি হল না তাঁর। মহীতোষের স্ত্রী স্বর্গছেঁড়া থেকে একদম নড়তে চায় না। তাকে অনেকদিন দেখেননি তিনি। হেমলতা বলতে মহীতোষ বলেছিলেন, 'সে ও বাড়ি ছেড়ে নড়বে না।'

বয়স তাঁকেও কব্জা করেছে। শরীরের চামড়া ঝুলে পড়েছে। কিন্তু বড়সড় কোন অসুখ তাঁর হয়নি, সেই রিকশার ধাক্কায় পড়ে গিয়ে পা ভাঙা ছাড়া। শীত সহ্য করতে আজকাল একটু কষ্ট হয়। লালইমলির সেই পুরোনো গেঞ্জি, পাঞ্জাবি, মোটা কাপড়ের কোট আর তুষের চাদরে লড়ে যান প্রাণপণে। বাঁচতে খুব ইচ্ছে হয় তাঁর। কত কি জিনিস হচ্ছে পৃথিবীতে, অন্যান্য মানুষের মত চট করে মরে যাবার কোন বাসনা হয় না। কিন্তু মুশকিল হল, শীত পড়েছিল শানিয়ে—তা এক রকম ছিল, সঙ্গে যে আজ রাত থেকে অসময়ের বৃষ্টি নামল। একদম শ্রাবণ মাসের বৃষ্টি।

শীতকালে জলপাইগুড়িতে হঠাৎ হঠাৎ বৃষ্টি আসে। এসে ঠাণ্ডাটা বাড়িয়ে দিয়ে যায়। যে সমস্ত মানুষ জরায় থিতোচ্ছিল তারা টুপটাপ চলে যায় এ সময়। তিস্তায় তখন টানের সময়। শীতের দাপটে ক্রমশ কুঁকড়ে যাচ্ছে নদীটা। তবু জল এখনও টলটলে। স্রোতের ধার নেই, যৌবন ফুরিয়ে যাওয়া মহিলার মত শুধু জাবর কেটে যাওয়া। বাঁধ প্রায় সম্পূর্ণ। ওপাশে সেনপাড়া ছাড়িয়ে তিস্তার বুকের ওপর পুল বানাবার কথাবার্তা চলছে। কলকাতা থেকে সরাসরি ট্রেনে বাসে আসাম

যাওয়া যাবে। পক্ষিরাজ ট্যাকসিগুলো গা-গতর ঝেড়ে মুছে এই কটা বছর কিছু কামিয়ে নেবার জন্য কিং সাহেবের ঘাটের দিকে আসব আসব করছে। এই সময় সন্ধ্যে থেকেই আকাশ কাঁপিয়ে বৃষ্টি নামল।

ভোর হল, ঘড়ি দেখলে বোঝা যায়—আকাশ তেমনি গোমরামুখো। জল ধরবার চিহ্ন নেই। যেন বর্ষা চলে যাওয়ার সময় এই মেঘগুলোকে হিমালয়ের ভাঁজে ভাঁজে ফেলে রেখে গিয়েছিল, নাহলে এই সময়ে এত বৃষ্টি পড়ে কখনো! তিস্তার জল বাড়ছে। যেন কোন গুপ্ত ওষুধে যৌবন ফিরে এল তার—এরকমটা কখনো হয় না। লক্ষ্মীপুজোর পর এত জল তিস্তায় বয় না। কিন্তু শহরের মানুষ এবার নিশ্চিন্ত। সেই প্রলয়ঙ্কর বন্যাটাকে রুখে দেবে নতুন তৈরী বাঁধ। তিস্তা সরাসরি শহরটাকে গ্রাস করতে পারল না এবার। কিন্তু করলার জল ছিটকে উঠে এল কিছু কিছু নিচু জায়গায়। হাসপাতাল পাড়াটা এই ঠাওায় তিনদিক জলের তলায় ডুবে রইল। আহ্লাদী মেয়ের মত করলা গিয়ে মুখ ঘষছে কিং সাহেবের ঘাটের পাশে তিস্তার বুকে।

ঠিক তিন দিন তিন রাতের শেষে বৃষ্টি থেমে রোদ উঠল। হেমলতার অবস্থা খুব কাহিল। গরম বস্ত্র তাঁর বেশী নেই। যতক্ষণ পেরেছেন উনুনের পাশে বসে থেকেছেন। চিরকাল এই কাঠ-কয়লার আগুনগুলো তাঁকে শীত থেকে বাঁচিয়ে রাখে। আপাদমস্তক মোড়া সরিৎশেখর রোদ উঠলে উঠোনে এসে বসলেন। দুজনে গল্প করছিলেন, আজ সন্ধ্যে থেকে শীত ডবল হয়ে পড়বে। রোদ উঠলেই শীত বাড়ে। অনিমেষ বাজারে গিয়েছিল। শুধু আলু, ঢেঁকিশাক আর চ্যাঁড়শ নিয়ে ফিরে এসে বলল, 'শিকারপুর ফরেস্টের দিকে প্রচণ্ড বন্যা হয়েছে, ভোটপাটি ভেসে গেছে।'

হেমলতা বাজার দেখে বললেন, 'ইস, তুই এতক্ষণ ধরে এই বাজার আনলি ?'

অনিমেষ বলল, 'কিছু থাকলে তো আনব। সবাই মারামারি করে নিয়ে নিচ্ছে যা পাচ্ছে।' অনেক দিন পরে বাজারে গিয়ে অনিমেষ অত্যন্ত বিরক্ত। ফেরত টাকাটা সে দাদুর দিকে বাড়িয়ে দিল।

সরিৎশেখর টাকাটা নিয়ে বললেন, 'মাছ এনেছ ?'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, 'না'।

সরিৎশেখর রাগ করলেন, 'কি আশ্চর্য! তোমাকে আমি যা বলি শোন না কেন? এখন এই তিন মাস মাছ না খেলে তোমার শরীরে বল হবে কি করে? বেশী পড়াশুনা করতে গেলে শরীরে জোর দরকার হয়।'

অনিমেষ হাসল, 'ত্রিশ টাকা সের কাটাপোনা খাওয়ার ইচ্ছে আমার নেই।

অত দামের মাছ তাই সবাই কিনছে না। মাছ না খেলেও আমার চলবে।'

ঠিক এই সময় কেউ একজন বাইরে থেকে অনিমেষের নাম ধরে ডাকতে লাগল। সে বেরিয়ে দেখল ওদের পাড়ারই একটি ছেলে, কংগ্রেস করে, দাঁড়িয়ে আছে। অনিমেষকে দেখে সে বলল, 'তাড়াতাড়ি কংগ্রেস অফিসে চল। মারাত্মক ফ্লাড হয়েছে ওপরের দিকে। নিশীথদা তোমাকে খবর দিতে বললেন—রিলিফ পার্টি যাবে।'

অনিমেষ ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে এক ছুটে দাদুর কাছে ফিরে এল, 'দাদু, বন্যাতে অনেক লোক খুব বিপদে পড়েছে। কংগ্রেস থেকে রিলিফ পার্টি যাচ্ছে, আমাকে ডাকছে।'

হেমলতা কাছেই ছিলেন। সরিৎশেখর কিছু বলার আগেই তিনি বলে উঠলেন, 'তোর যাবার কি দরকার। অনেক বেকার ছেলে আছে, তারা যাক। দু'মাস গেলেই তোর পরীক্ষা।'

অনিমেষ এরকমটাই আশঙ্কা করেছিল, গোঁ ধরে বলল, 'এখন তো পড়াশুনা শুরু হয়নি, মানুষের বিপদ শুনে ঘরে বসে থাকব ?'

সরিৎশেখর নাতির দিকে তাকালেন। হঠাৎ অনেকদিন পরে তাঁর শনিবাবার কথাটা মনে পড়ে গেল। কোন কাজে একে বাধা দিও না। তিনি নাতিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কখন ফিরছ ?'

অনিমেষ বুঝল আর বাধা নেই, 'বুঝতে পারছি না, যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসব। চিন্তার কিছু নেই।'

সরিৎশেখর আর কিছু বললেন না দেখে হেমলতা গজগজ করতে লাগলেন।

কংগ্রেস অফিসে মানুষ গিজগিজ করছে। বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে রিলিফ পার্টি যাচ্ছে। সরকার থেকে সাহায্যে পাওয়া যাচ্ছে, তাছাড়া দলীয় ভাণ্ডার থেকে চিঁড়ে-মুড়ি-গুড়ের বড় বড় থলে বোঝাই করা হয়েছে। অনিমেষ স্বভাবতই নিশীথ-বাবুর দলে যাবে স্থির হল। এর মধ্যে খবর এল বামপন্থীরাও রিলিফের জন্য ব্যবস্থা করছে। তবে তারা এখনও বের হয়নি।

অনিমেষ দেখল প্রত্যেকটা দলকে আলাদা আলাদা করে জায়গা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। ঠিক যাবার মুখটায় বিরামবাবু কংগ্রেস অফিসে এলেন। তিনি সব দেখেশুনে নিশীথবাবুকে একটু আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে গোপনে কিছু পরামর্শ এবং একটা কাগজ দিলেন। শেষ পর্যন্ত ওরা রিলিফ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। একটা ট্রাকে দু' দলের রিলিফ নিয়ে শহর ধরে রায়কতপাড়া দিয়ে

সেনপাড়া ছাড়িয়ে বাঁধের শেষপ্রান্তে ওঁদের নামিয়ে দেওয়া হল। আগে থেকেই সেখানে লম্বা লম্বা ডিঙি-নৌকো প্রস্তুত ছিল। দুটো দল নৌকোগুলো ভাগ করে নিল। অনিমেষদের ভাগ্যে তিনটে ডিঙি জুটল। ওরা থলেগুলো নৌকোতে চাপাতে বেশ ভারী হয়ে গেল সেগুলো। আজ অবধি কখনো ডিঙি নৌকোতে চড়েনি অনিমেষ। জলে ডুবে মরার একটা চান্স নাকি তার আছে। যদিও প্রত্যেকটা নৌকোতে দুজন করে পাকা মাঝি আছে। এক একটা ডিঙিতে ছয়জন মানুষ স্বচ্ছন্দে চড়তে পারে। কোন রকমে ব্যালেন্স রেখে ওরা নৌকোতে উঠল। নিশীথবাবু বললেন, তিনিও কোনদিন ডিঙিতে চড়েননি।

তিস্তার চেহারাটা রাতারাতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। বর্ষার সময় এই রকম মাঝে মাঝে দেখা যায়। যদিও মাথার ওপর এখন কড়া রোদ কিন্তু যে বাতাসটা তিস্তার বুক থেকে ভেসে আসছে সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছে শীতটা বাধ্য হয়ে দূরে অপেক্ষা করছে। অনিমেষ নিশীথবাবুর পাশে বসে ভয়ে ভয়ে জল দেখছিল। গেরুয়া রঙের ঢেউগুলো পাক খেতে খেতে যাচ্ছে। সরু নৌকো বেশ তীরের মত জল ঠেলে ওপরে উঠে যাচ্ছে তীর ধরে।

নিশীথবাবু বললেন, 'বাড়িতে বলে এসেছ?' ঘাড় নাড়ল অনিমেষ। নিশীথবাবু বললেন, 'কখন ফিরব জানি না। আজ দুপুরে আমাদের এই সব খেতে হবে। বুঝলে অনিমেষ, এই হল প্রকৃত দেশসেবা। শুধু বিপ্লবের ফাঁকা বুলি নিয়ে দেশসেবা হয় না।'

বাঁধ ছাড়িয়ে কিছুটা ওপরে যেতেই অনিমেষ স্তম্ভিত হয়ে পড়ল। গাছপালা মাটির ঘরবাড়ি যেন উপড়ে নিয়ে তিস্তা অনেকটা ভেতরে ঢুকে পড়েছে। নতুন তৈরী বাঁধ ভেঙে শহরে ঢুকতে পারেনি বলে তার আক্রোশ এইসব খোলা এলাকায় নির্মমভাবে মিটিয়ে নিয়েছে। এখনও জল এদিকে ছড়িয়ে রয়েছে, তিস্তা ঢুকে পড়েছে অনেকটা। মাঝে মাঝে কলাগাছ কিংবা দু-একটা খড়ের চাল দেখা যাচ্ছে। একটি মানুষ কোথাও নজরে পড়ল না ওদের। অনিমেষ খেয়াল করেনি, নদী ছেড়ে ওরা এখন মাঠের ওপর দিয়ে চলেছে। জলের রঙ দেখে ঠাওর করা মুশকিল। কিছুটা দূরে গিয়ে নৌকোগুলো দুভাগ হয়ে গেল। অন্য দলটা বাঁ দিক ঘুরে ভেতরে ঢুকে পড়ল, অনিমেষদের নৌকো চলল তিস্তার শরীরকে পাশে রেখে সোজা ওপরে।

নিশীথবাবু দু'হাতে চোখ আড়াল করে নদীর অন্য পাড় দেখার চেষ্টা করছিলেন। সমুদ্র দেখেনি অনিমেষ কিন্তু ওর মনে হল সমুদ্র নিশ্চয়ই এই রকম হবে। নিশীথবাবু মাঝিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওপারে যাওয়া যাবে মনে হয়?'

মাঝি, যার সামান্য দাড়ি আছে, বলল, 'আরো আধ ক্রোশ চলেন আগে।' বুক হিম হয়ে গেল অনিমেষের। ওই রকম পাগলা ফুঁসে-ওঠা ঢেউগুলো পার হতে গেলে নৌকো নির্ঘাত ডুবে যাবে। আর এখানে একবার ডুবে গেলে বাঁচবার কোন চান্স নেই। হয় ডেড বডি মঙ্গলঘাটে গিয়ে ঠেকবে, নয় সোজা পাকিস্তানে। সে তার সঙ্গীদের দিকে তাকাল। সবাই চুপচাপ নৌকো ধরে বসে আছে।

সামনে একটা গ্রাম পড়ল। জল এখনও চালের নিচে। এখানে বোধ হয় স্রোতটা মারাত্মক ছিল না, কারণ বাড়িগুলোর কিছু বেঁচে আছে। মাটির ঘর খড়ের চাল। দূর থেকে ওদের দেখে কিছু মানুষ চিৎকার করে উঠল। অনিমেষ দেখল একটা বিরাট ঝাঁকড়া বটগাছের ডালে ডালে অনেকগুলো মানুষ ঝুলছে। তারাই প্রাণপণে চিৎকার করে চলেছে। নৌকো কাছাকাছি হতে অনিমেষের শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বটগাছের কাছাকাছি একটা আমগাছে একজন নগ্ন মানুষ গলায় কাপড়ের ফাঁস দিয়ে ঝুলছে। তার শরীরের চামড়া এখন কালচে, একটা বিকট গন্ধ বেরুচ্ছে শরীরটা থেকে। দুটো শকুন তার দুই কাঁধের ওপর বসে অনিমেষদের দিকে বিরক্ত চোখে চেয়ে আছে। মানুষটার চোখ নেই, শরীরের নানা জায়গায় নিরক্ত ক্ষত।

প্রায় মানুষটির পায়ের তলা দিয়েই ওরা ডিঙি নিয়ে বটগাছটার দিকে এগিয়ে গেল। চিৎকারটা ওদের এগোতে দেখে সামান্য কমে এল, একটি গলা আর্তনাদের স্বরে বলে উঠল, 'আসেন বাবু, আমাগো বাঁচান, তিনদিন খাই না।'

সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলো বিভিন্ন কণ্ঠে আবৃত্তি করল। নিশীথবাবু সাবধানে নৌকোর ওপর উঠে দাঁড়ালেন, 'এই গ্রামে কেউ মারা গেছে?'

সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো কণ্ঠ সংখ্যাটা বলতে লাগল। বটগাছের ডালে বসা মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল অনিমেষ। অনাহার এবং বৃষ্টিতে ভিজে মানুষের চেহারা যে কতটা বীভৎস হতে পারে এদের না দেখলে বোঝা যাবে না। ওরা যে গাছ থেকে নামবে তার উপায় নেই। নৌকোটা গাছের তলায় নিয়ে গেলে একদম নিচের ডালে যারা আছে তাদের হাতে খাবারের ব্যাগ পৌঁছে দেওয়া যায়। নিশীথবাবু মাঝিকে নৌকোটা থামাতে বললেন। তিনজন লোক মারা গেছে। দুজন মহিলা আর একজন বৃদ্ধ। বাকী মানুষ পেছনের দিকে একটা শিবমন্দিরের চূড়ায় আশ্রয় নিয়েছে। খাবার জোটেনি কারো। নিশীথবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওই লোকটা আত্মহত্যা করল কেন?'

'ওর বাবু বড় ব্যথা। জল আইলে ঘর থিকা ইস্ত্রি আর মায়েরে লইয়া হুই উঁচু ঢিবায় রাইখ্য আইছিল। তারপর জলের মধ্যে ঘরে ফিইর্যা জিনিসপত্র যা

পারে লইয়া গিয়া দেখল তারা নাই। জল, ওই রাক্ষুসী তিস্তামাগী অগো খাইছে।' আমরা তখন যে যার প্রাণ বাঁচাই। এক রাত ওই আমগাছে বইস্যা থাইক্যা শেষমেষ পরনের বস্ত্র দিয়া আমাগো সামনে গলায় ফাঁস দিল, বাবু।'

ঘটনা শুনে অনিমেষ চোখের জল সামলাতে পারল না। এই তিন দিন তিন রাত ওরা শহরে বসে এসব ঘটনার কিছুই জানতে পারেনি। এতক্ষণ একটানা কথা বলে লোকটার গলা ধরে এসেছিল। এবার সবাই মিলে খাবার চাইতে লাগল। অনিমেষের সঙ্গীরা থলির মুখ খুলছিল কিন্তু নিশীথবাবু তাদের হাত নেড়ে একটু অপেক্ষা করতে বললেন। তারপর লোকগুলোর দিকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই গ্রামটার নাম কি?'

নামটা শুনে নিশীথবাবু চট করে পকেট থেকে বিরামবাবুর দেওয়া কাগজ বের করে তাতে কি দেখে নিলেন। অনিমেষ দেখল, নিশীথবাবুর মুখ বেশ গম্ভীর হয়ে গেছে। খানিক ভেবে নিয়ে মাঝিকে নৌকো ঘোরাতে বললেন। মাঝি বোধ হয় একদম আশা করেনি হুকুমটা, ফস করে জিজ্ঞাসা করে বসল, 'অগো খাবার দিবেন না?'

নিশীথবাবু বললেন, 'আমাদের আরো দুর্গম জায়গায় যেতে হবে। এখান থেকে জল হয়তো আজ দুপুরেই নেমে যাবে, তাছাড়া অন্য পার্টিও রিলিফ নিয়ে আসতে পারে।'

ওরা যে চলে যাচ্ছে মানুষগুলো প্রথমে বুঝতে পারেনি। কিন্তু সেটা বোঝামাত্র কান-ফাটানো চিৎকার উঠল। কাকুতি-মিনতি থেকে শুরু করে কান্না—অনিমেষের বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল। নিশীথবাবু এটা কি করে করলেন? অভুক্ত মানুষগুলোকে কিছু খাবার দিয়ে গেলে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হত! তাছাড়া কাগজের লেখাটা দেখার আগে পর্যন্ত ওঁর মুখ দেখে মনে হয়নি আরো দুর্গম জায়গার জন্য এই খাবারগুলোকে রাখতে হবে। ডিঙি নৌকো দূরে চলে যাচ্ছে দেখে এবার গালাগালি শুরু হল। পৃথিবীর শেষতম অশ্লীল ভাষায় গালাগালিগুলো শুনতে শুনতে অনিমেষ বলল, 'স্যার, না খেতে পেলে এরা মরে যাবে। কিছু দিলে ভাল হত—।'

অনিমেষের দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন নিশীথবাবু। জবাব দেবার কোন প্রয়োজন মনে করলেন না যেন। অনিমেষ দেখল কয়েকজন বোধ হয় আর থাকতে না পেরে গাছ থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর প্রাণপণে সাঁতার কেটে কাছে আসবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু নৌকো তখন অনেক দূরে, ওদের নাগালের বাইরে। এর ভাঙা ঘর, ওর উঠোনের পাশ দিয়ে ওরা চলেছে।

হঠাৎ অনিমেষের চোখে পড়ল একজন প্রায় পুঁটলি হয়ে যাওয়া বুড়ী একটা ভাঙা ঘরের টলে থাকা খড়ের চালে কোন রকমে বসে আছে। কিছু একটা আসছে বুঝতে পেরে চোখে হাতের আড়াল দিয়ে অদ্ভুত খনখনে গলায় বলে উঠল সে, 'কে যায়—অ মণি—আইলি নাকি?' ওরা কেউ কোন কথা বলল না, নিঃশব্দে জায়গাটা পার হয়ে গেল। বুড়ী তখনও কেটে যাওয়া রেকর্ডের মত বলে যাচ্ছে, 'অ মণি—কথা ক', 'অ মণি—কথা ক'।

নিশীথবাবু এবার অনিমেষের দিকে ফিরে তাকালেন। একটু অস্বস্তি হচ্ছে ওঁর মুখ দেখলে বোঝা যায়। যেন নিজের সঙ্গে কথা বললেন উনি, 'নিজেকে শক্ত করো অনিমেষ। আজকেই ওরা খাবার পেয়ে যাবে। কম্যুনিস্টরা গতবার এদের ভোট পেয়েছিল, খাবার ওরাই পৌঁছে দেবে।'

কেউ যেন লক্ষ কাঁটাওয়ালা চাবুক দিয়ে ওকে আচমকা আঘাত করেছে, অনিমেষ সোজা হয়ে বসলো, 'আপনি এইজন্য ওদের খাবার দিলেন না?'

'পরগাছা দেখেছ? যাদের খাবে তারই সর্বনাশ করবে! কংগ্রেস সরকার এদের আশ্রয় দিয়ে গ্রাম তৈরি করে দিয়েছিল, তার বিনিময়ে ওরা কম্যুনিস্টদের ভোট দিচ্ছে। জেনেশুনে মানুষ দ্বিতীয়বার ভুল করে না। তাছাড়া আমাকে হুকুমমত কাজ করতে হচ্ছে।'

অনিমেষ বলতে গেল, 'কিন্তু—।'

'না, আর কথা নয়। রাশিয়াতে কোন কম্যুনিস্ট যদি এই রকম পরিস্থিতিতে তার দলনেতাকে প্রশ্ন করত তাহলে তার চরম শাস্তি হয়ে যেত। কিন্তু যেহেতু আমরা বাক্-স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি, তাই তুমি প্রশ্নটা করতে পারলে। তফাৎটা বুঝতে চেষ্টা করো।'

অনিমেষ পেছন ফিরে তাকাল। সেই গ্রামটা অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। 'অ মণি কথা ক' বৃদ্ধার গলাটা ভুলতে পারছে না সে। হঠাৎ ওর মনে হল সুভাষ বোস, গান্ধীজী যদি এ পরিস্থিতিতে পড়তেন তাহলে তাঁরা কি করতেন। নিশ্চয়ই নিশীথবাবুর মত কথা বলতেন না। মানুষের খাবার নিয়ে, একদম নিঃস্ব হয়ে যাওয়া মানুষের বাঁচবার অধিকার নিয়ে যে রাজনীতি চলছে তা সমর্থন না করলে যদি রাজনীতি না করা যায় তবে দরকার নেই তার রাজনীতি করে। ওর মনে পড়ল নিশীথবাবু অনেকদিন আগে একবার বলেছিলেন, 'যারা বাস্তুহারা, বন্দেমাতরম্ মন্ত্র তাদের মুখে আসতেই পারে না।' কথাটা আজ এতদিন বাদে তিনি নিজের আচরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন নতুন করে। আচ্ছা, কম্যুনিস্টরাও কি কোন কংগ্রেসী গ্রামে গেলে রিলিফ দেবে না? কি জানি! অনিমেষ আর ভাবতে পারছিল না।

যত ওপরে উঠছে ওরা তত নদী ছোট হচ্ছে। সেই সঙ্গে স্রোতের দাপট বাড়ছে। মূল নদী দিয়ে নৌকো বাওয়া অসম্ভব হত। অনিমেষ দেখল অজস্র গাছপালা নদী দিয়ে ভেসে যাচ্ছে, আজ তাদের ধরতে কোন মানুষ নদীতে নামেনি। এত বেলা হল, সূর্য মাথার ওপর তার পা রাখল, কিন্তু খিদে পাচ্ছে না এতটুকু। খাওয়ার কথা বলছে না কেউ। এমন সময় মাঝি বলল, 'বাবু, ওপারে যাওয়া হইব না।'

নিশীথবাবু ঘাড় নাড়লেন, 'বুঝতে পেরেছি। তাহলে এদিকটাই সেরে যাই। আরো বাঁদিকে একটা গ্রাম আছে সেখানে চল।'

বাঁ দিকটা বেশ জঙ্গল, জল বোধ হয় উঠতে পারেনি সেখানে। কারণ নদী থেকে সেটা অনেকটা উঁচুতে। কিন্তু সেই জঙ্গলে ডাঙাটাকে পাশ দিয়ে তিস্তার একটা স্রোত ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। কিছু দূর যেতেই জঙ্গলের মধ্যে একটা মানুষ চিৎকার করে কিছু বলল। নিশীথবাবু মাঝিকে ভাল জায়গা দেখে নৌকো ভেড়াতে বলতে সে বলল, 'বাবু, এডা তো কুষ্ঠরোগীদের গ্রাম।'

নিশীথবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, সেখানেই যাব। কুষ্ঠ রোগীরা কি মানুষ নয়?'

ডেঙ্গো জমিটায় জল ওঠেনি। চারপাশে জলের মধ্যে নৈবেদ্যর চূড়ার মত মাথা উঁচু করে জেগে রয়েছে জায়গাটা। সূর্য এখন মাথার ওপর থেকে পশ্চিমে সামান্য হেলেছে কিন্তু আকাশটার চেহারা আবার টসকেছে। বৃষ্টির মেঘ নয়, কিন্তু একটু একটু করে ঘোলাটে হয়ে উঠছে আকাশ, রোদের চটক ফট করে মরে গেল।

অনিমেষ ডাঙ্গার দিকে তাকাল। কুষ্ঠরোগীরা থাকে এখানে! একটা চিৎকার অবশ্য শুনেছিল সে, কিন্তু এখন কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ঘন জঙ্গল ভেদ করে দৃষ্টি বেশী দূরে যায়ও না। সকাল থেকে এত রোদ হল তবু এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে গাছের পাতায় ডালে এখনও স্যাঁতসেতে ভাবটা আছে। কতখানি এলাকা নিয়ে ডাঙ্গাটা কে জানে। তবে বেশ উঁচুতে। কিন্তু এরকম ঘন জঙ্গলে মানুষ থাকে কি করে! বাইরে থেকে তো কোন ঘরবাড়ি চোখে পড়ছে না, কুষ্ঠরোগীরা তো মানুষ—অনিমেষ নিশীথবাবুর দিকে তাকাল।

পরিষ্কার মত একটা জায়গা-দেখে নৌকোটা ভেড়ানো হল। নিশীথবাবু নৌকো থেকে নেমে কয়েক পা হেঁটে ভেতরে গিয়ে বোধ হয় কাউকে দেখতে না পেয়ে আবার ফিরে এলেন, 'আরে মালগুলো নৌকো থেকে নামাও, চুপচাপ বসে আছ কেন?'

এক এক করে ব্যাগগুলো মাটিতে নামানো হলে মাঝি বলল, 'বাবু, কত সময় লাগব?'

নিশীথবাবু বললেন, 'তোমার সঙ্গে তো সারাদিনের চুক্তি আছে, অপেক্ষা করো।'

এতক্ষণ নৌকোয় বসে শুধু জল দেখতে দেখতে অনিমেষের একঘেয়ে মনে হচ্ছিল, হাত পা নাড়তে না পেরে খিল ধরে যাবার যোগাড়—এখন হাঁটতে পেরে স্বস্তি হল। বন্যার্তদের জন্য রিলিফ নিয়ে এসেছে অথচ এখানে তো বন্যার জল ওঠেইনি। কথাটা নিশীথবাবু শুনে খুব বিরক্ত হলেন, 'কি আশ্চর্য, এটুকু তোমার মাথায় ঢুকল না যে যারা জলে আটক হয়ে থাকে তারা খাবারের অভাবে অভুক্ত থাকবেই। জলবন্দীরা যে বন্যার্ত নয় তা তোমায় কে বলল?'

অনিমেষ উত্তর দিল না কিন্তু নিশীথবাবুর কথাটা সে মানতে পারছিল না। অনেক ভিখিরী দু'তিন দিন না খেয়ে থাকে শহরের রাস্তায়, কই তাদের তো রিলিফ দিতে যাওয়া হয় না। বন্যা এসে যাদের উৎখাত করেছে তারাই তো বন্যার্ত।

এমন সময় নিশীথবাবু বললেন, 'সবার যাবার দরকার নেই। তোমরা তিনজন আমার সঙ্গে এস।' আঙুল দিয়ে তিনি অনিমেষ আর দুজনকে ডাকলেন। বাকীরা থেকে গেল সেখানেই। ওদের মুখ দেখে অনিমেষ বুঝতে পারছিল যেতে না হওয়ায় ওরা খুব সন্তুষ্ট হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, নৌকো থেকে নামতেই সবাই দ্বিধা করছিল। যাওয়ার আগে একটা ব্যাগ খুলে নিশীথবাবু থেকে যাওয়া সঙ্গী এবং মাঝিদের কিছু খাবার দিলেন। চিঁড়ে গুড় আর লালচে রঙের পাউরুটি। এখন এই দুপুর পেরোনো সময়টায় এই সামান্য খাবার দেখেই অনিমেষের জিভে জল এসে গেল। ও যেন হঠাৎই টের পেল ওর প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। খিদে একদম সহ্য করতে পারে না ও। আজ অবধি অসময়ে খেতে হয়নি কখনো। কিন্তু আজ সকাল থেকে এই নৌকোয় নৌকোয় ঘুরে আর সেই গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলে থাকা লোকটাকে দেখার পর থেকে ওর খিদের অনুভূতিটা উধাও হয়ে গিয়েছিল। এখন হঠাৎ সেটা ফিরে এল।

কিন্তু নিশীথবাবু ব্যাগের মুখ বন্ধ করে প্রত্যেকের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ওঁর সঙ্গে এগোতে বললেন। অনিমেষদের সঙ্গী একটা মোটা মতন লোক এমন সময় বলে ফেলল, 'বন্যার্তদের খাবার দিতে গিয়ে আমরাই ক্ষুধার্ত হয়ে গেলাম। একটু খেয়ে নিয়ে গায়ে জোর করলে হত না?'

নিশীথবাবু বললেন, 'না না, আমরা এখানে বসে খাওয়া-দাওয়া করলে যাদের জন্য খাবার এনেছি তারা কি ভাববে? ওদের দিয়ে তবে খাওয়া যাবে।'

লোকটি মাথা নাড়ল, 'না, সে কথা ছিল না। তিনটে টাকা আর খিদের সময়

খাবার এই রকম কথা পেয়ে কাজে এসেছি। এখন উল্টোপাল্টা বললে চলবে কেন?'

কথাটা শুনে লোকটার দিকে অবাক হয়ে তাকাল অনিমেষ। সে কি! বন্যার্তদের সেবা করতে ও টাকা নিচ্ছে কংগ্রেসের কাছ থেকে? তার মানে যারা আজ রিলিফ দিতে এসেছে তারা কেউ সত্যিকারের কংগ্রেসী নয়, শুধু নিশীথবাবুর মত দু'একজন ছাড়া!

নিশীথবাবু খুব অস্বস্তিতে পড়েছেন বোঝা গেল, 'খিদে পেয়েছে তো এতক্ষণ নৌকোয় বসে খেলে না কেন? কাজের সময় যত ঝামেলা করো!'

'আমি তো মানুষ! আপনি লোকগুলোকে খেতে দিলেন না, আমি খাই কি করে? ঠিক আছে, চলুন, যা বলবেন করছি, দেখবেন টাকাটা যেন না মারা যায়।'

লোকটা ব্যাগ নিয়ে হাঁটা শুরু করল। নিশীথবাবু চাপা গলায় অনিমেষকে শুনিয়ে বললেন, 'এই সব লোক নিয়ে দেশে বিপ্লব হবে, ভাবো!'

জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতেই একজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। লোকটা বোধ হয় অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছিল, এখন কাছে আসতেই মুখোমুখি হল। বেঁটে মতন, গায়ে কাপড় জড়ানো এবং মুখচোখ ভীষণ ফোলা-ফোলা। ওদের দিকে তাকিয়ে লোকটা বলে উঠল, 'কি আছে ব্যাগে, খাবার?'

নিশীথবাবু ঘাড় নাড়লেন, 'কংগ্রেস থেকে রিলিফ নিয়ে এসেছি।'

লোকটা ঘাড় নাড়ল, 'খুব বান এসেছিল, শহর ভেসে গেছে?'

নিশীথবাবু বললেন, 'শহরে জল ঢোকেনি।'

লোকটা বলল, 'আমাদের এখানেও না। তবে কাল থেকে কেউ কিছু খাইনি, না এলে নৌকো ডুবিয়ে দিতাম। আসুন, মোড়ল আপনাদের নিয়ে যেতে বলেছে।'

প্রথম দিকে লোকটার কথাবার্তা ছিল এক ধরনের, শেষ কথাটা বলার সময় ওকে খুব রাগী-রাগী লাগল। লোকটার পিছু পিছু ওরা হাঁটতে লাগল। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা পথ বেশ পরিষ্কার। কিছু দূর যেতেই আর বাইরের জল চোখে পড়ল না। পথের ধারে ময়লা রক্তমাখা ফেটি পড়ে আছে। দেখেই গা ঘিনঘিন করে উঠল অনিমেষের। নিশীথবাবু নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে সেগুলোকে টপকে যেতে বললেন। কিছুটা যেতেই জঙ্গলটা যেন চট করে উধাও হয়ে গেল। সামনে বিরাট মাঠের মত পরিষ্কার জমি, তার চারধারে ছোট ছোট খেলার ঘরের মত ঘর। ঘরগুলোর চালে টিন দেওয়া, দেওয়াল যে যেরকম পেরেছে দিয়েছে।

যে-কোন ঘরেই মাথা নিচু করে ঢুকতে হয়। তবে ঠিক মধ্যিখানে বেশ শক্তমতন বিরাট চালাঘর। তার তলায় বেঞ্চি করে কাঠের খুঁটি পুঁতে রাখা হয়েছে। মাঠের এক কোণে অনেক মানুষ চুপচাপ বসে আছে। দূর থেকে তাদের ময়লা কাপড়ের স্তূপ বলে মনে হচ্ছিল। ওরা খোলা জমিতে এসে পড়তেই লোকটা ওদের সেখানে দাঁড়াতে বলে দ্রুত সেদিকে চলে গেল। নিশীথবাবু চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'কিভাবে এরা বেঁচে আছে ছাখ। আর শোন, এদের সামনে তোমরা এমন কিছু করো না যাতে এরা আঘাত পায়।'

মোটা লোকটা বলল, 'একদম কুষ্ঠরোগীদের ডেরায় নিয়ে এলেন, এ রকম কথা ছিল না।'

নিশীথবাবু কথাটা শুনেও যেন শুনলেন না। অনিমেষ দেখল দুজন লোক সেই জটলা থেকে ওদের চিনিয়ে নিয়ে আসা লোকটির সঙ্গে উঠে এসে চালাঘরটার নিচে দাঁড়াল। পথ-প্রদর্শকটি এগিয়ে এসে ওদের বলল, 'আসুন, মোড়ল আপনাদের সঙ্গে কথা বলবে।'

নিশীথবাবুর পেছন পেছন ওরা চালাঘরটার দিকে এগিয়ে গেল। এখন রোদ নেই, একটু একটু ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। সমস্ত মাঠটা জুড়ে অদ্ভুত মায়াময় একটা ছায়া নেমেছে। হাঁটতে হাঁটতে অনিমেষ সেই বাতাসে একটা শুঁটকো গন্ধ পেল, গন্ধটা গা গুলিয়ে দেয়। মোটা লোকটি ফিসফিস করে বলল, 'কেউ শালা টেঁসেছে নির্ঘাত।'

শহর থেকে এ জায়গাটা বেশী দূরে নয়, কিন্তু এ অঞ্চলে অনিমেষরা কখনো আসেনি। তিস্তার তীর ধরে পায়ে হেঁটে নিশ্চয়ই এদিকের মানুষজন যাওয়া আসা করে। শহরে যে সব কুষ্ঠরোগীদের ভিক্ষে করতে দেখা যায় তারাই যে এতটা দূর হেঁটে এই ডেরায় ফিরে আসে আগে জানতো না অনিমেষ। ওর মনে পড়ল, কোনদিন বিকেলবেলায় ও শহরের রাস্তায় একজন কুষ্ঠরোগীকেও ভিক্ষে করতে ছাখেনি। এক-একজনকে দেখে মনে হত এ নিজে হাঁটতে পারবে না, অথচ কি করে যে সে আসে এবং উধাও হয়ে যায় কিছুতেই ধরতে পারত না সে।

ওদের এগিয়ে যেতে দেখে দূরের জটলার ভেতর থেকে একটা গুঞ্জন উঠল। ব্যাগগুলো যে খাবারের বুঝতে নিশ্চয়ই কারো অসুবিধে হচ্ছে না। চালাঘরের নিচে দাঁড়ানো একজন লোক হাত তুলে নিষেধ করতেই গুঞ্জনটা চট করে থেমে গেল।

চালাঘরের সামনে এসে অনিমেষ মাটিতে চোখ নামিয়ে ফেলল। একটা শীতল স্রোত যেন হঠাৎই নড়েচড়ে পা থেকে মাথায় উঠে এল। এক পলক

তাকিয়েই আর তাকাবার শক্তিটা খুঁজে পেল না সে। যে লোক দুটি সামনে দাঁড়িয়ে আছে তাদের গায়ে পা-ঝুল-শার্ট, শার্টের ওপর ছেঁড়া কোট চাপানো। কোমর থেকে একটা ময়লা চিরকুট কাপড় লুঙ্গির মত হাঁটুর নিচ অবধি জড়ানো। পায়ে কাপড়ের জুতো আছে। কিন্তু একটা লোকের বাম হাত কবজির পর শেষ হয়ে গিয়েছে, মুখের দিকে তাকালে চোখে এক লক্ষ সূঁচ ফোটে। কারণ তার নাক নেই, চুলগুলোর জায়গায় লাল চামড়া দগদগ করছে। অন্য জনের অবস্থা আরো বীভৎস। তার কানের লতি যেন ছিঁড়ে পড়েছে। ওপরের ঠোঁট না থাকায় দাঁতগুলো ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। কারোরই চোখে পাতা নেই, দ্বিতীয় জনের আঙুলগুলো ছোট হয়ে এসেছে, একটা আঙুল গোড়া থেকে খসে গিয়ে চামড়ায় লেগে ঝুলছে।

চালাঘরের ঠিক মধ্যিখানে বেঞ্চিগুলোর গায়ে ইটের গোল চৌহদ্দিতে আগুন জ্বলছে। কাঠের আগুন। ইটগুলো উঁচু বলে ওরা দূর থেকে এটাকে লক্ষ্য করেনি। আগুনটা এইভাবে জ্বলছে, কি কাজে লাগে কে জানে।

'আপনারা কেন এসেছেন?'

একটু খোনা খোনা গলায় দুজনের একজন কথা বলল। অনিমেষ মুখ তুলে দেখল না তবে অনুমান করল নিশ্চয়ই হাতহীন লোকটি প্রশ্নটা করেছে। নিশীথবাবু নিশ্চয়ই একটু দমে গিয়েছিলেন, কারণ উত্তরটা দিতে তিনি ইতস্তত করছেন বোঝা গেল, 'মানে, চারধারে বন্যার জলে সব ভেসে গেছে, আপনারাও নিশ্চয়ই খাবার পাননি, আমরা রিলিফ নিয়ে বেরিয়েছি—তাই চলে এলাম।'

উত্তরটা শুনে খোনা গলা বলল, 'ভালই হল। আমাদের অবশ্য দু দিনের খাবার মজুত ছিল—কি আছে ওতে?'

নিশীথবাবু বললেন, 'পাঁউরুটি, চিঁড়ে আর গুড়।'

'খুব ভাল, খুব ভাল।' খোনা গলা আবার বলল, 'আসুন, ব্যাগগুলো ওখানে রেখে এই বেঞ্চিতে আপনারা বসুন।'

নিশীথবাবুর আদেশের জন্য ওরা অপেক্ষা করল না, ব্যাগগুলো নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল। এখানে বসার কি দরকার, এবার চলে গেলেই হয়। অনিমেষ লক্ষ্য করছিল, নিশীথবাবু আপনি-আপনি করে কথা বলছিলেন। অবশ্য খোনা গলার লোকটার কথা বলার ধরনে ভিখিরীসুলভ কোন ব্যাপারই নেই, বরং বেশ কর্তৃত্বের সুর প্রকাশ পাচ্ছিল।

মোটা লোকটা ব্যাগ নামানোর পর যেন মুক্তি পেয়ে বলল, 'চলুন যাওয়া যাক।'

নিশীথবাবু এবারও তার কথায় কান দিলেন না। বরং আস্তে আস্তে চালাঘরের

ভেতর ঢুকে বেঞ্চিতে বসলেন। অন্য লোক দুটো তাঁর সামনে হেঁটে উল্টো দিকের বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। তৃতীয় লোকটি যে ওদের এখানে নিয়ে এসেছে, বডিগার্ডের মত পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। নিশীথবাবু বসে ওদের দিকে তাকালেন, 'কি হল, তোমরা ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?' অগত্যা অনিমেষকে চালাঘরে ঢুকতে হল, ও বুঝতে পারল মোটা লোকটি বেজার মুখে ওর সঙ্গে আসছে।

বেঞ্চিতে বসা মাত্র কাঠের আগুনের ওম্ ওদের শরীরে লাগল। বাইরে যে হিম বাতাস বইছিল তার চেয়ে এই উত্তাপ অনিমেষের কাছে আরামদায়ক মনে হল। মোটা লোকটি অনেক ইতস্তত করে বেঞ্চিতে বসল। তার বসবার ধরনটা সবার নজরে পড়েছিল, কারণ এই সময় খোনা লোকটি বলে উঠল, 'চিন্তা করবেন না, যে সমস্ত রোগী সংক্রামক তারা এই বেঞ্চিতে বসে না। আপনি স্বচ্ছন্দে বসুন।'

অনিমেষ এতক্ষণে আবার সামনের দিকে তাকাল। তার অনুমানই ঠিক, যার নাক নেই সে এতক্ষণ কথা বলছিল। নিশ্চয়ই এ হল মোড়ল, আর দাঁত বের করা লোকটি ওর সহকারী। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর চেহারাগুলো ক্রমশ ওর সহ্য হয়ে গেল। অভ্যাস হয়ে গেলে সব কিছু এক সময় মেনে নেওয়া যায়। এই সময় মোড়ল খোনা গলায় বলল, 'খোকা, খিদে পেয়েছে মনে হচ্ছে, নৌকো করে আসতে খুব কষ্ট হয়েছে?'

অনিমেষ চটপট ঘাড় নাড়ল, না।

নিশীথবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, আপনাদের এখানে কতজন আছেন?'

'একশ তিনজন ছিলাম আজ সকাল পর্যন্ত, একজন একটু আগে মারা গিয়েছে। কেন বলুন তো? আপনারা কি সরকারী লোক?' লোকটি কথা বলার সময় মাঝে মাঝে কোটের হাতা দিয়ে নাকের জায়গাটা মুছছিল। অন্য লোকটি এখনও একটাও কথা বলেনি, শুধু তখন থেকে সে অন্যমনস্ক ভাবে তার ঝোলা আঙুলটা মুচড়ে যাচ্ছিল।

নিশীথবাবু তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'না না, আমরা কংগ্রেস থেকে রিলিফ দিচ্ছি। সরকারী লেভেলে এসব করতে সময় লাগে।'

মোড়ল বলল, 'ও একই হল। কংগ্রেস আর সরকার তো আলাদা নয়। তা সরকার তো আমাদের সাহায্য দেয় না; শহরে ভিক্ষে করতে গেলে পুলিস ঝামেলা করে।'

নিশীথবাবু বললেন, 'সবে তো আমরা স্বাধীন হয়েছি, এখনও সব দিক সামলে ওঠা সম্ভব হয়নি। চিন্তা করবেন না, আমি গিয়ে ডি সি'র সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলব।'

মোড়ল বলল, 'ভাল, খুব ভাল।' তারপর সে তার বডিগার্ডকে বলল, 'এঁদের খাবার ব্যবস্থা কর, এত দূর থেকে এসেছেন আমাদের উপকার করতে।'

সঙ্গে সঙ্গে নিশীথবাবু বলে উঠলেন, 'না না, আপনাদের ব্যস্ত হবার দরকার নেই। আমরা ফিরে গিয়ে খাব।'

মোড়ল বলল, 'আপনি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন। তিনজন লোক আমাদের সবার জন্য রাঁধে। তাদের অসুখ আছে কিন্তু তা একদম সংক্রামক নয়। আজ পাঁচ বছর হল অসুখ তাদের বাড়ে নি।'

নিশীথবাবু বললেন, 'ঠিক আছে, আমরা এই রুটি গুড় খাচ্ছি।' মাথা ঘুরিয়ে তিনি মোটা লোকটিকে বললেন, 'কিছু রুটি আর গুড় ব্যাগ থেকে বের করে আনো তো!'

তড়াক করে মোটা লোকটা উঠে গিয়ে ব্যাগের মুখ খুলতে লাগল। যদি এদের রান্না-করা খাবার খেতে হয় সেজন্য সে এক মুহূর্ত ব্যয় করতে রাজী ছিল না। অনিমেষ দেখল আকাশ আবার কালো হয়ে আসছে।

নিশীথবাবু বললেন, 'আচ্ছা, আপনাদের এখানে যত লোক আছেন তাঁদের মধ্যে মোটামুটি সুস্থ কজন? মানে মুখচোখ দেখে বোঝা যায় না তাঁদের অসুখ হয়েছে, আমি এরকম লোকের সংখ্যা জানতে চাইছি।'

বিকৃত মুখচোখ হলেও বোঝা গেল মোড়ল খুব অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে। কয়েক মুহূর্ত তাকে ভাবতে দেখল অনিমেষ। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'এভাবে বলা মুশকিল।'

নিশীথবাবু বললেন, 'তবু—।'

মোড়ল বলল, 'এই রোগ হয়েছে জানলেই আপনারা সংসার থেকে বার করে দেন, তা আজ মুখচোখ খেয়ে যায়নি এরকম লোকের সন্ধান করছেন, উদ্দেশ্যটা কি?'

নিশীথবাবু বললেন, 'আমরা একটা জিনিস চিন্তা করেছি, তাতে আপনাদের উপকার হবে।'

মোড়ল বলল, 'উপকার পেলে কে না নিতে চায় বলুন। তবে কেমন বিশ্বাস হয় না। এই দেখুন, এতদিন কেউ আসেনি এখানে, রাখালগুলো গরু চরাতে পাশের মাঠে এসে লক্ষ্য রাখত যেন কোন গরু দলছাড়া হয়ে এখানে না ঢুকে পড়ে। তা এখন এত জল হল, বৃষ্টি হল, চারধারে ভেসে গেল মানুষ—এই এখন আপনারা এলেন খাবার নিয়ে। আবার শুনছি উপকারও হবে—। কি জানি!'

মোটা লোকটি খাবার নিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে এসেছে ততক্ষণে। ব্যাগের

মধ্যে কি কি ছিল ছ্যাখেনি অনিমেষ। এখন মোটা লোকটি ওর হাতে একটা লালচে হাফ পাউণ্ড রুটি আর এক ঢেলা আখের গুড় দিতে ও নিশীথবাবুর দিকে তাকাল। নিশীথবাবুরও তাই বরাদ্দ এবং তিনি তা স্বচ্ছন্দে খেতে আরম্ভ করেছেন। মোটা লোকটি ইচ্ছে করেই চারটে রুটি এনেছে যাতে নিজেরটা শেষ করে সে চটপট অতিরিক্তটা খেতে পারে। দুপুরবেলায় আজ অবধি সে ভাত ছাড়া কোনদিন অন্য কিছু খায় নি। খুব ছোটবেলায় কারো বাড়িতে দুপুরে রুটি হলে ওর মনে হত তারা খুব গরীব, ভাত খাওয়ার সামর্থ্য নেই। এই পরিবেশে ওর এতক্ষণ খিদে বোধটা ছিল না, কিন্তু শুকনো রুটিতে একটা কামড় দিতেই মনে হল পেটের ভেতর আগুন জ্বলছে। এখন এই খিদের মুখে ওর মনে হল এত ভাল খাবার অনেকদিন সে খায় নি।

নিশীথবাবু বললেন, 'আপনারা খাবেন না ?'

মোড়ল বলল, 'আমরা দুবার খাই। উদয় এবং অস্তকালে। আপনারা চিন্তা করবেন না। এখানে কত রুটি আছে ?'

নিশীথবাবু একটা আনুমানিক সংখ্যা বললে মোড়ল হাত নেড়ে বডিগার্ডকে ডেকে ফিসফিস করে কিছু বলতেই সে সোজা দূরের জটলার কাছে চলে গেল। শুকনো রুটি গলায় আটকে যাচ্ছিল, একটু জল পেলে হত। কিন্তু মোটা লোকটা ফিসফিস করে বলল, 'খবরদার, জল খাবেন না। কলেরা হবে। লালা দিয়ে ভিজিয়ে ভিজিয়ে গিলে ফেলুন।'

এমন সময় অনিমেষ দেখল বডিগার্ডটার পেছন পেছন সমস্ত কুষ্ঠরোগীরা উঠে আসছে। মোটা লোকটা ফিসফিসিয়ে বলল, 'চলেন এই বেলা যাই।'

এগিয়ে আসা দলটার দিকে তাকিয়ে মোড়ল বলল, 'আমাদের এখানে একুশ-জন মেয়েছেলে আছে। তার মধ্যে সাতজন বুড়ী—তেমন হাঁটাচলা করতে পারে না, যে মারা গেছে সেটা মেয়েছেলে ছিল—বাচ্চা হতে গিয়ে মারা গেল।'

নিশীথবাবু অন্যমনস্ক গলায় বললেন, 'তাঁর স্বামীও এখানে আছেন ?'

মোড়ল বলল, 'আছে তবে খুঁজে বের করা যাবে না।'

বডিগার্ড ততক্ষণে ওদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। একটা বিরাট সাপের মত হয়ে সেটা মাঠময় কিলবিল করছে। অনিমেষ ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনে দেখল মোটা লোকটি তার পাশে চোখ বন্ধ করে বসে আছে। এখন অনিমেষের আর সেই ভয়-ভয় ভাবটা নেই। সে স্থির চোখে লোকগুলোকে দেখল। মেয়েরা আছে, তবে তাদের প্রায় প্রত্যেকের হাত-পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। এতক্ষণ লক্ষ করেনি, এখন অনিমেষ দেখল বডিগার্ডের ডান হাত থেকে মাঝে মাঝে টপটপ করে

রক্ত মাটিতে পড়ছে। ওর হঠাৎ সেই অনেকদিন আগের এক সকালবেলার কথা মনে পড়ে গেল। তিস্তার ওপর নৌকোয় বসে সে আঙুলহীন যে মানুষটির হাত ধরে বাঁচিয়েছিল সে কি এখানে আছে? কুষ্ঠরোগীরা কতদিন বাঁচে? সেই লোকটা কি এখন বেঁচে নেই? অনিমেষ এখনও চোখ বন্ধ করলে তার সেই চিৎকারটা শুনতে পায়, 'কেন বাঁচালি?' 'কেন বাঁচালি?' অনিমেষ উঠে দাঁড়িয়ে লাইনটাতে ভাল করে সেই মানুটিকে খুঁজতে লাগল। এমন সময় ওর নজরে পড়ল মাঠের শেষপ্রান্তে যেখানে এতক্ষণ মানুষগুলো বসেছিল সেখানে একটা শরীর ময়লা কাপড় মুড়ি দিয়ে টান-টান হয়ে শুয়ে আছে। যে মেয়েটির কথা একটু আগে মোড়ল বলছিল সে মাঠের ওপর মরে পড়ে আছে। মরে যাওয়া মানে বেঁচে যাওয়া—মাঝিটার সেই কথা এখন ভীষণরকম সত্যি বলে মনে হল অনিমেষের।

গুঞ্জন থেকে হইচই শুরু হয়ে গেল আচমকা। সবাই এগিয়ে এসে আগে ব্যাগটার কাছে পৌঁছতে চায়। বডিগার্ড চিৎকার করে তাদের সামাল দেবার চেষ্টা করছে কিন্তু তার একার পক্ষে সেটা প্রায় অসম্ভব। অনিমেষ মুখগুলো দেখল, প্রত্যেকটি মুখ কিছু পাবার আশায় বীভৎস হয়ে উঠেছে। শেষতক মোড়ল উঠে সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তাকে দেখে ক্রমশ হইচইটা কমে এল। মোড়ল চিৎকার করে তাদের থামতে বলে কথা শুরু করল, 'এইসব খাবার আমাদের জন্য। এই বাবুরা কংগ্রেস থেকে আমাদের জন্য এত জল ভেঙে নিয়ে এসেছেন। কেউ কেড়ে নেবে না, সবাই পাবে। যে বেয়াদপি করবে আমি তাকে ক্ষমা করব না। প্রত্যেকে লাইন দিয়ে খাবার নিয়ে যা।'

সাধারণ দেখতে এই লোকটির এত প্রভাব নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করত না অনিমেষ। সবাই চুপচাপ এসে খাবার নিতে লাগল। বডিগার্ড এক একটা রুটিকে কয়েক টুকরো করে কিছু চিঁড়ের সঙ্গে ওদের হাতে দিচ্ছিল। এই সময় মোড়ল ফিরে এসে নিশীথবাবুকে বলল, 'এইবেলা আপনি দেখে নিন প্রত্যেককে। আপনার কাজে লাগবে কি না।' নিশীথবাবু বোধ হয় একটু নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলেন, এখন সোজা হয়ে বসে ওদের লক্ষ্য করতে লাগলেন। তিনি খুব খুশী হচ্ছেন না মুখ দেখে বোঝা গেল।

এক এক করে সবার নেওয়া হয়ে গেল। শেষের দিকে কয়েকজন বুড়ী বোধ হয় খুব কম পেয়েছিল। তারা গুঁইগুঁই করতেই টুপটাপ কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বুড়ীগুলো পড়িমড়ি করে নিজেদের চালাঘরের দিকে ছুটে গেল। ওদের যাওয়ার ভঙ্গী দেখে কষ্ট হল অনিমেষের। এমন সময় দূর থেকে চিৎকার ভেসে এল। কারা যেন কাউকে ডাকছে। মোড়ল বলল, 'আপনাদের সঙ্গীরা বৃষ্টি

দেখে ভয় পেয়েছে।'

নিশীথবাবু মোটা লোকটিকে বললেন, 'ওদের গিয়ে বল আমরা কয়েক মিনিটের মধ্যেই আসছি।'

কথাটা শেষ হওয়ামাত্র মোটা লোকটি প্রাণপণে দৌড়ে মাঠ পেরিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল। বৃষ্টি এলে নৌকোয় ওর ফিরবে কি করে? অনিমেষ নিশীথ-বাবুর দিকে তাকাল। তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন। মোড়ল বলল, 'এখন বৃষ্টি হবে না। তা আপনি যা চেয়েছিলেন পেয়েছেন?'

নিশীথবাবু মাথা নাড়তে সে বলল, 'পাওয়া যায় না কখনো। আমরাও বোধ হয় আর আপনার উপকার পেলাম না, কি বলেন?'

নিশীথবাবু বললেন, 'তা কেন! তবে যা দেখলাম তাতে জন পনেরোর বেশী লোক পাওয়া যাবে না। মেয়েরা অবশ্য কাজে লাগতে পারে তবে দেখতে হবে হাতের আঙুলগুলো ঠিক আছে কি-না।'

মোড়ল বলল, 'তাও হল না, সব মজে গেছে। গিয়ে ভালই হয়েছে, প্রাণ বেরিয়ে যেত পুরুষগুলোর। কিন্তু আপনার উদ্দেশ্যটা কি বলবেন বাবু?'

নিশীথবাবু বললেন, 'তেমন কিছু নয়, যদি প্রয়োজন হয় এসে বলে যাব।'

মোড়ল হাসল, 'আপনারা আর আসবেন না। এখান থেকে যে যায় সে আর আসে না।'

নিশীথবাবু কথাটার জবাব দিলেন না, অনিমেষকে ইঙ্গিত করে চালাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর পেছনে যেতে গিয়ে অনিমেষের নজর পডল মোড়লের সঙ্গীর দিকে। এতক্ষণ সে একটাও কথা বলেনি, শুধু একনাগাড়ে হাতের ছেঁড়া আঙুলটা মুচড়ে যাচ্ছিল। নিশ্চয়ই এটা ওর মুদ্রাদোষ, কিন্তু এরকম বীভৎস মুদ্রাদোষের ওপর এতক্ষণ চোখ রাখতে পারেনি অনিমেষ। এখন দেখল পাক খেয়ে খেয়ে আঙুলটার ঝুলে থাকা চামড়াটা চুপচাপ খসে গিয়ে সেটা লোকটার অন্য হাতে উঠে এসেছে। প্রচণ্ড নাড়া খেল অনিমেষ। নিজের একটা আঙুল হাতের তালুতে নিয়ে লোকটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সামান্যক্ষণ দেখল, তারপর সেটাকে ছুঁড়ে ইটের চৌহদ্দিতে জ্বলা আগুনের ভেতর ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা চামড়া-পোড়া গন্ধ বের হল সেখান থেকে। খুব জোর পা চালিয়ে অনিমেষ বাইরে বেরিয়ে এল। লোকটা তখন আগুনের কাছে ঝুঁকে পড়ে তার আঙুলটা দেখছে। চট করে নিজের আঙুলের দিকে তাকাল অনিমেষ।

মোড়ল বলল, 'চললেন?'

নিশীথবাবু ঘাড় নাড়লেন।

মোড়লের যেন কিছু মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গীতে বলল, 'যাওয়ার আগে একটু কষ্ট করতে হবে যে। আমার সঙ্গে একটু আসুন।'

নিশীথবাবু অবাক হলেন, 'কেন? কি ব্যাপার?'

মোড়ল কোন উত্তর না দিয়ে ওদের ইঙ্গিতে আসতে বলে সামনের এক ঝুপসি ঘরের দিকে খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল। ওর বডিগার্ড তখনও ওদের পাশে দাঁড়িয়ে। নিশীথবাবু যেন বাধ্য হয়েই বললেন, 'চল দেখে আসা যাক।'

মাঠটা পেরিয়ে ছোট ঝুপসি ঘরটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই মোড়ল বাইরে থেকে চিৎকার করে ডাকল, 'ক্ষেন্তি, ও ক্ষেন্তি, বাচ্চাটাকে নিয়ে বাইরে আয়।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা বউ বাইরে বেরিয়ে এল। তার সর্বাঙ্গ কাপড়ে মোড়া, মাথার ঘোমটা বুক অবধি নেমে আসায় মুখ দেখা যাচ্ছে না। কোলের ওপর একগাদা কাপড়ের স্তূপের ওপর একটা লালচে রঙের শিশু শুয়ে। চুপচাপ চোখ বন্ধ করে ঘুমোচ্ছে।

মোড়ল একটু দূর থেকে ঝুঁকে পড়ে বাচ্চাটাকে চুকচুক শব্দ করে আদর করল। তারপর নিশীথবাবুর দিকে ফিরে মাঠের শেষপ্রান্তে শুয়ে থাকা মৃতদেহটিকে দেখিয়ে বলল, 'ওর মেয়ে। কি সুন্দর মুখখানা দেখুন।'

অনিমেষ দেখল, সত্যিই একটা ফুলের মত মেয়ে চুপচাপ ঘুমিয়ে আছে। এর হাত পা মুখ চোখ সব নিখুঁত, কোথাও অসুস্থতার চিহ্ন নেই। পৃথিবীর আর যে কোন মানুষের বাচ্চার মত সম্পূর্ণ সুস্থ। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

মোড়ল বলল, 'একে নিয়ে যাবেন?'

নিশীথবাবুর মুখের দিকে তাকাল অনিমেষ, তিনি ভীষণ বিব্রত হয়ে পড়েছেন। মুখ-চোখ কেমন হয়ে গেছে। কোনরকমে বললেন, 'দেখি, কথা বলে দেখি।'

মোড়ল বলল, 'আপনি যে রকম চাইছিলেন ঠিক সেরকম না। তার চেয়ে বেশী বলতে পারেন। মুখ চোখ হাত আঙুল সব ঠিক আছে। বাবু একে নিয়ে যান, নইলে একদিন ও আমাদের মত হয়ে যাবে। আপনি যা চেয়েছিলেন পেয়ে গেলেন বাবু।'

নিশীথবাবু এবার ঘুরে দাঁড়ালেন, 'আমি গিয়ে খবর দেব। এসো অনিমেষ।'

আর দাঁড়ালেন না তিনি, হনহন করে জঙ্গলের দিকে হাঁটতে লাগলেন। ওঁকে যেতে দেখে অনিমেষও পা চালাল। পেছনে মোড়লের গলা ভেসে এল, 'কি হল বাবু, ও বাবু!' অনিমেষ নিশীথবাবুর সঙ্গে জঙ্গলটার কাছে পৌঁছে গিয়ে দেখল মোড়ল দু হাতে বাচ্চাটাকে নিয়ে আদর করছে। বডিগার্ডটা ওদের দিকে তাকিয়ে হ্যা-হ্যা করে হাসছে আর চালাঘরের মধ্যে আগুনের সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে সেই

লোকটা এখনও তার আঙ্গুলটাকে পুড়ে যেতে দেখছে।

এতক্ষণে অনিমেষ কথা বলল, 'বাচ্চাটা দেখতে খুব সুন্দর। নিয়ে এলে ওকে বাঁচানো যেত স্যার। আপনি তো এইরকম চাইছিলেন।'

জঙ্গল পেরিয়ে নৌকোর দিকে হাঁটতে হাঁটতে নিশীথবাবু বললেন, 'বাচ্চা নিয়ে আমি কি করব! ও বাচ্চাকে কেউ নেবে না। তা ছাড়া আমি প্রাপ্তবয়স্ক লোকের কথা ভেবেছিলাম, পণ্ডশ্রম হল এখানে এসে।'

প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ খুঁজতে কুষ্ঠরোগীদের ডেরায় নিশীথবাবু কেন এলেন কিছুতেই বুঝতে পারছিল না অনিমেষ। জলপাইগুড়ি শহরে বা গ্রামে তো সেরকম মানুষ অনেক আছে। নাকি সেসব মানুষ নিশীথবাবুর কথা সব সময় শুনবে না, এদের পেলে সুবিধে হত। নৌকোয় বসে হিম বাতাসে কিনা জানে না, অনিমেষের সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল আচমকা।

সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী বিপুল ভোটে বিরোধীদের পরাজিত করে নির্বাচিত হয়ে গেলেন। লোকসভার প্রার্থী অপেক্ষাকৃত অখ্যাত কিন্তু তাঁকেও জিততে কিছু বেগ পেতে হল না। সেই বন্যার পর থেকে অনিমেষ আর কংগ্রেস অফিসে যায়নি, ফাইন্যাল পরীক্ষার চাপটা যেন পাহাড়ের মত রাতারাতি ওর ওপর এসে পড়েছিল। সরিৎশেখর রাতদিন লক্ষ রেখেছিলেন বাইরের দিকে যেন ওর মন না যায়। নাতির পরীক্ষা নয়, যেন তিনি নিজেই স্কুল ফাইন্যাল দিচ্ছেন। নিশীথবাবু কয়েকবার লোক পাঠিয়েছিলেন অনিমেষকে ডাকতে, সরিৎশেখর সযত্নে তাদের ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। বন্যার সময়ে অনিমেষ যে অভিজ্ঞতার স্বাদ পেয়েছিল তার ফলে রাজনীতিতে ওর আগ্রহটা যেন হঠাৎই মিইয়ে গেল। ওর খুব মনে হয়েছিল এই নির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থী জিততে পারবে না। রাজনীতি করতে গেলে মিথ্যা কথা বলতে হয়, শঠতা ছাড়া রাজনীতি হয় না—এসব ব্যাপার এর আগে এমন চোখে আঙ্গুল দিয়ে কেউ দেখিয়ে দেয়নি। নিশীথবাবুর মুখের কথা আর কাজের ধারার মধ্যে এত পার্থক্য—ব্যাপারটা মেনে নিতে ওর কষ্ট হচ্ছিল।

দুপুরে মন্টু আর তপন মাঝে মাঝে ওদের বাড়িতে আসত টেস্ট পেপার সল্‌ভ্‌ করতে। মন্টুদের ও সেই অভিজ্ঞতার কথাটা বলেছিল। এই প্রথম সে নিশীথবাবুর সমালোচনা বন্ধুদের কাছে করল। ব্যাপারটা অনিমেষকে যতটা উত্তেজিত করেছিল মন্টুকে তার কিছুই করল না। ইদানীং মন্টু একদম পাল্টে গেছে। আগের মত গা-জোয়ারি ভাবটা একদম নেই, মেয়েদের আলোচনা আর করে না। এক সময় ও দাদার কাছ থেকে শুনে এসে কম্যুনিস্ট পার্টির কথা বলত

মাঝে মাঝে, এখন তাও বলে না। নিশীথবাবুর কথা শুনে ও নির্লিপ্তের মত বলল, 'এসব ব্যাপার নিয়ে তুই কেন ভাবছিস, তোর ভোট আছে?'

অনিমেষ হকচকিয়ে গেল, 'ভোট নেই বলে আমরা ভাবব না। কংগ্রেসকে কোথায় নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে বল তো? এই দল এক সময় কারা করেছিল ভেবে ভাখ!'

মণ্টু বলল, 'আমার মাকে ছেলেবেলায় দেখেছি, কি সুন্দর দেখতে ছিল, চোখ জুড়িয়ে যেত। আর এখন রোগা হয়ে গিয়ে চামড়া ঝুলে গেছে, হাড বেরিয়ে গেছে—এখন দেখলে কেউ ভাবতেই পারবে না মা এককালে সুন্দরী ছিল। তাই বলে হা-হুতাশ করে মাকে আমি আবার সুন্দরী করতে পারব? এখন যেরকম সময় সেরকম ভাবাই ভাল।'

কথাটা ভাবতে ভাবতে অনিমেষ বলল, 'কিন্তু এরকম চললে আমাদের দেশের কোন উন্নতি হবে?'

মণ্টু খিঁচিয়ে উঠল, 'ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করিস না তো! এই দেশ কি তোর পৈতৃক সম্পত্তি যে তুই ভেবে ভেবে মরছিস। ধর তুই যদি তিনবার স্কুল ফাইন্যাল ফেল করিস, তোর দাদু যদি আর না পড়ায়, তাহলে কি করবি! কংগ্রেস তোকে দেখবে? কোন বড় নেতার বাডিতে গেলে তাঁর ছেলেমেয়ে তোকে ভ্যাগাবণ্ড ভাববে। ওসব ছাড় অনিমেষ।'

তপন ফিক করে হেসে বলল, 'হাঁস খেটেখুটে ডিম পাড়ে, আর দারোগাবাবু ওমলেট খায়।'

মণ্টু বলল, 'ঠিক। আগে নিজের কেরিয়ার তৈরি কর তারপর অন্য কথা। ভাখ না, বিরাম কর কেমন ম্যানেজ করে এখান থেকে কেটে পড়ল। শুনছি কলকাতার বরানগরে বাড়ি কিনেছে। মেনকার বিয়ে হয়ে গেছে এক বড়লোকের সঙ্গে। নিশীথবাবুর কি হল? হোল লাইফ শালা জেলা স্কুলে মাস্টারি করে কাটাবে।'

জীবনে এই প্রথম অনিমেষ চিন্তা করল, ও যদি ভালভাবে পাস না করতে পারে তাহলে কি হবে! দাদু আজকাল প্রায়ই বলেন, ফার্স্ট ডিভিসন হলে কলকাতায় পাঠাবেন—বাবা নাকি এরকম প্রতিজ্ঞা দাদুর কাছে করে গেছেন। দাদুর ইচ্ছা অনিমেষকে ইংরেজীর এম-এ হতে হবে—অথবা আইন পাস করবে অনিমেষ—এ বংশে যা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারত না কোনদিন। এই অবস্থায় যদি ওর রেজাল্ট খারাপ হয়—! অনিমেষ মনে মনে বলল, তা কখনো হবে না, হতে পারে না। আজ অবধি সে কখনো খারাপ কিছু করেনি, খারাপ কিছু হতে পারে

এরকম চিন্তা করতে ওর কষ্ট হয়। মণ্টুর দিকে তাকাল সে কি করে বড়দের মত ও যে কোন কাজ করার আগে দুটো দিক ভেবে নেয়।

হঠাৎ মণ্টু বলল, 'আচ্ছা অনি, তোর জীবনের অ্যাম্বিশন কি ?'

ভ্রূ কোঁচকাল অনিমেষ, 'অ্যাম্বিশন ?'

মণ্টু বলল, 'হ্যাঁ। তবে এইম অব লাইফ বলে এসেটা মুখস্থ বলিস না।'

চট করে জবাব দিতে পারল না অনিমেষ। সত্যি তো, কোনদিন সে ভেবে দ্যাখেনি বড় হয়ে কি করবে! কেউ চাকরি করে, কেউ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়র বা উকিল হয়। আবার কেউ কেউ রাজনীতি করে মন্ত্রী হয়ে যায়। ব্যবসা করে বড়লোক হচ্ছে অনেকে। আবার চাকরি বা ব্যবসা করে সাধারণ মানুষ হয়ে কষ্টে-সৃষ্টে দিন কাটাতে অনেককেই সে দেখছে চারপাশে। এককালে কেউ যদি ওকে এই প্রশ্ন করত তাহলে সে চটপট জবাব দিত দেশের কাজ করব। কিন্তু এখন—! অনিমেষের একটা লেখার কথা মনে পড়ল। কার লেখা এই মুহূর্তে মনে নেই। মানুষ এবং জন্তুর মূল পার্থক্য হল, জন্তু চিরকাল জন্তুই থেকে যায়। দু হাজার বছর আগে একটা গরু যেভাবে ঘাস খেত, দিন কাটাত, আজও সেভাবেই সে ঘাস খায়, দিন কাটায়। কিন্তু মানুষ প্রতিদিন যে জ্ঞান অর্জন করে সেটা সে তার সন্তানের জন্য রেখে যায়। সে যেখানে শেষ করছে তার সন্তান সেখান থেকে শুরু করে। এই যে এগিয়ে যাওয়া তার নামই হল উত্তরণের পথে পা বাড়ানো এবং সেটা মানুষের পক্ষেই সম্ভব। আফ্রিকার গভীর অরণ্যে সভ্যতার সংস্রবহীন যে মানুষ আদিগন্ত-কাল একইভাবে জীবন কাটাচ্ছে তার মত হতভাগ্য আর কেউ নেই। প্রকৃত সভ্য মানুষ এগিয়ে যাবে। তাই যদি হয়, তাহলে আমাদের পূর্বপুরুষ যেভাবে জীবন কাটিয়েছেন আমরা তার চেয়ে আরো উন্নত কোন উপায়ে কাটাব। যেভাবে ওঁরা দেশের কথা ভেবেছেন, দেশের উন্নতির স্বপ্ন দেখেছেন, অথচ সে সময় প্রতিকূল পরিবেশে তা অসম্ভব থেকে গেছে—আজ আমরা তা সম্ভব করব। কিন্তু শুধু একজন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়র বা ব্যবসায়ী হয়ে কি তা সম্ভব। আমরা যাঁদের উত্তরাধিকারী তাঁদের কাছে কি জবাব দেব। সুভাষচন্দ্র, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ—এঁরা তো কেউ চাকরি করেননি কখনো। অন্যের চাকর হয়ে কি স্বাধীনভাবে দেশের কথা ভাবা যায়।

মণ্টু আর তপন একদৃষ্টিতে অনিমেষের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। অনিমেষ যে প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারছে না এতে ওরা মজা পাচ্ছিল। মণ্টু বলল, 'কি রে, ধ্যান করছিস নাকি ?'

তপন বলল, 'আমার ঠিকুজিতে লেখা আছে আমি নাকি খুব বড় ইঞ্জিনিয়র

হব। ঠিকুজির কথা শুনে অনিমেষের চট করে শনিবাবার মুখটা মনে পড়ে গেল। শনিবাবা বলেছিলেন যে, আঠারো বছর বয়সে সে জেলে যাবে। আর অনেক অনেক বছর আগে অন্নপ্রাশনের সময় ও নাকি বই ধরেছিল—দাদু বলেছিলেন, বড় হলে এ আইনজ্ঞ হবে। এসব নিতান্তই ছেলেমানুষী বলে মনে হয় ওর। শেষ পর্যন্ত অনিমেষ বলল, 'ভবিষ্যতে কে কি হবে আগে থেকে বলা যায় ?'

মণ্টু বলল 'তবু লক্ষ্য তো থাকবে একটা, না হলে এগোবি কি করে ?'

অনিমেষ হাসল, 'তুই এবার সেই রচনার ভাষায় কথা বলছিস।'

মণ্টু বলল, 'আমি ঠিক করেছি যদি ফার্স্ট ডিভিসন পাই তাহলে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি হয়ে আই এস-সি পড়ব। আমাকেও ডাক্তার হতে হবে।'

সেই রাত্রে অনিমেষ চুপচাপ ছাদে চলে এল। এখন শীত যাবার মুখে, সামান্য চাদর হলেই চলে যায়। সরিৎশেখর হেমলতা অনেকক্ষণ শুয়ে পড়েছেন। রাত বারোটা নাগাদ সরিৎশেখর পাশের ঘর থেকে একবার গলা তুলে বললেন, 'এবার শুয়ে পড়।' ছাদে দাঁড়িয়ে সে একআকাশ তারা দেখতে পেল। এইসব তারাদের দিকে তাকালে এক সময় ও মাকে দেখতে পেত। এখন হঠাৎ ওর সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। এই ছাদেই মা পড়ে গিয়েছিলেন, আঠারো বছর বয়সে জেলে যাবার কথা শুনে মা অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। অনিমেষ দূরের বাঁধ পেরিয়ে নিরীহ বাচ্চার মত ঘুমিয়ে থাকা তিস্তা নদীকে দেখল। দু-মাসেই কাশ গাছ গজিয়ে গেছে। কারা যেন মাইকে এখনও শহরের পথে পথে ভোট চেয়ে আবেদন করে যাচ্ছে। আজ রাত বারোটার পর আর প্রচার চলবে না। অনিমেষ তারাদের দিকে তাকিয়ে নিজের অজান্তেই প্রশ্ন করে ফেলল, 'আমি বড় হয়ে কি হব ?' এই হিম মাখা রাত, ঝকমকে তারার আকাশ, তিস্তার বুক থেকে উঠে আসা নিঃশ্বাসের মত কিছু বাতাস অনিমেষের প্রশ্নটা শুনে গেল চুপচাপ। খুব গভীর কোন দুঃখ বুকের মধ্যে গড়াগড়ি খেতে খেতে যেন চলকে উঠল, অনিমেষ দেখল একটা তারা টুক করে খসে গিয়ে কি দ্রুত নেমে যেতে যেতে অন্য একটা তারার বুকে মুখ লুকোল। সম্মোহিতের মত ছাদময় পায়চারি করতে করতে একটা শব্দর সঙ্গে মনে মনে মারামারি করতে লাগল—জানি না জানি না।

নির্বাচনে বামপন্থী প্রার্থী হেরে যাবার পর কংগ্রেস বিরাট বিজয়ী মিছিল বের করেছিল। খবরটা শুনে প্রথমে বিশ্বাস করেনি অনিমেষ। নির্বাচনের আগ অবধি ও শুনে আসছে সবাই কংগ্রেস সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করছে। ইংরেজ আমলে এর চেয়ে সবাই সুখে ছিল, জিনিসপত্রের দাম যেরকম আকাশছোঁয়া হয়ে

গেছে তাতে সাধারণ মানুষ বাঁচতে পারে না। আর এসব কথাই বামপন্থীরা প্রচার করছিল একটু অন্য রকম সংলাপে। ফলে অনিমেষ ভেবেছিল এই নির্বাচনে কংগ্রেস একদম মুছে যাবে। কিন্তু বিপুল সমর্থন পেয়ে জিতেছে শুনে প্রথমে যে স্বস্তিটা ওর এসেছিল, ক্রমশ তা থিতিয়ে গেলে নিজের কাছেই নিজে কোন জবাব পেল না। তাহলে মানুষ যত কষ্ট পাক, যত গালাগালি দিক তবু কংগ্রেসকেই ভোট দেবে। বামপন্থীদের, বোঝাই যাচ্ছে, সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে না। বন্যার সময় যে রাজনীতি সে দেখে এসেছে, সাধারণ মানুষ সেসব জানলেও বোধ হয় বিশ্বাস করতে চায় না। এমন কি সরিৎশেখর পর্যন্ত ভোট দেবার আগে কংগ্রেসকে লক্ষ বার গালাগাল করে জোড়া বলদেই ছাপ দিয়ে এলেন। জলপাইগুড়িতে কাস্তে ধানের শীষে সোনালী রোদ আর পড়ল না। এরকমটা যে হবে তা বোধ হয় সবার আগে বামপন্থীরাই খবর রাখত। তাই নির্বাচন শেষ হবার পর পরই তারা আবার আন্দোলনে নেমে পড়ল—যেন নির্বাচনের রায়ে তাদের কিছু এসে যায় না।

এতদিন ধরে জেলা স্কুলে চেনা গণ্ডীতে পরীক্ষা দিয়েছে অনিমেষ। সেখানকার পরিবেশ এক রকম আর এবার ফাইন্যাল দিতে গিয়ে ও ভীষণ রকম অবাক হয়ে গেল। চার-পাঁচটা স্কুলের ছেলেরা পাশাপাশি পরীক্ষা দিচ্ছে। প্রথম দিন থেকেই প্রশ্নপত্র হাতে নিয়ে অনিমেষের পাশের ছেলেটি সমানে খুঁচিয়ে যাচ্ছে তাকে খাতা দেখাবার জন্য। ছেলেটির গালভর্তি দাড়ি, বয়স হয়েছে। অনিমেষ বিরক্তি প্রকাশ করতে সে বলল, 'আট বছর হল ভাই, এবার পাশ করতে হবেই।' বলে কোমর থেকে বই বের করে ওর দিকে বাড়িয়ে দিল, 'উত্তরগুলো দাগিয়ে দাও।'

'আপনি নকল করবেন ?' কোন রকমে কথাটা জিজ্ঞাসা করল সে। জেলা স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে নকল করার রেওয়াজ নেই। বড়জোর কেউ কেউ হাতের চেটোয় কিছু কিছু পয়েন্ট লিখে আনত। একবার একটি ছেলে মুদির দোকানে স্লিপের মত কাগজে খুদি খুদি করে উত্তর লিখে এনেছিল, সুশীলবাবু তাকে ধরতে পেরে ক্লাস থেকে বের করে দিয়েছিলেন। ছেলেটিকে ট্রান্সফার নিতে হয়েছিল। ওই ধরনের কাগজকে বলা হয় চোথা, মণ্টুর কাছ থেকে জেনেছিল অনিমেষ। অত খুদি খুদি করে লিখতে যে পরিশ্রম এবং সময় দরকার হয়, সে-সময় উত্তরটা সহজেই মুখস্থ হয়ে যাবার কথা। কিন্তু ফাইন্যাল পরীক্ষা দেবার সময় এই ছেলেটির দুঃসাহস দেখে তাজ্জব হয়ে গেল।

ছেলেটি মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'কোত্থেকে এলে চাঁদ, সতীত্ব ত্যাখানো হচ্ছে। পেছনে চেয়ে ভাখ না, টুকলির বাজার বসে গেছে।' মাথা ঘুরিয়ে অনিমেষ দেখল

কথাটা এক বর্ণ মিথ্যে নয়। ফস ফস করে বই-এর পাতা ছেঁড়ার শব্দ ; খাতার তলায় কাগজ ঢুকিয়ে ঝুঁকে পড়ে যারা লিখছে তাদের কাছে, যাদের কাছে উত্তর নেই তারা ক্রমাগত অনুরোধ জানিয়ে যাচ্ছে শেষ হয়ে গেলে দেবার জন্য। জেলা স্কুলের আরো কয়েকটি ছেলে ছিল ঘরটাতে, অনিমেষ দেখল তারা যেন কিছুই ঘটছে না এ রকম ভঙ্গীতে উত্তর লিখে যাচ্ছে। যে ভদ্রলোক গার্ড দিচ্ছিলেন তিনি এখন চেয়ারে বসে মোহন সিরিজের একটা বই পড়ছেন তন্ময় হয়ে। বইটার নাম দেখতে পেল ও, 'হতভাগিনী রমা'।

সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল অনিমেষের। সবাই যদি বই দেখে নকল করে লেখে তাহলে কেউ ফেল করবে না। এইসব মুখগুলো কলেজ, কলেজ থেকে যুনিভার্সিটি—ডাক্তার ইঞ্জিনিয়র—সব জায়গায় নকল করে পাস করা যায়? যদি যায় তাহলে ওরা তো কিছুই না জেনে যে যার মত বড় হয়ে যাবে। এক মুহূর্তের জন্য অনিমেষের মনে হল ওর মাথায় কিছু নেই—ও একটাও উত্তর লিখতে পারবে না। চোখ বন্ধ করে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকল সে। পাশের ছেলেটি বোধ হয় ভাবগতিক দেখে সুবিধে হবে না বুঝতে পেরেছিল, নিজের মনেই উচ্চারণ করল, 'কি মালের পাশেই সিট পড়ল এবার।'

অনিমেষ শুনল সে উঠে দাঁড়িয়ে বলছে, 'স্যার, পেচ্ছাপ করতে যাব।'

গার্ড ভদ্রলোক বই থেকে মুখ না তুলে বললেন, 'এক ঘণ্টা হয়নি এখনও।'

ছেলেটি বলল, 'এক ঘণ্টা অবধি চেক করতে পারব না।'

'যাও।'

শোনা মাত্রই ছেলেটা বেরিয়ে গেল। অনিমেষ দেখল যাবার সময় সে উত্তরপত্রটা জামার ভেতর ঢুকিয়ে নিল। দ্বিতীয় ঘণ্টার শেষে বাথরুমে গিয়েছিল সে। বাথরুমটা যেন পড়ার ঘর হয়ে গিয়েছে। যারা আসছে তারা কেউ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিচ্ছে না। বিভিন্ন আকারের কাগজের টুকরো থেকে বই-এর পাতার স্তূপ হয়ে গেছে সেখানে। সেই ছেলেটিকে এখানে দেখতে পেল না সে। কিছুই বলার নেই, অনিমেষের লজ্জা করছিল সেখানে জলবিয়োগ করতে। কোন গার্ড বা কর্তৃপক্ষের কেউ একবারও তদারকিতে আসছেন না এদিকে। অনিমেষ ফিরে আসছে, মণ্টুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এক রুমে সিট পড়েনি ওদের, মণ্টু ওকে জিজ্ঞাসা করল, 'কটা বাকী আছে তোর?'

অনিমেষ বলল, 'তিনটে।'

খুব সিরিয়স মুখ-চোখ করে মণ্টু বলল, 'তাড়াতাড়ি কর, সময় নেই বেশী।'

অনিমেষ মাথা নেড়ে বলল, 'কি অবস্থা ছাখ, এরকম টুকলিফাই চলে, না

দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।'

মন্টু গম্ভীর মুখে বলল, 'যারা করছে করুক, তোর কি?'

অনিমেষ ফিরে এসে সিটে বসতেই একটা অভিনব কাণ্ড হয়ে গেল। ও দেখল ওর খাতাটা ডেস্কে নেই। ভ্যাবাচাকা খেয়ে এপাশ-ওপাশ দেখতে ও প্রথমে ঠাওর করতে পারল না খাতাটা কোথায়! এমন সময় পেছনের ছেলেটি চাপা গলায় ওকে বলল, 'লাস্ট বেঞ্চিতে নিয়ে গেছে।' অনিমেষ দেখল দুটি ছেলে পাশাপাশি শেষ বেঞ্চিতে বসে একটা খাতা থেকে খুব দ্রুত টুকে যাচ্ছে। ও মোহন সিরিজের দিকে তাকাল, ভদ্রলোক টান-টান হয়ে বসে আছেন। ভীষণ রাগ হয়ে গেল অনিমেষের, দ্রুত শেষ বেঞ্চিতে গিয়ে চট করে খাতাটা কেড়ে নিল। আচমকা খাতাটা উঠে যাওয়াতে ছেলে দুটি হকচকিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার মধ্যে একজন দ্রুত নিজেকে সামলে বলল, 'শেষ লাইনটা বলে দাও গুরু।' কথাটা বলার মধ্যে এমন একটা রোয়াবি ছিল, অনিমেষ থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ওকে মুখ লাল করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ছেলেটি বলল, 'কেন ওরকম করছ, আরে আমাকে চিনতে পারছ না? কংগ্রেস অফিসে দেখা হয়েছিল, মনে নেই? আমরা ভাই বেরাদার।'

এমন সময় পেছন থেকে একটা চিৎকার কানে এল, 'অ্যাই, হোয়াট আর ইউ ডুয়িং দেয়ার? কি নাম তোমার, নম্বর কত? মোহন সিরিজ বইটাকে এক আঙুলে চিহ্নিত করে দ্রুত ছুটে এসে অনিমেষের সামনে দাঁড়ালেন, 'অ্যাই, তোমার সিট কোথায়?'

ভীষণ নার্ভাস হয়ে অনিমেষ বলল, 'সামনের দিকে।'

'তা এখানে কি করছ? নকলবাজি? আমার ক্লাসে সেসব একদম চলবে না। কোন স্কুল তোমার, নম্বর কত বল?' তর্জনী তুলে গর্জন করলেন ভদ্রলোক।

'আমার খাতা এরা নিয়ে এসেছিল—আমি কিছু জানি না।' অনিমেষ কোনরকমে বলল। একটা ভয় আচমকা ওকে ঘিরে ধরল এইবার। এই ভদ্রলোক যদি রেগেমেগে ওকে ক্লাস থেকে বের করে দেন, অথবা ওর নামে নালিশ করেন তাহলে চিরকালের জন্য ও ব্ল্যাকলিস্টেড হয়ে গেল।. নির্ঘাত ফেল করিয়ে দেবে ওকে।

'খাতা নিয়ে এসেছিল আর আমি দেখলাম না, ইয়ার্কি! কে এনেছিল?' ভদ্রলোক ফুঁসে উঠলেন।

এই সময় সেই কংগ্রেস অফিসের ছেলেটি উঠে দাঁড়াল, 'আমি স্যার, এই টেবিলের পাশে খাতাটাকে উড়ে আসতে দেখে তুলে রাখলাম। যা বাতাস চারধারে!'

'বাতাস ? বাতাস কোথায় ? ফ্যান তো বন্ধ। আর উড়ে এল যখন তখন আমায় বললে না কেন ? আর উড়ল কেন ? তুমি কোথায় ছিলে ?'

ভদ্রলোক কি করবেন ঠিক করতে পারছিলেন না। অনিমেষ ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিল ছেলেটার কথা শুনে। কি চমৎকার মিথ্যে কথা বলে ব্যাপারটা ঘুরিয়ে দিচ্ছে। ওর মনে হল এই মুহূর্তে ছেলেটার কথায় সায় না দিলে বাঁচবার উপায় নেই। ও বলল, 'বাথরুমে গিয়েছিলাম আমি। সে সময়—।'

'কি খাও যে এত ঘন ঘন বাথরুম পায় ? কিন্তু আমাকে বলোনি কেন ?'

গার্ড আবার ছেলেটির দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। হাসি চেপে ছেলেটি বলল, 'স্যার, আপনার রমার বোধ হয় খুব বিপদ তাই ডিস্টার্ব করতে চাইনি।'

হকচকিয়ে গেলেন ভদ্রলোক, 'অ্যাঁ, আমার রমা ? ওঃ হ্যাঁ, তা বটে। ঠিক আছে, যে যার সিটে ফিরে যাও। আমার ঘরে কোন আনফেয়ার ব্যাপার চলবে না।'

যেমন এসেছিলেন তেমনি দ্রুত ফিরে গেলেন ভদ্রলোক। অনিমেষ নিজের সিটে যাবার জন্য পা বাড়াল। যেন একটা পাহাড় চট করে মাথা থেকে নেমে গেল এমন হালকা লাগছে তখন। এমন সময় ছেলেটি আবার ডাকল, 'কই, লাস্ট লাইনটা হোক, আফটার অল আমরা এক পার্টির লোক !'

অগত্যা অনিমেষকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের খাতা থেকে এক নম্বর প্রশ্নটার শেষ লাইনটা ফিসফিস করে পড়ে যেতে হল।

সকাল থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি ঝরছিল। এটা ঠিক সেই উত্তরবঙ্গীয় বৃষ্টি যা কিনা এঁটুলির মত দিনরাতের গায়ে সেঁটে বসে থাকে। রাত্তিরবেলায় ঝমঝমিয়ে আকাশ ভেঙে পড়ে আবার সকালবেলায় ছিঁচকাঁদুনে মেয়ের মত সূঁচ বেঁধায়। জেলা স্কুলের লম্বা ঢাকা বারান্দায় অনিমেষরা সেই সকাল থেকে গুলতানি মারছিল। খবর আছে আজ রেজাল্ট বের হবে।

অবশ্য এরকম খবর গত কয়েক দিন ধরে রোজই আসছে। হঠাৎ কেউ বলল, রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে—ছোট্ট ছোট্ট স্কুলে—কোথায় কি ! গতকাল রেডিওতে নাকি বলেছে এ বছর পার্সেণ্টেজ খারাপ নয়। আবার আজ সকালে হেডমাস্টার মশায় এসে বললেন, দারুণ খবর আছে তাঁর কাছে, মার্কশীট না এলে তিনি কিছু বলবেন না।

কদিন থেকে উত্তেজনাটা বুকের মধ্যে দলা পাকাচ্ছিল—যদি খারাপ হয় তাহলে কি হবে ?

সরিৎশেখর গতকাল রেডিওতে কলকাতায় ফল বেরিয়ে গেছে শুনে আর ঘুমুতে পারেননি। সারারাত ছট্‌ফট করছেন। ভোরবেলায় উঠেই অনিমেষকে বলেছেন, রেজাল্ট বের হলে অবশ্যই যেন সে বাড়িতে চলে আসে। আজকে তাঁর বেড়াতে যাওয়া হল না। হেমলতা ভোরবেলায় বাবার হাঁকডাকে উঠে পড়ে একশ আটবার জয়গুরু নাম লিখে একমনে জয়গুরু বলে যাচ্ছেন। অনিমেষ যখন বেরুচ্ছে তখন একটা কাগজ ভাঁজ করে তার বুকপকেটে ঢুকিয়ে দিলেন। অনিমেষ গেট খুলে বাড়ি থেকে বের হতে গিয়ে একবার পেছন ফিরে দেখল দাদু আর পিসীমা বাইরের বারান্দায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন একদৃষ্টিতে। দাদুর দুই হাত জোড় করে বুকের ওপর রাখা, পিসীমার ঠোঁট দুটো নড়ছে।

হাত-পা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে যেতে লাগল ওর। চুপচাপ একা একা বাঁধের ওপর দিয়ে জেলা স্কুলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ওর মনে সেই ভয়টা চট করে ফিরে এল। যদি সেই গার্ড ভদ্রলোক মুখে কিছু না বলে চুপিচুপি ওর নামে রিপোর্ট করে দেন তাহলে কি হবে। আর-এ হয়ে গেলে সে এই বাড়িতে ফিরে আসবে কি করে? অনিমেষ মনে মনে ঠিক করল, যদি সেই রকম হয় তাহলে সে ওই ভদ্রলোককে ছেড়ে দেবে না, তার জন্য যদি তাকে জেলে যেতে হয় তো তাই হোক। জেলে যাবার কথাটা মনে হতেই শনিবাবার ভবিষ্যৎবাণী মনে পড়ে গেল ওর। যাঃ, আঠারো বছর হতে ওর তো এখনও দুই বছর বাকী আছে। কিন্তু ভয়টা কিছুতেই ওকে ছেড়ে যাচ্ছিল না, অস্বস্তিটা থেকেই গেল।

মুখ চোখ সবারই শুকনো। ফিনফিনে বৃষ্টির জলে সবারই জামাকাপড় স্যাঁতসেঁতে। বেরুবার আগে পিসীমা ছাতির কথা বলেছিলেন, ছাতি নিয়ে বের হলে বন্ধুরা খ্যাপায়—এ কথাটা পিসীমাকে বলে বলে বোঝাতে পারে না সে। সকাল নটা বেজে গেল, এখনও মার্কশীট এল না। তপন বলল, 'আচ্ছা খেলাচ্ছে মাইরি, ভাল্লাগে না। যা করবি করে ফ্যাল।'

অর্ক সিগারেট ধরাল। এই প্রথম স্কুল-কম্পাউণ্ডে বসে অনিমেষ কাউকে সিগারেট খেতে দেখল। তপন বলল, 'অ্যাই অর্ক, কি হচ্ছে?'

অর্ক কেয়ার করল না, 'বেশ করছি, খাবার জিনিস খাচ্ছি। পারলে হেডুকে বল আমায় রাস্টিকেট করতে।'

সেটা আর সম্ভব নয় এখন এই মুহূর্তে সবাই মেনে নিল। জেলা স্কুলের কারোর ওদের ওপর কর্তৃত্ব করার অধিকার নেই। অর্ককে আগে মাঝে মাঝে সিগারেটে টান দিতে দেখেছে কিন্তু এখন বুক ফুলিয়ে ঠোঁট গোল করে ও যেভাবে রিং বানাতে লাগল তাতে বোঝাই যায় ও এ ব্যাপারে বেশ পোক্ত। এই সময় নিশীথবাবু স্কুলে

এলেন। ওদের সামনে দিয়ে যেতে যেতে অনিমেষকে দেখে তিনি এগিয়ে এলেন, 'তোমাদের রেজাল্ট এসে গেছে। একটু পরেই স্কুলে এসে যাবে।' অনিমেষকে মাথা নীচু করতে দেখে বললেন, 'কি, খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছ মনে হচ্ছে!' কষ্ট করে ঘাড় নাড়ল অনিমেষ। এমন সময় উনি বোধ হয় অর্ককে দেখতে পেলেন। অর্ক সেইরকম ভঙ্গীতে সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে, নিশীথবাবুকে দেখে একটু সঙ্কোচ করছে না। চলে যাওয়ার আগে তিনি একটু হেসে বললেন, 'আর কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে পারলে না?'

অনিমেষ দেখল, অর্কের মুখটা হঠাৎ কেমন হয়ে গেল। নিশীথবাবু চলে যাওয়ার পর ওর হাতেই সিগারেট জ্বলে জ্বলে ছোট হয়ে যেতে লাগল। মুখে কিছু না বললেও ও আর যেন টানতে পারছিল না। আবার কি আশ্চর্য, সিগারেটটা ফেলে দিতেও ওর যেন কোথায় আটকাচ্ছিল।

শেষ পর্যন্ত ওদের চোখের সামনে দিয়ে একজন স্যার রেজাল্টের কাগজপত্র নিয়ে হেডমাস্টার মশাই-এর ঘরে ঢুকে গেলেন। দমবন্ধ উত্তেজনায় সবাই ছটফট করছে। স্কুলের মোটকা দারোয়ান অফিসের গেটে দাঁড়িয়ে, সে কাউকে ভেতরে যেতে দেবে না। ওদের পুরো ব্যাচটা হেডমাস্টার মশায়ের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে, অথচ কেউ কোন কথা বলতে পারছে না। এই সময় অনিমেষ লক্ষ্য করল, ওর হাতের তেলোয় চটচটে ঘাম জমেছে—অদ্ভুত দুর্বল লাগছে শরীরটা। এর মধ্যে একজন স্যার এসে বলে গেলেন ওদের রেজাল্ট নাকি ভাল হয়েছে, মার্কশীট দেখে প্রত্যেকের ফলাফল নামের পাশে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে—সেটাই একটু বাদে নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দেওয়া হবে। মণ্টু অনিমেষ এবং তপন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল। মণ্টু বলল, 'লাস্ট ডে ইন স্কুল।'

তপন ঘাড় নাড়ল, 'যদি শালা গাড্ডা মারি—অহঙ্কার করলে উল্টোটা হয়।' আর এই সময় বৃষ্টিটা নামল আর একটু জোরে। ছাট আসছিল বারান্দায়—ওরা সরে সরে নিজেদের বাঁচাচ্ছিল। তপন আবার কথা জুড়ল, 'আমাদের কার দুঃখে আকশে কাঁদছে কে জানে। শুনেছি অমঙ্গল কিছু এলে প্রকৃতি জানিয়ে দেয়।'

তারপর দরজা খুলে গেল হেডমাস্টার মশাই-এর ঘরের। তিনি বাইরে এলেন। এখন বর্ষকাল, তবু তিনি গলাবন্ধ সাদা লং কোট পরেছেন। ওঁর পেছনে ভূগোল স্যার। তাঁর হাতে একটা বিরাট কাগজ ভাঁজ করা। নোটিশ বোর্ডের দিকে ওঁদের এগিয়ে যেতে সবাই নীরবে পথ করে দিল। সেখানে হেডমাস্টার মশাই ঘুরে দাঁড়ালেন। সামনে দাঁড়ানো উদ্‌গ্রীব মুখগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে তিনি যেন সামান্য কাঁপতে লাগলেন, 'এইমাত্র তোমাদের ফলাফল এসেছে—এ খবর

তোমরা নিশ্চয়ই পেয়েছ। আজ আমার, আমাদের স্কুলের সব চেয়ে আনন্দের দিন। তোমরা জানো, এ বছর আমি রিটায়ার করব—যাবার আগে আমি যে গৌরবের মুকুট তোমাদের কাছ থেকে পেলাম তা চিরকাল মনে থাকবে। আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি',—এই সময় তাঁর কণ্ঠস্বর চড়ায় উঠে কাঁপতে লাগল, 'আমার স্কুলের কেউ অকৃতকার্য হয়নি। তোমরা আমার মুখ উজ্জ্বল করেছ।' সঙ্গে সঙ্গে যেন পাথরচাপা একরাশ নিঃশ্বাস আনন্দের অভিব্যক্তি হয়ে প্রচণ্ড আওয়াজে ছড়িয়ে পড়ল। হেডমাস্টার মশাই দু'হাত তুলে সবাইকে চুপ করতে বললেন। শব্দ একটু ম্রিয়মাণ হলে তিনি বাঁ হাতে গলার বোতামটা ঠিক করতে করতে বললেন, 'এছাড়া আর একটি খবর আছে। আমাদের স্কুল থেকে একজন এই বছর স্কুল ফাইন্যালে দ্বিতীয় হয়েছে—এই জেলা থেকে আজ অবধি কেউ সে সম্মান পায়নি।'

খবরটা সবাই শুনে থ হয়ে গেল। স্কুল ফাইন্যালে স্ট্যাণ্ড করা রীতিমত চাঞ্চল্যকর ব্যাপার। এর আগে এফ ডি আই থেকে একজন নিচের দিকে স্ট্যাণ্ড করতেই শহরে হইচই পড়ে গিয়েছিল। কে সেই ছেলে? অরূপ? টেস্টে ওর রেজাল্ট সব চেয়ে ভাল ছিল। এই সময় হেডমাস্টার মশাই গলা তুলে ডাকলেন, 'অর্ক—অর্ক আছ এখানে?'

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা পেছনে দাঁড়ানো অর্ককে জড়িয়ে ধরল হইচই করে। হেডমাস্টার মশাই দেখলেন এই মুহূর্তে ওকে আলাদা করা অসম্ভব। তিনি একজনকে বলে গেলেন, অর্ক যেন যাবার সময় দেখা করে যায়।

ভূগোল স্যার ততক্ষণে নোটিশ বোর্ডে কাগজটা টাঙিয়ে দিয়েছেন। সবাই সেটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে একমাত্র অর্ক ছাড়া। সবাই একসঙ্গে নিজের রেজাল্ট দেখতে চায়। অনিমেষ কিছুতেই ভিড় ঠেলে এগোতে পারছিল না। ও দেখল অর্ক দূরে দাঁড়িয়ে মেজাজে নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে ওদের দিকে তাকিয়ে হাসছে। তাজ্জব হয়ে গেল অনিমেষ, এই মুহূর্তে কেউ সিগারেট খেতে পারে! ভিড়টার দিকে তাকাল সে যদি থার্ড ডিভিসন হয়ে যায়—আর-এ হয়নি বোঝা যাচ্ছে, হলে হেডমাস্টার মশাই নিশ্চয় বলতেন। আর পারল না অনিমেষ অপেক্ষা করতে, ভিড়ের একটা দিক সামান্য ফাঁক হতেই সে ঢুকে পড়ল সেইখান দিয়ে। তারপর ঠেলেঠুলে একেবারে নোটিস বোর্ডের ছয় ইঞ্চির মধ্যে ওর চোখ চলে এল। প্রথমে সার দেওয়া পিঁপড়ের মত নামগুলো চোখে ভাসল। সহ্য হয়ে এলে ও প্রথম থেকে নামগুলো পড়তে লাগল। অরূপ ফার্স্ট ডিভিসন একটা দাঁড়ি, অর্ক একটা দাঁড়ি, তারপর দুটো দাঁড়ি—দুটো—দুটো—একটা—দুটো—

নিজের নাম চোখে আসতেই দৃষ্টিটা পিছনে ডান দিকে সরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন পেছন থেকে কোমর জড়িয়ে ধরে ওকে ওপরে তুলে ধরে চিৎকার করে উঠল। নোটিস বোর্ডের ওপরে মাথা উঠে যাওয়ায় নিজের নামের পাশে এক দাঁড়িকে বিরাট লম্বা দেখল সে।

সমস্ত শরীরে লক্ষ কদম ফুলের আনন্দ—তপনের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সময় নিল অনিমেষ। তপন সেকেণ্ড ডিভিসন পেয়েছে এবং মণ্টু ফার্স্ট ডিভিসন। বারোজন ফার্স্ট ডিভিসন, আঠারোজন সেকেণ্ড, বাকীরা থার্ড ডিভিসন। মণ্টু এগিয়ে এসে সাহেবী কায়দায় গম্ভীর মুখে ওর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল। তপনের কোন আপসোস নেই—ও জানতো দ্বিতীয় ডিভিসনই ওর বরাদ্দ। ওরা বেশ দৃঢ় পায়ে বাইরে হেঁটে এসে অর্ককে খুঁজল—না, অর্ক কোথাও নেই। হেডমাস্টার মশাই-এর ঘরেও যায়নি।

তপন বলল, 'আমরা এখন কলেজ স্টুডেন্ট—আঃ, ফাইন!'

মণ্টু বলল, 'মাইরি, শেষ পর্যন্ত বড় হয়ে গেলাম। ভাবাই যায় না। শালা আজ যদি রম্ভারা এখানে থাকতো তো ট্যারা হয়ে যেত।'

অনিমেষ কিছু বলল না। স্কুল থেকে বের হবার আগে সে একবার নিশীথবাবুর সঙ্গে দেখা করে যাবে কি না ভাবল। কিন্তু মণ্টুরা বেরিয়ে যাচ্ছে—এবং সঙ্গে সঙ্গে কুষ্ঠ-রোগীদের ডেরাটার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় ও শক্ত হয়ে গেল।

বাইরে সমানে বৃষ্টি হচ্ছে। একটুও তোয়াক্কা না করে ওরা রাস্তায় নেমে পড়ল। মণ্টু বলল, 'চল গার্লস স্কুলটা দেখে আসি—ওখানে ফেলু মেয়েরা আজ হেভি কাঁদবে।'

এখন এই বৃষ্টিতে হাঁটতে অনিমেষের ভীষণ ভাল লাগছিল। ও একবার ভাবল, দাদুকে একছুটে বলে আসে খবরটা কিন্তু বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে ইচ্ছেটা চেপে গেল। আজ বাংলাদেশে ও একাই শুধু স্কুল ফাইন্যাল পাস করেনি। বৃষ্টিতে হাঁটতে হাঁটতে ওরা শহরটাকে ভিজতে দেখল। শহরের লোকেরাও বিভিন্ন ছাউনির তলায় দাঁড়িয়ে তিনটি কাকভিজে তরুণের ব্যাপার দেখে অবাক হল। গার্লস স্কুলের দিকে যেতে যেতে তপন হঠাৎ গান ধরল, 'এখন আর দেরি নয়, ধর্ গো তোরা হাতে হাতে ধর্ গো। আজ আপন পথে ফিরতে হবে সামনে মিলন-স্বর্গ।'

ও এক লাইন গাইছে, অনিমেষ আর মণ্টু পরের লাইনটা আবৃত্তি করছে। এই বৃষ্টির জল গায়ে মুখে মেখে গান গাইতে গাইতে ওরা ঝোলনাপুলের ওপর এসে দাঁড়াল। অনিমেষদের সুরের ঠিক নেই কিন্তু একটা খুশির জোয়ার সুরকে ছাপিয়ে

যাচ্ছিল। এক ভদ্রলোক ছাতি মাথায় আসছিলেন, মণ্টুর চেনা—হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি, রেজাল্ট বেরিয়েছে? পাস করেছ মনে হচ্ছে?' গাইতে গাইতে ঘাড় নাড়ল মণ্টু, মুখে জবাব দিল না।

গার্লস স্কুলের কাছে এসে গানটা থেমে গেল। আর তখনই ওরা একটা মেয়েকে দেখতে পেল। বৃষ্টির মধ্যে একা একা হেঁটে যাচ্ছে। ওরা দেখল মেয়েটার মুখ কান্নায় মুচড়ে গেছে। সামলাতে পারছে না বেচারা। ওদের তিনজনেরই মন খারাপ হয়ে গেল আচমকা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে মেয়েটার চলে যাওয়া দেখতে দেখতে মণ্টু বলল, 'চল বাড়ি যাই।' যেন এই কথাটার জন্যই ওরা এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। তিনজনেই তিন দিকে কোন কথা না বলে দৌড়তে লাগল।

বাড়ির গেটে হাত দিতেই অনিমেষ দেখল পিসীমা ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন বারান্দায়। যেন সে চলে যাওয়ার পর থেকে একচুলও নড়েননি। দাদুকে দেখতে পেল না সে। পিসীমা ওকে দেখেছেন, তাঁর চোখ দুটো অনিমেষের মুখের ওপর। পায়ে পায়ে কাছে এগিয়ে গেল অনিমেষ। হেমলতা ভাইপোর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, কোন কথা বলতে পারছিলেন না। অনিমেষ ইচ্ছে করে চুপ করে ছিল। ওর বেশ মজা লাগছিল পিসীমার অবস্থা দেখে। কি বলবেন কি করবেন বুঝতে পারছেন না তিনি। শেষ পর্যন্ত অনিমেষ ঝুঁকে পড়ে হেমলতাকে প্রণাম করল, 'আমি পাস করেছি, ফার্স্ট ডিভিসন হয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে জড়িয়ে ধরলেন হেমলতা। অনিকে দু হাতে জড়িয়ে ধরলেন, আতিশয্যে চিৎকারটা কান্নায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। অনিমেষ দেখল পিসীমার মুখ ওর বুকের ওপর—ও অনেক লম্বা হয়ে গিয়েছে। কান্না মেশানো গলায় হেমলতা তখন বলছিলেন, 'অনিবাবা, তুই পাস করেছিস—ও মাধু ছাখ—তোর অনি ফার্স্ট ডিভিসন পেয়েছে—মাধু চোখভরে ছাখ।'

মায়ের নাম শুনে থর থর করে কাঁপতে লাগল অনিমেষ। এই সময় জুতোর শব্দ তুলে সরিৎশেখর দরজায় এসে দাঁড়ালেন। অনিমেষ তখনও হেমলতার দু' হাতের বাঁধনে আটক। সরিৎশেখর গম্ভীর মুখে নাতিকে দেখলেন, তারপর বললেন, 'আশা করি ফার্স্ট ডিভিসন হয়েছে?'

বাবার গলা শুনে হেমলতা অনিকে ছেড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ—আপনার নাতি মুখ রেখেছে—আপনি মাধুকে কথা দিয়েছিলেন।'

নিজের শরীরটাকে যেন অনেক কষ্টে সামলে নিলেন সরিৎশেখর, 'কথা তো সবাই দিতে পারে, রাখে কয়জন। এই আনন্দের খবরের জন্য এতকাল বেঁচে আছি, হেম।'

অনিমেষ ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে দাদুকে প্রণাম করল। সরিৎশেখরের হাতটা ওর মাথার ওপর এলে অনিমেষ অনুভব করল দাদুর শরীর কাঁপছে। বিড়বিড় করে কিছু একটা বলছেন। অনিমেষ উঠে দাঁড়ালে সরিৎশেখর গম্ভীর গলায় বললেন, 'কিন্তু এতে আমি সন্তুষ্ট নই অনিমেষ, তোমাকে আরো বড় হতে হবে— আমি ততদিন বেঁচে থাকব।'

॥ এগারো ॥

সরিৎশেখর দিন ঠিক করে রেখেছিলেন পঞ্জিকা দেখে। বিদেশযাত্রা এবং জ্ঞানার্জনের প্রশস্ত সময় আগামী মঙ্গলবার। নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস ছাড়ে রাত্রে, কিন্তু বিকেলবেলায় জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকেই যাত্রা শুরু করা যায়। এসব আগে-ভাগেই ছকে রেখেছিলেন তিনি। কিন্তু মুশকিল হল আজ কাগজে দেখলেন বুধবার কলকাতায় বামপন্থীরা হরতালের ডাক দিয়েছে। বাড়িতে কাগজ রাখা বন্ধ করেছিলেন তিনি, শুধু রবিবার দুটো কাগজ নেন। বাকি ছয় দিন কালীবাড়ির পাশে নিত্য কবিরাজের দোকানে বসে পড়ে আসেন। নাতির পাসের খবর সবাইকে দিয়ে সেদিনের কাগজটা হাতে তুলতেই সব গোলমাল হয়ে গেল। ব্যাটারা আর হরতাল ডাকার দিন পেল না! সরিৎশেখরের হঠাৎ মনে হল নাতিকে তিনি একটা অনিশ্চিত এবং অগ্নিগর্ভ হাঁ-মুখের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। কলকাতা শহরকে বিশ্বাস করতে পারা যায় না, অন্তত এই কাগজগুলো পড়ে মনে হয় কলকাতা থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল! রাতদিন মারামারি, মিছিল, হরতাল, ছাত্র-আন্দোলন সেখানে লেগেই আছে। অনিমেষ সেখানে গিয়ে নিজেকে কতটা নিরাপদে রাখতে পারবে? একেই ছেলেটার মাথায় এই ধরনের একটা ভূত সেই পনেরই আগস্ট থেকে চেপে আছে—সেটা উস্কে উঠবে না তো? হেমলতার ভয় কলকাতায় গেলে মেয়েরা তাঁর ভাইপোকে চিবিয়ে খাবে। শনিবাবা বলেছিলেন, এর জীবনে প্রচুর মেয়ে আসবে, তারা সর্বনাশ করবে, আবার তাদের জন্যই ওর উন্নতি হবে। কিন্তু মাথা খেয়ে নিলে তারপর আর কি ছাই হবে। হেমলতার এইসব চিন্তা সরিৎশেখরকে স্পর্শ করে না। তাঁর নাতির ওপর বিশ্বাস আছে। মেয়েছেলে ওর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তেমন হলে তিনি নিজে কলকাতায় যাবেন। কিশোরী মিত্তিরের বাড়ি শোভাবাজারে। এককালে এই অঞ্চলে ছিলেন তিনি, সরিৎশেখরের ভারী অন্তরঙ্গ। অনিমেষের দেখাশোনার ভার তিনি নিয়েছেন চিঠির মাধ্যমে। অতএব তেমন কিছু হলেই খবর পাবেন সরিৎশেখর। এই সময় তাঁর চট করে বড় ছেলে পরিতোষের কথা মনে পড়ে গেল।

তাকে জলপাইগুড়িতে রেখেছিলেন আর একজনের কাছ থেকে খবরাখবর ঠিকমত পাবেন এই আশায়। পেয়েছিলেন? সবই ঠিক, কিন্তু কলকাতায় না গেলে অনিমেষের ভবিষ্যৎ এই শহরের চারপাশেই পাক খাবে। আনন্দচন্দ্র কলেজ থেকে আহা-মরি ফল করে পাস করার আশা পাগলও করবে না। অতএব প্রেসিডেন্সী অথবা সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে অনিমেষকে ভরতি করতে হবেই। তাঁর ইচ্ছা ও সেণ্ট জেভিয়ার্সে ভরতি হোক। মিশনারি কলেজ, ইংরেজীটা ভাল শিখবে, সহবত পাবে। সরিৎশেখর এখনও বিশ্বাস করেন ইংরেজীতে উত্তম ব্যুৎপত্তি না থাকলে জীবনে বড় হওয়া যায় না। তারপর খবরে জেনেছেন সে কলেজে মেয়েরা পড়ে না, হেমলতার আশঙ্কার কোন কারণ নেই। কো-এডুকেশন কলেজ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব কোন গোঁড়ামি নেই। তবে চিকিৎসার চেয়ে সতর্কতাই শ্রেয়। অবশ্য প্রেসিডেন্সী কলেজে দেশের ভাল ভাল ছেলেরা পড়ে, বিখ্যাত অধ্যাপকরা পড়ান। মোটামুটি নিশ্চিন্ত থাকা যায় ছাত্রের পড়াশুনার ব্যাপারে। যদিও সেখানে মেয়েরা পড়ে। তবে এই মেয়েরা যখন মেধাবী এবং কৃতী, নাহলে ওই কলেজে ভরতি হতে পারত না, তাই তাদের সময় হবে না ছেলেদের মস্তিষ্ক চর্বণ করার। আর করলেও—তাঁর নাতবউ পড়াশুনায় স্কলার—সরিৎশেখর অতটা আশা করতে পারেন না। তা ছাড়া প্রেসিডেন্সীর গায়েই নাকি বেকার হোস্টেল। পায়ে হেঁটে আসা-যাওয়া করবে অনিমেষ। গাড়িঘোড়ায় চাপার ব্যাপারে কলকাতা শহরকে অবিশ্বাস করেন তিনি। বেকার হোস্টেল থেকে সেণ্ট জেভিয়ার্স কত দূর—হেঁটে যাওয়া অসম্ভব কিনা কিশোরী মিত্রকে জানাতে লিখেছিলেন। অনেকেই যেমন হয়, চিঠি দেবার সময় সব পয়েণ্টের কথা খেয়াল করে না—কিশোরী মিত্রও তাই করেছেন।

আজ নাতিকে স্বর্গছেঁড়ায় পাঠালেন সরিৎশেখর। যাবার আগে বাপের সঙ্গে দেখা করে আসুক। মাতাপিতার আশীর্বাদ ছাড়া কোন সন্তান জীবনে উন্নতি করতে পারে না। অনিমেষকে তাই তিনি স্বর্গছেঁড়ায় পাঠালেন, দু'চার দিন থেকে আসুক। সাধারণত ছেলেটা সেখানে যেতে চায় না—এবার বলতেই রাজী হয়ে গেল। ফাঁকা বাড়িতে সরিৎশেখর চুপচাপ বসে অনিমেষের কথা ভাবছিলেন। ওর কলকাতায় পড়তে যাবার ব্যাপারে প্রথমে মহীতোষের ইচ্ছা ছিল না ঠিক কিন্তু তিনি বরাবর জোর করে এসেছেন। কিন্তু সেখানে ছেলেটার পেছনে প্রতি মাসে যে খরচ হবে তা যোগানোর সামর্থ্য তাঁর নেই। পেন্সন আর এই সামান্য বাড়িভাড়া—এতে তাঁকে যেভাবে চলতে হচ্ছে তা থেকে অনিমেষকে সাহায্য করা সম্ভব নয়। ওর পড়াশুনার দায়িত্ব তাই মহীতোষকে নিতে হবে। তিনি বিশ্বাস করেন সে তা নেবে। নিজের সন্তানদের পেছনে তিনি জীবনের কতখানি উপার্জন

ব্যয় করেছেন ? সেগুলো থাকলে আজ তিনি অনিমেষকে কারো কাছে পাঠাতেন না। অতএব মহীতোষ তার নিজের ছেলের জন্ম টাকা খরচ করবে না কেন ? ঠিক এই মুহূর্তে তাঁর মনে হল যে, এতদিন তিনি যেন অনিমেষের কেয়ারটেকার হয়ে ছিলেন। সেই স্বর্গছেঁড়া ছেড়ে চলে আসার সময় বউমার কাছ থেকে যে ছেলেটার দায়িত্ব হাত পেতে চেয়ে নিয়েছিলেন, এত বছর ধরে যাকে বুক দিয়ে আড়াল করে রেখে বড় করলেন, আজ সেই দায়িত্ব তাঁর শেষ হয়ে গেল। এখন তিনি মুক্ত। কিন্তু এটুকু ভাবতেই তাঁর সমস্ত শরীর কেমন দুর্বল হয়ে গেল। উত্তরের বারান্দায় ভাঙা বেতের চেয়ারে বসে সরিৎশেখর অনেক বছর পরে তাঁর জরাগ্রস্ত চোখ দুটো থেকে উপচে পড়া জলের ধারাকে অনুভব করলেন। চোখ মুছতে একটুও ইচ্ছে হল না তাঁর।

কুচবিহার লেখা বাসে চেপেছিল অনিমেষ। ময়নাগুড়ি রোডে এলে টিকিট কাটার সময় জানতে পারল সেটা স্বর্গছেঁড়ায় যাবে না, ধূপগুড়ি থেকে ঘুরে অন্য পথ ধরবে। এখন নেমে পড়াও যা, ধূপগুড়িতে নামাও তা। মিছিমিছি বেশী পয়সা খরচ হয়ে গেল। ধূপগুড়িতে নেমে ও স্বর্গছেঁড়ার দিকে একটা মিষ্টির দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। হাটবার হলে ঘন ঘন বাস পেত কিন্তু আজ বোধ হয় অপেক্ষা করতে হবে। বার্নিশ থেকে পরের বাসটা, অথবা মালবাজার মেটেলি থেকে বাস এলে সেটাতে উঠতে হবে। অথচ এখান থেকে স্বর্গছেঁড়া বেশী দূর নয়—মাইল আটেক। দৌড়েই চলে যাওয়া যায়।

অনেক দিন পরে স্বর্গছেঁড়ায় যাচ্ছে সে। অথচ সেই প্রথমবারের মত উত্তেজনা হচ্ছে না, এখন সমস্ত মন বসে আছে বুধবার সন্ধ্যেবেলার দিকে তাকিয়ে। মঙ্গলবার দিন ঠিক ছিল, কিন্তু হরতালের জন্ম দাদু দিনটা পিছিয়ে দিলেন। বৃহস্পতিবার কলকাতায় পৌঁছাবে সে। ভাবতেই সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল ওর। এতদিন ধরে বিভিন্ন বই, খবরের কাগজ আর মানুষের মুখে মুখে শুনে মনের মধ্যে কলকাতা এক স্বপ্নের শহর হয়ে গেছে—সেখানে যেতে পারার সুযোগ পেয়ে অনিমেষ আর কিছু ভাবতে পারছিল না। ওর মনে পড়ল, অনেক অনেক দিন আগে যখন সে ছোট ছিল তখন একদিন দাদু ওকে বলেছিলেন কলকাতায় যখন যাবে যোগ্যতা নিয়ে যাবে। প্রথম ডিভিসনে পাস করলে নিশ্চয়ই যোগ্য হওয়া যায়। অনিমেষের মনটা এখন বেশ ভালো হয়ে গেল। স্বর্গছেঁড়ায় আসবার আগে সামান্য অস্বস্তি ছিল। মহীতোষের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে, তার পড়াশুনার খরচ যদি মহীতোষ না দেন তাহলে এ সি কলেজেই পড়তে হবে। মনে মনে একটা কুণ্ঠাও বোধ করছিল সে। সেই ঘটনার পর থেকে মহীতোষের সঙ্গে তার কথাবার্তা একদম হয়

না বললেই চলে। জলপাইগুড়িতে তিনি কদাচিৎ আসেন, এলে মুখোমুখি হলে দু'একটা ছাড়া-ছাড়া কথা বলে মহীতোষ কর্তব্য শেষ করেন। ছোটমা এর মধ্যে যে কবার এসেছেন তার বেশীর ভাগ সময় কেটেছে বাপের বাড়িতে। মহীতোষ ইদানীং ছোটমাকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছেন। বাবাকে ও কিছুতেই নিজের বলে ভাবতে পারে না। আচ্ছা, বাবার সে-সব অভ্যেস কি চলে গেছে? কি জানি!

একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল অনিমেষ, কানের কাছে বিকট আওয়াজে একটা হর্ন বেজে উঠতেই ভীষণরকম চমকে উঠল। সামলে নিয়ে ও দেখল একটা কালো গাড়ি সামনে দাঁড়িয়ে আছে, হর্নটা বেজেছে ওটাতেই। ঝুঁকে পড়ে ড্রাইভারকে দেখতে গিয়ে অবাক হয়ে গেল সে। বত্রিশটা দাঁত বের করে বাপী স্টিয়ারিং-এ বসে হাসছে, চোখাচোখি হতে চেঁচিয়ে বলল, 'উঠে আয়।' বাপী গাড়ি চালাচ্ছে—ব্যাপারটা বুঝতে-না-বুঝতে অনিমেষ ব্যাগ নিয়ে গাড়িতে উঠে বসল। বেশ ঝকঝকে তকতকে গাড়ি, তবে নতুন নয়।

বাপী হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, 'তুই এখানে কি করছিলি?'

অনিমেষ বলল, 'কুচবিহারের বাসে উঠে পড়েছিলাম। কিন্তু তুই—গাড়ি চালাচ্ছিস?'

'কেন?' ভ্রূ তুললো বাপী, 'এটা আবার শক্ত কাজ নাকি!'

'কার গাড়ি এটা?'

'বীরপাড়ার খোকনদার। আমি মান্থলি সিস্টেমে চালাই। দু নম্বর পেট্রোল পেলে ভাল হয়, না হলে এই ছয়-সাতশ টাকা মাস গেলে—তাই বা কে দেয় বল!'

বাপী ইঞ্জিন স্টার্ট করল। আরো বিস্ময়, অনিমেষ কোন রকমে বলল, 'তুই ট্যাকসি চালাস?'

'ইয়েস, প্রাইভেট। এই তো একজনকে বানিশে ছেড়ে এলাম।'

বাপীর গাড়ি চলতে শুরু করলে অনিমেষ আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। ওর সমবয়সী একজন গাড়ি চালাচ্ছে—কি রকম চালায় কে জানে, যদি অ্যাক্সিডেন্ট করে! কিন্তু সে দেখল বাপীর গাড়ির চাকা একটু এপাশ ওপাশ হচ্ছে না। আর মাঝে মাঝেই ও এক-হাত ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মুখে বসে আছে—তার মানে বেশ পাকা ড্রাইভার। বাপীটা চিরকালই দুর্দান্ত, কিন্তু এইরকম হবে এটা কল্পনা করতে পারেনি সে। কিন্তু বাপীর তো এখনও আঠারো বছর হয়নি, তার আগে লাইসেন্স পাওয়া যায়? প্রশ্নটা করতেই বাপী গম্ভীর মুখে বলল, 'লাইসেন্স হয়ে গেছে। ডেট অফ বার্থ গণাদা ঠিক করে দিয়েছে। গণাদাকে চিনলি? আরে আমাদের

এখানকার এম-এল-এ। ইলেকশনের সময় হেভী খেটেছিলাম তো ওর হয়ে, কম্যুনিস্টরা শালা সব বোল্ড আউট হয়ে গিয়েছে। তা গণাদা দুই বছর ম্যানেজ করে লাইসেন্স বের করে দিয়েছে। আমার তো আর পড়াশুনা হল না।'

'পড়লি না কেন?' অনিমেষ ওদের ছোটবেলার কথা ভাবল।

'ধুস। ওসব আমার আসে না। আর পড়েও তো টাকা রোজগারের ধান্দা করতে হবে। বিশুটা মাইরি সেকেণ্ড ডিভিসন পেয়ে এখন থেকে বাগানের চাকরির ধান্দায় লেগেছে। কত পাবে? বড় জোর তিনশ', আমি পাচ্ছি ছয়, সাত—ব্যাস, আর কি চাই?'

'বিশু সেকেণ্ড ডিভিসনে পাস করেছে?'

ঘাড় নাড়ল বাপী, 'হুঁ।' তারপর যেন মনে পড়ে যেতে জিজ্ঞাসা করল, 'তুই?'

মুখ নামিয়ে অনিমেষ বলল, 'ফার্স্ট ডিভিসন।'

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে জব্বর ব্রেক কষল বাপী। মাথাটা অল্পের জন্য ঠুকে যাওয়া থেকে বেঁচে গেল, কিন্তু তার আগেই হইহই করে ওকে জড়িয়ে ধরল বাপী, 'আরে বাস্, আগে বলিসনি—আমি জানতাম তুই ফার্স্ট ডিভিসন পাবি—উঃ, কি আনন্দ হচ্ছে, আমাদের অনি ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করেছে।' কথাগুলো বলতে বলতে সে টপাটপ চুমু খেতে লাগল অনিমেষকে। অস্বস্তি হচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই মুখ সরিয়ে নিতে পারছে না অনিমেষ, ও বুঝতে পারছিল বাপীর উচ্ছ্বাসের মধ্যে কোন কৃত্রিমতা নেই।

উচ্ছ্বাস কমে এলে বাপী স্টিয়ারিং-এ ফিরে গিয়ে বলল, 'তুই মাইরি বহুৎ বড়া অফিসার হবি, না? কলকাতায় পড়তে যাবি, না জলপাইগুড়িতে?'

গম্ভীর গলায় অনিমেষ বলল, 'কলকাতায়।'

'কি কপাল মাইরি। কত সিনেমা স্টার দেখবি—আঃ! নে সিগারেট খা।'

এর মধ্যে ও কখন প্যাকেট বের করেছে দ্যাখেনি অনিমেষ, এখন বাপীকে একটা কড়া সিগারেট ওর দিকে বাড়িয়ে ধরতে দেখল। আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ল অনিমেষ, 'না, আমার ঠিক অভ্যাস নেই।'

সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল বাপী, 'যা বাবা, তুই খাস না? একদম গুড বয়? আরে তুই এখন স্কুল-বয় নস, কলেজে উঠেছিস—একটা সিগারেট খা ভাই। আমার হাতে হাতেখড়ি কর—চিরকাল তাহলে আমাকে মনে রাখবি।' বেশ কিছুক্ষণ পীড়াপীড়ি করতে অনিমেষ হাত বাড়িয়ে সিগারেটটা নিল। ফস করে দেশলাই জেলে নিজেরটা ধরিয়ে বাপী ওরটা ধরিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। খুব আস্তে

সিগারেটটায় টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল অনিমেষ। একটা কষা স্বাদ জিভটাকে ভারী করে তুলেছে। নাক দিয়ে ধোঁয়া বের করার সাহস ওর হচ্ছিল না। জানলার পাশে বসে ভুড়ুয়া নদীকে চলে যেতে দেখল এবার। বাঁক ঘুরলেই স্বর্গছেঁড়া। উত্তেজনায় জোরে টানতে গিয়ে ধোঁয়াটা পেটে ঢুকে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে খকখকে কাশি এসে গেল ওর। দম বন্ধ হবার যোগাড়। সিগারেটটা রাস্তায় ফেলে দিয়েও স্বস্তি পাচ্ছিল না সে। ব্যাপার দেখে বাপী হেসে বলল, 'মাইরি অনি, তুই একদম গুডি বয় হয়ে আছিস!'

মুঠো খুললেই হাতের রেখার মত পরিষ্কার, বাঁক ঘুরতেই চা-বাগানের মাথা ডিঙিয়ে স্বর্গছিঁড়া চোখে পড়ল। চায়ের পাতা দেখলেই বুকের মধ্যে কেমন সিরসির করে অনিমেষের। একটু আগে আঙরাভাসার ওপর দিয়ে পার হবার সময় বাপী বলেছিল, 'আজ স্বর্গছেঁড়া চা-বাগানে একটা দারুণ ব্যাপার হচ্ছে।'

স্বর্গছেঁড়া চা-বাগানে কোন দারুণ ব্যাপার ঘটলে সেটা যেন ঠিক মানায় না। চুপচাপ শান্তভাবে স্বর্গছেঁড়ার দিনগুলো কেটে যাবে—ভোরবেলায় ট্রাকটরগুলো শব্দ করে চা-বাগানের ভেতর দিয়ে ঘোরাফেরা করবে, কুলিরা দল বেঁধে পাতি তুলতে বা ঝাড়াই-বাছাইএর কাজে ছুটবে, বাবুরা সাইকেলে হেলতে দুলতে ফ্যাক্টরী বা অফিসে যাবেন, আর তারপর গোটা দিন স্বর্গছেঁড়া দেয়ালা করে যাবে একা একা। বাপী বলল, 'আজ লেবাররা হরতাল করেছে—কেউ সকাল থেকে কাজে বের হয়নি।'

'সে কি!' ভীষণরকম চমকে গেল অনিমেষ। ওর চট করে সুনীলদার মুখটা মনে পড়ে গেল। এখানকার কুলিকামিনদের সঙ্গে সুনীলদা এসে কিছুদিন থেকে গেছে। কিন্তু এ জিনিস স্বর্গছেঁড়ায় কখনো হয়নি। দাদুর চলে যাওয়ার দিন যে কুলিরা ওর পায়ে লুটিয়ে পড়ে কেঁদেছিল তারাই আজ ধর্মঘট করছে—কিছুতেই মেলাতে পারছিল না অনিমেষ। ও দেখল রাস্তার দু'ধারে আজ ছুটির দিনের দৃশ্য। কুলি লাইন থেকে বের হয়ে মেয়ে-পুরুষ পিচের রাস্তার দু পাশে বসে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। অনিমেষ বলল, 'কি করে করল? কেন করল?'

'পি এস পি আর সি পি আই। মাইনে বাড়াবার জন্য, ভাল কোয়ার্টারের জন্য আর কি কি যেন সব। গোলমাল হতে পারে আজ।' স্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে বাপী কথা বলছিল। স্বর্গছেঁড়া টি এস্টেটের নেমপ্লেটটা চোখে পড়তেই গাড়ির গতি কমিয়ে দিল বাপী, ঠিক অনিমেষদের বাড়ির সামনে সেটাকে দাঁড় করিয়ে বলল, 'বিকেলে বাজারে আসিস। কাল অনেক রাত অবধি খুব খাটুনি গেছে, এখন ঘুমোব।'

দরজা খুলে অনিমেষ মাটিতে পা দিতেই ইউক্যালিপটাস পাতার তীব্র গন্ধ ভক করে নাকে লাগল। ও দেখল পাশেই একটা বাঁদরলাঠি গাছে বড়সড় শকুনকে ঘিরে কতকগুলো কাক খুব চিৎকার করছে। ও বাপীকে বলল, 'এত খাটিস না, মারা পড়বি।'

বাপী গাড়ি চালিয়ে চলে যাবার সময় বলে গেল, 'দূর শালা। বিয়েবাড়ির খাটুনি, কাল এলে তোকেও খাটতে হত। আমাদের সীতা দেবীকে কাল হরধনু ভঙ্গ করে রামবাবু আজ নিয়ে যাচ্ছেন।' একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে গাড়িটা চলে যাওয়ার পর অনিমেষ পাথরের মত রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকল।

এখান থেকে সার দেওয়া বাগানের কোয়ার্টারগুলো পরিষ্কার দেখা যায়। মাঠ পেরিয়ে কাঁঠালিচাঁপা গাছটার পাশ ঘেঁষে সীতাদের কোয়ার্টারটাকে আজ একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে। বেশ কিছু মানুষ সেখানে জটলা করছে, ত্রিপল টাঙিয়ে অনেকখানি জায়গা ঘিরে রাখা হয়েছে। পাশেই একটা লরিতে খাট আলমারি তোলা হয়েছে, সেটার পাশ ঘেঁষে কালো রঙের অস্টিন গাড়ি দাঁড়িয়ে। সীতার বিয়ে হয়ে গেল! সংবিৎটা ফিরে আসতেই অনিমেষ বুকের ভেতরে একটা অদ্ভুত শূন্যতা অনুভব করল। এই প্রথম ওর মনে হল কি একটা জিনিস যেন হারিয়ে গেল, আর কোন দিন সে ফিরে পাবে না। শেষবার দেখা সীতার ঘুমন্ত জরো মুখ, অদ্ভুত আড়াল রেখে কাছে টেনে নেওয়ার মত কথা—অনিমেষ এই আসাম রোডের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করল সীতাকে ও ভালবেসেছিল। ঠিক যে ভাবে রম্ভা তাকে ভালবাসার কথা বলেছিল কিংবা উর্বশীর চোখের চাহনিতে যে আহ্বান ছিল এটা সেরকম নয়। সত্যি বলতে কি, প্রেম-ভালবাসা ওর মাথায় কখনোই তেমন জোরালোভাবে আসেনি, আর আসেনি বলে রম্ভাকে ওর ভাল লাগেনি এক বিন্দু, উর্বশীর ব্যাপারে সে একটুও উৎসাহ পায়নি। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে ওর মনে হল সীতা ওকে ভালবাসত এবং একটুও চিন্তা না করে তার মনের ভেতর সীতার জন্য একটা নিশ্চিন্ত জায়গা তৈরি করা ছিল যেখানে বাইরের কোন সমস্যার আঁচ লাগার কথা কখনই কল্পনায় আসেনি। সীতাটা চট করে বিয়ে করে ফেলল? ওর মা তো ওকে পড়াশুনা করাতে চেয়েছিলেন। তা হলে কি ও পড়াশুনায় ভাল ছিল না! সেই সীতা—ছোটবেলায় হাত ধরলে যে ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠত, কয় বছর আগে ওর সঙ্গে কথা বলার সময় যে সীতা একদম নিজের অনুভূতি ওর মনের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে—তার বিয়ে হয়ে গেল। অথচ ও তো সীতাকে কখনো কোন চিঠি লেখেনি, মন্টুর মত মুখ করে বলেনি, আই লাভ ইউ সীতা। তা হলে ওর বুকের ভেতর এ রকম করছে কেন? সীতা কি করে জানবে

অনিমেষের মনের মধ্যে এরকম ব্যাপার ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হল, সীতা জানত, নিশ্চয়ই জানত—অন্তত জানা উচিত ছিল। দু'পাশের মরে শুকিয়ে যাওয়া পাতাবাহারের গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওর মনে হল, এই পৃথিবীতে তার জন্য কোন ভালবাসা অপেক্ষা করে নেই।

ক্লাবঘর বন্ধ। ওপরের খড়ের চাল এলোমেলো। ওদের কোয়ার্টারের বারান্দায় উঠে এসে অনিমেষ একটু থমকে দাঁড়াল। এখন বাবার বাড়িতে থাকার কথা নয়। এই সময় ছোটমা নিশ্চয়ই জলখাবার খেতে ব্যস্ত। দরজার কড়া নাড়তে গিয়ে দূর থেকে উলুধ্বনি ভেসে এল। যেন শুনতে চায় না এই রকম ভঙ্গীতে ও জোরে জোরে কড়া নাড়তে লাগল।

ভেতর থেকে কোন শব্দ নেই, কেউ সাড়া দিচ্ছে না। খিড়কি দরজার দিকে তাকাল অনিমেষ। বাইরে থেকে আঙুল ঢুকিয়ে একটু কায়দা করলে দরজাটা খোলা যেত, এখনও সেরকম আছে কি? সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে যাবে এমন সময় ও দেখল একটা বাচ্চা ছেলে ছুটে আসছে ওর দিকে। কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল, 'আপনাকে ডাকছে।'

'কে?'

অনিমেষ অবাক হল। ছেলেটির মুখ সে আগে দ্যাখেনি, ওরা চলে যাবার পর নিশ্চয়ই ও হয়েছে। ছেলেটির বুক ওঠানামা করছিল, বলল, 'মাসীমা।'

'মাসীমা কে?' অনিমেষের কৌতূহল বাড়ছিল।

এই বাড়িতে থাকে। আঙুল দিয়ে অনিমেষদের কোয়ার্টারটা দেখাল সে। ছোটমা ওকে ডাকছে তাহলে। ছোটমা কোথায় আছে? নিশ্চয়ই গাড়ি থেকে নামতে দেখেছে ওকে। অনিমেষকে ইতস্তত করতে দেখে ছেলেটি বলল, 'দিদিমাও আপনাকে বার বার করে যেতে বলল।'

'দিদিমা?'

'ওই যে, যার বিয়ে হচ্ছে তার দিদিমা।' ছেলেটি বিজ্ঞের মত হাসল এবার।

এতক্ষণে অনিমেষের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। ছোটমা সীতাদের বাড়িতে আছে। সেখান থেকে তাকে দেখে এই ছেলেটিকে দিয়ে ডাকতে পাঠিয়েছে। ওর মনের ভেতরে যে অভিমানটা এতক্ষণ টলটল করছিল সেটা যেন চট করে গড়িয়ে গেল। সীতাদের বাড়িতে সে যাবে কেন? ওকে দেখে ছোটমা তো চলে আসতে পারত। এতদিন পর সে স্বর্গছেঁড়ায় আসছে, অথচ ছোটমা ওখানে বসে থাকল। ও ভাবল ছেলেটিকে বলে দেয় যে সে যাবে না। কিন্তু তার আগেই ছেলেটি মুখ ঘুরিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, 'আসছে।'

একটু দ্বিধা করল অনিমেষ। এখন সে কি করবে? নিশ্চয়ই কেউ এসে বাইরে দাঁড়িয়েছে যাকে ছেলেটি জানান দিল। না গেলে ব্যাপারটা খুবই খারাপ দেখাবে। আর এই সময় ওর মনে হল, সীতাকে আর কোন দিন সে দেখতে পাবে না। কনের বেশে সীতাকে দেখবার লোভ হঠাৎ ওর মনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ব্যাগটা হাতে নিয়েই অনিমেষ ছেলেটির সঙ্গে মাঠে নেমে পড়ল। সীতাদের কোয়ার্টারের দিকে ঘুরতেই ও দেখতে পেল দূরে মাঠের ওপর নিজেদের বাড়ির সামনে একটি ছোট মেয়ের কাঁধে হাত রেখে ঠাকুমা দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পেছনে ত্রিপলের তলায় লোকজন ওদের দিকে তাকিয়ে আছে।

অনিমেষ ব্যাগটা এক হাতে নিয়েই ঠাকুমাকে প্রণাম করল। উঠে দাঁড়াতেই খপ করে বুড়ী ওর হাত চেপে ধরলেন, 'রাগ করেছিস?'

ভীষণ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল অনিমেষ। ঠাকুমা কি বলতে চাইছেন? ও না বুঝে ঘাড় নাড়ল। কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে থেকে ঠাকুমা বললেন, 'পাসের খবর এসেছে?'

ঘাড় নাড়ল অনিমেষ।

'ফাস্টো কেলাস?'

হেসে ফেলল অনিমেষ, 'হ্যাঁ।'

সঙ্গে সঙ্গে বুড়ী চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওরে, মিষ্টি নিয়ে আয়, অ বউমা, কোথায় গেলে সব—আমার অনিবাবা ফাস্টো ক্লাস পাস করেছে। সে বেটি থাকলে আজ কি করতো—' বলতে বলতে মুখটা ভেঙে চৌচির হয়ে গেল ঠাকুমার। কান্নায় কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'সীতুটাকে আজ পার করে দিল রে।'

'ভালই তো', মুহূর্তে শক্ত হয়ে গেল অনিমেষ, 'ভালই তো। আপনি বলতেন, মেয়েদের জন্ম হয়েছে সংসার করবার জন্য।'

ঠাকুমার পায়ে জোর নেই, বোধ হয় এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আর শরীরটাকে খাড়া রাখতে পারছিলেন না। ওঁকে টলতে দেখে অনিমেষ এক হাতে জড়িয়ে ধরে সামলে দিল। সেভাবেই কাঁদতে কাঁদতে ঠাকুমা বললেন, 'তাই বলে ডবল বয়সের মানুষের সঙ্গে বিয়ে দেবে গো। আমার কথা শুনল না—পাত্র অফিসার নাকি।'

ঠাকুমার কথা শেষ হবার আগেই পেছনের জটলা থেকে সীতার বাবা উঠে এসে তাঁকে ধরলেন, 'আঃ মা, কি বলছ তুমি। এখন এসব বলে লাভ আছে?'

মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলেন ঠাকুমা, কিন্তু তাঁর শরীরটা কাঁপতে লাগল থরথর করে। সীতার বাবা ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'তুমি তো খুব বড় হয়ে গেছ, কদ্দিন পর তোমাকে দেখলাম। ফার্স্ট ডিভিসন পেয়েছ? বাঃ বাঃ, বেশ।

খুব ভাল হল আজকের দিনে এসেছ। যাও ভেতরে যাও।’

ঠাকুমাই লেংচে লেংচে ওর হাত ধরে ভেতরে নিয়ে এলেন। অনিমেষের খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। ত্রিপলের তলায় লোকগুলো ওর দিকে উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছে। ঠাকুমার কথাটা শোনার পর ভেতরে যাবার ইচ্ছেটাই উবে গিয়েছিল। এই বিয়ে কি সীতার বাবা জোর করে দিয়েছেন? ওর খেয়াল হল, বিয়ের ব্যাপারে মতামত দেবার বয়স সীতার এখনো হয়নি। হলে পরে কি সীতা প্রতিবাদ করত?

চা-বাগানের বিয়েবাড়িতে আতিশয্য তেমন হয় না। জলপাইগুড়ি শহরে বন্ধুদের দাদা-দিদির বিয়েতে গিয়ে অনিমেষ মাঝে মাঝে সানাই বা মাইক বাজতে দেখেছে, মেয়েরা ছুটোছুটি করে বিয়েবাড়ি জমিয়ে রেখেছে। কিন্তু চা-বাগানে আচার-অনুষ্ঠান পালন হয় আন্তরিকভাবে, কিন্তু বিয়েবাড়ির চটক তেমন থাকে না। সাধারণত কোয়ার্টারের ভেতরে যে উঠোনমত জায়গা থাকে সেখানেই অনুষ্ঠানটা হয় আর অসমবয়সী মেয়েরা আচার খাওয়ার মত রসিয়ে রসিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠানটা সম্পন্ন করায়। অনিমেষ দেখল ঠাকুমা ওকে ঘর পেরিয়ে উঠোনে নিয়ে যাচ্ছেন।

ভেতরে পা দিতেই আবার উলুধ্বনিটা কানে এল। কিন্তু সেটাকে ছাপিয়ে ঠাকুমা চিৎকার করে সবাইকে ডাকতে লাগলেন। ততক্ষণে ওরা ভেতরের বারান্দায় পৌঁছে গেছে। ওখানে দাঁড়িয়ে উঠোনে নজর পড়ল অনিমেষের। ঠিক মধ্যিখানে চার দিকে চারটে কলাগাছ পুঁতে মাঝখানে বর-বউ বসে আছে। তাদের ঘিরে মেয়েদের জটলা। ছোটমাকে দেখল অনিমেষ, সীতাকে জড়িয়ে ধরে কিছু একটা করছেন। ওকে দেখে হাসবার চেষ্টা করলেন। সীতার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল অনিমেষ। একটা জবুথবু কাপড়ের পুঁটলির মত দেখাচ্ছে সীতাকে। মাথা নিচু, বেনারসী কাপড়ের পাড়টা চকচক করছে। সীতার মাথার মুকুট এখন বর্শার ফলার মত তার দিকে তাক করা। মুখটা দেখতে পেল না অনিমেষ। সীতার পাশে যিনি বসে আছেন তাঁকে বেশ শক্তসমর্থ বলে মনে হল ওর। নিশীথবাবুদের বয়সী হবেন বোধ হয়। ঠাকুমার হাঁকডাকে মুখ তুলে ওদের দিকে তাকিয়ে আছেন। বেশ মোটা গোঁফ আছে সীতার বরের। ঠাকুমার ডাকে সীতার মা আড়াল থেকে ঘোমটা মাথায় বেরিয়ে এলেন। এক পলক দেখেই অনিমেষ বুঝে ফেলল উনি একটু আগেও খুব কাঁদছিলেন। সীতার মা এসে ওর হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে আর একজনের হাতে দিয়ে বললেন, ‘কি ভাল লাগছে

আজ তুমি এসেছ। সীতা বার বার তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করছিল তুমি আসবে কিনা।' অনিমেষ মাথা নিচু করল। ওর হঠাৎ খেয়াল হল পাসের খবর দিয়েছে যখন তখন এঁদের প্রণাম করা উচিত। কিন্তু সেই মুহূর্তে ওর সীতার বরের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যেতেই ও মত পাল্টে ফেলল। ঠাকুমা ততক্ষণে ওর ফার্স্ট ডিভিসনে পাসের খবর, ওর মত ভাল ছেলে হয় না, পনেরই আগস্ট স্বর্গছেঁড়ার সমস্ত ছেলের মধ্যে থেকে শুধু ওকেই পতাকা তুলতে দেওয়া—এইসব সাতকাহন পাঁচজনকে গর্ব করে শোনাচ্ছেন।

অনিমেষ সীতার ওপর চোখ রেখেছিল। ও দেখল সে এসেছে, সামনে দাঁড়িয়ে আছে শুনেও সীতা একবারও মুখ তুলে ওকে দেখল না। সীতার মা বললেন, 'জানিই তো, ও ফার্স্ট ডিভিসনে পাস না করলে কে করবে। তুমি বসো, এখন তো কলকাতায় পড়তে যাবে, আর কবে পেটভরে খাওয়াবার সুযোগ পাব জানি না।' উনি দ্রুত রান্নাঘরের দিকে চলে যেতে অনিমেষ দেখল বিয়ের বরকনেকে ছেড়ে সবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ততক্ষণে ঠাকুমা ওকে টানতে টানতে উঠোনের নামিয়েছেন, 'বিয়েতে এলি না তো কি হয়েছে, বাসীবিয়েতে এলি এই ভাগ্যি। নে আমাদের জামাইকে ত্মাখ। ওগো নাতজামাই, এই যে ছেলেটাকে দেখছ, ভীষণ বিদ্বান। তোমার বউ-এর সঙ্গে ছেলেবেলায় খেলা করত।' ভদ্রলোক এমনিতে খুব অস্বস্তি নিয়ে বসেছিলেন, কথাটা শুনে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসে নমস্কার করলেন। এতবড় লোক তাকে নমস্কার করছে দেখে হকচকিয়ে অনিমেষ হাতজোড় করতেই ঠাকুমা হেসে ফেললেন, 'ওমা, এইটুকুনি ছেলেকে নমস্কার করছ কি গো।' এই সময় সীতার পাশে বসে থাকা ছোটমাকে বলতে শুনল অনিমেষ, 'আমার ছেলে।'

ভদ্রলোক আবার হাসলেন, হাসিটা ভাল লাগল না অনিমেষের। কেমন বোকা-বোকা। ঠাকুমা আবার ডাকলেন, 'ও ছুঁড়ী, ত্মাখ কে এসেছে। লজ্জায় মাথা যে মাটিতে ঠেকল, আমাদের যেন আর কোন দিন বে হয়নি।' একটু একটু করে মুখ তুলল সীতা। বেনারসী, মুকুট আর ওড়নার চালচিত্রের সামনে সীতার মুখটা ঠিক দুর্গাঠাকুরের মত দেখাচ্ছে। বুকের মধ্যেটা হঠাৎ থম-ধরা দুপুর হয়ে গেল অনিমেষের, সীতার দুই চোখের পাতা শ্রাবণের আকাশ হয়ে রয়েছে। অথচ কি সহজ গলায় সীতা কথা বলল, 'তোমরা নাড়ুগোপালকে নাড়ু খাওয়াও ঠাকুমা।' কথাটা শেষ হতেই দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ফেলল সীতা। চোখে জল না এনে বুকভরে কেঁদে যাওয়া যায়—অনিমেষ সেই রকম কাঁদতে কাঁদতে সীতার চোখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে ঘুরে দাঁড়াল। প্রচণ্ড

দুঃখের মধ্যে হঠাৎ এক ধরনের সুখ মানুষ পেয়ে যায়। অনিমেষের মনে হল বিয়ের খবরটা কানে যেতেই ওর বুকের মধ্যে যে ইচ্ছেটার খবর ও পেয়েছিল, এই মুহূর্তে সীতা সেটাকে আসনে বসিয়ে দিল। পায়ে পায়ে বারান্দায় উঠে এল অনিমেষ। বাসীবিয়ে আশীর্বাদ বোধ হয় হয়ে গিয়েছিল। মেয়েরা হইচই করতে করতে বরকনেকে ভিতরে নিয়ে যাচ্ছে। এই সময় সীতার বাবা এসে তাড়া দিলেন, 'ওদের যাবার সময় হয়ে যাচ্ছে।'

মিষ্টিমুখ না করে সীতার মা ছাড়লেন না। এদিকে মেয়ে-জামাই চলে যাবে —বাড়িসুদ্ধ সেসব ব্যাপারে ব্যস্ত ছিল। এ বাড়িতে অনিমেষের এখন কেমন একলা একলা লাগতে শুরু করল। কন্যাযাত্রীদের খাওয়াদাওয়া আগেই চুকে গিয়েছিল। জামাই খেতে বসেছে। সীতাকে খাওয়ানোর জন্য জোর চেষ্টা চলেছে, সে খাবে না। এলোমেলো একটু ঘুরে ওর মনে হল এখন এই বাড়ি থেকে চলে যাওয়াই ভাল। ঠিক এই সময় ছোটমা ওর ব্যাগ হাতে নিয়ে কাছে এল, 'চল, এখন বাড়ি যাবে তো?' ঘাড় নেড়ে ব্যাগটা ওর হাত থেকে নিয়ে অনিমেষ ছোটমার সঙ্গে বেরিয়ে এল। ছোটমা মাথায় অনেকখানি ঘোমটা টেনে দিয়েছে, চওড়া-পেড়ে টাঙাইল শাড়িতে ছোটমাকে চমৎকার দেখাচ্ছে। ওর হঠাৎ মনে হল, ছোটমা তেমনি রোগাই আছেন।

বাইরে আর একটা গাড়ি এসেছে মেয়ে-জামাইকে নিতে। লরিতে মালপত্র তোলার কাজ শেষ। ওরা চুপচাপ মাঠে নেমে এল। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ছোটমা বলল, 'তুমি খুব রোগা হয়ে গেছ, আর কি লম্বা।' অনিমেষ হাসল। ছোটমা আবার বলল, 'সীতাটা খুব ভাল মেয়ে ছিল, না?'

'ছিল বলছ কেন?' অনিমেষ কথাটা শুধরে দিতে চাইল।

'বিয়ে হলে মেয়েদের পুনর্জন্ম হয়।' তারপর একটু থেমে বলল, 'আমার ওপর তোমার রাগটা কমেছে?'

অনিমেষ মুখ তুলল, 'রাগ করতে যাব কেন খামকা!'

'তাহলে নিজের মুখে আমায় তোমার পাসের খবর দিলে না কেন?'

অনিমেষ দেখল ছোটমার মুখটা কেমন হয়ে গেল। ও তাড়াতাড়ি বলল, 'ঠাকুমা বললেন তাই ভাবলাম শুনেছ। সবাই তো ফার্স্ট ডিভিসন পায়—নতুন আর কি!'

'ইস, বেশী বেশী। তোমার বাবা শুনলে ভীষণ খুশী হবেন। ক'দিন থেকেই খবরটা শোনার জন্য ছটফট করছেন। এবার কলকাতায় যাবে তো, দিন ঠিক হয়েছে?'

কথা বলতে বলতে ওরা বাড়ির সামনে চলে এসেছিল। অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, 'হুঁ, বুধবার।'

বারান্দায় উঠে ছোটমা ঘুরে দাঁড়াল। তারপর চট করে ডান হাতের মধ্যমা থেকে একটা আংটি খুলে অনিমেষের বাঁ হাতটাকে ধরে ফেলল। অনিমেষ কিছু বোঝার আগেই ছোটমা আংটিটা ওর বাঁ হাতের অনামিকায় পরিয়ে দিল, 'অনিমেষ, আমি তো হাজার হোক তোমার মা, তোমাকে কোন দিন কিছু দিতে পারিনি—এইটে কখনো হাত থেকে খুলবে না, কথা দাও।' হাতটা মুখের সামনে তুলে ধরতেই অনিমেষ দেখল চকচকে নতুন সোনার আংটির বুকে বাংলায় অ অক্ষরটা লেখা রয়েছে। তার মানে ছোটমা তাকে দেবে বলেই আংটিটা করিয়ে রেখেছিল। অনিমেষের বুকটা ভার হয়ে গেল, কোনরকমে সে বলল, 'তুমি জানতে আমি ফার্স্ট ডিভিসন পাব?'

আস্তে আস্তে ছোটমা বলল, 'আমি রোজ ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতাম যে।'

ব্যাগটা মাটিতে রেখে অনিমেষ ছোটমাকে প্রণাম করল। খুব শান্ত হয়ে প্রণাম নিয়ে অনিমেষের নত মাথায় নিজের দুই হাত চেপে ধরল ছোটমা।

চাবি বের করে যখন অনিমেষকে দরজা খুলতে বলল ছোটমা, ঠিক তখন পেছনে সাইকেলের আওয়াজ হল। এতদিন কড়ায় তালা লাগানো হত, অনিমেষ গা-তালাটাকে আগে দ্যাখেনি। সাইকেলের শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, মহীতোষ নামছেন। চোখাচোখি হতেই মহীতোষ যেন কি করবেন বুঝতে পারছেন না। সাইকেলটাকে রেখে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কয়েক পা এগিয়ে এলেন কথা না বলে। অনিমেষ দেখল বাবার চেহারাটা কেমন বুড়ো-বুড়ো হয়ে গিয়েছে, একটু রোগা লাগছে। সিঁড়ির ধাপে পা দেবার আগেই অনিমেষ দ্রুত নেমে গিয়ে ওঁকে প্রণাম করল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি ফার্স্ট ডিভিসন পেয়েছি।' কথাটা শুনেই মহীতোষ দু'হাতে ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন। বাবার মাথা তার সমান, আলিঙ্গনে দাঁড়িয়ে থাকতে ওর অসুবিধে হচ্ছিল। মহীতোষ ওকে জড়িয়ে ধরে ওপরে উঠে এলেন, 'খোকাকে খেতে দাও।' চটপট অনিমেষ বলল, 'আমি খেয়েছি।'

এই সময় একটা কান্নার রোল উঠল সীতাদের বাড়িতে। ওরা তাড়াতাড়ি বাইরে এগিয়ে এসে দেখল প্রথমে কালো গাড়ি, পেছনে লরিটা সীতাদের বাড়ি ছেড়ে এগিয়ে আসছে। সীতার ঠাকুমা মা প্রচণ্ড জোরে কেঁদে কেঁদে উঠছেন। সীতার বাবাকে চোখে পড়ল না। গাড়ি যখন ওদের বাড়ির সামনে দিয়ে রাস্তার দিকে বাঁক নিচ্ছে, ঠিক তখন অনিমেষ সীতাকে দেখতে পেল। জানলায়

ধারে গাল চেপে সীতা একদৃষ্টে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। এত দূর থেকেও সীতার চোখ থেকে জল গড়াতে দেখল অনিমেষ।

মহীতোষ হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ভাগ্যিস আমাদের মেয়ে নেই।' তারপর ছেলে আর স্ত্রীকে দেখে তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিলেন, 'দাদু ভাল আছেন?'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'তোমার খবরে নিশ্চয়ই খুশী হয়েছেন। ওঁর জন্যেই এটা সম্ভব হল।' তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'অনিমেষ, এখন তুমি বড় হয়েছ। আমরা তো ভগবান নই, অনেক সময় অনেক ভুল করি—সেগুলো মনে রেখো না। সুখ পাওয়া ভাগ্যের কথা, কিন্তু তাই বলে দুঃখের কথা মনে রাখলে শুধু কষ্ট পেতে হয়।'

অনিমেষ কিছু বলল না। বাবা কি বলতে চাইছেন সে বুঝতে পারছে, কিন্তু এই মুহূর্তে সেসব কথা তার মনে একদম আসছে না। সীতার চোখ দুটো মন থেকে সরাতে পারছিল না সে। ও দেখল, গাড়িগুলো ধূপগুড়ির রাস্তায় মিলিয়ে গেল। হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গীতে মহীতোষ বললেন, 'ওহো, তোমরা তাড়াতাড়ি কর, বাগানের লেবাররা খুব খেপে গেছে আমরা কাজ করেছি বলে, ওরা এখানে হামলা করতে আসতে পারে।'

ছোটমা আঁতকে উঠে বলল, 'সে কি! কি হবে তাহলে?'

মহীতোষ বললেন, 'জরুরী জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। বাজারের সত্য সেনের বাড়িতে তোমাদের রেখে আসব। গোলমাল মিটে গেলে আবার ফিরে আসবে।'

ছোটমা দৌড়ে দরজা খুলতে গেল। এই সময় অনিমেষ দেখল, কিছু কুলিকামিন হইহই করতে করতে ফ্যাক্টরীর দিকে ছুটে যাচ্ছে আসাম রোড দিয়ে। নিজের শরীরের মত পরিচিত স্বর্গছেঁড়ায় এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে—একদম বিশ্বাস হচ্ছিল না অনিমেষের। এই মুহূর্তে ওর চোখের সামনে সীতা নেই।

ভেতর থেকে মহীতোষের গলা ভেসে এল, অনিমেষকে ডাকছেন। অনিমেষ সাড়া দিয়ে দেখল চা-বাগানের নুড়িবিছানো পথ দিয়ে সাইকেলগুলো দ্রুত মাঠের দিকে ছুটে আসছে। টাইপবাবু, ডাক্তারবাবু, পাতিবাবু, মশাবাবুরা জোরে জোরে প্যাডেল ঘুরিয়ে যে যার কোয়ার্টারের দিকে চলে যাচ্ছেন। মনোজ হালদারকে চিনতে পারল অনিমেষ, সেই রকম চেহারা আছে এখনও, নিজের কোয়ার্টারের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ সাইকেল ঘুরিয়ে সীতাদের কোয়ার্টারের সামনে গিয়ে উত্তেজিত হয়ে কিছু বলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সীতার বাবাকে ওঁদের গেটে দেখতে পেল অনিমেষ। মাথা নেড়ে কিছু জিজ্ঞাসা করে চেঁচামেচি করে বাড়ির লোকদের

কিছু বলতে লাগলেন। এই সময় আরও কিছু লেবারকে পতাকা হাতে লাইন থেকে ছুটে আসতে দেখল অনিমেষ। বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ হইহই করতে করতে চা-বাগানের নুড়িবিছানো পথটায় ঢুকে যাচ্ছে। এবং অনিমেষ অবাক হয়ে শুনল কেউ একজন চিৎকার করে উঠতেই বাকিরা জানান দিল, 'জিন্দাবাদ'। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ।' বলার ধরনটা শহরে শোনা ধ্বনির মত নয়, বরং বেশ মজা পেয়ে গেছে ওরা—ভাবভঙ্গীতে তাই মনে হল। ওরা চলে যাওয়ার পর অনিমেষ দেখল আসাম রোডের ওপারে মারোয়াড়ী দোকানের ঝাঁপ শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল।

অনিমেষ ব্যাপারটাকে কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছিল না। এই শান্ত সরল মানুষগুলো হঠাৎ এরকম ক্ষেপে গেল কেন? ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছে বাবুদের দেখলে এরা কেন্নোর মত গুটিয়ে যায়, বাবুদের কোয়ার্টারে ছেলেকে কাজে লাগাতে পারলে ধন্য হয়—তারাই এখন ক্ষেপে গেল কেন? আর বাবুদের তো এমন ভয় পেতে দেখেনি ও। লোকগুলো কি চাইছে? টাকা-পয়সা—খাবার-দাবার? ওর মনে পড়ল সুনীলদা বলেছিল পৃথিবীতে দুটো জাত আছে, একদল হল সর্বহারা, অন্যদল বুর্জোয়া। বুর্জোয়া মানে যার সব আছে, কিন্তু সামান্য কিছু হারাবার ভয়ে যে অনেক বেশী সর্বহারাদের কাছে আদায় করে। তাহলে এই লেবারগুলো সর্বহারা। কিন্তু ওর মনে হল, বাবা এবং অন্যান্য বাবুরা মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন। এরা আর যাই হোক, এই কোয়ার্টারগুলোতে এসে হামলা করবে না। কখনো কোন মদেসিয়া ওঁরাওকে ও অভদ্র হতে দেখেনি, হাড়িয়া খেয়ে মাতাল হয়ে গেলেও না। অনিমেষ মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে কোয়ার্টার-গুলোকে ভাল করে দেখল। সব কটার দরজা বন্ধ। আসাম রোড দিয়ে হুস হুস করে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। হঠাৎ ওর মনে হল, স্বর্গছেঁড়ার চেহারাটা যেন অনেকখানি পাল্টে গেছে। এই মাঠের মধ্যে দাঁড়ানো গাছ দুটো কেমন শীর্ণ, পাতাবাহার গাছগুলো শুকিয়ে মরে যাচ্ছে, বৈশাখ মাসের শেষে প্রখর রোদে স্বর্গছেঁড়া এখন পুড়ছে। অথচ চিরকাল এখানে একটা ঠাণ্ডা ভাব থাকত, এই সময় ভুটানের পাহাড় থেকে মেঘগুলো বৃষ্টি নিয়ে আসত।

কোয়ার্টারের বারান্দায় উঠে এল অনিমেষ। আর বাবা তাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন এবং এই প্রথম ওঁর মুখে সে খোকা ডাকটা শুনতে পেল। অন্য সময় হয়তো খোকা শুনলে তার হাসি পেত কিন্তু সেই মুহূর্তে ওঁর ডাকটা ভাল লেগেছিল। এখান থেকে চলে যাওয়ার পর থেকে বাবার সম্পর্কে ওর মনে যে ঘৃণা এবং তিক্ততা বাসা বেঁধেছিল, এই মুহূর্তে তার কোন অস্তিত্ব নেই। বাবা

যেন আমূল পাল্টে গেছেন। শুধু তার সঙ্গেই নয়, ছোটমার সঙ্গেও বাবা কি ভাল ব্যবহার করছেন। মহীতোষের বুকের সঙ্গে লেপ্টে থাকার সময়কার অস্বস্তিটা ওর মনে আবার এল। বাল্যকাল থেকে এ পর্যন্ত এ রকম ঘটনা ঘটেছে কিনা ওর মনে পড়ে না। কি সব যে চটপট হয়ে যায়। যাকে দেখতে আজ খারাপ লাগল, কাল হয়তো সেটা অন্য রকম হতে পারে।

আশ্চর্য! বসার ঘরটা ঠিক সেই রকম আছে। এই যে এতগুলো বছর কেটে গেল, এই ঘরটার ওপর তার কোন ছাপ পড়েনি। শুধু সোফার ওপর কভারগুলো এখন পাল্টে গেছে এবং—। অনিমেষ পায়ে পায়ে সোফার পাশে দেওয়ালের সামনে এসে দাঁড়াল। একটা বড় ফ্রেমে বাঁধানো ছবিতে তার চার-পাঁচ বছরের মুখটা হাসছে। কি ভীষণ দুষ্টু-দুষ্টু লাগছে চোখ দুটো। নিজের যে এরকম একটা ছবি আছে একদম জানা ছিল না, অনিমেষ দেখল এই এত বছর হয়ে গেল, তার মুখ খুব সামান্যই পাল্টেছে। এই ছবি আগে এখানে ছিল না। বাবা নিশ্চয়ই নতুন করে বাঁধিয়ে এখানে টাঙিয়েছেন। কবে থেকে? অনিমেষের সব কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল।

মাঝের ঘরে পা দিতেই অনিমেষ দেখল বাবা দ্রুত জানলাগুলো বন্ধ করছেন, ছোটমা উবু হয়ে বসে স্যুটকেসে কি সব ভরছে। ওকে দেখে ছোটমা বলল, 'তুমি এতদিন পর এলে, আর কি হাঙ্গামায় পড়তে হল বল তো।'

অনিমেষ বলল, 'কিন্তু এখানে গোলমাল হবে কেন?'

মহীতোষ বললেন, 'লেবাররা স্ট্রাইক কল করেছিল যখন তখন আমাদের পরামর্শ করেনি। আজ যেহেতু আমরা অফিসে গেছি, ওরা ক্ষেপে গেছে। স্ট্রাইকটা যে আমাদের নয় সেটা ওরা বুঝতে চাইছে না।'

অনিমেষ বলল, 'আমাদের বাগানের কুলিরা এমন করবে কোনদিন কেউ কল্পনা করতে পারেনি?'

মহীতোষ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ওদের দাবিগুলো ঠিক আছে কিন্তু এভাবে কোন কাজ হয় না। জলপাইগুড়ি থেকে লোক এসে রাতদিন তাতিয়ে এই কাণ্ড করেছে, তারপর আমাদের জুলিয়েনবাবু আছেন—তিনিই তো এখন ওদের নেতা।'

'জুলিয়েন?' প্রশ্নটা করেই অনিমেষ ভাবল বাবা কি সুনীলদাকে চেনেন?

'বকু সর্দারের ছেলে। তোর দাদুর পেছনে যে বকু সর্দার দিনরাত ঘুরে বেড়াত। বকুটা মরে গেছে, ওর ছেলে হল এদের পাণ্ডা। আবার মজা হল জুলিয়েন কিন্তু নিজে লেবার নয়—অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টোরকিপার—ছোট মালবাবু।

কোম্পানি এখন মদেসিয়াদের বাবুদের চাকরিতে নিচ্ছে—এবার ঠ্যালা বোঝ।'
মহীতোষ আর দাঁড়ালেন না, দৌড়ে অন্যান্য ঘরগুলো সামলাতে গেলেন।

কুলিদের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে ওরা এবং বোঝাই যাচ্ছে বাগানের সবাই কোয়ার্টার ছেড়ে বাজারের দিকে চলে যাবে। যেহেতু বাজার এলাকাটা চা-বাগানের আওতায় পড়ে না, তাই সেখানে গেলে কুলিরা হামলা করতে পারবে না। এতদিন ধরে যে মানুষগুলোকে দিনরাত চোখের ওপর দেখে আসছেন এই বাগনের বাবুরা, আজ যেন আর তাদের বিশ্বাস করতে পারছেন না। অথচ মজার ব্যাপার, দু দলই এই বাগানে কর্মী। বিলেতে বসে কলকাতার অফিসের মাধ্যমে কোম্পানী এই বাগানের ওপর কর্তৃত্ব করছে এবং তার সরাসরি দায়িত্ব ম্যানেজারের ওপর। কুলিরা দাবিদাওয়া ম্যানেজারকে জানিয়েছেন, ম্যানেজার সেটা কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। যতক্ষণ কোন সিদ্ধান্ত না হবে ধর্মঘট চলবে। ম্যানেজার সকাল থেকে তাঁর বাংলোর সামনে একগাদা সিকিউরিটির লোক বসিয়ে রেখেছেন—সবাই জানে সাহেবের কাছে দুটো বন্দুক আছে। ওখানে হামলা সহজে হবে না। কিন্তু কুলিরা বাবুদের কাজে যাওয়াটা মানতে পারছে না। জুলিয়েন নিজে আজ কুলিদের সঙ্গে আছে। যদিও বাবুদের য়ুনিয়ন আলাদা, তবু কুলিদের রাগ ওঁদের ওপরই পড়েছে। এতদিন ধরে যা কিছু হুকুম ওরা পেয়েছে তা বাবুদের কাছ থেকেই, ম্যানেজারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ওদের হয় না। জুলিয়েন ওদের পরিষ্কার করে না বললেও ওদের বুঝতে কষ্ট হয়নি যা কিছু অত্যাচার তা এই বাবুদের মাধ্যমেই সাহেব করেছেন। তাই আজ বাবুরা কাজে গিয়েছে খবর পেয়ে দলে দলে লোক ছুটছে ফ্যাক্টরীর সামনে।

মহীতোষদের ডেকে ম্যানেজার আগাম খবরটা দিয়েছেন। সাদা চামড়ার এই সাহেব উত্তরবঙ্গের চা-বাগানগুলোয় স্কটিশদের শেষ প্রতিনিধি। এখন বেশ ভাল হিন্দী বলতে পারেন ভদ্রলোক। অত্যাচারী বলতে যা বোঝায় মহীতোষরা এঁকে সেরকম মনে করেন না। অবশ্য সাহেবের একটা নিজস্ব গোয়েন্দাবাহিনী আছে, যারা ওঁকে এই চা-বাগানের সব খবর আগাম এনে দেয়। তাই সাহেব যখন মহীতোষদের ডেকে কুলিদের সম্ভাব্য আক্রমণের কথা বলছিলেন তখন চট করে কেউ বিশ্বাস করতে পারেননি। এতদিনের পরিচিত মুখগুলো, যারা সাত চড়েও রা কাড়ে না, তারা আজ আক্রমণ করবে ভাবতে পারছিলেন না। যদিও বেশ কিছুদিন ধরে তাঁরা খবর পাচ্ছিলেন, বিভিন্ন পার্টির লোক এসে লাইনে লাইনে কুলিদের তাতাচ্ছে কিন্তু কেউ সেটায় তেমন গা করেননি। দীর্ঘকাল ধর্মঘট বা আন্দোলন চালাবার মত মানসিক এবং আর্থিক ক্ষমতা এদের নেই—এটা সবাই

জানে না। এই চা-বাগানে যে সমস্ত কুলি-কামিন কাজ করে তাদের বেশী ভাগ হপ্তায় হপ্তায় টাকা পায়। যদিও একটা পরিবারের একদম শিশু ও বৃদ্ধ ছাড়া ছেলে মেয়ে মা বাবা সবাই কাজে আসে, কিন্তু হপ্তার টাকা পেলে সেটা ঘরে পৌঁছয় খুবই সামান্য। স্বর্গছেঁড়ার চৌমাথায় বিরাট ভাটিখানা তো আছেই, শনিবার রাত্রে জুয়োর বোর্ড বসে যায় ডব্লিউ-এর শেষে। ডব্লিউ হল ছোট ছোট বাজার—কিন্তু তার পর জুয়াড়ীরা এসে সেখানে ফাঁদ পাতে অনেক রাত পর্যন্ত পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে। কুলিরা যে টাকা রোজ হিসাবে পায় কামিনরা পায় তার অর্ধেক। এই টাকা হাতে এলেই এদের মেজাজ হাঁড়িয়া না হলে শান্ত হয় না। ফলে দুদিন যেতে না যেতে ধারের মাত্রা বাড়তে থাকে।

এই রকম অর্থনৈতিক অবস্থা যাদের, যারা ম্যানেজার তো দূরের কথা—বাবুদের দেখলেই হাতজোড় করে অনুগ্রহের আশায় দাঁড়িয়ে পড়ে মাথা নিচু করে, তাদের কোন পলিটিক্যাল পার্টির লোক ক্ষ্যাপালেও কোন কাজ হবে না এই বিশ্বাস সকলের ছিল। কিন্তু কদিন থেকে উত্তেজনা চরমে উঠে আজ সকালে যখন মহীতোষরা ফ্যাক্টরীতে এলেন তখন দেখলেন একটাও লোক নেই ধারেকাছে, আংরাভাসার বুকে হুইলটা পর্যন্ত ঘুরছে না। নিঝুম হয়ে আছে স্বর্গছেঁড়া চা-বাগানের ফ্যাক্টরী এবং অফিস। দু-একজন যারা ভয়ে ভয়ে এসেছিল, গতিক সুবিধের নয় বলে গা-ঢাকা দিয়েছে। ফাঁকা ফ্যাক্টরীতে থাকতে ওদের অস্বস্তি হচ্ছিল, এমন সময় সাহেব তাঁর কোয়ার্টারে বাবুদের ডেকে পাঠিয়ে আক্রমণের সংবাদ দিলেন। ডাক্তারবাবু কথাটাকে একদম নাকচ করে দিয়ে বলেছিলেন, কুলিরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না। আজ এত বছর তাঁকে দেবতার মত মেনে এসেছে, এখন ওঁর গায়ে হাত তুলবে? অসম্ভব। কিন্তু সাহেব বললেন, যেহেতু দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে আর তাঁর নিজস্ব ক্ষমতা নেই, তাই সেরকম কিছু হলে তিনি বাবুদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারবেন না। সেজন্যে তিনি ওঁদের বিশ্বস্ত আনুগত্যের কথা স্মরণ রেখে আগাম খবরটা জানিয়ে দিচ্ছেন এবং যদি সম্ভব হয় বাবুরা যেন এখনই কোন নিরাপদ জায়গায় সাময়িকভাবে চলে যান। গোলমাল মিটে গেলে সাহেব আশা করেন যে তাঁরা কাজে যোগ দেবেন এবং এই আনুগত্যের কথা সাহেব তাঁর সুপারিশসহ কোম্পানিকে জানিয়ে দেবেন। একথা শোনার পরই ওঁরা যে যার কোয়ার্টারে ফিরে এসেছেন।

মহীতোষের অবশ্য মাথায় আর একটা চিন্তা ছটফট করছিল। স্কুল ফাইন্যালের রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে। অনিমেষ হয়তো আজই স্বর্গছেঁড়ায় আসবে।

ছেলে যদি পাস না করতে পারে তাঁর বলার কিছু নেই। কারণ মাধুরী চলে যাওয়ার পর তিনি একমাত্র টাকা পাঠানো ছাড়া ওর প্রতি কোন কর্তব্য করেননি। তা ছাড়া কোন কালেই তিনি ছেলেকে কাছে ডেকে নিজের করে নিতে পারেননি। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিবাহের পর থেকে তাঁর মধ্যে ছেলের সম্পর্কে একটা অস্বস্তি এমন দানা বেঁধেছিল যে, ভালভাবে কথা বলতে যেন কিসে বাধতো। তারপর সেই বীভৎস দিনগুলো। সন্তানের জন্য তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী তাঁকে কোনদিন বিব্রত করেনি, বরং তিনিই এরকম কিছু হোক চেয়েছিলেন। এ পক্ষের ছেলে-মেয়ে এলে ব্যাপারটা সহজ হয়ে যাবে—সংসারে জড়িয়ে পড়লে অনেক অস্বস্তি কেটে যাবে; এই রকম একটা ধারণা মাথায় ঢুকে যাওয়ায় সেই অশান্তির সময়টা চলে এল। ওষুধপত্র, টোটকা, মাদুলি—কিছুতেই যখন স্ত্রী পুত্রবতী হল না, তখনই যোগাযোগ হল অধর তান্ত্রিকের সঙ্গে। তিনদিন তিনরাত সরুগাঁর শ্মশানে ওঁর সঙ্গে বসে কারণ পান করার পর হঠাৎই তাঁর মনে হল তিনি অত্যন্ত অন্যায় করছেন। এই স্ত্রীকে বিবাহ এবং সন্তান কামনা করে তিনি মাধুরীর প্রতি চূড়ান্ত অসম্মান দেখিয়েছেন। ফলে সন্তান-ইচ্ছা চট করে মিলিয়ে গেল—তান্ত্রিক তাঁকে শেখালেন কি করে মৃত মাধুরীর আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে কেটে গেল দিনগুলো। এখনও সব ব্যাপার স্পষ্ট করে মনে পড়তে চায় না। তান্ত্রিক বাড়িতে এসে নিয়মিত দক্ষিণা নিয়ে যেত। সেই সময় মুখ গুঁজে কাজ করে গেছে এই স্ত্রী, ঝাড়িকে বাড়ি থেকে তিনি তাড়িয়ে দিয়েছেন। জলপাইগুড়িতে গেলে ছটফট করতেন। কতক্ষণে স্বর্গছেঁড়ায় ফিরে আসবেন। মাধুরীর দেখা তিনি পেতেন কি? কেমন অস্পষ্ট ধোঁয়াটে একটা ধারণা তাঁর এখনও আছে যে অধর তান্ত্রিক মাধুরীর মুখোমুখি ওঁকে করিয়ে দিয়েছিলেন একদিন। মাধুরীকে খুব দুঃখী-দুঃখী মনে হয়েছিল সেদিন। অধর তান্ত্রিক বলেছিল, তাঁর সন্তান কামনাই মাধুরীকে দুঃখী করেছে।

তারপর সেই রাত এল। তিনি অনিমেষকে কি বলেছিলেন খেয়াল নেই, শুধু মনে আছে অনিমেষ ওঁকে ঠেলে দিয়েছিল। যখন জ্ঞান এল তিনি দেখলেন মাথায় ব্যাণ্ডেজ, সমস্ত শরীর দুর্বল, তিনি কিছুই চিন্তা করতে পারছেন না। ছেলে জলপাইগুড়িতে ফিরে যাওয়ার সময় তিনি স্ত্রীকে বলেছিলেন তাকে বলে দিতে যে সরিৎশেখর যেন এসব ঘটনার কথা জানতে না পারেন। ছেলের কারণেই তিনি আঘাত পেয়েছেন মাথায় এই বোধ হতেই চট করে গুটিয়ে গেলেন মহীতোষ। অনিমেষ কথা রেখেছিল, তার কারণ এর পর কতবার তিনি জলপাইগুড়ি গিয়েছেন, সরিৎশেখর এসব ব্যাপারে কোনদিন কিছু জিজ্ঞাসা

করেননি। অনিমেষ সম্পর্কে যেটুকু আড়ষ্টতা ছিল মনে মনে, সেটা যেন এই ঘটনার পর লজ্জায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। নিজের তৈরি করা বেড়াটা আর কখনো তাঁর পক্ষে ডিঙানো সম্ভব হল না।

বিছানায় শুয়ে থাকার সময়ই ঝাড়ি এই বাড়িতে ফিরে এল। ওঁর অবস্থা দেখে সে চিৎকার কান্নাকাটি করে অধর তান্ত্রিককে গালাগালি করতে লাগল। তিনি দেখলেন ঝাড়ি যেন হঠাৎ অসমসাহসী হয়ে এ বাড়ির ভালমন্দ দেখাশুনা করছে। সুস্থ হয়ে শুনলেন অধর তান্ত্রিক আর সরুগাঁর শ্মশানে নেই, কিছু লোক এক রাত্রের অন্ধকারে সেখানে গিয়ে মেরেধরে তাড়িয়ে দিয়েছে। আর সব চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এত ব্যাপার ঘটে গেল অথচ তাঁর স্ত্রীর যেন কিছুতেই কোন বিকার নেই। খুব স্বাভাবিক জীবনযাপন করছে সে—ভুলেও আর ওই সময়ের কথা উচ্চারণ করে না।

আজ বাড়ি ফিরেছিলেন একটা উত্তেজনা নিয়ে। ফিরে এসে পুত্রকে দেখে ওঁর অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে করছিল। অথচ কিছুই বলতে পারলেন না। এমন কি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরার সময় তাঁর মনে হয়েছিল এ যেন তাঁর সন্তান নয়। যৌবনে এসে পড়া একটা প্রায় পূর্ণ শরীর, যার গোঁফের রেখা স্পষ্ট, গালে সামান্য ব্রণ, মাথায় যে তাঁর সমান —তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেও দীর্ঘ দূরত্বের বলে বোধ হচ্ছিল। একমাত্র বুকের ভেতর ছাড়া সন্তান কখনও চিরকাল পরিচিত থাকে না—অনিমেষ তো হবেই। কিন্তু কি খেয়ালে আজ ওকে তিনি খোকা বলে ডেকে উঠলেন। ওর যখন হামাগুড়ি দেবার বয়স, মাধুরীর নকল করে মহীতোষ মাঝে মাঝে খোকা বলে ডাকতেন। আধো-বুলি-ওঠা অনিমেষ ডাকটা শুনলেই কা-কা করে উঠত। এটা ছিল একটা মজার খেলা ওঁদের কাছে। আজ সব কথা যা বলা যায়নি এই একটি ডাকের মাধ্যমে যেন বলে ফেলেছেন তিনি—ভেতরটা কেমন শান্তিতে ভরে যাচ্ছিল।

ভেতরের ঘরের দরজা বন্ধ করতে মহীতোষ ছুটে যেতেই অনিমেষ ভ্রূ কুঁচকে এই ঘরটা দেখল। আশ্চর্য, মায়ের ছবিটা তো আর এখানে নেই! সেই অন্ধকার ধোঁয়াটে পরিবেশে মাধুরীর বিষণ্ণ ছবিটা, যেটা দারুণ চাপ সৃষ্টি করতো বুকের মধ্যে—অনিমেষ অবাক হয়ে দেখল, সেটা কোনকালে এখানে ছিল কিনা বোঝা যাচ্ছে না। বরং ঘরটা বেশ পরিষ্কার, দুটো সিঙ্গল খাট জোড়া দিয়ে বিছানা পাতা আছে। বাবা এবং ছোটমা এখানে শোন্—বোঝাই যাচ্ছে। অনিমেষ নিজের অজান্তেই মাধুরীর ছবিটা এখানে না দেখতে পেয়ে খুশী হল। ধীর পায়ে

ও ভেতরের বারান্দায় আসতেই বাবার গলা শুনতে পেল, 'খোকা, ঝাড়িকে ডাক—আর দেরি করা ঠিক হচ্ছে না।'

কথাটা শুনে কেমন হতভম্ব হয়ে গেল অনিমেষ। এখানে আসার পর চটপট এমন সমস্ত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে যে সে তাল রাখতে পারছে না। ঝাড়িকাকু এ বাড়িতে আবার কি করে ফিরে এল! বাবা তো ওকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। মাত্র ত্রিশ মাইল দূরত্বে থেকে ও এসব ঘটনা জানতে পারল না! স্বর্গছেঁড়া থেকে চলে যাওয়ার পর থেকে ওর সঙ্গে সংযোগ রাখার দায়িত্ব যেন কারো নেই, সে যে এই বাড়ির একমাত্র ছেলে, এই জায়গার সঙ্গে তার নাড়ির সম্পর্ক—এ কথা সবাই যেন চট করে ভুলে গেছে। অবশ্য সে একা নয়, যে দাদু চিরকাল এখানে থেকে গেলেন, তাঁকেও কেউ কোন কথা জানাবার প্রয়োজন বলে মনে করে না। অভিমানটা বুকের মধ্যে জমতে শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওর খেয়াল হল এখান থেকে চলে যাওয়ার পর সে একটি চিঠি নিজে লেখেনি। চিঠি লিখলে ও নিশ্চয়ই সব কথা জানতে পারত—চিঠির কথা মনে হলেই সীতার কথা মনে পড়ে যায়।

উঠোনে নেমে এল অনিমেষ। পেয়ারা গাছটায় একগাদা চড়ুইপাখি হইচই করছে। উঠোনের ওপাশে সেই বুড়ো কাঁঠাল গাছটাকে অ্যাদ্দিনে সত্যিই জরাগ্রস্ত বলে মনে হচ্ছে। গায়ে শ্যাওলা পড়ে জবুথবু হয়ে রয়েছে গাছটা। নিজের অজান্তেই বুকভরে নিঃশ্বাস নিল অনিমেষ—আঃ! ওর মনে হল এই সব রক্তের মত পরিচিত গাছ-গাছালির গন্ধ যেন ও বাতাসে পাচ্ছে।

এই সময় ও ঝাড়িকাকুকে সেখানে দেখতে পেল। সেই খাকি রঙের হাফপ্যান্ট আর ছিটের ফতুয়া পরে ঝাড়িকাকু একটা ঝুড়ি নিয়ে পেছনের বাগান থেকে বেরিয়ে আসছে। এই ক'বছরে অনেকটা বদলে গেছে ঝাড়িকাকু। চুল পেকে গিয়ে শরীরটা একটু কুঁজো হয়েছে। ও এগিয়ে যেতেই ঝাড়িকাকু থমকে দাঁড়াল। বোধ হয় অনিকে এতখানি লম্বা সে আশা করেনি। বিস্ময়টা কাটিয়ে উঠে পিতলের সেই দাঁতটা বের করে হাসল, 'পাস করেছিস?'

ততক্ষণে ওর সামনে এসে পড়েছে অনিমেষ, ঘাড় নেড়ে দুহাতে ঝাড়িকাকুর হাত দুটো ধরে বলল, 'কেমন আছ তুমি?'

সঙ্গে সঙ্গে মুখটা আরো বুড়োটে হয়ে গেল, মাথা নেড়ে ঝাড়িকাকু বলল, 'ভাল না রে, দু'পায়ে যা বাতের ব্যথা—বেশী দিন বাঁচব না রে। বাঁচতে আর ভালও লাগে না।'

সে কথায় কান না দিয়ে অনিমেষ বলল, 'ওঃ, তোমাকে এ বাড়িতে দেখে কি ভাল লাগছে।'

ঝাড়িকাকু বলল, 'মহী যদি এখানে জায়গা না দিত, তাহলে না খেয়ে মরেই যেতাম। এই বুড়ো বয়সে ওসব কাজ পারি? তা কর্তাবাবু কেমন আছেন? বড়দি?'

অনিমেষ বলল, 'ভাল আছেন, তবে বয়স তো হচ্ছে।'

ঝাড়িকাকু বলল, 'হ্যাঁ রে, বয়স না হলে কেউ বুঝতে পারে না সে জিনিসটা কেমন? তা তুই তো এখন কোলকাতায় যাবি পড়তে, না? ফিরে এলে দেখবি তোদের ঝাড়ি আর নেই। তা নাই থাকলাম, তুই বড় হ, অনি।' তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় খবরটা দিল, 'তোর সেই মাস্টারমশাই—যার কাছে তোতে আমাতে গিয়েছিলাম রে—মরে গেছে।'

চট করে সেই নস্তিমাখা ঘেমো মুখটা যেন সমস্ত আকাশ জুড়ে অনিমেষের চোখের সামনেটা ভরাট করে দিল। এইমাত্র বলা ঝাড়িকাকুর কথাটায় একটা মুখ ভেসে উঠল—ওর সমস্ত কান জুড়ে যিনি বন্দেমাতরম শব্দটা শুনিয়েছিলেন। চুপচাপ দাঁড়িয়ে অনিমেষ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। সেটা দেখে ঝাড়িকাকু অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কাঁদিস না অনি, ওভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল।'

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে মহীতোষ ভেতরের বারান্দায় এসে ওদের দেখতে পেলেন, 'কি করছিস তোরা এখনও, এর পরে আর সময় পাওয়া যাবে না।'

ঝাড়িকাকু কিছু বুঝতে না পেরে অনিমেষের দিকে একবার তাকিয়ে খুব নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে?'

মহীতোষই দ্রুত বলে গেলেন, 'বাগানের কুলিরা ক্ষেপে গেছে, বাড়িতে এসে হামলা করতে পারে। জিনিসপত্র যেখানে যা আছে পড়ে থাক, এখন বাজারে চল।'

ঝাড়িকাকু বলল, 'কুলিরা খামোকা হামলা করতে যাবে কেন?'

'রেগে গেলে কারো মাথা ঠিক থাকে? আমরা কাজে গিয়েছি বলে ওরা রেগে গেছে। চল চল।' মহীতোষ তাড়া দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন।

কিন্তু ঝাড়িকাকুর ব্যস্ততার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। ঘাড় নেড়ে বলল, 'তোরা যাবি যা, আমি যাব না।'

মহীতোষ বললেন, 'যদি মারধোর করে?'

'আমাকে মারবে না। আমি ওদের সবাইকে চিনি। আমি গেলে এই বাড়ি দেখবে কে?' ঝাড়িকাকু এগিয়ে গিয়ে রান্নাঘরের বারান্দায় ঝুড়িটাকে নামিয়ে রাখল। মহীতোষ কিছু বলতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কাঁধ ঝাঁকিয়ে দ্রুত ভেতরে চলে

গেলেন। সেদিকে তাকিয়ে ঝাড়িকাকু বলল, 'মানুষের রকম দেখেছিস, যাদের সঙ্গে এতদিন বাস করল এখন তাদেরই ভয় করছে। এই মদেসিয়াগুলোর মত সরল মানুষ কখনো কাউকে মারতে পারে?'

ঝাড়িকাকুর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ অনিমেষের মনে হল এত নির্লিপ্ত এবং ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলতে বোধ হয় খুব কম মানুষই পারে। বাবার অস্থিরতা ও ঝাড়িকাকুর স্থিরতা খুব স্পষ্ট হয়ে ওর চোখে পড়ছিল। হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেছে এরকম ভঙ্গীতে ঝাড়িকাকু বলল, 'এই অনি, তুই দাঁড়িয়ে আছিস কেন, যা চলে যা তাড়াতাড়ি।'

অনিমেষ বলল, 'সত্যি ওরা মারতে পারে? আমরা তো কোন দোষ করিনি।'

ঝাড়িকাকু বলল, 'তা হোক, তবু তোর যাওয়া ভাল।'

'কিন্তু তুমি যাচ্ছ না কেন?' ঝাড়িকাকুর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর অনিমেষের এইভাবে চলে যেতে ইচ্ছে করছিল না।

এবার ঝাড়িকাকু হেসে ফেলল, 'যতই পাস কর বাবা, তুই এখনও ছেলেমানুষ আছিস। ওরে, আমি যে বাঙালী নই তা এই বাগানের সব কুলি জানে। আমাকে কিছু বলবে না।'

অনিমেষ স্তব্ধ হয়ে গেল। সময়ের সঙ্গে ও একদম ভুলে গিয়েছিল যে ঝাড়িকাকু বাঙালী নয়। অবশ্য একথা ওকে দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। এখন ওর নিজেরই অবিশ্বাস হচ্ছিল, সেই সঙ্গে ওর মনে একটা বিষণ্ণতা কোথা থেকে চলে এল। নিজে বাঙালী নয় এই কথাটা কি ঝাড়িকাকু এতকাল সযত্নে লালন করে এসেছে মনে মনে? তাহলে এই বাড়ির মানুষ হয়ে যায় কি করে? কেন বাবার সমস্যা নিয়ে ঝাড়িকাকু কষ্ট পেয়েছিল? অনিমেষ বুঝতে পারল না। কিন্তু এ কথাটা ঠিক, বাঙালী নয় বলে ঝাড়িকাকু শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারছে আজকে। হয়তো এই কারণেই আজ বাড়িটা রক্ষা পেয়ে যাবে। কোন কোন সময় দুর্বলতাই মানুষের রক্ষাকবচ হয়ে থাকে।

এতদিন বাদে স্বর্গছেঁড়ায় এল, অথচ এখনই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। কি যে সব ব্যাপার হয়ে যায়! অনিমেষ যেন অতিকষ্টে বারান্দায় উঠে এল। ততক্ষণে ছোটমা একটা বিরাট ব্যাগ নিয়ে এদিকে চলে এসেছে। না, বাইরের দরজায় তালা দিয়ে যাওয়া হবে না। সেটা ভেতর থেকে বন্ধ করে এদিকের দরজা দিয়ে যাওয়া হবে। যাতে বাইরে থেকে কেউ চট করে বুঝতে না পারে কেউ বাড়িতে নেই। অনিমেষের সীতার ঠাকুমার কথা মনে হল। যদি সবাই

চলে যায় কোয়ার্টার ছেড়ে, তাহলে তিনি যাবেন কি করে ? পাঁচ মিনিট নিজের পায়ে হাঁটাটাই তো ওঁর পক্ষে অসম্ভব। তা ছাড়া কত বাচ্চাকাচ্চা এই সব কোয়ার্টারে নিশ্চয়ই আছে। ও ছোটমাকে হাত নেড়ে খিড়কি দরজা দিয়ে একছুটে বাইরে এল। আর আসতেই একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল। মাঠ পেরিয়ে বিভিন্ন কোয়ার্টার থেকে বাবুরা ছেলে মেয়ে বউদের সঙ্গে নিয়ে আসাম রোডের দিকে দৌড়ে যাচ্ছেন। অনেককেই ও চিনতে পারছিল—কেউ কেউ নতুন। সীতার বাবা-মাকে দেখতে পেল না সে এই দলের মধ্যে। ওঁরা আসাম রোডের ওপর উঠে বাজারের পথে বাঁক ঘুরতেই অনিমেষ ফিরল। ছোটমা ততক্ষণে উঠোনে নেমে এসেছে। পেছনে বাবা। বাবার হাতে স্যুটকেস। অনিমেষ এগিয়ে গিয়ে ছোটমার হাত থেকে ব্যাগটা নিতেই ছোটমা বলল, 'ঠাকুরকে ফেলে রেখে যাচ্ছি—জল-বাতাসাও পাবেন না।'

মহীতোষ হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'রাখো তো তোমার ঠাকুর! বেঁচে থাকলে তোমরা অনেক জল-বাতাসা দেবার সুযোগ পাবে।'

ছোটমা হঠাৎ সন্দিগ্ধ গলায় বলে উঠল, 'তোমরা সত্যি কি করেছ ওদের বল তো যে এখন প্রাণের ভয় পাচ্ছ ?'

মহীতোষ বিরক্ত হলেন, 'আঃ, এখন বকবক না করে পা চালাও তো!'

খিড়কির দরজা দিয়ে বাইরে আসতে আসতে অনিমেষ বলল, 'অন্য বাবুরা সবাই একটু আগে চলে গেছে, শুধু ঠাকুমাদের দেখলাম না।'

ছোটমা বললেন, 'সে কি! কি হবে! ওঁর পক্ষে তো যাওয়াও অসম্ভব। একবার খোঁজ নিলে হয় না ? বিয়েবাড়ির সব অগোছালো হয়ে পড়ে আছে।'

মহীতোষ হতাশ ভঙ্গী করলেন। ঝাড়িকাকু পেছনে পেছনে আসছিল, কথাটা শুনে বলল, 'তোমরা যাও, আমি দেখছি।'

বিয়েবাড়ি শব্দটা কানে যেতেই অনিমেষ কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল। আচ্ছা, যদি সীতারা যাবার আগেই রাগী কুলিরা এসে পড়ত ? তাহলে সীতা কি নতুন বেনারসী পরে বরের সঙ্গে একটু আগে দেখা বাবুদের মত দৌড়ে পালাত ?

মহীতোষ আরেকটু এগিয়ে গিয়েছিলেন। ঝাড়িকাকুকে সীতাদের বাড়ির দিকে এগোতে দেখে অনিমেষ ছোটমার সঙ্গে বাবার পেছন পেছন হাঁটতে লাগল। ছোটমা বললেন, 'যাই বল বাপু, এই কুলিদের সঙ্গে নিশ্চয়ই বাবুরা ভাল ব্যবহার করত না, নাহলে পালাবার কথা মনে আসবেই বা কেন ?' কথাটাকে মনে মনে সমর্থন করে অনিমেষ পেছন থেকে বাবার শরীরটাকে লক্ষ্য করল, এই মুহূর্তে অত বড় মানুষটাকে কেমন অসহায়-অসহায় দেখাচ্ছে।

মহীতোষ ঘাড় ফিরিয়ে কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে অনিমেষ চট করে ডানদিকে মাঠের শেষপ্রান্তে ফ্যাক্টরীতে যাবার রাস্তার দিকে তাকাল। হইহই শব্দটা জলস্রোতের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে এখন। ক্রমশ কালো কালো মাথাগুলো দেখা গেল।

অসহায়ের মত ওরা আসাম রোডের দিকে তাকাল, সেখানে পৌঁছানোর আগেই কুলিরা নিশ্চয়ই ওদের দেখে ফেলবে। কারণ এখন ওরা ঠিক মাঠের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে।

চিৎকার ক্রমশ বাড়ছে, সামান্য যে কজন রাস্তার মুখে গেটের সামনে পৌঁছেছে তার অনেক অনেক গুণ বেশী লোক যে এখনও আড়ালে রয়েছে এটা বুঝতে কোন অসুবিধে হল না ওদের। মহীতোষ দৌড়ে স্ত্রী-পুত্রদের কাছে এসে হতাশ গলায় বললেন, 'তখন থেকে তাড়া দিচ্ছি তোমরা শুনলে না, এখন কপালে কি আছে কে বলতে পারে। সব বাবুরা চলে গেল সময়মত—'। কয়েক পা হেঁটে আসতেই ওদের বাড়ির সামনের ক্লাবঘরটা আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল মধ্যিখানে। এইসময় ওরা মাদলের শব্দ শুনতে পেল। অনিমেষ দেখল ছোটমার মুখ একদম সাদা হয়ে গিয়েছে। এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে এখনই দ্রুত পা চালিয়ে আসাম রোডে উঠে যাওয়া উচিত। অবশ্য কুলিরা যদি আক্রমণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে এসে থাকে তাহলে ওরা এই মুহূর্তে যত দূরত্বেই থাক ছোটমাকে নিয়ে ওদের হাতের নাগালের বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ওরা যে শারীরিক আঘাত করবে এমন তো নাও হতে পারে। হয়তো চিৎকার চেঁচামেচি করে ক্রোধ প্রকাশ করবে—তারপর বুঝিয়ে বললে বুঝতেও পারে। ওদের বাড়িতে আসবার আগে সীতাদের বাড়ি কুলিদের সামনে পড়বে—সীতার মা-বাবা-ঠাকুমা তো বাড়িতেই আছেন।

খুব দ্রুত এসব কথা চিন্তা করে অনিমেষ বাবাকে বলল, 'এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে চল বাড়িতেই ফিরে যাই।' মহীতোষও বোধহয় সেরকম চিন্তা করেছিলেন, কথাটা শুনে দ্রুত খিড়কির দরজার দিকে হাঁটতে লাগলেন। অনিমেষ হাঁটতে গিয়ে দেখল ছোটমা তেমন জোরে পা ফেলতে পারছে না। ওকে সাহায্য করার জন্য অনিমেষ ছোটমার ডান হাতটা ধরল। ধরেই ও চমকে উঠল, এত শীতল হাত সে এর আগে কোনদিন ধরেনি।

খিড়কি দরজা বন্ধ করতেই মনে হল একটা বিরাট আড়াল হয়ে গেল—আপাতত কোন ভয় নেই। এতটুকু হেঁটে আসতেই ছোটমা হাঁপাচ্ছে, অথচ যাবার সময় কোন অসুবিধে ছিল না। হল্লাটা ক্রমশ বাড়ছে, বোঝাই যাচ্ছে প্রচুর লোক এখন মাঠে জমায়েত হয়েছে। তাদের গলায় বিক্ষোভের আওয়াজটা

হঠাৎ উল্লাসে রূপান্তরিত হয়ে গেল। ব্যাপারটা কি অনিমেষ বুঝতে পারল না। ওর মনে হল এখন ঝাড়িকাকু এখানে উপস্থিত থাকলে তবু যেন কিছুটা বল পাওয়া যেত। বাবা এই বাড়ির কর্তা—অথচ বাবাকে কি অসহায় লাগছে দেখতে।

মহীতোষ পকেটে হাত ঢুকিয়ে খোঁজার ভঙ্গী করে শেষ পর্যন্ত হতাশ গলায় বলে উঠলেন, 'যাচ্চলে, সিগারেটের প্যাকেটটা ঘরে ফেলে এসেছি।'

ছোটমা এতক্ষণে কথা বললেন, 'এখানে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব? দরজা খোল, আমি ঘরের ভেতর বসব—যা হয় হোক।'

মহীতোষ যেন অন্য কোন উপায় চিন্তা করছিলেন, কথাটাকে আমল দিতে চাইলেন না, 'পাগল।'

ছোটমা বলল, 'সীতার বাবা-মা যদি বাড়িতে থাকতে পারে তো আমরা পারব না কেন?'

মহীতোষ বললেন, 'সীতার বাবা আজ অফিসে যায়নি, ছুটিতে আছে। তাই ওদের কোন ভয় নেই, ওঁকে তাই কিছু বলবে না দেখো।'

অনিমেষ কথাটা শুনে বাবার দিকে তাকাল। সীতার বাবা নিশ্চয়ই মেয়ের বিয়ের জন্য ছুটি নিয়েছিলেন। সেটাই এখন তাঁর কাজে লাগবে। কুলিদের তিনি বোঝাতে পারবেন যে তিনি কাজেও যাননি এবং মনে কোন পাপ নেই বলে কোয়ার্টার ছেড়ে কোথাও চলে যাননি। কুলিরা কি শুনবে সেকথা? অন্তত এখন পর্যন্ত সীতাদের বাড়ি থেকে যখন কোন আর্তনাদ ভেসে আসছে না, তখন এর উল্টোটা ভাবা যাচ্ছে না।

নিজের উঠোনে ফিরে ছোটমা কিছুটা ধাতস্থ হয়েছে। কুলিদের হল্লাটা ক্রমশ বাড়ছে। ওরা টের পেয়ে গেছে বাবুরা তাঁদের কোয়ার্টার ছেড়ে পালিয়ে গেছে। প্রথম কোয়ার্টারে কাউকে না পেয়ে বোধহয় সেটার ওপর পাথর ছুঁড়েছে ওরা। অনিমেষরা এখান থেকেই টিনের ছাদে পড়া পাথরের দুমদাম শব্দ শুনতে পেল। বোধহয় এই শব্দেই ছোটমার চেতনা অন্যরকম কাজ করল। গোয়ালঘরের দিকে কয়েক পা এগিয়ে ছোটমা বলল, 'চল পেছনদিকে চলে যাই।'

মহীতোষ বললেন, 'তুমি নদী পার হতে পারবে? আর নদী পার হলেই তো কুলি লাইন। গিয়ে কি লাভ হবে?'

ছোটমা বলল, 'এই লাইনের মেয়েদের আমি চিনি। দেখো ওরা আমাদের কিছু বলবে না। সামনে যারা এসেছে তারা অন্য লাইনের লোক।'

মহীতোষ অগত্যা কি করবেন বুঝতে না পেরে ছেলের দিকে তাকালেন।

অনিমেষ বলল, 'এখানে দাঁড়িয়ে তো কোন লাভ হবে না। তার চেয়ে চল।'

ওরা এবার পেছনের দরজা দিয়ে বেশ জলদি হাঁটতে লাগল। অনিমেষ দেখল বুনো গাছে বাড়ির পেছনটা ছেয়ে গেছে। একটি মাত্র সরু পায়ে-চলা-রাস্তা গোয়ালঘরের পাশ দিয়ে নদীর দিকে চলে গেছে। গোয়ালঘরটা শূন্য, শুধু একটা লালরঙা গরু তার বাচ্চাকে নিয়ে খুঁটিতে বাঁধা হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের দেখে সেটা চট করে বাচ্চাটার গা চাটতে লাগল। গোয়ালঘরটা দেখে অনিমেষের কালীগাই-এর কথা মনে পড়ে গেল। ও বুঝতে পারল বেচারা মরে গেছে। অদ্ভুত একটা ব্যথা ওর মনটাকে হঠাৎ ছুঁয়ে গেল। ও কোন কথা না বলে চুপচাপ হাঁটতে লাগল। এখান দিয়ে চলাফেরা করলেই কালীগাই-এর সেই হাম্বা ডাকটা যেন কান বন্ধ করেও শোনা যায়।

নদীর সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। অনিমেষ দেখল জলেরা এখনও চুপচাপ বয়ে চলে যায়। তবে এখানে নদীর গভীরতা যেন আরো কমেছে। মাঝে মাঝে শ্যাওলা বুকে নিয়ে ছোট ছোট চড়া মাথা তুলেছে। স্রোত আছে—কিন্তু ভীষণ বয়স্ক দেখাচ্ছে নদীটাকে।

অনিমেষ আগে জলে নামল। হাঁটুর নিচেই জল, ব্যাগ নিয়ে পার হতে কোন অসুবিধে হল না। জলের তলায় এখনও সেইরকম নানা রঙের নুড়িপাথর পড়ে আছে। ওর পায়ের শব্দেই বোধহয় একটা লাল চিংড়ি লাফিয়ে অন্য ধারে চলে গেল। পার হয়ে অনিমেষ বলল, 'না, কোন স্রোতই নেই, চলে এস।'

ছোটমা মহীতোষের হাত ধরে ধীরে ধীরে পার হয়ে এল। এপারে এসে মহীতোষ হাঁফ ছেড়ে বললেন, 'ভাগ্যিস কোম্পানী আর নদীটার ওপর নজর দেয় না—নাহলে পার হওয়া যেত না।'

অনিমেষ ভাবল জিজ্ঞাসা করে যে নদী বন্ধ হয়ে গেলে ফ্যাক্টরীর হুইলটা চলবে কি করে, কিন্তু ঠিক সেসময় একটা উদোম বাচ্চাকে ও অবাক চোখে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। বছর ছয়-সাতের মদেসিয়া ছেলেটি দুপাশের বুনো গাছের মধ্যে দিয়ে যে চলার পথটা কুলি লাইনের দিকে চলে গেছে তার একপাশে একটা হোঁতকা কুকুরের বাচ্চাকে কোলে নিয়ে জুলজুল করে ওদের দেখছে। মহীতোষও বাচ্চাটাকে দেখেছিলেন, নেহাতই গোবেচারা একটা কালো রোগা শিশু। কিন্তু ওঁর মনে হল এটাই যদি এখনই ছুটে গিয়ে লাইনে ওদের উপস্থিতির কথা সবাইকে জানিয়ে দেয়, তাহলে আর কিছুই করার থাকবে না। কি করবেন বুঝতে না পেরে তিনি ছেলের দিকে তাকালেন। অনিমেষ কিছু বলতে হয় তাই জিজ্ঞাসা করল, 'এই, মরা ঘর কিধার?'

ছেলেটা কোন উত্তর দিল না, শুধু ওর দুটো হাত কুকুরছানাকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরল আর চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল। আর এই সময় পেছনে নদী পেরিয়ে জঙ্গলের প্রান্তে ওদের কোয়ার্টারের সামনে বোধহয় চিৎকারটা এসে পৌঁছেছে, কারণ এখানে দাঁড়িয়েও ওরা বুঝতে পারছিল দূরত্বটা বেশী নয়। সেই সঙ্গে মাদলে ডুম ডুমা ডুম শব্দ যেন অদ্ভুত আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে যাচ্ছিল। শব্দটা প্রকট হতেই ছেলেটার মুখ-চোখের ভাব বদলে গেল। খুব উত্তেজিত হয়ে সে একটা হাত শব্দটাকে লক্ষ্য করে উঁচিয়ে ধরে গোঁ গোঁ করে আওয়াজ করতে লাগল। মুহূর্তে অনিমেষরা বুঝতে পারল বেচারা কথা বলতে পারে না। ওর চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে, হাতের কুকুরছানাটা ঝুলে পড়েছে। ছোটমা বোধ হয় সামলাতে পারল না নিজেকে, চট করে একটা হাত বাচ্চাটার মাথায় রাখল। অনিমেষ দেখল সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটা কেমন শান্ত হয়ে গেল, তারপর ছোটমার গা ঘেঁষে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু ওর চোখ দুটো ভীষণ অবাক হয়ে ছোটমার মুখের ওপর সেঁটে রইল। মহীতোষ বোধহয় এ দৃশ্য বেশীক্ষণ দেখতে চাইছিলেন না, স্যুটকেসটা তুলে বললেন, 'লাইনের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার দরকার নেই, বরং নদীর ধার দিয়ে একটু এগিয়ে গেলেই চা-বাগান পড়বে একবার ওতে ঢুকে পড়লে আর কোন ভয় নেই। বাগান দিয়ে সোজা এগিয়ে খুঁটিমারি ফরেস্টের কাছে বাজারের রাস্তা পেয়ে যাব, চল।'

ওরা এগোতেই বাচ্চাটা ছোটমার কাপড় ধরে টানাটানি শুরু করল। এক হাতে কুকুর অন্য হাতে কাপড় ধরে সে গোঁ গোঁ শব্দ করে ছোটমাকে লাইনের দিকে নিয়ে যেতে চাইছে। ঠিক এই সময় দড়াম দড়াম করে শব্দ শুরু হয়ে গেল। ক্ষিপ্ত কুলিরা ওদের কোয়ার্টারের টিনের ছাদে পাথর ফেলছে। অনিমেষ নদীর ধার দিয়ে সামান্য এগিয়ে গিয়েছিল, এবার ফিরে এসে বলল, 'না, কোন রাস্তা নেই, কাঁটাগাছের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে মা যেতে পারবে না।'

মহীতোষ নিজের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাওয়াটা পছন্দ করছিলেন না, একটু উষ্ণ গলায় বললেন, 'পারবে না বললে তো হবে না, এছাড়া কোন উপায় নেই।'

ছোটমা বলল, 'যা কপালে আছে হবে—লাইন দিয়েই চল।'

মহীতোষ বললেন, 'তাহলে আর মিছিমিছি বাড়ি ছেড়ে এলে কেন? কপাল ঠুকে বাড়িতে থেকে গেলেই তো হত।'

ছোটমার যেন জেদ এসে গেল চট করে, 'আমি তো তাই থাকতে চেয়েছিলাম, তোমরাই তো ভয় পেয়ে দৌড়ে মরছ। আমি এগোচ্ছি, এই লাইনের মেয়েরা

আমাকে চেনে, কিছু বলবে না। তোমরা আমার পেছনে এসো।'

মহীতোষ কিছু বলার আগেই ছোটমা সরু পায়ে-চলা-পথটা দিয়ে বাচ্চাটার সঙ্গে হাঁটতে আরম্ভ করল। মহীতোষ চুপচাপ ওদের চলে যাওয়াটা দেখছিলেন। অনিমেষ কাছে এসে বলল, 'চল।'

কাধ ঝাঁকালেন মহীতোষ, 'জেনেশুনে এরকম রিস্ক নেবার কোন মানে হয়? যেই বাচ্চাটা আঁচল ধরে টেনেছে অমনি মন নরম হয়ে গেল!' অনিমেষ অনেক কষ্টে হাসি চাপল, বাবা এবং মায়ের এই ব্যাপারটা ওর কাছে নতুন—বাবাকে খুব অসহায় দেখাচ্ছে এখন। অগত্যা ছেলের সঙ্গে মহীতোষ স্ত্রীর অনুগামী হলেন। জঙ্গলটুকু পার হতেই কয়লার গুঁড়ো বিছানো রাস্তাটা পড়ল। ডানদিকের চা-বাগান থেকে উঠে এসে সোজা ফ্যাক্টরীর দিকে চলে গিয়েছে। ট্রাক্টরের ভারী চাকার দাগ রয়েছে এখানে। রাস্তার ওপাশে সার দিয়ে কুলিদের ঘরগুলো। বেশীর ভাগই খড়ের ছাউনি, মাটির দেয়াল দু-একটা ইটের গাথুনি থাকলেও ওপরে খড় চাপানো হচ্ছে। অনিমেষ দেখল সমস্ত লাইনটা খাঁ-খাঁ করছে। কোথাও কোন মানুষের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। বেশির ভাগ বাড়ির দরজা বন্ধ, গরুগুলো খুঁটিতে বাঁধা, মুরগীগুলো মেজাজে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। মহীতোষও বিস্ময়ে ঘরবাড়ি দেখছিলেন। এই অঞ্চলে তিনি অনেক বছর আগে এসেছিলেন। তাঁর কোয়ার্টার থেকে সামান্য দূরত্বের এই লাইনে আসবার কোন প্রয়োজন তাঁর পড়ে না। এখন এই নিঝুম পরিবেশ তাঁকে ভীষণ রকম আশ্বস্ত করল। বোঝাই যাচ্ছে এই লাইনের ছেলে-বুড়ো-মেয়ে-মদ্দ এই মুহূর্তে তাঁর বাড়ির সামনে জমায়েত হয়েছে। বেশ উত্তেজিত গলায় তিনি বললেন, 'তাড়াতাড়ি এই বেলা লাইনটা পার হয়ে চল।'

অনিমেষরা কেউ-ই এরকম আশা করেনি, এখন দ্রুত হাঁটা শুরু করে দিল। বাচ্চাটাও সঙ্গে সঙ্গে আসছিল, মহীতোষ তাকে ধমকালেন, 'এ ছোঁড়াটা, ঘর যা।' সে শুনল কি না বোঝা গেল না, কারণ তার মুখ খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পরম আনন্দে সে ছোটমার হাত ধরে একটা মাটির বাড়ির দাওয়ার দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। ছোটমা বলল, 'আ গেল যা, এ ছোঁড়া যে ছাড়ে না। আর এর বাপ-মায়ের বুদ্ধি ছাখো—একে একা ফেলে পালিয়েছে সব।' পালানো শব্দটা অনিমেষের কানে লাগলেও সে কিছু বলল না। ছেলেটা ততক্ষণে গোঁ-গোঁ করে আঙুল তুলে কাউকে দেখাবার চেষ্টা করছে। একটু এগোতেই ওদের নজরে পড়ল, ঘরটার দাওয়াতে রোদ্দুরে পা ছড়িয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে কেউ বসে আছে। তার সামনে অনেকটা গম শুকুতে দেওয়া হয়েছে, বসে থাকা মানুষটার হাতে একটা

লাঠি—বোধহয় কাক চিল থেকে পাহারা দেবার জন্য। অনিমেষ দেখল মানুষটা স্ত্রী কি পুরুষ চট করে বোঝা যাচ্ছে না, কারণ তার মাথার সাদা চুল গুঁড়ি গুঁড়ি করে ছাটা। গায়ের চামড়া ঝুলে গুটিয়ে এসেছে। বেচারা চোখে দেখে না বোধহয়, কারণ ওরা এত কাছে এসেছে তবু তার কোন ভাবান্তর নেই। বাচ্চাটা হঠাৎ ছুটে গিয়ে গোঁ-গোঁ চিৎকার করতে সে একটু নড়েচড়ে বসে নিদাঁত মাড়ি বের করে কিছু বলল। মহীতোষ একটু সামনে গিয়ে ভাল করে লক্ষ্য করে বললেন, 'সেরা বলে মনে হচ্ছে।'

ছোটমা বলল, 'সেরা ? সেই যে তুমি যার গল্প বলেছিলে ?'

মহীতোষ মাথা নাড়লেন, তারপর কাছে গিয়ে ডাকলেন, 'এই তুমারা নাম সেরা ?'

লোলচর্ম মুখটা এবার যেন হদিশ পেল তার সামনে কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে। অনিমেষ এর আগে কোনদিন সেরাকে ছাখেনি অথবা এর নামও শোনেনি। মদেসিয়া লাইনে এ নামের কেউ থাকতে পারে ভাবা যায় না। যদিও বয়স হয়েছে বেশ, তবে বোঝাই যায় রোগে ভুগে ভুগে এর অবস্থা এইরকম জীর্ণতায় এসে ঠেকেছে। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এর গায়ের রঙ অন্য পাঁচটা মদেসিয়ার মত গভীর কালো নয়। বরং যে-কোন বাঙালী মেয়ের সঙ্গে মিলে যায় চট করে। চোখের পাতা সাদা হয় কখন কে জানে, সাদা চোখের মণি যেন আতিপাতি করে খুঁজতে চাইল সামনে দাঁড়ানো মুখগুলোর দিকে চেয়ে, 'কৌন ?'

সেরাকে দেখে মহীতোষ পুরনো দিনের স্মৃতি নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন এখন আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে পরিস্থিতির কথা মনে পড়ে গিয়ে চট করে গুটিয়ে গেলেন। তারপর স্ত্রী-পুত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন বেচারার বয়স হয়ে গেছে বলে চিনতে পারছে না—চল যাওয়া যাক। ওই তো চা-বাগান দেখা যাচ্ছে।'

কিন্তু ততক্ষণে সেরা উঠে দাঁড়িয়েছে লাঠিতে ভর করে, আর সেই বাচ্চাটা দৌড়ে গিয়ে কুকুরছানা সমেত ওর এক হাতের তলায় অবলম্বন হয়ে গিয়েছে। মহীতোষ যখন যাবার জন্য পা বাড়াচ্ছে ঠিক তখনই সেরা বলে উঠল, 'বুড়াবাবাকে লেড়কা ?'

মহীতোষের পা ছুটো যেন শক্ত হয়ে গেল। অনেকদিন বাদে কেউ তাঁকে এই নামে সম্বোধন করল। তিনি যখন প্রথম চাকরিতে ঢুকেছিলেন তখনই সেরার যৌবন ফুরিয়ে গেছে কিন্তু ওর গল্পটা বেশ চালু ছিল। সে সময় পাতি তোলার কাজ থেকে ছাড়িয়ে ওকে ফ্যাক্টরীতে বাছাই-এর কাজে লাগানো হয়েছিল। মহাতোষ দেখেছিলেন কাজের চেয়ে ও বেশী কথা বলত আর বলার ভঙ্গীতে এমন

একটা কর্তৃত্ব ছিল যে যারা পছন্দ করত না তারাও চুপ করে শুনত। সেই সেরা এখন অথর্ব হয়ে তাকে পুরানো নামে ডেকে ফেলল—মহীতোষ একটু রোমাঞ্চিত হলেও তাঁর মনে হল পেছনে বিপদ নিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় এখন নয়। তবু যাবার সময় তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ।'

'ও কৌন, বহু, বেটা, আরে কাঁহা ভাগতিস রে—ও বুড়োবাবাকে লেড়কা?' মহীতোষরা দাঁড়িয়ে পড়লেন। সেরার গলা থেকে এরকম আওয়াজ বের হতে পারে কল্পনা করা যায় না। সেরার গলা শুনে, যদি কেউ থেকে থাকে আশেপাশে, বেরিয়ে এলেই হয়ে গেল। মহীতোষ সেরার শোনার মত গলায় বললেন, 'হ্যাঁ।'

'বুড়োবাবাকে নাতি? ও ছোউয়া, ইধার আ, মো পানে আ, তুহার মুখ দেখি।' জোরে জোরে অনিমেষকে ডাকতে লাগল সে। মহীতোষের ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ছোটমা বলল, 'যাও, তাড়াতাড়ি ঘুরে এস।'

অনিমেষ সামনে এগিয়ে যেতেই সেরা বাচ্চাটার মাথা থেকে সরিয়ে নিজের বুকে হাত রেখে বলল, 'মেরা নাম সেরা, ফাস্টো কেলাস। বেস্ট।' শেষের শব্দটা একটু মনে করে নিয়ে বলল। আর তারপরই ফোকলা মুখে হেসে বলল, 'হাম বুড্ডী হো গিয়া। তু বুড়াবাবাকে নাতি? তুর জনম হল তো বুড়াবাবা মিঠাই খাওয়ালেক, আভি তু জোয়ান হো গিয়া বাপ, হাম বুড্ডী হো গিয়া।' কথাগুলো অসংলগ্ন কিন্তু অনিমেষ অনুভব করছিল আন্তরিকতা না থাকলে এভাবে কথা বলা যায় না। অথচ এই মুহূর্তে অন্যান্য কুলিরা প্রতিশোধ নিতে তাঁদের কোয়ার্টারের সামনে হল্লা করছে। কেন যে এমন হয়। মৃদু হেসে ও চলে আসতে চাইছিল কিন্তু সেরা ছাড়বার পাত্র নয়, সামান্য গলা নামিয়ে সেরা বলল, 'ও জেনানা কৌন হ্যায়? তুর দোসরা মা?'

অনিমেষ বলল, 'হ্যাঁ। আমরা যাচ্ছি।'

'কাঁহা যাহাত্তিস রে?'

'বাজারে।'

'বা-জা-র! তুর ঘরকা সামনে রাস্তা ছোড়কে ইধার সে কাহে?'

অনিমেষ কি জবাব দেবে বুঝতে না পেরে বাবার দিকে তাকাল। মহীতোষ ওকে ইশারা করে চলে আসতে বললেন। আর এই সময় নদীর ওপারে চিৎকার চেঁচামেচি বেড়ে গেল সহসা। এমন শব্দ করে মাদলগুলো বাজাতে লাগল যে অনিমেষের মনে পড়ল রহস্যময় আফ্রিকা বইতে এই ধরনের মাদল বাজিয়ে নর-খাদকদের আসবার গল্প সে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে শুনল সেরা বলছে, 'শালা—হারামি। হরতাল করবেক, কাম করবেক নাই, সাহেব পয়সা নেহি দেগা তো

থায়গা ক্যা ? সব কই নিমকহারাম হো গিয়া।' বিড়বিড় করে যাদের উদ্দেশে সেরা গালাগালি দিতে আরম্ভ করল তারা এখন বাড়ি ফিরছে। নদীর বুকে তাদের গলায় শব্দ শোনা যাচ্ছে। অনিমেষ আর দাঁড়াল না, দৌড়ে মহীতোষদের সঙ্গ নিল। বাঁ দিকে একটা টিউবওয়েল, সেটা ছাড়াতেই ঝুপড়ি হয়ে থাকা বিরাট অশ্বত্থ গাছের গা ঘেঁষে চা-বাগানের শুরু। ওরা যখন চা-বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়েছে তখন পেছনে পায়ের শব্দ শুনতে পেল—খুব দ্রুত একটা লঘু আওয়াজ এগিয়ে আসছে। চা-গাছ ওদের বুক সমান উঁচু, মাঝে মাঝে বড় শেড্ ট্রি আর পাতি তোলার সুবিধের জন্য পায়ে চলার রাস্তা চলে গেছে বাগানময়। মহীতোষ বললেন, 'বসে পড়, বসে পড।'

ওরা তিনজনেই বসে পড়ল চটপট। লাইনে এখন জোর কথাবার্তা চলছে। সেই সঙ্গে হাসি আর চিৎকার। মাদলটা ঘুরে ফিরে অনেকরকম বোল তুলছে এখন। এগিয়ে আসা আওয়াজটা হঠাৎ থেমে গেল। সামনের ওই বিরাট অন্ধকার করে রাখা অশ্বত্থ গাছটার জন্য কাউকে দেখা যাচ্ছে না। যে এসেছে সে কি ওদের সন্ধান পেয়েছে ? অনিমেষের মনে হচ্ছিল সেরা নিশ্চয়ই ওদের কথা ফিরে আসা কুলিদের বলবে না। আর যদি ওরা টের পেত তাহলে এতক্ষণে দল বেঁধে এদিকে ছুটে আসত। কিছুক্ষণ এভাবে উবু হয়ে বসে থেকে অনিমেষের অস্বস্তি হতে আরম্ভ করল। চারাগাছগুলোর তলায় ঢোকার কোন প্রশ্ন নেই কিন্তু ওরা যেখানে রয়েছে তার তলায় অনেক ছুঁচলো আগাছা, ঘাস শরীরটাকে বিব্রত করছিল। মহীতোষ যেন ফিসফিসিয়ে ছোটমাকে বললেন, 'এও কপালে লেখা ছিল।' ছোটমার মুখ শুকিয়ে গিয়েছে, চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। এই সময় অনিমেষ ওকে দেখতে পেল। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাউকে খুঁজছে। মহীতোষও ওকে দেখেছিলেন। স্বস্তির নিঃশ্বাসটা তাঁর এত জোরে হয়েছিল যে ছোটমা চোখ খুলে সামনে দেখলেন এবং সেই সময় বাচ্চাটা এদিকে মুখ ফেরাল। তিনটে মানুষ যে এভাবে উবু হয়ে বসে আছে সে দৃশ্যে ওর মুখে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। ও অনিমেষের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ সামনে এগিয়ে এসে ডান হাতটা এগিয়ে ধরল। অনিমেষ দেখল ওর হাতে একটা কাগজের মোড়ক ধরা আছে। ভীষণ অবাক হয়ে গেল সে, এইভাবে পেছন ধাওয়া করে এসে কি দিতে চাইছে ও ? মোড়কটা নিয়ে কাঁপা হাতে সেটাকে খুলল অনিমেষ। পুরনো খবরের কাগজের ভাঁজগুলো খুলতেই অনিমেষ তাজ্জব হয়ে গেল। গোটা চারেক গুড়ের বাতাসা রয়েছে তাতে। ও মুখ তুলে তাকাতেই দেখল ছেলেটা হলদে দাঁত বের করে হাসল, তারপর একটা হাত পেছনদিকে ওদের লাইনের দিকে নির্দেশ করেই

সেটাকে ফিরিয়ে অনিমেষের দিকে উঁচিয়ে ধরে অবোধ্য শব্দ করে চলল। পেছন থেকে মহীতোষ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার ?'

অনিমেষ ওঁদের বাতাসাগুলো দেখাল। ছোটমা বলল, 'আহা রে, তোমাকে খেতে দিয়েছে বুড়ী, কি ভাল ছাখো তো।'

মহীতোষ বললেন, 'আশ্চর্য।'

অনিমেষ এতখানি আপ্লুত হয়ে গিয়েছিল, ও কোন কথা বলতে পারছিল না। যাদের ভয়ে ওরা বাড়ি ছেড়ে চা-বাগানের মধ্যে লুকিয়ে আছে তাদেরই একজন তাকে প্রথম দেখল বলে চারটে বাতাসা পাঠিয়ে দিয়েছে মুখমিষ্টি করতে। হয়তো এই বাতাসাগুলো সেরার কাছে মহার্ঘ্য জিনিস, কিন্তু তাই সে পাঠিয়ে দিয়েছে সরিৎশেখরকে সম্মান দেবার জন্য। এই মুহূর্তে অনিমেষ দাদুর জন্য গর্ব অনুভব করছিল। ও দুটো বাতাসা বাচ্চাটার হাতে দিতেই সে একসঙ্গে মুখে পুরল, তারপর হাত নেড়ে অনিমেষকে ডাকতে লাগল।

অনেকক্ষণ থেকে অনিমেষের মনের মধ্যে একটা হীনমন্যতা তিল তিল করে জন্ম নিচ্ছিল। এইভাবে বাড়িতে আসামাত্র কিছু গরীব কুলির ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া ও মনে মনে আর সমর্থন করতে পারছিল না। ওর মনে হচ্ছিল আজ কুলিদের এই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার পেছনে নিশ্চয়ই সুনীলদার পরিশ্রম আছে। সেই সুনীলদার সঙ্গে তার মিত্রতা, সুনীলদার শেষযাত্রায় সঙ্গী হওয়া, সর্বহারাদের সম্পর্কে সুনীলদার কথা শুনে অনেক কিছু স্পষ্ট করে দেখা—এখানে এসে এইভাবে পালিয়ে বেড়ানোর ফলে মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে। আসলে এখানে আসামাত্রই এত সব ঘটনা পর পর ঘটে গেল যে সে মাথা ঠিক করে কোন কিছু চিন্তা করতে পারে নি। এখন এই মুহূর্তে বাচ্চাটার হাতে পাঠানো বৃদ্ধা মদেসিয়া রমণীর ভালবাসা পেয়ে ভীষণভাবে নাড়া খেল। এইভাবে পালিয়ে বেড়াবার কোন অর্থ হয় না। ওর মনে হল ও নিশ্চয়ই রাগী কুলীদের বোঝাতে পারবে যে ওদের শত্রু তারা নয়। এই বাচ্চাটা যেন অনিমেষকে লজ্জা দিয়ে গেল। ও আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি যাচ্ছি।'

মহীতোষ চমকে উঠলেন, 'সে কি ! কোথায় যাচ্ছিস ?'

অনিমেষ বাবার দিকে তাকিয়ে এতক্ষণের ভাবা কথাগুলো বলব-বলব করেও বলল না। ওর মনে হল এসব কথা বাবা বুঝবেন না। বাবার যখন যৌবন ছিল তখন তিনি দেশকে স্বাধীন করার জন্য কোন আন্দোলন করেন নি। এই ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ মানুষের মত নিজের পরিবারের বাইরে আর কিছু ভাববার মত মানসিকতা বাবার কখনো তৈরি হয় নি। এখানকার কংগ্রেস কম্যানিস্ট কোন

ব্যাপারই তাঁকে স্পর্শ করে না। এই চা-বাগানের কুলিদের ওপর তিনি কখনোই অত্যাচার করেন নি বটে কিন্তু এরাও যে মানুষ, মানুষের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকবার জন্য এরা চেষ্টা করতে পারে সেটাও তিনি ভাবতে পারেন না। যেন ঈশ্বর পৃথিবীতে যাকে যেভাবে চিরকাল রেখে এসেছেন'সে সেইভাবে থাকবে। শুধু নিজের এবং পরিবারের মানুষের ওপর কোন আঘাত হলে তিনি বিচলিত হয়ে উঠবেন। অনিমেষের মনে হল, তার জানাশোনা মধ্যবিত্ত মানুষরা সবাই বাবার মত একা একা।

ও এইসব কথা বলল না, শুধু বলল, 'দেখে আসি কি ব্যাপার! এইভাবে কতক্ষণ বসে থাকব।' মহীতোষ স্পষ্ট বিরক্ত হলেন কিন্তু ততক্ষণে অনিমেষ এগিয়ে গিয়েছে। মহীতোষ চাপা গলায় বললেন, 'মরবে মরবে, চিরকাল এই-রকম জেদী থেকে গেল, বুদ্ধিশুদ্ধি হল না।'

ছেলেটার হাত ধরে অনিমেষ চা-বাগান থেকে উঠে আসছে এমন সময় পেছন থেকে ছোটমার ডাক শুনতে পেল। পেছন ফিরে সে দেখল ছোটমা এগিয়ে আসছে। ও এটা ভাবতে পারে নি, ভেবেছিল বাবা আর ছোটমা আপাতত এখানে থাকুন, পরিস্থিতি বুঝে পরে ব্যবস্থা করা যাবে। ছোটমা এসে বলল, 'চল।'

'তুমি যাবে?' অনিমেষ বিশ্বাস করতে পারছিল না।

'আমি আর বসে থাকতে পারছি না। তাছাড়া তোমার যদি কোন ক্ষতি না হয় আমারও হবে না। আর যাই হোক মেয়েদের ওরা কিছু বলবে না। চল।'

ছোটমাকে হাঁটতে দেখে অনিমেষ বলল, 'বাবা?'

'উনি থাকুন। সবাই তো সমান নয়। ওঁর পক্ষে এটাকে স্বাভাবিকভাবে নেওয়া সম্ভব নয়। বরং এখানেই ওঁর মনে হবে বিপদ কম। ছোটমার কথা শুনে অনিমেষ চুপচাপ হাঁটতে লাগল। পেছন থেকে মহীতোষের গলার চাপা ডাক ওরা আর শুনতে পেল না, কারণ ততক্ষণে সেই বিরাট অশ্বত্থ গাছটা ওরা পেরিয়ে এসেছে। ছোটমার মুখের দিকে তাকিয়ে অনিমেষের কেমন গুলিয়ে গেল। মানুষের চরিত্র ও এখন কিছুই বুঝতে পারে না।

দূর থেকে মনে হচ্ছিল যেন কুলি লাইনে মেলা বসেছে। প্রচুর মানুষের ভিড়, গোল হয়ে তারা নাচ দেখছে। পরস্পরের কোমর জড়িয়ে ধরে ছেলেমেয়েরা মাদলের তালে আগু-পিছু হয়ে নাচছে। প্রথমে ওদের দেখতে পেয়েই অনিমেষের বুকটা কেঁপে উঠেছিল, কি হবে কে জানে! কিন্তু খুব দ্রুত ও নিজেকে সামলে নিল, পরিস্থিতি যাই হোক ও তার মোকাবিলা করবে। ছোটমার মুখ দেখে মনে হল না একটুও ভয় পেয়েছে। যারা এইরকম আনন্দ করে নাচতে পারে তারা

কি মানুষকে আক্রমণ করতে পারে ?

স্বর্গছেঁড়ার কুলি লাইনে তাদের সীমানায় কোন বাবুর বউকে আসতে ছাখেনি কখনো, ফলে ওদের দেখতে পাওয়ামাত্র ভিড়টা জমাট বেঁধে গেল। সবাই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কৌতূহলী চোখ তুলে ওদের দেখছে। ছেলেটার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ওদের সামনে এসে অনিমেষ খুব অস্বস্তি বোধ করল। এই মানুষগুলোকে দেখে একটুও রাগী বলে মনে হচ্ছে না। কাকে কি কথা বলা যায়—পূর্ব প্রস্তুতি না থাকায় অনিমেষের গোলমাল হয়ে গেল। ও বাচ্চাটার হাঁটার টানে সেরার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ছোটমা বলল, 'সবাই দেখছে।'

সেরা দাঁড়িয়েছিল দাওয়ায়। ওদের ফিরে আসতে দেখে ফোকলা মুখে বাচ্চাটাকে কিছু বলতেই সে ঘাড় নেড়ে জবাব দিল, দিয়ে হাসল। লাঠিতে ভর রেখে একটু সামনে এগিয়ে সেরা সমবেত জনতাকে দেখাল, 'বুড়োবাবুকে নাতি।'

একটা গুঞ্জন উঠল, যেন মুহূর্তেই জনতা অনিমেষকে চিনতে পারল। ছোটমাকে অনেক কামিন চেনে। তারা ঠেরে-ঠুরে কথা বলছে। এমন সময় ভিড় ঠেলে একজন বয়স্ক মদেসিয়া এগিয়ে এল ওদের দিকে। অনিমেষ ঠিক বুঝতে পারছিল না হাওয়া কোন্ দিকে, শার্ট প্যাণ্ট পরা প্রৌঢ় লোকটিকে দেখলে মনে হয় বেশ ভদ্র। লোকটি সামনে এসে ওদের দেখে বলল, 'আপনি মহীবাবুর ছেলে ?' স্পষ্ট বাংলা উচ্চারণ, কথা বলার মধ্যে একটা কর্তৃত্বের আভাস আছে, অনিমেষ ঘাড় নাড়ল। 'এখানে কি করছেন ?'

অনিমেষ জবাব দেবার আগেই ছোটমা বলল, 'বেড়াতে এসেছি।'

উত্তরটা বোধ হয় আশা করেনি লোকটি, হেসে বলল, 'এখানে কাউকে বেড়াতে আসতে দেখিনি কখনো। আমার নাম জুলিয়েন, এখানকার লেবার ইউনিয়নের সঙ্গে আছি। আজ হরতাল হবার পর বাবুরা তাঁদের কোয়ার্টার ছেড়ে বাজারে চলে গেছেন আমাদের ভয়ে আর আপনারা এখানে বেড়াতে এসেছেন এটা ভারি অদ্ভুত ব্যাপার।'

অনিমেষ এবার কথা বলল, 'আপনারা ভয় দেখাচ্ছেন কেন ? বাবুদের বিরুদ্ধে তো আপনাদের লড়াই নয় !'

'নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু হরতাল জেনেও কাজে গিয়ে ওঁরা ভয় পেয়ে গেছেন। আসলে সাহেবকে হাতে রাখতে চায় সবাই। মিডলক্লাস মেণ্টালিটি। অথচ আমাদের কোনো পরিকল্পনা ছিল না ওঁদের আক্রমণ করার। আমরা এত হাজার শ্রমিক ইচ্ছে করলে—যাক, সাহেব আমাদের বেশির ভাগ দাবি মেনে নিয়েছেন—প্রথম পদক্ষেপে এটা বিরাট জয়। সেই জয়-উৎসব করতে আমরা আপনাদের

ওখানে গিয়ে দেখলাম কোয়ার্টার খালি।' জুলিয়েন হাসল।

কথাটা শুনে ভীষণ ভাল লাগল অনিমেষের। হঠাৎ ও বলে ফেলল, 'আজ সুনীলদা থাকলে খুব খুশী হতেন।'

'সুনীলদা? আপনি সুনীলবাবুকে চিনতেন?' জুলিয়েন চমকে গেল।

'হ্যা। ওঁর কাছে আমি অনেক গল্প শুনতাম।' অনিমেষ বলতেই জুলিয়েন ওর দুই হাত জড়িয়ে ধরল, 'সুনীলবাবু না এলে আমরা অন্ধকারে থাকতাম। আপনি যখন সুনীলবাবুর বন্ধু তখন আমাদেরও বন্ধু।'

অনিমেষ অনেকক্ষণ কথা বলতে পারল না। এই মানুষগুলোকে কি চট করে ওরা ভুল বুঝেছিল। ওর মনে হল একসঙ্গে দীর্ঘকাল বাস করেও মানুষের সঙ্গে মানুষের চেনাশোনা হয় না।

হঠাৎ ওর চোখে পড়ল ছোটমা অশ্বত্থ গাছের পাশ দিয়ে চা-বাগানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জুলিয়েনের হাত ধরা অবস্থায় ও বলল, 'আমার বাবা ওখানে আছেন।'

জুলিয়েন ছোটমার যাওয়াটা দেখছিল। একটু চুপ করে থেকে ও বলল, 'বুঝতে পেরেছি। চলুন আপনি আমার ঘরে বসবেন।'

অনিমেষ বুঝতে পারল, বাবাকে লজ্জা দিতে চাইছে না জুলিয়েন। ভীষণ কৃতজ্ঞ হয়ে হাঁটতে লাগল অনিমেষ।

খাওয়া-দাওয়া সারতে বিকেল গড়িয়ে এল। ছোটমা মহীতোষকে নিয়ে আগেই বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। অবশ্য মহীতোষ নাকি কুলি লাইনের সামনে দিয়ে পার হয়ে ফিরতে চাননি, বাগানের মধ্যে দিয়ে সামান্য এগিয়ে ফ্যাক্টরীর পাশ ঘেঁষে ছোট সাঁকোটা পেরিয়ে সুরকি বিছানো পথটা দিয়ে ওঁরা ঘুরে এসেছেন। সমস্ত চা-বাগানে আজ খুশীর আমেজ লেগেছে, দিনদুপুরে হাঁড়িয়া খেয়ে নাচগান শুরু হয়ে গিয়েছে। ওদের জীবনে এরকম ঘটনা এর আগে ঘটেনি, স্বয়ং সাহেব বাংলোর বারান্দায় জুলিয়েন আর তিনজনকে ডেকে নিয়ে গিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা করে ওদের দাবী মেনে নিয়েছেন। ওরা জীবনে কখনো গল্প শোনেনি যে বাবুরা ওদের ভয়ে কোয়ার্টার ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে। এই আনন্দের প্রকাশ কিছু ছেলের মধ্যে বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল, তারা বাবুদের কোয়ার্টারের উপর ঢিল ছুঁড়েছে, গাছপালা ছিঁড়েছে—ব্যাস, এর বেশী এগোয়নি। জুলিয়েন সম্পর্কে পুরোনোপন্থী মানুষদের মনে যে সন্দেহের মেঘ ছিল তা রাতারাতি কেটে গিয়ে সে এখন নায়ক হয়ে গিয়েছে। অনিমেষ জুলিয়েনদের ঘরে বসে সেটা

বেশ টের পাচ্ছিল।

জুলিয়েনের সঙ্গে কথা বলে বেশ ভাল লাগল অনিমেষের। সরিৎশেখরকে স্পষ্ট মনে আছে ওর। ওর বাবা বকু সর্দারের দিনগুলো থেকে এতদিন স্বর্গছেঁড়া খুব একটা পাল্টে যায় নি। কালো কালো মানুষগুলো হাঁড়িয়া খেয়ে নিজেদের মধ্যে যতই মারামারি করুক, সাহেব তো দূরের কথা, বাবুদের সামনে পড়লে কেঁচো হয়ে যায়। বেশ কয়েক বছর আগে ওদের একটা দাবী সাহেবদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল যে, কুলিদের যেসব ছেলে কলেজে উঠবে মিশনারীদের কাছ থেকে পড়াশুনা করে তাদের বাগানে কাজ দিতে হবে। বাবুদের এতে আপত্তি করার কিছু নেই কিন্তু তবু আপত্তি উঠেছিল। জুলিয়েন আর একজন এই চা বাগানে বাবুর কাজ পেয়ে দেখল ওদের কোয়ার্টার অন্যান্য বাবুদের সঙ্গে নয়—দূরে লাইন ঘেঁষে তৈরী হল। আবার মজার ব্যাপার, অন্য যে লেবার-ছেলেটি বাবুর চাকরি পেল সে বড় কোয়ার্টারে যাবার পর অন্যান্য লেবারদের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে দিল। সে না পেল বাবুদের কাছে সম্মান, না পেল লেবারদের ভালবাসা। এই সময় সুনীলদা না এলে এখানকার লেবারদের সংগঠিত করা যেত না। এমন কি জুলিয়েন নিজেও খুব হতাশ হয়ে পড়েছিল সে সময়। পি এস পি বা কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে তার যে যোগাযোগ ছিল তাতে ওদের সম্পর্কে ভাল ধারণা ও মনে মনে তৈরী করতে পারছিল না। সুনীলদা ওকে একটা ছবি দিয়ে গেছে। ছবিটা দেখাল জুলিয়েন। এর আগে এই ছবি কখনো দেখেনি অনিমেষ। দাড়িওয়ালা এক প্রৌঢ়ের ছবি। নিচে ইংরেজীতে নাম লেখা—কার্ল মার্কস। পেছনে সুনীলদার নিজের হাতে লেখা কয়েকটা লাইন—'যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল আজ রাত্রে, তার মুখে খবর পেলাম সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক।' চট করে সুনীলদার মুখটা মনে পড়ে গেল অনিমেষের, সেই সঙ্গে হুড়মুড় করে চলে এল ওকে শ্মশানে নিয়ে যাবার রাতটার কথা। জুলিয়েন বলল, 'সুনীলবাবুকে যারা হত্যা করেছে আমি তাদের জানি। বদলা নিতে পারতাম, কিন্তু তাহলে আজকের এই আন্দোলনটা হত না। জানেন, পৃথিবীতে যারা ভাল কাজ করতে আসে তাঁদের বেশীদিন বাঁচতে দেওয়া হয় না। আবার মজার ব্যাপার হল, তাঁরা নিহত হন বলেই সে কাজটা দ্রুত হয়ে যায়। আচ্ছা, এই মার্কসও তো সাহেব ছিলেন—অথচ দেখুন—।'

ফিরে আসার সময় অনিমেষ চুপচাপ একা একা হেঁটে এল নদী পেরিয়ে। চার-ধারে যেন পরবের মেজাজ—মাদল বাজছে—ছেলে-মেয়েরা গান গাইছে। মহাত্মা গান্ধী, সুভাষচন্দ্র বসু এবং কার্ল মার্কস—অনিমেষ যেন দুটো হাত দিয়ে এই তিনজনকে ছুঁয়ে দেখতে দেখতে হাঁটছিল। দেশ বড়, না দেশের মানুষ বড়।

নদী পার হতেই ঝাড়িকাকুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ওকে দেখেই গলা তুলে বকাঝকা করতে আরম্ভ করল, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলি—তোর বাবা কখন এসে গিয়েছে—বিকেল হয়ে গেল, খাওয়া-দাওয়া করতে হবে না?'

অনিমেষ হেসে ফেলল, খিদে বোধটা ওর একদম হয়নি আজ। সীতাদের বাড়িতে মিষ্টি খাওয়ার পর এত সব উত্তেজনাময় ঘটনা ঘটে গেল যে খাওয়ার কথা আর মনেই হয়নি। কিন্তু ঝাড়িকাকুর ব্যাপারস্যাপার অনেকটা দাদুর মত, বিকেল হতে এখনও অনেক দেরি, তবু বলল বিকেল হয়ে গিয়েছে।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ঝাড়িকাকু বলল, 'তোরা মিছিমিছি চলে গেলি, ওরা আনন্দ করতে এসেছিল। সীতাদের বাড়ি থেকে মিষ্টি খেয়ে গেল।'

অনিমেষ বলল, 'হুঁ। জুলিয়েন বলল।'

'জুলিয়েন? জুলিয়েনকে তুই চিনিস?' ঝাড়িকাকু ওর মুখের দিকে তাকাল।

'একটু আগে আলাপ হল। বেশ ভাল লোক।'

'ভাল লোক?' খিঁচিয়ে উঠল ঝাড়িকাকু, 'ওই তো সব নষ্টের গোড়া। এতদিন ধরে কুলিদের খেপিয়ে খেপিয়ে আজ এইসব করেছে। সবাই বলে ও না'কি কমনিষ্ঠ।'

'কি বললে?' হেসে ফেলল অনিমেষ, 'কম নিষ্ঠ মানে জানো?'

'ওই তো যারা গরীব মানুষদের খেপায়।' নির্লিপ্ত গলায় ঝাড়িকাকু জবাব দিল।

'দূর। কম নিষ্ঠ মানে হল কোন কাজে যার আন্তরিকতা নেই। আর তুমি যেটা বলতে চাইছ সেটা হল কম্যুনিস্ট।' অনিমেষ বুঝিয়ে বলতেই ঝাড়িকাকু কিছুক্ষণ ভেবে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, গান্ধীবাবা কি কম্যুনিস্ট?'

প্রশ্নটা শুনে অনিমেষ হকচকিয়ে গেল প্রথমটা। ওর মনে হল হ্যাঁ বলতে পারলে ওর ভাল লাগত। কিন্তু কোথায় যেন আটকে যায়। পরক্ষণেই ওর খেয়াল হল ঝাড়িকাকু মহাত্মা গান্ধীর নাম জানে তাহলে। যে মানুষটার নাম এইরকম নির্জন জায়গায় ঝাড়িকাকুর মত নিরক্ষর মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করে সে মানুষ কংগ্রেসী কি কম্যুনিস্ট—তাতে কিছু এসে যায় না। কার্ল মার্কস সম্পর্কে ও তেমন কিছু জানে না। সুনীলদার মুখে দুই-একবার নামটা শুনেছিল। দুনিয়ার সর্বহারাদের কথা যাঁরা চিন্তা করেন তাঁদের গুরু হলেন কার্ল মার্কস। ছবিটা দেখে শ্রদ্ধা জাগে মনে। ওঁর সম্পর্কে আরো জানতে হবে—অনিমেষ মনে মনে স্থির করল।

খাওয়া-দাওয়া সারতে বিকেল হয়ে গেল। সকালবেলায় রান্নাবান্না হয়নি।

কুলিরা চলে গেলে ঝাড়িকাকু বাড়ি ফিরে উনুন জ্বালিয়ে ভাত চাপিয়ে দিয়েছিল। ছোটমা সবকিছু অন্যদিনের মত সেরে নিয়ে রান্না শেষ করলে অবেলায় ওদের খাওয়া হল। আজ অনিমেষ বাবার সঙ্গে বসে খেল। আজকের এই ব্যাপারটা মহীতোষকে বেশ নড়বড়ে করে দিয়েছে। তিনি যে অযথা ভয় পেয়েছিলেন এটা স্বীকার করতে এখনও তিনি প্রস্তুত নন। সাহেব কুলিদের দাবী মেনে নেবে এটা তাঁর কল্পনাতেও ছিল না। বরং গতকালও তিনি সাহেবকে ভীষণ একরোখা দেখেছিলেন আর আজ সকালে কুলিদের মুখচোখ দেখে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন এরা একটা তুলকালাম কাণ্ড করতে পারে। কিন্তু কি ব্যাপার ঘটলো যে সাহেব ওদের দাবী মেনে নিল, যাতে কুলিদের জয় হয়ে গেল। এটাই তাঁর বোধগম্য হচ্ছে না। অন্য বাবুদের সঙ্গে কথা বললে অবশ্যই ব্যাপারটা জানা যেত। কিন্তু এরপর কি করে এই বাগানে থাকা যাবে? কুলিরা তো বেপরোয়া হয়ে যাবে। একবার অধিকারের স্বাদ পেলে কি আর তাঁদের তোয়াক্কা করবে? এতদিন, সেই ছেলে বেলা থেকে এখানে এই স্বর্গছেঁড়ায় এই সম্মানের সঙ্গে তিনি বসবাস করছেন—আজ মনে হচ্ছে তাতে ফাটল ধরে গেল। ওদের দাবী ছিল, বাস করবার মত ভাল কোয়ার্টার্স, রেশনের পূর্ণ পরিমাণ দেওয়া। চাকরির নিরাপত্তা এবং কারো ব্যক্তিগত কাজে কোন শ্রমিককে কাজে লাগানো চলবে না। সাহেব কি কি দাবী মেনে নিয়েছেন জানা নেই—কিন্তু এর পরে ওরাই তো চোখ রাঙাবে। ওঁর মনে হল সরিৎশেখর যে আরামে চাকরি করে গিয়েছেন, তাঁর নিজের বাকী জীবনটা সেভাবে কাটবে না। প্রোডাকশন বাড়াতে গেলে ফ্যাক্টরীতে তাঁকে অনেক সময় কঠোর হতে হয়, কিন্তু এখন আর সেটা সম্ভব হবে না। দুপুর থেকেই তাঁর মনে হচ্ছিল যদিও এখনও অনেকদিন চাকরি আছে কিন্তু এখনই যদি রিটায়ার করা যেত তাহলে যেন স্বস্তি পেতেন। চেষ্টা করলে অন্য বাগানের চাকরি পাওয়া অসম্ভব নয়—কিন্তু সেখানেও এই স্বর্গছেঁড়ার হাওয়া যে লাগবে না তা কে বলতে পারে? সারাজীবনে নিজস্ব সঞ্চয়ের পরিমাণ বেশী নয়, তারপর অনিমেষের পড়াশুনা আছে। যদি কলকাতায় ভাল ফল করে তাহতে ওকে ডাক্তারী পড়াবার বাসনা আছে। এই একটি প্রফেসনে এই দেশে কারো অর্থের অভাব হয় না। ডাক্তারী পড়াবার খরচ অনেক, তিনি জানেন। তাই ও যতদিন না নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছে ততদিন এইভাবে মুখ বুজে চাকরি করে যেতে হবে।

খেতে বসে তেমন কোন কথা হয়নি। বিকেলে খবরের কাগজটা দিয়ে গেলে মহীতোষ সিগারেট ধরিয়ে বাইরের ঘরের সোফায় বসেছিলেন কাগজ হাতে। অনিমেষ বেরুচ্ছে যাচ্ছিল, তিনি ওকে ডাকলেন। কলকাতায় যাবার ব্যাপারে বাবার

সঙ্গে এখন অবধি কোন কথাই হয়নি। মনের মধ্যে একটা ধুকপুকুনি আছে—কোথায় গিয়ে উঠবে, কিভাবে কলেজে গিয়ে ভরতি হবে—কত টাকা লাগবে। নিজের থেকে মহীতোষের সঙ্গে আলোচনা করতে ওর সঙ্কোচ হচ্ছিল। এখন তিনি ডাকতেই ও ঘুরে দাঁড়াল। মহীতোষ সিগারেট ধরাতে ধরাতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কবে যাওয়া যেন ঠিক হল ?'

বাবার দিকে তাকিয়ে অনিমেষ বলল, 'বুধবার।'

'টিকিট কাটা হয়েছে ?' মহীতোষ কাগজের ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছিলেন না।

অনিমেষের মনে হল এখন বাবার চেহারাটা যেন আমূল পাল্টে গেছে, দুপুরে কুলিদের আক্রমণের সময়কার চেহারাটা যেন উধাও হয়ে গেছে। খুব গম্ভীর এবং চিন্তামগ্ন দেখাচ্ছে। ও বলল, 'না। হলদিবাড়ি থেকে থ্রু কোচ আসে সেটায়

'আর কেউ যাচ্ছে, বন্ধুবান্ধব ?'

'কয়েকজন যাবে কলকাতায় পড়তে, তবে একসঙ্গে যাবে কিনা জানি না।'

'যেতে পারবে তো একা ?'

'হুঁ।'

'আমি সঙ্গে গেলে ভাল হত, তা নিজেই যাও। কেউ দেখিয়ে দিয়ে শেখার চেয়ে নিজে ঠেকে শিখলে লাভ হয় বেশী। আমার এক বন্ধু আছে, বউবাজারের কাছে থাকে, তাকে লিখেছি তোমার কথা। সে সাহায্য করবে। তাছাড়া তোমার ছোটকাকা আছে কলকাতায়। সে ব্যস্ত লোক—সময় পাবে কিনা জানি না। আমাকে হঠাৎ চিঠি দিয়েছে তুমি পড়তে কলকাতায় গেলে যেন ওকে জানানো হয়। বুধবার রওনা হবে—উম্, তাহলে এখনই টেলিগ্রাম করে দিতে হয় দেবব্রতকে। কোন্ কলেজে ভরতি হবে ?'

'জানি না। প্রেসিডেন্সি কলেজে—।'

'হ্যাঁ, প্রথমে ওখানেই চেষ্টা করবে দেবব্রত, না হলে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়বে। সায়েন্স নিয়ে ইণ্টারমিডিয়েট পাস করে মেডিকেল কলেজে ভরতি হবে, এটাই আমার ইচ্ছা।'

'সায়েন্স !' অনিমেষ ঠোঁটটা কামড়াল, 'আমার ইচ্ছা আর্টস নিয়ে পড়ব। দাদুও চান ইংরেজীতে আমি যেন এম-এ পাশ করি।'

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে হাতের কাগজটা নামিয়ে রাখলেন মহীতোষ, 'না না, আর্টস নিয়ে পড়লে সারা জীবন কষ্ট করতে হবে। এখন সায়েন্স ছাড়া কদর নেই, তোমাকে ডাক্তারী পড়তে হবে।'

অনিমেষ যেন চোখে আতঙ্ক দেখল, 'কিন্তু আমার যে আর্টস ভাল লাগে।'

হাত নেড়ে যেন মহীতোষ কথাটা উড়িয়ে দিলেন, 'শখের ভাল লাগা আর বেঁচে থাকা এক কথা নয়। আর্টস পড়ে এম-এ পাশ করে তুমি কি করবে? স্কুল-কলেজে মাস্টারি? কত টাকা পাবে মাইনে? সারা জীবন কষ্ট পাবে, মনে রেখো। তাছাড়া আমার আর চাকরি করতে ভাল লাগে না। যদ্দিন না তুমি দাঁড়াচ্ছ ততদিন আমাকে করতে হবে। তাই ডাক্তারী পাশ করলে তোমার টাকার অভাব হবে না।'

অনিমেষ কোনরকমে ঢোক গিলে বলল, 'আমার অঙ্ক একদম ভালো লাগে না।'

মহীতোষ বললেন, 'চেষ্টা করলে সবকিছু সম্ভব। এই যে আমি, আমার কখনো ইচ্ছে ছিল না এই চা-বাগানের চাকরি করি। কিন্তু তোমার দাদুর পক্ষে আমাকে আর পড়ানো সম্ভব ছিল না তখন, আর আমাকে বাধ্য হয়ে এই চাকরি নিতে হল। তা চেষ্টা করে আমি তো অনেক বছর কাটিয়ে দিলাম। সেদিক দিয়ে তুমি তো ভাগ্যবান।'

অনিমেষ বলল, 'যদি ভাল রেজাল্ট না হয়?'

এবার মহীতোষ বড় বড় চোখে ছেলের দিকে তাকালেন, 'তাহলে বুঝব তুমি পড়াশুনায় যত্ন নাওনি, শোন, তোমার মা'র ভীষণ সাধ ছিল তোমাকে ডাক্তার করার।'

এই ধরনের একটা বোঝা ওর ওপর চাপিয়ে দেওয়া অনিমেষ কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। এ ব্যাপারে যেন ওর কোন বক্তব্য থাকতে পারে না। বাবা এবং দাদু যা বলবেন তাই ওকে মেনে নিতে হবে। আর ওঁদের বক্তব্যের প্রতিবাদ করলেই অমোঘ অস্ত্রের মত মায়ের নাম করে একটা বক্তব্য চাপিয়ে দেওয়া হবে। যেন মা যা বলে গেছেন, ও তার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না। অনিমেষের সন্দেহ, মা সত্যিই এইসব বলে গিয়েছেন কি না। ওর স্থির বিশ্বাস, মা যদি আজ বেঁচে থাকতেন তাহলে নিশ্চয়ই সে তাঁকে বুঝিয়ে রাজী করাতে পারত। ও এখন কি করবে? যদি সে বাবাকে মুখের ওপর বলে দেয় যে সায়েন্স নিয়ে পড়া তার পক্ষে সম্ভব নয়, তাহলে কি বাবা তার কলকাতায় যাওয়া বন্ধ করে দেবেন, কি জানি! সংশয়ের দোলায় দুলতে দুলতে ও ঠিক করল, এ ব্যাপারে দাদুর ওপর নির্ভর করা ছাড়া কোন উপায় নেই। বাবা নিশ্চয়ই দাদুর মুখের ওপর কোন কথা বলতে পারবে না। অতএব এখন চুপ করে থাকাই ভাল।

মহীতোষ খবরের কাগজটা আবার তুলে নিলেন, যেন ও ব্যাপারে যা বলার তা

বলা হয়ে গেছে, 'আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি তোমাকে মাসে একশ কুড়ি টাকা পাঠালেই ভালভাবে চলে যাবে। দশ-বারো টাকার বেশী হাতখরচ লাগা উচিত নয়। আর বাজে ছেলেদের সঙ্গে একদম মিশবে না। কলকাতা হল এমন একটা জায়গা যেখানে একটু আলগা হলেই নষ্ট হয়ে যেতে বেশী সময় লাগে না। কলেজ ছাড়া হোস্টেলের বাইরে কোথাও যাবে না, আর কখনই ইউনিয়ন বা পলিটিক্যাল পার্টির সংস্রবে যাবে না। রাজনীতি একটি ছাত্রের জীবন যেভাবে বিষিয়ে দেয়, অন্য কিছু সেভাবে পারে না। যা হোক, আমি চাই তুমি মাথা উঁচু করে আমার সামনে ডাক্তার হয়ে এসে দাঁড়াও।'

এখন প্রায় সন্ধ্যে। আসাম রোডের গাছগুলো হাজার পাখির চিৎকার যেন রবিবারের হাটের চেহারা নিয়েছে। মাঝে মাঝে এক একটা গাড়ি হুস হুস করে ছুটে যাচ্ছে। অনিমেষ শেষ সূর্যের রোদের আভা মাখা কোয়ার্টারগুলোর দিকে তাকাল। এই ছবির মত বাড়িগুলো ওর বুকের ভেতরে সেই ছেলেবেলা থেকে একই রকম জায়গায় আছে, শুধু সীতাদের বাড়িটা ছাড়া। ওই ত্রিপল, দুটো কলাগাছ—দ্রুত চোখ সরিয়ে নিল অনিমেষ। এই নির্জন রাস্তায় অজস্র পাখির গলা শুনতে শুনতে ও হাঁটছিল। ওর সমস্ত শরীর এখন কেমন ভারী লাগছে। বাজারের সীমা আসার আগেই ও থমকে দাঁড়াল, ওর বুকের মধ্যে চিরকালের চেনা এই স্বর্গছেঁড়া তিল তিল করে যে মোচড় দিচ্ছে সেটা অনুভব করতে করতে এগিয়ে আসা মানুষটার দিকে তাকাল। এই এত বছর পরেও ও রেতিয়াকে একই রকম দেখল। সেই ময়লা ছেঁড়া হাফপ্যান্ট, একটা নোংরা ফুলহাতা শার্ট, চুলগুলো রুক্ষ, পা দিয়ে রাস্তা মেপে এগিয়ে আসছে। ওর বসন্তের ছাপ মারা মুখটায় সেইরকম ভীরুতা এখনও লেগে আছে।

মুখোমুখি হতেই অনিমেষ রেতিয়ার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পায়ের শব্দ যত মৃদুই হোক না কেন, রেতিয়া হঠাৎ কুঁকড়ে গেল, তারপর ওর অন্ধ চোখ দুটো চট করে বন্ধ করে কান খাড়া করে শব্দ চিনতে চাইল। অনিমেষের সেই খেলাটা মনে পড়ল। ও এবার গলাটা ভারী করে জিজ্ঞাসা করল, 'কাঁহা যাহাতিন রে?'

সেইভাবে দাঁড়িয়ে রেতিয়া জবাব দিল, 'ঘর'।

'মেরা নাম বোল্?'

প্রশ্নটা শুনেই রেতিয়ার মুখটা আকাশের দিকে উঠে গেল। সেই বসন্তে খোঁড়া মুখটা সহসা ছুঁচলো হয়ে গিয়ে দুটো চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল।

অনিমেষ বুঝতে পারল ও প্রাণপণে গলার স্বরটা মনে করতে চেষ্টা করছে। কত বছর দেখা হয়নি অনিমেষের সঙ্গে, তাছাড়া গলা পাল্টে সে কথা বলেছে কিন্তু এখন অনিমেষ একাগ্র হয়ে প্রার্থনা করছিল যেন রেতিয়া ওকে চিনতে পারে। আর সেই মুহূর্তে রেতিয়া ওর লাল-ছোপ-ধরা দাঁত বের করে একগাল হাসল। যেন ওর ধাঁধাটা মিটে গেছে এমন ভঙ্গীতে ও হাত বাড়িয়ে দিল, 'অনি।'

নিজের নামটা রেতিয়ার গলায় শুনে অদ্ভুত সুখে অনিমেষের সমস্ত শরীরে একটা কাঁপুনি এসে গেল। ও চট করে রেতিয়ার বাড়ানো হাত দুটো ধরতেই বুকের গভীরে দ্রুত-হয়ে-ওঠা মোচড়টা ঝর ঝর করে দু'চোখ থেকে কান্না হয়ে ঝরে পড়ল। ও কোন কথা বলতে পারছিল না। রেতিয়া যেন এরকমটা আশা করেনি, ও অনিমেষের হাত ধরেই জিজ্ঞাসা করল, 'অনি ?'

এবার হাতটা ছাড়িয়ে নিল অনিমেষ, তারপর দ্রুত চোখ মুছে নিজেকে সামলে নতে নিতে বলল, 'হ্যাঁ।'

'ক্যা হুয়া তুমহারা ? রোতা হ্যায় কাহে ?'

কেন কান্না এল ? রেতিয়ার এই প্রশ্নটার জবাব ও সত্যিই চট করে নিজেই খুঁজে পেল না। এই স্বর্গছেঁড়া থেকে অনেক অনেক দূরে চলে যেতে হবে এই বোধটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা মাত্র বুক চেপে ধরেছিল। তারপর সীতাদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে বুকের মধ্যে কি যেন শুরু হয়ে গিয়েছিল। রেতিয়ার মুখে নিজের নামটা শুনতে পেয়েই ওর মধ্যে চট করে কান্নাটা এসে গেল। অনিমেষ বলল, 'এইসেই। রেতিয়া, হাম কোলকাতামে যায়েগা।'

রেতিয়া যেন চিন্তিত হল, 'উতো বহুৎ দূর—জলপাই সে ভি—না ?'

অনিমেষ এ কথার জবাব দিল না। সে জলপাইগুড়িতে থাকুক কিংবা কলকাতায় —স্বর্গছেঁড়ার সঙ্গে যে দূরত্ব তৈরী হয়ে গেছে তা কোনদিন কমবে না। শুধু এই রেতিয়ার মত কেউ যখন এত বছর পরও তার গলা মনে রেখে নাম ধরে ডেকে ওঠে, তখন মনটা কেমন হয়ে যায়।

বাজারের দিকে যাবার ইচ্ছে ছিল ওর। কাল হয়তো দুপুরের আগেই ওকে চলে যেতে হবে। তাই আজ স্বর্গছেঁড়ার বাজার-এলাকায় ঘুরে আসার ইচ্ছা ছিল ওর। বিশু কিংবা বাপীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে নিশ্চয়ই ভাল লাগত। কিন্তু এই সন্ধ্যে হয়ে যাওয়া সময়টায় ওর মনে হল রেতিয়ার সঙ্গে হেঁটে ওকে লাইনে পৌঁছে দিলেই বোধ হয় ভাল লাগবে। এখন আর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে ওর একটুও ইচ্ছে করছিল না। হঠাৎ ওর মনে হল, স্বর্গছেঁড়ার গাছপালা মাটি মাঠ আংরাভাসা নদীর মত রেতিয়া যেন প্রকৃতির একটা অঙ্গ। ও রেতিয়ার হাত ধরে

রাস্তার পাশ ধরে হাঁটতে লাগল। ক্রমশ অন্ধকারে সমস্ত চরাচর ছেয়ে যেতে লাগল। মাথার ওপর পাখিরা এখন গাছে গাছে জায়গা পেয়ে গিয়েছে। অনেকক্ষণ চুপচাপ হেঁটে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'তুম ক্যায়সা হ্যায় রেতিয়া ?'

রেতিয়া সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হয়ে গেল কিছুটা, তারপর বলল, 'আজ হাম কুছ নেহি খায়া—হামকো কই খানে নেহি দিয়া।'

'সে কি, কেন ?' অবাক হয়ে গেল অনিমেষ।

বেচারা রেতিয়া অন্ধ বলে কাজ করতে পারে না এবং ওর বাপ মা দাদার কাছে থাকে। তাহলে তারা ওকে খেতে দেয়নি কেন ? বিমর্ষমুখে রেতিয়া বলল, আজ সুবেরে সব হরতাল পরব কিয়া। কই ঘরমে নেহি হ্যায়। সামনে সব হাঁড়িয়া পিকে বেহুঁস হো গিয়া।'

'বাজারে গিয়ে চা খাসনি ?'

ঘাড় নাড়ল রেতিয়া, 'নেহি দিয়া আজ।'

কেন দেয়নি জিজ্ঞাসা করল না অনিমেষ, শুধু পকেটে হাত ঢুকিয়ে বেশ কিছু খুচরো পয়সা বের করে না গুনে রেতিয়ার হাতের মুঠোয় গুঁজে দিল। রেতিয়া চমকে গিয়ে হাতটা ওপরে তুলতেই পয়সাগুলো আঙুলের ফাঁক গলে টুং টাং করে রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ল। 'যাঃ, গির গিয়া পয়সা।' ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে রেতিয়া মাটিতে বসে পড়ে দুহাতে হাতড়ে হাতড়ে পয়সা খুঁজতে লাগল। এখন এখানে ঘন অন্ধকার। সাদা চোখে কিছুই ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে ছুটে যাওয়া এক একটা গাড়ি অন্ধকারকে ছুঁড়ে ফেলে মুহূর্তের জন্য চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। এইরকম একঝলক আলোয় অনিমেষ দেখল অনেক দূরে রেতিয়ার নাগালের বাইরে একটা এক আনা পড়ে আছে। ও চট করে এগিয়ে গিয়ে সেটা তুলতেই জায়গাটা আবার অন্ধকার হয়ে গেল। তীব্র আলোর পর অন্ধকার আরো গাঢ়তর হয়। ছড়িয়ে থাকা পয়সাগুলো খুঁজতে ওকে এখন হাতড়াতে হচ্ছে। অনিমেষ আবিষ্কার করল, ওরসঙ্গে রেতিয়ার এই মুহূর্তে কোন পার্থক্য নেই—দুজনেই এই মুহূর্তে অন্ধ।

ছোটমা বোধ হয় আগে থেকেই বিছানাপত্র ঠিক করে রেখেছিলেন। মহীতোষের একটা পুরোনো হোল্ডল ছিল, সেটাই পরিষ্কার করে বিছানাপত্র ঢুকিয়ে বেঁধে দেওয়া হল। ঝাড়িকাকু সেটাকে মাথায় নিয়ে ওর সঙ্গে চলল। সকালে মহীতোষ তাঁর বন্ধু দেবব্রতবাবুর ঠিকানা লেখা একটা চিঠি দিয়ে দিয়েছেন অনিমেষকে। টেলিগ্রাম করে দেওয়া হয়েছে, যাতে তিনি অবশ্যই স্টেশনে আসেন। প্রিয়তোষকে তিনি পরে জানাবেন, যদি ভরতি হতে অসুবিধে হয়

তবেই যেন ওর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। মহীতোষ ভাই-এর সাহায্য নেওয়া ঠিক পছন্দ করছেন না।

টাকা-পয়সা যত্ন করে ওর সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হল। ছোটমা বার বার করে এ ব্যাপারে সজাগ হতে বললেন ওকে। যাবার সময় যখন অনিমেষ ওঁদের প্রণাম করল, তখন মহীতোষ অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, 'যখন যা দরকার হবে আমাকে জানিও, সঙ্কোচ করবে না।'

কুচবিহার থেকে আসা বাসে জিনিসপত্র তুলে ও যখন উঠতে যাচ্ছে তখন হঠাৎই ঝাড়িকাকু হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। এতক্ষণ ধরে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছিল অনিমেষ, কিন্তু কান্না বড় ছোঁয়াচে রোগ। তবু সে কোন রকমে ঝাড়িকাকুকে বলল, 'এই, তুমি কাঁদছ কেন?'

সমস্ত বাসের লোক অবাক হয়ে দেখল, ঝাড়িকাকু কান্না গিলতে গিলতে বলল, 'আমি আর বেশীদিন বাঁচব না রে, তোকে আর আমি দেখতে পাব না—তুই ফিরে এসে দেখবি আমি নেই, মরে গেছি।'

দাঁড়াতে পারল না অনিমেষ, ঠোঁট কামড়ে দ্রুত বাসে উঠে পড়ল। বাসসুদ্ধ লোক এখন ওর দিকে তাকিয়ে আছে, সে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। ঝাড়িকাকু সরে রাস্তার পাশে যেতেই বাসটা ছেড়ে দিল। দুহাতে নিজের গাল চেপে সেই বেঁটেখাটো প্রৌঢ় মানুষটাকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল সে। হঠাৎ ওর সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল, সত্যি যদি আর ঝাড়িকাকুকে না দেখতে পায়? চোখ বন্ধ করে ফেলল অনিমেষ।

হু-হু করে বাসটা ছুটে যাচ্ছে। সেই ইউক্যালিপটাস গাছগুলো—ওদের কোয়ার্টারগুলো স্বর্গছেঁড়া লেখা বাগানের বিরাট বোর্ডটা যেন দৌড়ে দৌড়ে পেছনে চলে যেতে লাগল। ওদের বাড়ির বারান্দায় কি ছোটমা দাঁড়িয়ে ছিল? ঠিক বুঝতে পারল না অনিমেষ। সবুজ গালচের মত চা-বাগানটা যেন ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। দূরের ফ্যাক্টরী বাড়িটার ছাদ চোখে পড়ল। মহীতোষ বোধ হয় এতক্ষণে সেখানে ফিরে গিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। হঠাৎ এই মুহূর্তে অনিমেষের বাবার জন্য হঠাৎ কষ্ট বোধ হল। ওর মনে হল ও যেন বাবাকে ঠিক বুঝতে পারেনি। কেমন একা একা হয়ে আছেন উনি, সেখানে অনিমেষ কেন, ছোটমাও কোনদিন পৌঁছাতে পারেনি।

মুঠো বন্ধ করার মত একসময় স্বর্গছেঁড়া হারিয়ে গেল। আংরাভাসার পুল পেরিয়ে যেতেই অনিমেষ পেছনের সিটে শরীর এলিয়ে দিল। ওকে এখন অনেক দূর যেতে হবে, অনেক দূর। পেছনে এখন স্বর্গছেঁড়া চুপচাপ পড়ে থাকে। সেই

ছোটবেলার নদীটা এবং তার রঙিন মাছগুলো, সেই কুয়াশার অথবা কাঁঠাল গাছের অন্ধকারগুলো—তারা এখানে ঘোরাফেরা করুক। নতুন দিদিমণি নেই, ভবানী মাস্টার যেখানে গিয়েছেন সেখানে কি এই স্বর্গছেঁড়ার মত শান্তি আছে? জানা নেই, কিন্তু সেই ঘামের গন্ধমাখা স্নেহের স্পর্শটুকু তিনি নিশ্চয়ই নিয়ে যেতে পারেননি। স্বর্গছেঁড়ার বাজার দিন দিন পাল্টে যাচ্ছে—জলপাইগুড়ি শহরটা যেন ক্রমশ স্বর্গছেঁড়াকে গ্রাস করে নিচ্ছে—নিক, এখন তার কিছুতেই এসে যায় না। তবু কেন যে রেতিয়ারা এখনও বোকার মত পায়ে মেপে এক কাপ চায়ের জন্য অতটা পথ হেঁটে যায় আর অনেক বছর পরও তার গলা শুনে চট করে চিনে ফেলে! হয়তো একদিন আর পারবে না। অনিমেষের খেয়াল হল এই পথ দিয়েই সীতা মাথায় মুকুট পরে দুটো চোখ চেয়ে দেখতে দেখতে চলে গেছে।

।। বারো ।।

স্বর্গছেঁড়ার খবর শুনে সরিৎশেখর চিন্তিত হলেন। বকু সর্দারের ছেলে মাংরা যে নাকি জুলিয়েন নাম নিয়েছে, সে-ই কুলিদের খেপিয়ে তুলেছে এরকম একটা চিত্র তিনি যেন স্পষ্ট দেখলেন। এরকম কিছু হবে তা তিনি অনেক আগেই অনুমান করেছিলেন, যখন বাগানের কুলিরা তাদের সন্তানদের বাবু-চাকরিতে ঢোকাবার জন্য আবদার শুরু করেছিল। সেটা যে এত তাড়াতাড়ি হুমকিতে পরিণত হবে এরকমটা অবশ্য ভাবেননি। এরপর মহীতোষের পক্ষে সেখানে কতদিন নিশ্চিন্তে চাকরি করা সম্ভব হবে? চা-বাগানের চাকরি ছাড়া ওর তো অন্য কোনো বিদ্যে জানা নেই যে বাইরের চাকরি পাবে। ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন সরিৎশেখর। অনিমেষ অবশ্য দাদুর এই দুশ্চিন্তার কারণ ঠিক বুঝতে পারছিল না। ও অনেকক্ষণ দাদুর সঙ্গে তর্ক করে গেল। কুলিরা তো কোন অন্যায় করেনি। তারা যে ঘরে থাকে সে ঘর ওদের গোয়ালের চেয়ে ভাল নয়। যে রেশন ওরা চাইছে তা তো বাঁচার জন্য যে কোন মানুষ আশা করতে পারে। আর কেউ যদি শিক্ষিত হয়, তাহলে ভাল চাকরি আশা করতে পারে না? ওরাও তো ভারতের নাগরিক। সরিৎশেখর অবশ্য সরাসরি এর জবাব দিলেন না। শুধু বললেন, 'যে কোন সৃষ্টির সময় একদল কয়েকজনের প্রতি বিনয়ী এবং অনুগত যদি না হয়, তাহলে সৃষ্টি সুসম্পন্ন হতে পারে না। যখনই অধিকারে সবাই সমান শক্তি অর্জন করে, তখনই অসম্মান আসে আর আসল কর্ম লক্ষ্যচ্যুত হয়, বিশেষ করে আমাদের এই দেশের মানুষ যেহেতু নিরক্ষর তাই অধিকার তাদের মাথা ঘুরিয়ে দেয়।' দাদুর কথা পুরোপুরি মানতে পারল না অনিমেষ। সরিৎশেখর প্রসঙ্গটা

শেষ করলেন, এখন তোমার বয়স কম। অভিজ্ঞতা হোক, চোখ চেয়ে জীবনটাকে ছাখো, নিজেই বুঝতে পারবে।'

পিতাপুত্রের মধ্যে সন্তোষজনক কথাবার্তা হয়েছে শুনে সরিৎশেখর খুশি হলেন। ঠিক এইরকমটাই চাইছিলেন তিনি। পিতামাতার আশীর্বাদ ছাড়া কোন সন্তান বড় হতে পারে না, এই কথাটা তিনি বার বার করে বলতে লাগলেন। তোমার মায়ের কাছ থেকে যখন তোমায় আমি চেয়ে এনেছিলুম তখন তুমি এই একটুখানি ছিলে। সেই থেকে তোমাকে বুকে আগলে এত বড করেছি। এখন তুমি ভালভাবে পাস করেছ, কলকাতায় পড়তে যাচ্ছ, আমার দায়িত্ব শেষ। আমি তো কেয়ারটেকার হয়ে ছিলাম, কাজে ফাঁকি দিইনি কখনো।'

কোত্থেকে দুধ যোগাড় হল কে জানে, পিসীমা পায়েসের ব্যাপারে বিকেল থেকে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। জয়াদি নেই। এখন যে কি হয়েছে, জয়াদি প্রায়ই বাপেরবাড়ি যাচ্ছেন। জয়াদির বর একা-একাই থাকেন। সুনীলদা মারা যাবার পর সেই যে তার বাবা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন, আর কোন নতুন ভাড়াটে আসেনি। শোনা যাচ্ছে সরকার এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। হয়তো তাতে দাদুর ভালই হবে, কারণ দাদু প্রায়ই অভিযোগ করতেন যে সরকার তাঁকে কম ভাড়া দিচ্ছে। কিন্তু আবার নতুন ভাড়াটের সঙ্গে যোগাযোগ করা, ভাড়া ঠিক করা এবং তাতে যে সময় যাবে সেটা ম্যানেজ করা—দাদুর সাহায্য করার কোন লোক যে এখানে নেই। দাদুর দিকে তাকালেই আজকাল বোঝা যায় যে বয়স তাঁকে চারপাশ থেকে কামড়ে ধরেছে। ভীষণ কষ্ট হল অনিমেষের দাদুর জন্য।

বিকেল থেকেই জলপাইগুড়ি শহরে মিছিল বের হল। আগামীকাল সারা বাংলা জুড়ে যে হরতালের ডাক দেওয়া হয়েছে, তা সফল করার জন্য আবেদন জানিয়ে মিছিলগুলো শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল। টাউন ক্লাবের সামনে ছোটখাটো মিটিং হয়ে গেল। অনিমেষ বিকেলবেলায় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়েছিল। অর্ক এবং মণ্টু কলকাতায় পড়তে যাবে। ওরা যদি কাল ওর সঙ্গে যায় তো খুব ভাল হয়। দাদুর আর তর সইল না, এ সপ্তাহে নাকি আর ভাল দিন নেই। এখনও এ-সব ব্যাপার কেউ মানে? কিন্তু দাদু এমন বিশ্বাস নিয়ে বলেন যে, মুখের ওপর প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে করে না।

রায়কতপাড়ায় মণ্টুদের বাড়ি। সেদিকে যাবার জন্য বেরিয়ে ও দেখল টাউন ক্লাবের সামনে বেশ জোরে বক্তৃতা চলছে। কৌতূহলী হয়ে সে রাস্তার একপাশে দাঁড়াল। যিনি বক্তৃতা করছেন, তাঁকে এর আগে দেখেনি সে, মাথায় টাক, খুব হাত নেড়ে কথা বলছেন 'আপনারা জানেন এই দেশের স্বাধীনতা

এল কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ যেখানে ছিলাম সেখানেই থেকে গেলাম। স্বাধীনতা কি কংগ্রেসের ব্যক্তিগত সম্পত্তি যে তা নিয়ে তারা যা ইচ্ছে করবে? যখন সাধারণ মানুষের মুখে ভাত নেই, পরনে বস্ত্র নেই, যে দেশের মানুষের গড দৈনিক আয় মাত্র দু আনা সে দেশের মন্ত্রীরা কোটিপতি হচ্ছেন, তাদের ছেলেরা বিদেশে পড়তে যাচ্ছে! কি করে সম্ভব হচ্ছে? কারণ এই দেশ চালাচ্ছে ওই কংগ্রেসীরা নয়, তাদের প্রভু হয়ে মাত্র চার-পাঁচটা ফ্যামিলি। তাঁদের তুষ্ট করে তাঁদের টাকার পাহাড় আরো বাড়াতে কংগ্রেসীরা আমাদের শরীর থেকে রক্ত শুষে নিচ্ছে, বিনিময়ে তারাও ছিটেফোঁটা পাচ্ছে। কংগ্রেসীরা জানে ওই চার-পাঁচটি পরিবার যদি বিরূপ হয়, তাহলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়বে আর তাদের স্থান হবে ডাস্টবিনে। তাই ওদের ঘাঁটানোর সাহস কংগ্রেসীদের নেই। আমরা নানা সময় এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করে এসেছি। কিন্তু দেশের মানুষকে আরো ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এই সোনার দেশের মানুষ আজ রিক্ত নিঃস্ব, তাদের পেটে ভাত নেই। আমাদের আগামীকালের হরতাল সেই প্রতিবাদের প্রথম পদক্ষেপ। আমাদের স্পষ্ট দাবী, খাবার দাও, বস্ত্র দাও, বাঁচার মত বাঁচতে দাও। বলুন আপনারা আমার সঙ্গে, খাবার দাও, বস্ত্র দাও—!'

বক্তা পরবর্তী পাদপূরণের জন্য নীরব হলে দেখা গেল মুষ্টিমেয় কণ্ঠে মাত্র আওয়াজ উঠল। কিন্তু এই ত্রুটিটা যেন ওরা এড়িয়ে যেতে চাইল, এমন ভঙ্গিতে পরবর্তী বক্তা তাঁর বক্তৃতা শুরু করলেন। মোটামুটি একই কথা হাত নেড়ে প্রচণ্ড চিৎকারে তিনি যখন বলছিলেন, তখন পথচলতি জনতা বেশ মজা পাচ্ছিল। এই রকম সিরিয়স ব্যাপারকে হাস্যকর করে তোলার জন্য ভদ্রলোক নির্ঘাত দায়ী। অনিমেষও দাঁড়াল না।

রাস্তার পাশে গাছগুলোতে, দেওয়ালে হরতালের পোস্টার পড়েছে। ধর্‌ধরা আর করলা নদীর মুখে যে ব্রীজটা নিচু হয়ে কচুরিপানার ডগা ছুঁয়ে আছে, সেখানে দাঁড়াল সে। ধর্‌ধরার আসল নাম কি ধরলা? করলায় মিশছে যখন তখন এরকম নাম হওয়াই উচিত। কিন্তু ছেলেবেলা থেকে সে ধর্‌ধরা নামই শুনে আসছে। করলা যে রকম গভীর এবং গম্ভীর, ধর্‌ধরা তেমন না। এই ধর্‌ধরার থমকে চলা জল কোন রকমে গিয়ে পড়েছে করলায়, করলা সেই জলে স্রোতের টান দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তিস্তায়। তিস্তা তার বিরাট ঢেউ-এ সেই জলকে মিশিয়ে ছুটে যাচ্ছে ব্রহ্মপুত্র কিংবা সমুদ্রের দিকে। ধর্‌ধরার এলিয়ে থাকা জলের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ শরীরে কেমন কাঁটা দিয়ে উঠল। মানুষের জীবন ঠিক এইরকম, এই নদীর মতন। সে যখন স্বর্গছেঁড়ায় ছিল তখন সেই ইউক্যালিপটাস গাছ, চায়ের বাগান, মাঠ, ভবানী

মাস্টার আর নতুন শেখা বন্দেমাতরম ছাড়া কিছুই জানত না। তখন মাথার ওপর ওদের সমস্ত পরিবারটা ছিল, চারধারে যেন স্বপ্নের, আদরের দেওয়াল তাকে আড়াল করে রেখেছিল। তারপর এই ধরধরার করলায় মিশে যাওয়ার মত সে এল জলপাইগুড়িতে। এখানে নতুন স্যার, কংগ্রেস, বিরাম কর, রম্ভা আর সুনীলদা তার চারপাশের দেওয়ালটাকে যেন আস্তে আস্তে সরিয়ে নিল। ইনকিলাব জিন্দাবাদ এবং সুনীলদা—ছোটমা আর এই বাবা, অনিমেষ মাথা নাড়ল। আর আগামীকাল সে ট্রেনে উঠবে, কলকাতায় যেতে হবে তাকে। ঠিক নদীর সমুদ্রে পড়ার মতন। কলকাতায় মানুষ নাকি দয়ামায়াহীন, কেউ কারো বন্ধু নয়। সেখানে চোর বদমাস আর পণ্ডিতেরা পাশাপাশি বাস করে, কিন্তু কে যে কি তা চিনে নেওয়া সহজ নয়। কলকাতার মানুষ শিক্ষিত হয় এবং উচ্ছন্নে যাবার জন্য সাহায্য পায়। অদ্ভুত রহস্য নিয়ে এখন কলকাতা তার সামনে দুলছে, নদীর সামনে সমুদ্রের ঢেউ-এর মতন। কলকাতা-বিষয়ক অনেক বই পড়েছে সে, না গিয়েও অনেক রাস্তার নাম সে জানে। কলকাতা এখন তাকে টানছে, কিন্তু যে স্বর্গছেঁড়াকে সে ছেড়ে এল, যে জলপাইগুড়ি থেকে চলে যেতে হচ্ছে, তাকে আর এমনভাবে কখনো ফিরে পাবে না এই বোধ ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলছিল অনিমেষকে। এবার স্বর্গছেঁড়ায় গিয়ে সে একটা নগ্ন সত্যের মুখোমুখি হয়ে গেল। দীর্ঘকাল মাটির সঙ্গে বসবাস না করলে শিকড় আলগা হয়ে যায়। ওখানকার নতুন ছেলেদের কাছে সে যেন বাইরের লোক বলে মনে হচ্ছিল। এই জলপাইগুড়িতেও তার একদিন এমন অনুভব হবে—অনিমেষ স্পষ্ট বুঝতে পারছিল।

ধরধরা করলার সঙ্গমের পাশ ঘেঁষে তপুপিসীদের স্কুল। অনেকদিন তপুপিসীকে দেখেনি সে, তপুপিসি এখন কেমন আছে? তপুপিসীকে নিজের পাসের খবর দিয়ে আসার ইচ্ছেটা কোনরকমে সামাল দিল সে। তাঁর মুখোমুখি হতে হঠাৎ খুব সঙ্কোচ হচ্ছিল ওর, অথচ সে তো কোন অন্যায় করেনি। ছোটকাকার ব্যবহারের জন্য সে তো দায়ী নয়। তবু—। অনিমেষ হাসপাতাল পাড়ার রাস্তায় পা বাড়াল। ডানদিকে ফার্মেসি ট্রেনিং সেন্টারের সামনে বিরাট ঝিল—আর বাঁদিকে হাসপাতাল। কার যেন কেউ মারা গিয়েছে, হাস-পাতালের উঠোনে মৃতদেহ রেখে একা একা সে চিৎকার করে কাঁদছে। অনিমেষ মুখ ফিরিয়ে নিল। কান্না বড় সংক্রামক—নিজেকে স্থির রাখতে দেয় না।

দিনবাজারের পোস্ট অফিসের সামনে এসে রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াল সে। বিরাট একটা মিছিল আসছে কংগ্রেসের। সামনে চরকার ছবিওয়ালা পতাকা হাতে একটি বালক, পেছনে জলপাইগুড়ির সমস্ত বয়স্ক কংগ্রেসীরা। হরতালের বিরুদ্ধে

স্লোগান দিচ্ছেন তাঁরা। অনেকের হাতেই পোস্টার। অনিমেষ পড়ল, 'নেতাজীকে দালাল বলে কারা—হরতাল ডেকেছে যারা', 'গড়ার আগেই ভাঙতে চায় কারা—হরতালের শরিক যারা', 'দেশকে বাঁচান—কম্যুনিস্ট দালালদের থেকে দূরে থাকুন', 'রক্ত দিয়ে পাওয়া স্বাধীনতা হঠকারীদের খেয়ালমত হারাব না। হারাব না।'

মিছিলের দিকে তাকিয়ে অনিমেষের পা শক্ত হয়ে গেল। হরবিলাসবাবু! সম্পূর্ণ অশক্ত চেহারা নিয়ে সেই বৃদ্ধ অন্য একজনকে অবলম্বন করে মাথা নিচু করে কোনরকমে হেঁটে যাচ্ছেন। স্পষ্ট, যেন চোখ কান বন্ধ করলেও নিজের রক্তে সেই কথাগুলোকে অনিমেষ শুনতে পায়, 'আমাদের সংগ্রাম শান্তির জন্য, ভালবাসার জন্য। আপনারা সবাই প্রস্তুত হোন। এখন সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে, আমাদের জাতীয় পতাকা স্বাধীন ভারতের আকাশে মাথা উঁচু করে উড়বে। তাকে তুলে ধরছে আগামীকালের ভারতবর্ষের অন্যতম নাগরিক শ্রীমান অনিমেষ।' মুহূর্তেই অনিমেষ সেই সব ফুলের পাপড়ি যা পতাকা থেকে খুলে পড়েছিল তার স্পর্শ সমস্ত শরীরে অনুভব করল। বুকের ভেতরে কে যেন সারাক্ষণ চুপচাপ বসে বসে ঘুমোয়, আর হঠাৎ হঠাৎ ঘুম ভেঙে এমন এক বায়না করতে থাকে যে তাকে সামলানো দায় হয়ে ওঠে। অনিমেষ দ্রুত পা ফেলে মিছিলের ভেতর ঢুকে পড়ল, তারপর হরবিলাসবাবুর পাশে গিয়ে তাঁর অন্য হাত আঁকড়ে ধরল। বৃদ্ধের চোখে প্রায় সাদা হয়ে আসা কাঁচের চশমা, সময় তাঁর শরীর থেকে অনেক কিছু খুবলে খুবলে নিয়ে গিয়েছে, সোজা হয়ে হাঁটতে তিনি পারেন না। হঠাৎ একজন কেউ তাঁর হাত ধরেছে বুঝতে পেরে তিনি শরীর বেঁকিয়ে মুখ কাত করে তাকে দেখতে চেষ্টা করলেন। চলতে চলতে অনিমেষ এবার অস্বস্তিতে পড়ল। হরবিলাসবাবুকে সে চেনে কিন্তু তিনি তো তাকে মনে নাও রাখতে পারেন। মিছিলটা পোস্ট অফিসের সামনে দিয়ে রায়কতপাড়ার দিকে যাচ্ছে। হরবিলাসবাবুর সঙ্গী একজন তরুণ, অনিমেষকে হাত ধরতে দেখে হেসে বলল, 'দাদু ছাড়ছিল না, তাই নিয়ে এলাম।'

চলতে চলতে হরবিলাসবাবু কথা বললেন, ফ্যাসফেসে গলায়, শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ হয় না, 'তুমি কে বাবা? কি নাম?'

শুকনো কাঠির মত হাত ধরে অনিমেষ বলল, 'আমার নাম অনিমেষ। আপনার এইরকম চেহারা হল কি করে!'

'রোগ বাবা, কালব্যাধি। এই মরি কি সেই মরি, তবু মরি না। তা শুনলাম কংগ্রেস একটা ভাল কাজ করছে—দেশ গড়ার কাজে সবাইকে ডাকছে, তাই চলে এলাম। হরতাল কার বিরুদ্ধে করছিস? ভাই হয়ে ভাইকে ছুরি মারবি? অবশ্যি

কংগ্রেসও আমাকে আর ডাকে না, ঘাটের মড়াকে কে পছন্দ করে।'

কথা বলতে বলতে হাঁপ ধরে যাচ্ছিল এবং বোধ হয় নিজের শরীরটাকে ঠিক বুঝতে পারেননি, হরবিলাসবাবু সহসা দাঁড়িয়ে পড়লেন। অনিমেষ দেখল তাঁর বুক জোরে ওঠানামা করছে, চোখ দুটো বড় হয়ে উঠেছে। ও খুব ঘাবড়ে গিয়ে হরবিলাসবাবুর সঙ্গীকে বলল, 'উনি বোধ হয় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, চলুন ওই বারান্দায় ওঁকে একটু বসিয়ে দিই।'

মিছিলের লোকজন ওদের মধ্যে রেখে এগিয়ে যাচ্ছিল। কেউ কেউ কৌতূহলী চোখে, কেউ শুধুমাত্র জিভ দিয়ে একটা সমব্যথার শব্দ বাজিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। একজন বলল, 'এই শরীর নিয়ে ঝামেলা বাড়াবার জন্য আসার কি দরকার ছিল!' হরাবলাসবাবুর সঙ্গীও খুব বিরক্ত হয়ে পড়ল, 'বললাম পারবেন না—হল তো। কবে কি করেছেন এখনও সেই সব জাবর কাটা!'

ওরা দুজনে সন্তর্পণে ওঁকে রাস্তার পাশে এক বারান্দায় নিয়ে গিয়ে বসাল। মিছিলের আর কোন মানুষ ওদের সঙ্গে এল না। জেলখানার পাশ দিয়ে মিছিল এবার এগোচ্ছে উমাগতি বিদ্যামন্দিরের দিকে। অনিমেষ দেখল মিছিলের শেষাশেষি নিশীথবাবু স্লোগান দিতে দিতে হেঁটে যাচ্ছেন। ওঁর মুখ সামনের দিকে, অনিমেষদের তিনি লক্ষ্য করলেন না। হঠাৎ অনিমেষের মনে হল, নিশীথবাবুকে খুব বয়স্ক মনে হচ্ছে। খদ্দরের পাঞ্জাবি এবং ধুতি পরা নিশীথবাবুর শরীরটা কেমন যেন বুড়িয়ে গিয়েছে। হরবিলাসবাবুর পক্ষে শুয়ে পড়লেই ভাল হত, তবু খানিকক্ষণ বসে হাঁপের টানটা কমল। একহাতে চশমাটা খুলে অন্য হাতের আঙুলে চোখের কোল মুছলেন তিনি। অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'এখন কেমন বোধ করছেন আপনি?'

মাথা নাড়লেন হরবিলাসবাবু, 'ভাল।'

কিছু বলা উচিত তাই অনিমেষ বলল, 'এই শরীর নিয়ে আপনার আসা ঠিক হয়নি।'

কেমন বিহ্বল মুখ তুলে হরবিলাসবাবু তাকে দেখলেন, 'এখন আর ঠিক-বেঠিক জ্ঞান থাকে না। এই খাই, পরমুহূর্তে মনে হয় খাইনি। এই আমি ইংরেজেদের সঙ্গে লড়েছি, মাঝে মাঝে বিশ্বাসই হয় না। শরীর পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মরে যাওয়া উচিত।'

অনিমেষ বলল, 'আপনি আর কথা বলবেন না। বরং একটা রিকশা নিয়ে বাড়ি ফিরে যান।'

হরবিলাসবাবুর সঙ্গী বোধ হয় এই রকম কিছু ভাবছিল, সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল,

'আপনারা বসুন, আমি একটা রিকশা ডেকে আনি।' বোধ হয় হাত নেড়ে বারণ করতে যাচ্ছিলেন হরবিলাসবাবু, কিন্তু সে তা না শুনে পোস্ট অফিসের দিকে এগিয়ে গেল।

এবার যেন হরবিলাসবাবুর খেয়াল হল, 'তোমাকে তো আগে দেখিনি বাবা, কি নাম ?' অনিমেষ খুব অবাক হয়ে গেল। এই খানিক আগে সে ওঁকে নিজের নাম বলেছে, অথচ এই মুহূর্তে তিনি সেটা ভুলে গিয়েছেন। ও আবার নাম বলল। 'তুমি আমাকে চেনো ?' খেয়াল করতে না পেরে হরবিলাসবাবু বললেন।

'হ্যাঁ, আপনি একসময় এই জেলার অন্যতম কংগ্রেসকর্মী ছিলেন, কতবার জেল খেটেছেন। সাতচল্লিশ সালের পনেরই আগস্টের কথা আপনার মনে আছে ?' অনিমেষের গায়ে হঠাৎ কাঁটা ফুটে উঠল। ও উদ্‌গ্রীব হয়ে বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকাল।

হরবিলাসবাবু যেন তারিখটা নিয়ে কয়েকবার ভাবলেন, ঘাড় নেড়ে বললেন, 'ও দিনটায় তো আমরা স্বাধীন হলাম।'

'সেদিন আপনি কোথায় গিয়েছিলেন ? খুব ভোরবেলায় ?'

আবার খানিক চিন্তা করে ঘাড় নাড়লেন হরবিলাসবাবু, 'মনে পড়ছে না ভাই। আজকাল সব কেমন গুলিয়ে যায়। অথচ এই তো সেদিনের কথা। আচ্ছা, সেবার সোদপুরে—।'

ওঁকে থামিয়ে দিল অনিমেষ, 'না। আপনি স্বর্গছেঁড়ায় গিয়েছিলেন। সেখানে আপনার উপস্থিতিতে প্রথম জাতীয় পতাকা তোলা হয়েছিল।'

আচমকা যেন মনে পড়ে গেল বৃদ্ধের, 'হুঁ, হুঁ ! সেই প্রথম পতাকা উঠল মাথা উঁচু করে। ওরা ফুল বেঁধে দিয়েছিল। কত ফুল পড়ল আকাশ থেকে, শঙ্খ বাজাল মেয়েরা। মনে পড়ছে, মনে পড়ছে। তুমি সেখানে ছিলে ?'

অনিমেষ খুব আস্তে বলল, 'আপনি আমাকে পতাকা তুলতে ডেকেছিলেন, আমি প্রথম সেই পতাকা তুলেছিলাম।'

ওর দিকে উদ্‌গ্রীব চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হরবিলাসবাবু হঠাৎ দুটো শুকনো হাত বাড়িয়ে ওর মুখ চেপে ধরলেন অঞ্জলির মত। তারপর কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন, 'মনে রাখা বড় শক্ত। আমি মনে রাখতে পারি না, আমি মরে গেছি, তুমি মনে রেখেছ—তোমার দায়িত্ব অনেক। দাদু, তোকে বড় হিংসে হচ্ছে রে !'

ঠিক এই সময়ে রিকশা নিয়ে ছেলেটি ফিরে এল, 'আসুন।'

দুজনে ধরাধরি করে হরবিলাসবাবুকে রিকশায় তুলে দিল। অনিমেষ লক্ষ্য

করছিল যে তিনি ওর মুখ থেকে চোখ সরাচ্ছিলেন না। অনিমেষের মনে হল, তিনি ওর বুকের ভেতরটা দেখতে পাচ্ছেন। ও ঝুঁকে পড়ে তাঁকে প্রণাম করল। হরবিলাসবাবু জড়সড় হয়ে রিকশায় বসেছিলেন, বোধ হয় ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও শরীর নাড়তে পারলেন না। সঙ্গী ছেলেটি নিচে দাঁড়িয়েছিল, বলল, 'আপনি একা যেতে পারবেন ?'

অনিমেষ বলল, 'ওঁকে একা ছাড়া কি ঠিক হবে ?'

ছেলেটি বেজার মুখে বলল, 'আমার কাছে পয়সা নেই, রিকশাভাড়া আপনার কাছে আছে ?' ভীষণ বিরক্ত হয়ে পড়লেন হরবিলাসবাবু, আড়চোখে অনিমেষ সেটা দেখতে পেল। ও চট করে পকেটে হাত দিয়ে দুটো আধুলি খুঁজে পেল। স্বর্গছেঁড়া থেকে ফিরে ওর কাছে কিছু পয়সা এসেছে। অনিমেষ চট করে সেটা ছেলেটির হাতে গুঁজে দিতে সে দ্বিরুক্তি না করে নিয়ে নিল।

রিকশাটা চলে গেলে অনিমেষ কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। কোথাও যেন একটা খুশীর ঝরনা মুখ বুঁজে বসেছিল, হঠাৎ সামান্য ফাঁক পেয়ে সেটা তির তির করে ওর সমস্ত বুক ভাসিয়ে দিচ্ছে। হরবিলাসবাবুর জন্য সামান্য কিছু করতে পারায় ওর নিজেকে খুব মূল্যবান বলে মনে হতে লাগল।

মিছিলটা তখন হারিয়ে গিয়েছে। অন্যমনস্ক হয়ে সে মন্টুদের বাড়ির দিকে হাঁটছিল। মন্টুদের বাড়ি উমাগতি বিদ্যামন্দিরের পাশে। মন্টুর মাকে অনিমেষের খুব ভাল লাগে। মন্টুর বাবা অসুস্থ হয়ে আছেন অনেক দিন, তাই সংসারের হাল ধরে আছেন মাসীমা। এখানকার একটা বাচ্চাদের স্কুলে তিনি পড়ান, প্রচুর খাটতে পারেন এবং যখনই দেখা হয় এমন মিষ্টি করে হাসেন ভাল না লেগে পারা যায় না। মন্টুদের বাড়ির সামনে এসে অনিমেষ বুঝতে পারল মিছিল ভেঙে গেছে স্কুলের মাঠে পৌঁছে। কারণ খদ্দরপরা মানুষগুলো গল্প করতে করতে ফিরে যাচ্ছেন। রিকশাওয়ালারা যেন মেলা বসেছে এমন ভঙ্গীতে হর্ন বাজাচ্ছে। টিনের দরজা ঠেলে উঠোনে ঢুকে পড়ল অনিমেষ। বিরাট কাঁঠাল গাছের সামনে মন্টুদের টিনের চালওয়ালা বাড়ি। অনিমেষ দেখল মাসীমা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। ওকে দেখে মিষ্টি মুখ হাসিতে ভরে গেল, 'পাস করে তোর পিঠে ডানা গজিয়েছে শুনলাম, আমাকে প্রণাম করার সময় পাচ্ছিস না।'

কথার ধরন এমন যে না হেসে পারা যায় না। অনিমেষ প্রায় দৌড়ে গিয়ে ওঁকে প্রণাম করল। মাসীমা চিবুকে হাত দিয়ে চুমু খেলেন, 'তারপর, এখন তো তোরা সব কলকাতার বাবু হতে চললি। আমাদের কথা মনে থাকবে তো ?'

'কেন মনে থাকবে না, বাঃ।' অনিমেষ প্রতিবাদ করল।

'বোস গিয়ে ঘরে, আমি সন্ধ্যেটা দিয়ে আসি।' মাসীমা বললেন।

মণ্টু কোথায় মাসীমা?' অনিমেষ চারধারে নজর বোলাল। তার গলা শুনলে মণ্টু নিশ্চয়ই বাইরে বেরিয়ে আসত।

মাসীমা বললেন, 'ও আজ সকালে শিলিগুড়ি গেল আমার ছোটদার কাছে। তোর সঙ্গে রেজাল্ট বের হবার পর আর দেখা হয়নি?'

মণ্টু বাড়িতে নেই শুনে অনিমেষ হতাশ হল, 'না। ও কবে যাবে কলকাতায়?'

'ওই তো হয়েছে মুশকিল। আমার ছোটদার শালার বাড়ি বেহালায়। বউদির ইচ্ছে ও সেখানে থেকে পড়াশুনা করুক। তা এত আগে থেকে গিয়ে কি হবে! মণ্টু তাই বউদিকে মার্কসীট দিতে গিয়েছে, ভরতি-টরতি হয়ে গেলে ও যাবে। তা তুই কবে যাচ্ছিস রে?' মাসীমা যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়ালেন।

'আগামী কাল।' অনিমেষ বলল।

'ওমা, তাই নাকি! কোথায় উঠবি? কার সঙ্গে যাবি?' মাসীমা আবার এগিয়ে এলেন। যেন এত তাড়াতাড়ি চলে যাওয়াটা ওঁর ধারণায় ছিল না।

'কার সঙ্গে আবার, একাই যাব। আমি কি ছোট আছি নাকি! ওখানে বাবার এক বন্ধু আছেন, তাঁর বাড়িতে উঠে হোস্টেল ঠিক হলে চলে যাব।' খুব গম্ভীর গলায় অনিমেষ জবাব দিল।

'সে কি! তোকে বাড়ি থেকে একা ছাড়বে? আর তা ছাড়া কাল হরতাল, কলকাতায় যদি কোন বিপদ-আপদ হয়? আমার কিন্তু ভাল লাগছে না।' মাসীমাকে সত্যি সত্যি খুব চিন্তিত দেখাল।

অনিমেষ জোর করে হাসল, 'কিছু হবে না।' কিন্তু মনে মনে ও হঠাৎ দুর্বল হয়ে পড়ল। কলকাতায় যাবার সময় যত এগিয়ে আসছে তত যেন একটা অনিশ্চিত এবং অজানা জগতে পা বাড়াবার উত্তেজনা বুকের মধ্যে ড্রাম বাজাচ্ছে। ও লক্ষ্য করল এখন ওর হাতের চেটো ঘামছে। কিন্তু খুব গম্ভীর হয়ে সে, এই দুর্বলতাকে ঢেকে রাখতে চাইল।

মাসীমা আর সন্ধ্যে দিতে গেলেন না। যদিও এখনও শেষ বিকেলের আলো কোনরকমে নেতিয়ে পড়ে আছে আকাশটায়, তবু সন্ধ্যে বলা যায় না। তবে যে কোন মুহূর্তেই রাত নেমে আসতে পারে। আজ অবশ্য ছটার মধ্যে বাড়ি ফেরার তাড়া নেই। কাল যখন কলকাতায় যাবার জন্য জলপাইগুড়ি ছাড়তেই হবে তখন আজ নিশ্চয়ই দেরি করে গেলে দাদু কিছু মনে করবেন না। এর মধ্যেই ওর নিজেকে বেশ বড়-বড় বলে মনে হচ্ছে। এখন ঠোঁটের ওপর নরম সিল্কি চুল বেরিয়ে

গোঁফের আকৃতি নিয়ে নিয়েছে। সে তুলনায় গালে দাড়ি কম, চিবুকে অবশ্য বেশ কিছু বড় হয়েছে।

এখন পর্যন্ত নিয়মিত দাড়ি কামানো অভ্যাস করেনি। একবার পেন্সিলে ব্লেড ঢুকিয়ে টেনেছিল, কেমন অস্বস্তি হয়। কলেজে না ভরতি হলে দাড়ি কামাবে না ঠিক করেছিল অনিমেষ। একটা প্লেটে কিছু পাটিসাপটা নিয়ে মাসীমা বেরিয়ে এলেন, 'বন্ধু নেই বলে পালাবার মতলব করছিস বুঝতে পাচ্ছি, এটা খেয়ে যা।'

'এখন পাটিসাপটা ?' অনিমেষের খুব ভাল লাগল।

'সারাদিন বসেছিলাম, করে ফেললাম। বড ছেলেটা খুব ভালবাসে।' মাসীমা ওকে সামনে বসিয়ে ওগুলো খাওয়ালেন।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। টিনের দরজা খুলে বাইরে বেরুতে বেরুতে ও মাসীমার শাঁখ বাজানোর আওয়াজ পেল। তিনবারের আওয়াজটা শেষ হতে ও হাঁটা শুরু করল। উমাগতি বিদ্যামন্দিরের মাঠে এখনও কিছু জটলা আছে। মিছিলের কিছু লোক এখনও গল্প করছে ওখানে। দূর থেকে আর একটা ছোট দল ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে আসছে। আগামীকালের হরতালের স্বপক্ষে ওদের স্লোগান কংগ্রেসীদের দেখে জোরদার হল। অনিমেষ খুব আশঙ্কা করছিল এবার হয়তো মুখোমুখি একটা সংঘর্ষ বেধে যাবে। কিন্তু কংগ্রেসীরা চুপচাপ ওদের চলে যাওয়া দেখল। ওরাও খুব দ্রুত এবং এদের অবজ্ঞা করেই হেঁটে গেল। অনিমেষ ফেরার জন্য পা বাড়াতে যাচ্ছে এমন সময় পেছন থেকে ওর নাম ধরে কেউ ডেকে উঠল। পেছনের মাঠের অন্ধকার থেকে একজন মানুষকে এগিয়ে আসতে দেখল সে। রাস্তার আলো মুখে পড়তেই ও নিশীথবাবুকে চিনতে পারল। ওঁকে দেখে অনিমেষ খুব অস্বস্তিতে পড়ল। ইদানীং নিশীথবাবুর সঙ্গে ওর তেমন যোগাযোগ নেই। ওঁর হোস্টেলের ঘরে আগের মত নিয়মিত যাওয়া ও বন্ধ করেছে সেই বন্যার পর থেকেই। স্কুল যতদিন ছিল ততদিন মুখোমুখি হলে কথা বলেছে কিন্তু আগের মত আগ্রহ দেখায়নি। ফাইনাল ইয়ার, পড়াশুনোর চাপ খুব এরকম ভান দেখিয়ে ও সরে থেকেছে। কিন্তু নিশীথবাবু ওর মনের কথা বুঝতে পেরেছেন —এই ধরনের একটা কথা একদিন বলেও ছিলেন।

'কি ব্যাপার, ভাল রেজাল্ট করেছ অথচ দেখা করতে আসনি যে ?' নিশীথবাবু ওর পাশে এসে দাঁড়ালেন না।

অনিমেষ পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'আমি এখানে ছিলাম না, স্বর্গছেঁড়ায় গিয়েছিলাম।'

'তা কি ঠিক হল, এখানে পড়বে না কলকাতায় যাবে ?'

নিশীথবাবুর মুখের একটা পাশ দেখতে পাচ্ছিল সে, খুব স্বাভাবিক গলায় কথা বলছিলেন তিনি। অনিমেষ বলল, 'কলকাতায় যাব, কাল যাওয়া ঠিক হয়েছে।'

'খুব ভাল। ওখানে না গেলে এই সময়কে, এই দেশকে জানা যায় না। কি নিচ্ছ, সায়েন্স না আর্টস?'

নিশীথবাবুর প্রশ্নটা শুনে অনিমেষের আচমকা বাবার মুখ মনে পড়ে গেল। ইস, একদম ভুলে গিয়েছিল সে। বাবার প্রস্তাব সে যে মেনে নিতে পারছে না এবং দাদুকে ওর স্বপক্ষে রাজী করাতে হবে এ কথাটা একদম খেয়াল ছিল না। ভাগ্যিস নিশীথবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, না হলে পরে মুশকিলে পড়তে হতো। দাদুর সঙ্গে যাবার আগে কথা বলতে হবে। নিশীথবাবুকে ও জবাব দিল, 'আর্টস নেব।'

মাথা নাড়লেন তিনি, 'আমি এরকমটাই ভেবেছিলাম। তা ওখানে কোথায় থাকবে? তোমার কাকা বোধ হয় এখন কলকাতায় আছেন?'

অনিমেষ বলল, 'না, আমি হোস্টেলে থাকব। প্রেসিডেন্সি কলেজে তো হোস্টেল আছে।'

'হ্যাঁ, ইডেন হোস্টেল।' তারপর দুজনে অনেকক্ষণ চুপচাপ হেঁটে এল। জেলখানা পেরিয়ে পোস্ট অফিসের সামনে এসে হঠাৎ নিশীথবাবু যেন নিজের মনেই বলে উঠলেন, 'কাল হরতাল।'

অনিমেষ বলল, 'হ্যাঁ, সন্ধ্যে ছটা পর্যন্ত।'

'নিশীথবাবু বললেন, 'সেটা বড কথা নয়। কথা হল হরতাল আদৌ হবে কি না? কলকাতার কথা জানি না, ওখানকার মানুষ হুজুগে, এখানে ইলেকশনের যা রেজাল্ট তাতে তো এখানে ওদের ডাকে কেউ সাড়া দেবে না। তুমি কি বল?'

অনিমেষ সহসা জবাব দিল না। হরতাল হবে না বললে নিশীথবাবু নিশ্চয়ই খুশী হবেন। কিন্তু ও কি সত্যি জানে যে হরতাল হবে না? নিশীথবাবু আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কথা বলছ না যে?'

'মানে ঠিক বলা যায় না। কম্যুনিস্টরা যে কথা বলছে তা তো একদম মিথ্যে নয়। সব মানুষ তো সমান খেতে পায় না, জামাকাপড় পায় না। আর জিনিস-পত্রের দাম যা বেড়ে গেছে সবাই তো কিনতেও পারে না। সরকার থেকে তেমন কোন ব্যবস্থা—'

অনিমেষকে থামিয়ে দিলেন নিশীথবাবু, 'বেশ, বেশ। আমাদের এই রাষ্ট্রের বয়স কত? এখনও আমরা বালক। এই কয় বছরে রাতারাতি ইংরেজদের ছিবড়ে করে যাওয়া দেশটাকে বড়লোক করে দেওয়া যায়? এটা ম্যাজিক নাকি? তার জন্য সময় লাগবে না? নিঃস্ব অবস্থা থেকে তিল তিল করে গড়তে হবে না?

কম্যুনিস্টদের পক্ষে নেই নেই করে মানুষকে খেপিয়ে তোলা সহজ, তাতে কোন দায়িত্ব নেই। সাহায্য নয়—শত্রুতাই ওদের একমাত্র বেঁচে থাকার অবলম্বন।'

অনিমেষ এ ধরনের কথা এর আগেও শুনেছে, তাই বলল, 'কিন্তু গরীবদের কিছু লাভ না হলেও বড়লোকরা আরো বড়লোক হচ্ছে। কংগ্রেসী নেতাদের নাকি প্রচুর টাকা হচ্ছে।' ও বিরাম করের নামটা বলতে গিয়েও চেপে গেল।

'হতে পারে। তবে ব্যতিক্রম কি নিয়ম? এই আমি, কলকাতা ছেড়ে চলে এলাম এখানে, কংগ্রেসকে ভালবেসে ওর জন্য কাজ করছি, কে আমাকে টাকা দিয়েছে? কতটা বড়লোক হয়েছি আমি? তুমি কি আমার কোন পরিবর্তন দেখেছ অনিমেষ? আমি কি বুর্জোয়া যে কংগ্রেসকে বুর্জোয়াদের পার্টি বলে ওরা? দেশের জন্য কাজ করছি এটাই আমার আনন্দ—ওরা যদি সন্দেহ করে করুক। নিন্দে করে বা সন্দেহ করে কেউ সিদ্ধিলাভ করতে পারে না।'

'কিন্তু কম্যুনিস্টরা যে সমান অধিকারের কথা বলে—',অনিমেষ হঠাৎ থেমে গেল। ও বুঝতে পারছিল শুধু শোনা কথার ওপর একটা দলের যুক্তিগুলো বলা যায় না।

নিশীথবাবু হঠাৎ গলা খুলে হাসলেন, তারপর কোনরকমে সেটাকে সামলে বললেন, 'অনিমেষ, তোমাকে একটা কথা বলি। আমাদের এই তেত্রিশ কোটি দেবতার দেশে কখনো কোন ইজম চলতে পারে না। কম্যুনিস্টরা এখন যে সব বড় বড় কথা বলছে সেগুলো বলার জন্যই। যদি ওরা ক্ষমতা পায় তা হলে আমরা যা করছি ঠিক তাই করবে। তখন যদি কেউ হরতাল ডাকে জোর করে তা ভাঙতে চাইবে। ক্ষমতায় বসলে সব মাথায় উঠে যাবে—একথা আমি তোমায় লিখে দিতে পারি—তখন আর কথা বেরুবে না।'

অনিমেষ চট করে জবাব দিতে পারল না। কি হবে না হবে তা সে বলবে কি করে। নিশীথবাবুর নিশ্চয়ই তার থেকে অভিজ্ঞতা বেশী। অবশ্য এটা ঠিক যে ও নিশীথবাবুকে চিরকাল এরকমই দেখে এসেছে, বড়লোক হলে অবশ্যই ওরা টের পেত। কিন্তু শুধু বিরামবাবুর বাড়িতে যাওয়া-আসা ছাড়া সেরকম কিছু চোখে পড়েনি ওর।

'তুমি বিরামদার ঠিকানা জান?' হঠাৎ নিশীথবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

'না।' অনিমেষ বলল।

'তোমার যদি দরকার হয় আমার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে যেও। বিরামদার মত ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোককে কলকাতায় থাকলে দরকার হবেই। ওখানে তুমি কাজ করার অনেক সুবিধে পাবে। আমাদের ইউনিয়ন তো সব কলেজেই আছে। আর

যদি সিনসিয়ারলি কাজ করা যায় তবে দেশের নেতাদের চোখে সহজেই পড়া যায়, কলকাতায় থাকার এটাই হল সুবিধে। তুমি তো ইডেনে থাকবে বলছিলে, সেখানে অবশ্য বামপন্থী দলগুলো—ছাত্র ফেডারেশনের জোর বেশী।'

অনিমেষ অনেকক্ষণ কোন কথা বলছিল না। ওরা দুজন সমস্ত রাস্তাটা চুপচাপ হেঁটে এল। যত সময় যাচ্ছে অনিমেষের বোধ হচ্ছিল নিশীথবাবু যেন গুটিয়ে যাচ্ছেন। নৈঃশব্দ্য যে কখনো কখনো গোপনে গোপনে কথা তৈরি করে নেয় এই প্রথম বুঝতে পারল অনিমেষ। এই যে অনিমেষ খুব জোরের সঙ্গে কথা বলেনি, তিনি একাই অনেকক্ষণ বলে গেলেন—এটা চুপচাপ হাঁটতে গিয়ে যেন নিশীথবাবু আবিষ্কার করে ফেলেছেন। তাই হাকিমপাড়ায় পৌঁছে দুজনের আলাদা পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে নিশীথবাবু একটু থমকে দাঁড়ালেন। অনিমেষ যাবার সময় তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি ভীষণ ধরা গলায় বললেন, 'অনিমেষ, অবিশ্বাস করে ঠকার চেয়ে বিশ্বাস করে হারানো অনেক ভাল।'

।। তেরো ।।

আটটার মধ্যেই খাওয়াদাওয়া চুকে গেল। সরিৎশেখরই তাড়া দিচ্ছিলেন। আজ বিকেলে ইলেকট্রিক বিল এসেছে, দেখে মাথায় হাত। প্রথম ঝাঁঝ মিটিয়েছিলেন তিনি হেমলতার ওপরে। এত আলো জ্বাললে তিনি আর কি করে পেরে উঠবেন। হেমলতা তখন রান্নাঘরে বসে পায়েসের শেষ ব্যবস্থা করছিলেন, অনেক কষ্টে বাবার সঙ্গে তর্ক করার ঝোঁকটাকে সামলালেন। তর্ক মানেই ঝগড়া, অশান্তি। অন্যদিন হলে ছেড়ে দিতেন না কিন্তু কাল অনি কলকাতায় চলে যাবে, আজ তাঁর মন ভীষণ অশান্ত, কিছুতেই কিছু ভাল লাগছে না। সেই ছোট্টবেলা—ছোট্টবেলা জন্মালো তো ও তাঁরই হাতে! তারপর চোখের সামনে তিল-তিল করে ওকে বড় হতে দেখলেন, এই দেখা যে কতটা কষ্টের এখন এই মুহূর্তে তিনি উপলব্ধি করছেন। নিজের সন্তান নেই, সন্তান-স্নেহ কথাটা লোকমুখে শোনা, কিন্তু হঠাৎ আজ সকাল থেকে তাঁর মনে হচ্ছে তাঁর শরীরের একটা অংশ কাল বিযুক্ত হতে যাচ্ছে। বাবার চিৎকার শুনেও তিনি এখন কিছু বলতে পারলেন না, তার বদলে দু চোখ উপচে জল এসে গেল। অথচ অনি তাঁর ছেলে নয়, সেই কোকিল এসে যেন ডিম পেড়ে রেখে গেছে—তবু কেন যে ছাই এমন হয়! মৃতা ভ্রাতৃবধূকে মনে মনে ঠেসতে লাগলেন তিনি, 'বেঁচে থাকলে আজ দেখতাম তুই কি করতিস? মরে গিয়ে সব দায় চাপিয়ে গেলি!' বাঁ হাতে চোখ মুছলেন তিনি। আজকাল যে কি হয় তার, মাঝে মাঝে বড়-মা, ছোট-মা আর মাধুরীর মুখ এক হয়ে তালগোল পাকিয়ে যায়। মৃতা এই তিন

মহিলাকে বড় কাছাকাছি মনে হয়।

ভাড়াটে বসাবার পর থেকেই বাড়ির ট্যাক্স বেড়েছিল, কিছুদিন আগে আবার বেড়েছে। সরিৎশেখর তার বিরুদ্ধে আপিল করেছিলেন, বেশ কয়েকবার তিনি মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে ঘোরাঘুরি করেছেন কিন্তু সেই আবেদন শোনার সময় বাবুদের এখনও হয়নি। ফলে বাড়ির ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করেছেন তিনি। এদিকে জলের সাপ্লাই শহরে কমে গেছে, যেটুকু আসে তাতে চাপ নেই, ফলে অত সাধের ওয়াটার-ট্যাঙ্কটা শুকনো থাকে। পুচ-পুচ করে কয়েক দফায় যে জল আসে তাতে হেমলতার কিছুই হয় না, ভাড়াটেরাও বিরক্ত হয়েছে, কলের মিস্ত্রী এসে বলে গেল, চুপচাপ বড় পাইপ লাগিয়ে নিন—জল পাবেন। কিন্তু সে পাইপ কেনার পয়সা কোথায়? নিজেকে অভিমন্যুর মত মনে হয় আজকাল, চারধারে অভাবের তীরগুলে উঁচিয়ে বসে আছে, নড়াচড়া করলেই খোঁচা লাগছে। আজ শুতে যাবার সময় তাঁর বুকে সামান্য ব্যথা বোধ হচ্ছে। প্রেসারট্রেসার কখনো চেক করাননি। শরীর মাঝে মাঝেই অকেজো হয়ে যাচ্ছে, তখন হোমিওপ্যাথি গুলি তাঁকে সাহায্য করে।

একটু আগে হেমলতা মশারি টাঙিয়ে দিয়ে গেছে, মাথার কাছে খাটের নিচে খবরের কাগজের ওপর বালির বাক্সে কফ ফেলার জায়গা ঠিক রাখতে ভোলেননি। একটা দিন এই মেয়ে না থাকলে তাঁর শরীরটা বিকল হয়ে যাবে একথা তাঁর চেয়ে আর কেউ ভাল করে জানে না। তবু কোন সমস্যায় পড়লেই মেয়ের ওপর হম্বিতম্বি করেন, কারণ এটাই সব চেয়ে নিশ্চিন্ত জায়গা। এখন রাগ করতে পারেন এমন মানুষ আর তাঁর ধারেকাছে নেই। বুকের ব্যথার কোন ওষুধ তাঁর কাছে নেই, এটা নতুন উপসর্গ। ডান হাত বুকে রাখলেন তিনি। শরীর ক্রমশঃ শুকিয়ে দড়ি পাকিয়ে যাচ্ছে। সেই সব মাস্‌লগুলো কোথায় চলে গেল, চামড়াগুলো গুটিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। নিজের শরীরের দিকে তাকালে বড় কষ্ট হয় এখন।

পঁচাত্তর বছর বড অল্প সময়—দেখতে দেখতে চলে গেল। কিন্তু মৃত্যু অনেক দূরে—আরো পঁচিশটি বছর তাঁর বেঁচে থাকার বড় সাধ। পৃথিবীতে রোজ কত কি খবর হয়—মরে গেলে সে সব জানা যাবে না। তিনি সারাজীবন কোন নেশা করেননি, এমন কি চা খাননি পর্যন্ত, এখনও বাজার থেকে সোজা ব্যাগ হাতে দ্রুত হেঁটে বাড়ি ফেরেন। বেঁচে থাকার অধিকার তাঁর আছে। এরকমটা ভেবে মনটা প্রফুল্ল হল সরিৎশেখরের। কিন্তু সে সামান্যক্ষণের জন্য, বুকের মধ্যে হাঁপ লাগছে। এই যে বেঁচে থাকতে ভাল লাগে, এই বাড়িটাকে রোজ ভোরে উঠে দেখতে ইচ্ছে করে সেটা কি জন্যে? এত বছর বেঁচে থেকে তিনি কি দেখলেন? দুই স্ত্রী—রা তো অনেকদিন আগেই ট্যাং ট্যাং করে চলে গেল। বড় ছেলের মুখদর্শন এ

জীবনে তিনি করবেন না, ছোট ছেলে—হ্যাঁ, তাকেও তিনি বাতিল করেছেন। এক মেয়ে চোখের সামনে মরে গেল, আর একজন বিধবা হয়ে সারাজীবন থান পরে তাঁর সংসারে পড়ে রইল। একমাত্র মহীতোষ যে কিনা কোনদিন তাঁর মুখের ওপর তর্ক করেনি, তাঁকে আঘাত দেয়নি, কিন্তু ওর কাছেও তিনি আপন হতে পারেননি কোনদিন। মহীর বউ তো জোয়ান বয়সেই চলে গেল। অর্থাৎ এই এত বছর বয়স তাঁকে শুধু দুঃখই দিয়ে গেছে—বেঁচে থেকে বোধ হয় সুখ পাওয়া যায় না। এই যদি নীট ফল হয় তাহলে তাঁর এত বাঁচতে ইচ্ছে করে কেন? এই যে এই বাড়ি, তাঁর নিজের সন্তানের চেয়ে কাছের বলে মনে হয়, এও তো একটু একটু করে সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ভাড়াটের অনাদর, ট্যাক্সের বোঝা তো আছেই, এতদিনে একবারও তিনি হোয়াইটওয়াশ করাতে পারলেন না। যত্ন না পেলে সব কিছুই নষ্ট হয়ে যায়, যাচ্ছেও।

এইসব সমস্যার মধ্যে বাস করেও তিনি একটি জায়গায় অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন, সেখানে তাঁর কোন রকম গাফিলতি ছিল না—তা হল অনিমেষকে মানুষ করা। লোকে যে কেন মানুষ করার কথা বলে, মানুষ কেউ কাউকে করতে পারে না। তিনি তাঁর পুত্রদের পারেননি। শরীর বড় হওয়া আর মানুষ হওয়া যখন এক ব্যাপার নয় তখন এই চলতি কথাটা মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু অনিমেষের বেলায় তাঁর যত্নের অভাব ছিল একথা কেউ বলতে পারবে না। আর সুখ কিংবা আনন্দ এই যে অনিমেষ তাঁর আওতায় থেকে একটু একটু করে লক্ষ্যের দিকে এগিয়েছে, কখনও হোঁচট খায়নি। এই ছেলে প্রথম ডিভিসনে পাস করবে এ অন্ধ বিশ্বাস তাঁর ছিল এবং সেটা মিথ্যে হয়নি। আজ অবধি যখন যা খেতে বা পরতে দিয়েছেন ও কখনও সে নিয়ে অভিযোগ করেনি—এটাই মানুষ হবার প্রথম পদক্ষেপ। একমাত্র যে জিনিসটা সরিৎশেখরকে ভাবাত, মাঝে মাঝে ছোট ছেলের পরিণতির কথা মনে করিয়ে দিত, তা হল অনিমেষের দেশের কাজে আকৃষ্ট হওয়ার প্রবণতা। সেই ছেলেবেলা থেকে ওর কংগ্রেসের প্রতি যে আকর্ষণ তা কি এখনও আছে? ইদানীং ওর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা হয় না। অনিমেষের সঙ্গে ওর সেই নতুন স্যারের সম্পর্ক কি তা তিনি জানেন না। তবে রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ সত্ত্বেও যদি এ ছেলে এমন ভাল ফল করে পাস করতে পারে, তবে তিনি কখনই আপত্তি করবেন না। আজ রাত্রে সরিৎশেখর বিছানায় শুয়ে এইসব চিন্তা করতে করতে আসল জায়গায় শেষ পর্যন্ত এলেন—অনিমেষ কাল কলকাতায় চলে যাচ্ছে।

বুকের ব্যথার জায়গায় এখন যেন কোন স্পর্শ লাগল—কারণ উপলব্ধি করতে পারলেন সরিৎশেখর। এবং এই প্রথম তিনি ভীষণ অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর

শরীর মনের হুকুমে চলে ? এবং কোন্ মন, না যে মনকে তিনি নিজেই জানতেন না। এমনিতে তাঁর সম্পর্কে নির্দয় কঠোর পাষাণ এইসব বিশেষণ ব্যবহৃত হয়, সত্যি বলতে কি, অন্যায়ের সঙ্গে তিনি কোন দিন আপস করেননি বলেই তাঁর সম্পর্কে সবাই একথা বলে। কিন্তু অনিমেষকে তিনি বড় করেছেন, পড়াশুনা শিখিয়েছেন আরও বড় হবার জন্য—কলকাতায় না গেলে তা সম্ভব নয়—এসব তো অনেক দিনের জানা কথা। তাহলে ? তাছাড়া তাঁর বংশে আজ অবধি কেউ কলকাতায় পড়তে যায়নি—সেদিক দিয়ে তাঁর গৌরবের ব্যাপার।

আজ খেতে বসে অনিমেষ মহীতোষের ইচ্ছার কথা জানিয়েছিল। ওর বাবা ওকে ডাক্তার হতে বলেছে—সায়েন্স পড়াতে চায়। অথচ নাতির ইচ্ছে সে আর্টস পড়ে। তাঁকেই সালিশী করেছে সে। অনিমেষ ইংরেজীতে এম এ পাস করে অধ্যাপক হোক এই চিন্তা তাঁকে খুশী করে। মহীতোষ কদিন দেখেছে তার ছেলেকে ? সে কি করে জানবে ওর মনের গঠন কেমন ? ফট করে কিছু চাপিয়ে দিলে ফল ভাল পাওয়া যাবে ? তিনি নাতিকে বলেছেন সায়েন্স পড়তে যদি ভাল না লাগে তো পড়ার দরকার নেই। সেকথা শুনে অনিমেষের মুখ কি রকম উজ্জ্বল হয়েছিল এখন চোখ বন্ধ করেও তিনি দেখতে পেলেন। আজকাল কোন সিদ্ধান্ত নেবার জন্যে কেউ বড় একটা তাঁর শরণাপন্ন হয় না—সরিৎশেখরের তাই আজ নিজেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে বোধ হচ্ছিল। মহীতোষের সঙ্গে পরে তিনি এ ব্যাপারে কথা বলবেন। অতএব কাল যে ছেলেটা কলকাতায় যাচ্ছে তাতে তাঁর চেয়ে সুখী আর কে হতে পারে ? তবু যে কেন এমনটা হয় ? কেন মনে হচ্ছে সেখানে ওর কিছু হলে তিনি দেখতে পাবেন না! একটা অজানা শহরে ছেলেটা এক একা কিভাবে বাস করবে ? সেই সঙ্গে এতক্ষণে যে ব্যাপারটা তিনি মনের আড়ালে-আবডালে রাখছিলেন সেটা চট করে সামনে এসে দাঁড়াল—কাল থেকে তিনি সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়বেন। কখনও প্রকাশ না করলেও আজ অবধি তাঁর বেঁচে থাকার কারণ যেন অনিমেষকে ঘিরেই ছিল, কাল থেকে বাড়িটা ফাঁকা হয়ে পড়বে। তিনি কি করে বাঁচবেন ? যৌবনে যে কোন সমস্যার মুখোমুখি তিনি যেভাবে হতে পারতেন এই পঁচাত্তর বছরের এসে তা আর সম্ভব নয়—এই সত্যটা যেন বুকের ব্যথাকে আগলে রাখছিল। এখন তিনি বুঝতে পারেন যে হেমলতা ক্রমশ অশক্ত হয়ে পড়ছে—শারীরিক ক্ষমতায় সে আর বেশীদিন এভাবে কাজ করে যেতে পারবে না। যদি তাঁর আগে হেমলতা চলে যায়, তাহলে তিনি কি করবেন ? এই বাড়িতে সম্পূর্ণ একা একা তিনি কিভাবে থাকবেন ? এখন এই বয়সে আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। মহীতোষের কাছে গিয়ে দুদিন তিষ্ঠোতে পারবেন না তিনি।

কেউ জানে না, কাউকে জানাননি তিনি, বেশ কিছুদিন আগে গোপনে একটা উইল করেছেন এই বাড়ির ব্যাপারে। তাঁর অবর্তমানে এই বাড়ির সম্পূর্ণ মালিকানা হেমলতার, কিন্তু তিনি এই সম্পত্তি ভোগ করতে পারবেন, বিক্রি করতে পারবেন না। হেমলতার পর অনিমেষ এই বাড়ির মালিক হবে। আর কেউ নয়—আর কারো কথা তিনি চিন্তা করতে পারেন না। উইল করার সময় মনে হয়েছিল মানুষ যখন বোঝে মৃত্যু খুব কাছে, চলে যাওয়ার সময় আর সুযোগ পাওয়া যাবে না, তখনই উইল করে। কিন্তু তিনি কখনই খুব শিগগির যাচ্ছেন না, তাহলে উইল করা কেন? কিন্তু করে ফেলে আর পাল্টানো বা বাতিল করা হয়নি। এবং যেহেতু এটা একটা দুর্বলতা তাই কাউকে জানানোর প্রয়োজন বোধ করেন নি, এমন কি হেমলতাকেও নয়। অনিমেষ কাল চলে যাবে। সে যদি কৃতিত্বের সঙ্গে এম এ পাস করে অধ্যাপনা করে তাহলে কি জলপাইগুড়িতে ফিরবে? না, কখনোই নয়। এই কথাটা এই মুহূর্তে অত্যন্ত বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলেন। কলকাতায় গিয়ে শিকড় গাড়লে কেউ আর ফিরে আসে না। ওঁর মনে হতে লাগল, অনিমেষের এই চলে যাওয়াটা শেষ যাওয়া। এর পর ও আসবে ক্ষণিকের জন্য—সাময়িকভাবে। এই অনিমেষকে আর তিনি কখনো ফিরে পাবেন না। অতএব এই বাড়ির মালিকানা পেলে সে কোনদিনই তার দখল চাইবে না। তখন এত যত্নের বাড়িটার কি অবস্থা হবে?

ভীষণ অস্বস্তি হতে লাগল তাঁর। চট করে অনেক অনেক বছর আগে শোনা শনিবাবার কথা মনে পড়ল। এর কোন কাজে বাধা দিও না—এই সংসারে সে আটকে থাকবে না। কথাটাকে এই মুহূর্তে তিনি ভীষণ সত্যি বলে মনে করতে লাগলেন। এবং এই প্রথম সরিৎশেখর ব্যথার কারণটা পুরোপুরি আবিষ্কার করলেন। তাঁর বুকের ভেতর থেকে কি একটা জিনিস আস্তে আস্তে খসে যাচ্ছে। তাঁর ভীষণ ইচ্ছা হচ্ছে সেটাকে দুহাতে আঁকড়ে ধরে রাখেন, অথচ ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তিনি বাধা দিতে পারলেন না। তাঁকে তাঁর নিজের সৃষ্টির পূর্ণ রূপ দেখে যেতে হবে। ভীষণ অস্বস্তি নিয়ে একা বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করতে করতে গভীর রাতে সহসা উঠে বসলেন সরিৎশেখর।

জিনিসপত্র মোটামুটি গোছগাছ হয়ে গেছে। একটা স্যুটকেস আর ছোট হোল্ডল নিয়ে সে যাবে। কাল সন্ধ্যেবেলায় ট্রেন। শিলিগুড়ি থেকে যে নর্থ-বেঙ্গল এক্সপ্রেস ছাড়ে তাতে হলদিবাড়ি থেকে আসা একটা কম্পার্টমেন্ট জুড়ে দেওয়া হয়। অনিমেষ জলপাইগুড়ি স্টেশনে সেই লোকাল ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে

উঠবে। সাধারণত জলপাইগুড়ির মানুষ আগেভাগেই লোক পাঠিয়ে হলদিবাড়ি থেকে জায়গা দখল করে আনে কিন্তু একজনের পক্ষে তেমন কোন অসুবিধে হবে না। আজ সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরতেই ও জয়াদির গলা পেয়েছিল, নিশ্চয়ই জয়াদি বিকেলে বাড়ি ফিরেছেন। যাওয়ার আগে ওঁর সঙ্গে দেখা হবে ভেবে খুশী হয়েছিল অনিমেষ। সত্যি বলতে, জয়াদিই প্রথম তাঁকে কলকাতার সঙ্গে পরিচিত করিয়েছিলেন। জয়াদি না থাকলে সে জানতেই পারত না জীবনানন্দ দাশ নামে সেই বিখ্যাত কবি ট্রামের তলায় চাপা পড়েছিলেন। জয়াদির সঙ্গে দেখা করার জন্য সে ওঁদের বারান্দায় উঠে আসতেই থমকে দাঁড়িয়েছিল। খুব চাপা গলায় জয়াদি কথা বলছিলেন, 'এত যার সন্দেহ তার পক্ষে বিয়ে করা উচিত হয়নি।' জয়াদির স্বামীর গলা কিন্তু চড়া ছিল, 'ওসব নাটুকে কথা ছেড়ে দাও, নবেল পড়ে মাথা বিগড়ে গিয়েছে তোমার। এত ঘন ঘন বাপেরবাড়ি যাওয়া পছন্দ করি না আমি।' খুব নির্লিপ্তের মত জয়াদি বললেন, 'বেশ, যাব না।'

'অ্যাঁ! কি বললে? এক কথায় রাজি? তা সেই সব কচি কচি ভাইগুলোর মাথা চিবোতে পারবে না বলে মনখারাপ লাগছে না? তোমার যে পুরুষ-ধরা রোগ ছিল তা যদি জানতাম কোন্ শালা বিয়ে করত!'

দ্রুত নেমে এসেছিল অনিমেষ। ওর মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। কি ভীষণ নোংরা গলায় জয়াদির স্বামী কথা বলছেন। জয়াদির এই সমস্যায়, জয়াদিকে এতখানি নোংরার মধ্যে থাকতে হয় কোনদিন সে টের পায়নি। ওঁর সঙ্গে কথা বলেও আভাস পায়নি কখনো। ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিল নেই এটা টের পেয়েছে, কিন্তু তাই বলে এতটা! কচি কচি ভাই বলতে উনি কি বোঝাচ্ছিলেন? সে অর্থে ও নিজেও তো জয়াদির ভাই। ভীষণ অসহায় লাগল অনিমেষের। একবার মনে হয়েছিল পিসীমাকে ব্যাপারটা বলবে, কিন্তু চলে যাওয়ার সমস্যা নিয়ে বাড়ির সবাই এত চিন্তিত যে এ কথাটা বলার অবকাশ পায়নি।

এখন রাত দশটা হবে। এই সময় জলপাইগুড়ি শহর ক্রমশ নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে। ওদের পাড়াটায় দোকানপাট নেই, বড় ছাড়া ছাড়া বাড়ি, তাই গভীর রাতটা খুব তাড়াতাড়ি নেমে আসে। একদম ঘুম পাচ্ছে না আজ অনিমেষের। কাল চলে যেতে হবে—এই বোধটা মাঝে মাঝে সেই একাকিত্বের ভয়টাকে উসকে দিচ্ছে। অন্যমনস্ক হয়ে ও সামনের দেওয়ালের দিকে তাকাল। সেখানে সেই ছোট কুকুরটা এখনও চুপচাপ বসে আছে। আজ থেকে অনেক বছর আগে এটাকে আবিষ্কার করেছিল সে। দেওয়ালের চুনের আস্তরণ সরে গিয়ে যে ফাটল হয়েছে সেটাই একটা কুকুরের আকৃতি নিয়ে নিয়েছে। খুব মজা লাগত ছেলেবেলায়। চট

করে দেখলে মনে হয় খুব আদুরে ভঙ্গী নিয়ে কুকুরটা চেয়ে আছে। আজ এত রাত্রে ওর কুকুরটার জন্য ভীষণ কষ্ট হল, কাল থেকে সে আর এটাকে দেখতে পাবে না।

আগামীকাল ধর্মঘট। এবার যেভাবে কম্যুনিস্টরা শহরের পথে পথে প্রচার করে বেড়াচ্ছে এর আগে কখনো সেরকম দেখা যায়নি। কিন্তু একটা জিনিস অনিমেষ কিছুতেই বুঝতে পারে না, সাধারণ মানুষ একদম উত্তেজিত নয়। বরং তাদের মধ্যে নিস্পৃহ ভাব দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। অন্তত ফেরার সময় ও লক্ষ্য করেছে, কারো মধ্যে তেমন চাঞ্চল্য নেই। অথচ মানুষের খাবারের জন্য এই হরতাল। তাহলে কি জলপাইগুড়ির সমস্ত মানুষ কংগ্রেসের সমর্থক হয়ে গেল? কি জানি। কিন্তু যদি এই হরতালের ফলে কাল ট্রেন বন্ধ হয়ে যায়—তাহলে? এ সপ্তাহে আর নাকি ভাল দিন নেই।

ভেজানো দরজা খুলে বাইরে এল অনিমেষ। ওদের বাগানটা এখন জঙ্গলে ভরে গেছে। সামান্য বৃষ্টি হলেই গাছগুলো তরতর করে বড় হয়ে ওঠে। ফুলের গাছ আর নেই, বিভিন্ন ফলের গাছেই বিরাট জায়গাটা ভরাট। এখন সবে চাঁদ উঠেছে। লম্বা সুপুরি গাছগুলোর মাথায় তার জ্যোৎস্না নেতিয়ে পড়ে আছে। চারধারে একটা আবছা আলো অন্ধকারের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে রয়েছে। চট করে তাকালে বোঝা যায় না, কিন্তু চোখ সয়ে এলে দেখতে কোন অসুবিধে হয় না। অনিমেষ দেখল দাদুর ঘরে আলো জ্বলছে না, কোন শব্দ আসছে না সেখান থেকে। পিসীমার রান্নাঘর থেকে সামান্য আলো আসছে বাইরে।

উঠোনে নেমে এল সে খালিপায়ে। এখন গরমকাল। সময়ে অসময়ে বৃষ্টি আসে। উঠোনের ঘাসগুলো এখন মাথাচাড়া দিয়েছে, গোড়ালি ডুবে যায়। এভাবে নামা ঠিক হয়নি, কারণ এই সময় সাপেরা মেজাজে চারধারে ঘুরে বেড়ায়। কখন কে বিরক্ত হয়ে ছোবল মারবে—অনিমেষ খুব সাবধানে পা ফেলতে লাগল। দাদুর ঘর পেরিয়ে পিসীমার রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়াল সে। দরজার কাঁচ দিয়ে ঈষৎ আলো বাইরে আসছে। এটা ইলেকট্রিক আলো নয়, নিশ্চয়ই কুপীর আলো। পিসীমা ইলেকট্রিক আলো বাঁচাতে কুপী জ্বালান রাত্রে শোওয়ার সময়। এইটে ওঁর বহু পুরনো অভ্যেস। স্বর্গছেঁড়া থেকে আসবার সময় পিসীমা ওটা নিয়ে এসেছেন। নিঃশব্দে বারান্দায় উঠে দরজার কাছে এসে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল অনিমেষ। ভেতর থেকে চাপা গলায় পিসীমা একটানা সেই শ্লোকটা বলে যাচ্ছেন। 'গুরুদেব দয়া কর দীনজনে'। এবং তারপরেই হু-হু করে কান্নাটা ঘরের মধ্যে পাক খেতে লাগল। পিসীমা কাঁদছেন। কেন? কান্নাটাও যেন সর্তক ভাবে—সরিৎশেখর

বা আর কেউ টের পান তিনি চান না। যেন নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে কান্না। কান্নার সঙ্গে চাপা কথা একটা একটা করে অনিমেষের কানে এল—পিসীমা সেই অনেকদিন আগে চলে যাওয়া, বোধ হয় চেহারা গুলিয়ে বা ভুলে যাওয়া পিসেমশাইকে অভিযোগ করে কেঁদে যাচ্ছেন, কেন তাঁকে একা ফেলে রেখেছেন এতকাল! কতদিন তিনি এইভাবে পৃথিবীতে থাকবেন, এখানে থাকলেই তো দুঃখ পেতে হয় —এই যেমন যে ছেলেটাকে মা মারা যাবার পর বুকে করে মানুষ করেছেন সেও আজ চলে যাচ্ছে তাঁকে ছেড়ে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে অনিমেষ নিঃশব্দে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। ও একবার ভাবল পিসীমাকে ডাকবে কিন্তু ওর শরীর যেন সায় দিতে চাইল না। ভীষণ ভারবোধ হল তার, কাউকে জানতে না দিয়ে সে আবার উঠোনে নেমে এল।

এখান থেকে চলে গেলে আর কিছু না হোক দুজন মানুষকে ছেড়ে যেতে হবে যাঁরা তাকে আগলে রেখেছিলেন। পৃথিবীর আর কোথাও গিয়ে, জীবনের কোন সময়ে কি আর কাউকে সে পাবে এমন করে যে তাকে ভালবাসবে। খোলা উঠোনে দাঁড়িয়ে সে মুখ তুলে পরিষ্কার আকাশের দিকে তাকাল। দূরে এক কোণায় বাচ্চা মেয়ের কাঁপা হাতে পরা বাঁকা টিপের মত অর্ধেক চাঁদ আকাশে আটকে আছে। মাথার ওপর অনেক তারার ভিড়। যেন হইচই পড়ে গেছে সেখানে। আজ অনেকদিন পর কেন বার বার ছেলেবেলাটাকে মনে পড়ে যাচ্ছে? এই রকম তারার রাতে সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকত। সেখানে অনেক তারার মধ্যে একটা তারা খুব জলজল চোখ করে তার দিকে তাকাত আর কিছুক্ষণ চোখাচোখি হওয়ার পর সেই তারাটা যখন মায়ের মুখ হয়ে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলত, সে-সময় ওই তারাটাকে না দেখতে পেলে ওর কান্না পেত। এখন অনিমেষ আকাশের দিকে মুখ করে অনেক তারার মধ্যে সেই তারাটাকে খুঁজতে চাইল। আশ্চর্য, তারাও পাল্টে যায় নাকি! কারণ ওখানে অনেকগুলো জলজলে তারা একসঙ্গে জ্বলছে, কাউকে আলাদা করা যাচ্ছে না।

এখন আর তেমন করে মায়ের কথা মনে পড়ে না। মায়ের ছবি আছে, খুব সুন্দর চেহারা। মাঝে মাঝে সেদিকে তাকালে নিজেকে খুব একা মনে হয় কিন্তু তার বেশী নয়। তার একটা ভাই হতে যাবার আগেই দুর্ঘটনায় মা মারা গেছেন —এই খবরটা আর কোন ভাবপ্রবণ ঘটনার মধ্যে তাকে টেনে নিয়ে যায় না।

অনিমেষ উঠোন পেরিয়ে পাশের দরজা খুলে বাড়ির সামনে চলে এল। আশেপাশের সব বাড়ির আলো নিবে গেছে। এখন আর মাইকের শব্দ শোনা যাচ্ছে না যেটা সন্ধ্যেবেলায় ছিল। অনিমেষ ঢেঁকিরশাকের জঙ্গলটা ছাড়িয়ে ভাড়াটেদের

ঘরের সামনে ওদের সদর দরজার দিকে এগোল। চাঁদটা বোধ হয় সামান্য ওপরে উঠেছে, কারণ এখন চারদিক মশারির মধ্যে ঢুকে দেখলে যেমন দেখায় তেমন দেখাচ্ছে। অন্যমনস্ক হয়ে কয়েক পা হেঁটে সামনে তাকাতে ওর চোখ যেন ঝাপসা দেখাল। জয়াদির ঘরের সামনে বারান্দায় কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। ওপাশের থামের গায়ে হেলান দিয়ে যে আকাশের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে সে যে জয়াদি তা বুঝতে দেরি হল না অনিমেষের। জয়াদি ওখানে কি করছে? এভাবে কেন জয়াদি দাঁড়িয়ে থাকবে? মানুষের যখন খুব দুঃখ হয় তখনই এরকম ভঙ্গীতে সে দাঁড়াতে পারে—অনিমেষ এটুকু বুঝতে পারছিল। জয়াদিকে ডাকতে গিয়ে থেমে গেল সে। এত রাতে ও যদি জয়াদির সঙ্গে কথা বলে, তাহলে জয়াদির স্বামী রাগ করবেন না তো? সন্ধ্যেবেলায় তিনি তো এ ধরণের একটা কথা বলে জয়াদিকে আঘাত করেছিলেন। এখন কি আর আগের মতন জয়াদির সঙ্গে কথা বলা তার মানায় না?

অনিমেষ নিঃশব্দে আবার নিজের ঘরের দিকে ফিরে চলল। ওর মনে হল আর যাই হোক এখন জয়াদিকে একা একা থাকতে দেওয়া উচিত, কারণ অনেকসময় ওর নিজেরই একা থাকতে ভাল লাগে। দরজা বন্ধ করে ও যখন উঠোন পেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াচ্ছে তখনই সরিৎশেখরের ঘরের দরজা খুলে গেল। অনিমেষ দ্রুত নিঃশব্দে জায়গাটা পেরিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গিয়ে আলো নেবাল। এখন এত রাত্রে দাদু তাকে দেখলে অনেক রকম প্রশ্নের সামনে পড়তে হবে। তার চেয়ে সে শুয়ে পড়েছে এটা বুঝতে দেওয়া ভাল। খাটে শুয়ে সে অন্ধকার ঘরে চুপচাপ কিছুক্ষণ পড়ে থাকল। না, আজ রাত্রে ওর কিছুতেই ঘুম আসবে না। অন্ধকার ঘরের দেওয়ালে কাঁচের জানলায় চোখ বোলাতে গিয়ে সে শক্ত হয়ে গেল। একটা মুখ কাঁচের জানলার বাইরে থেকে মুখ চেপে ভেতরটা দেখবার চেষ্টা করছে? কে? চোর নয় তো! সঙ্গে সঙ্গে ওর মেরুদণ্ডে যেন একটা ভয় ঠাণ্ডা অনুভূতি নিয়ে ঘোরাফেরা করতে লাগল। বিছানা থেকে ওঠার ক্ষমতাটা সে এই মুহূর্তে হারিয়ে ফেলেছে, গলা থেকে কোন শব্দ বেরুচ্ছে না। বাইরের জ্যোৎস্নার পটভূমিতে ভেতর থেকে একটা আবছা অন্ধকার মেশানো মুখের ছায়া কাঁচের ওপর লেপ্টে আছে এখনও। সে কি করবে? অনিমেষ অনেক চেষ্টা করে যখন উঠে বসতে পারল তখন আর ছায়াটা জানলায় নেই। কাঁপুনি শরীরে নিয়ে অনিমেষ আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর পা টিপে টিপে সে জানলার পাশে এসে দাঁড়াল। বাইরে জ্যোৎস্নায় এখন উঠোনটা পরিষ্কার হয়ে আছে। অনিমেষ প্রথম চমকটা কাটিয়ে উঠে খুব ধীরে হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে যাওয়া শরীরটাকে দেখতে

পেল। এই শরীরটাকে সে জন্ম থেকে জানে। দাদুর এই রকম হেঁটে যাওয়া অসহায় ভঙ্গী সে আগে কখনো দেখেনি, লাঠি না নিয়ে দাদু এসেছিলেন। অনিমেষ বুঝতে পারছিল না, সরিৎশেখর এত রাত্রে এই জানলায় মুখ দিয়ে কি দেখছিলেন?

খাওয়া-দাওয়ার পর থেকেই সরিৎশেখর তাড়া দিচ্ছিলেন। সেই কোন্ সন্ধ্যে-বেলায় ট্রেন অথচ দাদু এমন করে তাড়া দিচ্ছেন যেন আর সময় নেই। জিনিসপত্র গুছিয়ে বাইরে রাখা আছে। দাদু গিয়ে একজন পরিচিত রিকশাওয়ালাকে বলে এসেছেন, সে খানিক আগে এসে বসে আছে। অনিমেষ দেখল ট্রেন ছাড়তে এখনও আড়াই ঘণ্টা বাকি। আজ জলপাইগুড়ি শহরে হরতাল বিচ্ছিন্ন ভাবে হয়েছে। দিনবাজার এলাকায় দোকান বন্ধ করা নিয়ে মারামারি হয়েছে। তবে অন্যদিনের চেয়ে আজকের দিনটা আলাদা সেটা বোঝা গিয়েছিল। রিকশা চলেছে তবে তা সংখ্যায় অল্প। সরকারী অফিস বা স্কুলগুলো হয়নি। কিন্তু সিনেমা হল খোলা ছিল—সরিৎশেখর রিকশাওয়ালার কাছ থেকে এইসব সংবাদ আরো বিশদভাবে জেনে নিচ্ছিলেন।

নিজের ঘরে অনিমেষ যখন জামাকাপড় পরছে তখন হেমলতা দরজায় দাঁড়িয়ে। তাঁর মুখটা থমথম করছে, 'শেষ পর্যন্ত অনিবাবা কলকাতায় চললি?'

অনিমেষের বেশী কথা বলতে ভয় করছিল, ও চেষ্টা করে হাসল।

'গিয়েই চিঠি দিয়ে খবরাখবর জানাবি আর প্রত্যেক সপ্তাহে যেন চিঠি পাই।' হেমলতা মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন।

'আচ্ছা।' অনিমেষ চুল আঁচড়াতে লাগল।

'বেশী বাইরে ঘুরবি না, বাজে আড্ডা দিবি না। যত তাড়াতাড়ি পড়াশুনা শেষ করে চলে আসতে পারিস সেই চেষ্টা করবি। তোর যা খাওয়াদাওয়ার ধরন—ওখানে পেট পুরে খেতে দেবে কিনা জানি না।'

'বাঃ, খেতে দেবে না কেন?' অনিমেষ বলল।

'হ্যাঁরে, তোদের কলেজে মেয়েরা পড়ে নাকি?'

'জানি না।'

'দেখিস বাবা। কলকাতার মেয়েরা খুব—মানে অন্য রকম। ওদের সঙ্গে একদম মিশবি না।' হেমলতা শেষবার সর্তক করলেন।

'আমার সঙ্গে মিশবেই বা কেন?' অনিমেষ ঠাট্টা করার চেষ্টা করল।

'কি জানি বাবা, শনিবাবা তো সেই রকম কি বলেছিল। আর হ্যাঁ, ওসব পার্টি-ফার্টি একদম করবি না। তোর জেলে যাবার ফাঁড়া আছে, মাধু তো সেই

চিন্তায় গেল। আমি কি করব।' ছটফট করতে লাগলেন হেমলতা।

অনিমেষের হয়ে গেলে হেমলতা ওর হাত ধরে ঠাকুরঘরে নিয়ে গিয়ে প্রণাম করতে বললেন। পিসীমার মন বুঝে অনিমেষ মাটিতে মাথা ঠেকাতে ওর চুলে হাত পড়ল। অনিমেষ শুনল বিড়বিড় করে পিসীমা সেই কাল রাত্রের মন্ত্রটা বলে যাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত একটা ডুকরে-ওঠা কান্নার মাঝখানে পিসীমা বললেন, 'ঠাকুরের সামনে বসে তুই আমাকে কথা দে যে এমন কিছু করবি না যাতে তোর জেল হয়। বল, আমাকে ছুঁয়ে বল।'

গলা বুজে এসেছিল অনিমেষের, কোন রকমে বলল, 'আচ্ছা।'

'আচ্ছা না, আমাকে ছুঁয়ে বল, কথা দিলাম।' পিসীমা ওর হাতে ধরলেন।

আর সেই সময় সরিৎশেখরের চিৎকার শোনা গেল, 'কি হল তোমাদের, তখন থেকে বলছি কেউ শুনছ না। এদিকে ট্রেনের সময় যে হয়ে এল।'

অনিমেষ উঠে দাঁড়িয়ে পিসীমাকে প্রণাম করল। 'আরে আগে আমাকে কেন, বাবাকে করবি তো।' বলতে বলতে অনিমেষকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। আর সেই মুহূর্তে কান্নার কোন সঙ্কোচ থাকল না।

সরিৎশেখর আর অপেক্ষা করতে রাজী নন। পিসীমাকে নিয়ে অনিমেষ বাইরে বেরিয়ে এল। জয়াদি ওদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে। আজ সকালে জয়াদির সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা হয়েছে। একবারও কালকের কথা তোলেননি তিনি, অনিমেষও ঘুণাক্ষরে জানায়নি কাল রাতে সে ওঁকে দেখেছে। যা কিছু গল্প কলকাতাকে নিয়ে। এখন চোখাচোখি হতে জয়াদি ম্লান হাসলেন, 'চললে ?'

মাথা নাড়ল অনিমেষ। বুকের মধ্যে এখন একশ সমুদ্র ফুঁসছে—যে কোন মুহূর্তেই বাঁধ ভেঙে যেতে পারে। মুখ ফিরিয়ে অনিমেষ দেখল তার জিনিসপত্র রিকশায় তোলা হয়ে গিয়েছে। দাদু পিসীমার কেচে দেওয়া লংক্লথের পাঞ্জাবি আর মিলের ধুতি পরে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। ওকে দেখে আর একবার ঘড়ি দেখে নিলেন, 'তাড়াতাড়ি কর। এই সময় যোগটা খুব ভাল আছে।'

জয়াদি বললেন, 'আপনি স্টেশনে যাচ্ছেন তো ?'

সরিৎশেখর রিকশার দিকে এগোতে এগোতে বললেন, 'কালীবাড়িতে যেতেই হবে, কাছেই যখন, ঘুরে আসি।'

অনিমেষ পিসিমার দিকে ফিরে বলল, 'পিসীমা, আমি যাচ্ছি।'

পেছন থেকে জয়াদি বলে উঠলেন, 'যাচ্ছি বলো না, বলো আসছি।'

হেমলতা চট করে থানের আঁচল হাতে জড়িয়ে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে সে অবস্থায় ঘাড় নাড়লেন। ছোট ছোট পা ফেলে অনিমেষ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে

রিকশায় চাপল, ঘাড় ঘুরিয়ে সে আবার নিজেদের বারান্দার দিকে তাকাল। রিকশা এখন চলতে শুরু করেছে। আশ্চর্য, পিসীমা এখন এই মুহূর্তে আর বারান্দায় নেই। কেমন খাঁ খাঁ করছে জায়গাটা। নিঃশব্দে টপটপ করে জল পড়তে লাগল অনিমেষের দু-গাল বেয়ে। রিকশাটা যখন টাউন ক্লাবের কাছ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে তখন অনিমেষ পাশে বসা সরিৎশেখরের গলা শুনতে পেল, 'তোমাকে অনেক দূরে যেতে হবে অনিমেষ। এইভাবে ভেঙে পড়লে চলবে না। চোখের জল মুছে ফেল।' চট করে শক্ত হয়ে গেল অনিমেষ। পাশাপাশি রিকশায় বসে সে দাদুর শরীর থেকে আর্নিকা হেয়ার অয়েলের গন্ধ পেল। গন্ধটা ওকে এক লহমায় অনেকদিন আগে যেন টেনে নিয়ে গেল। যেদিন সরিৎশেখর ওর সঙ্গে স্বর্গছেঁড়ার রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কলকাতায় যাবার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। এখন জরা এসে শরীর দখল করা সত্ত্বেও এই মুহূর্তে সেই মানুষটি যেন একটুও পাল্টায়নি। কাল রাত্রে দেখা সেই সরিৎশেখরকে এখন চেনা অসম্ভব।

টাউন ক্লাবের মাঠ, পি ডবলিউ ডি'র অফিস, করলা নদীর পুল পেরিয়ে রিকশাটা এক ভি আই স্কুলের মোড়ে চলে এল। এখন বিকেল। দোকানপাট এ চত্বরে অন্যদিনের মত খোলা। হরতাল শেষ হবার কথা ছটায়—কিন্তু দেখে মনে হয় এখানে হরতাল আদৌ হয়নি। রাস্তাঘাটে লোকজন আড্ডা মারছে। এত দূর পথ এল, আশ্চর্য, একটাও চেনা মুখ ওর চোখে পড়ল না।

স্টেশনের সামনেটা জমজমাট। রেডিও বাজছে দোকানে। রিকশা থেকে নেমে ওরা মালপত্র নিয়ে প্ল্যাটফর্মে এলো। সরিৎশেখর চশমার খাপ থেকে টাকা বের করে ফাঁকা কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটলেন। ট্রেন আসতে অনেক দেরি। প্ল্যাটফর্মে লোকজন বেশী নেই। কুলিকে জিজ্ঞাসা করে থ্রু কোচ কোথায় দাঁড়ায় জেনে সেখানে মালপত্র নামানো হল। পেছনেই একটা বেঞ্চি, সরিৎশেখর সাবধানে সেখানে বসে নাতিকে পাশে ডাকলেন।

'তোমার পিসী যে খাবার দিয়েছে রাস্তায় তাই খেয়ো, বুঝলে?' দাদুর কথা শুনে অনিমেষ ঘাড় নাড়ল। দু পায়ের মধ্যিখানে লাঠিটাকে রেখে হাতলের ওপর গাল চেপে সরিৎশেখর কথা বলছেন, 'টাকা-পয়সা সব সাবধানে নিয়েছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'গিয়েই চিঠি দেবে।'

'আচ্ছা।'

'যে ভদ্রলোক তোমায় নিতে আসবেন তিনি তোমাকে চিনবেন কি করে তাই ভাবছি, কোনদিন দেখেননি তো।'

'টেলিফোন বুথের সামনে মালপত্র নিয়ে দাঁড়াতে হবে। আমার বর্ণনা দিয়ে ওঁকে চিঠি লিখেছেন। তাছাড়া ওঁর ঠিকানা আছে আমার কাছে।'

'জানি না কি হবে। কলকাতায় ঠিকানা খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। উটকো লোকের কথায় কান দিও না। তার চেয়ে তোমার কাকাকে লিখলে বোধ হয় ভাল হত।'

'কিছু হবে না।'

'তোমার কি সব ফাঁড়া আছে শুনেছি—রাজনীতি থেকে দূরে থেকো। আমাদের মত লোকের ওসব মানায় না।'

অনিমেষ কোন জবাব দিল না। অনেকদিন বাদে দাদুর পাশে বসে এইভাবে কথা বলতে ওর ভারী ভাল লাগছিল। এতদিন ধরে এক বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও তিল তিল করে যে ব্যবধান তৈরি হয়ে গিয়েছিল সেটা এখন হঠাৎই যেন মিলিয়ে গেছে। অনিমেষ চুপচাপ বসে থাকল।

কুলিদের চিৎকার, যাত্রীর ব্যস্ততায় একসময় স্টেশনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। এত কুলি কোথায় ছিল কে জানে—অনিমেষ ট্রেন-টাইম ছাড়া কখনো এদের দেখতে পায়নি। সরিৎশেখর বেঞ্চি ছেড়ে সামান্য এগিয়ে ঝুঁকে বাঁদিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'সিগনাল দিয়েছে দেখছি, রেডি হও।'

কথাটা শুনেও অনিমেষ উঠতে চেষ্টা করল না। ওর মনে হচ্ছিল বুঝি জ্বর এসে গেছে শরীরে, হাত পা কেমন ভারী বলে বোধ হচ্ছে। যাবার সময় যত এগিয়ে আসছে—অনিমেষের এখন খুব ইচ্ছে করছিল ট্রেনটা দেরি করে আসুক। অথবা আজ তো ট্রেনটা নাও আসতে পারত। কত কি তো পৃথিবীতে রোজ হয়ে থাকে।

এই সময় বেশ কিছু মালপত্র নিয়ে একটি পরিবার যেন সমস্ত প্ল্যাটফর্মে আলোড়ন তুলে এদিকে এগিয়ে এল। অনিমেষ দেখল কুলিকে শাসন করতে করতে একজন মহিলা আগে আগে আসছেন, তাঁর পেছনে বয়স্ক রোগা এক ভদ্রলোক আর ওদের বয়সী অতিরিক্ত স্বাস্থ্যবতী একজন মেয়ে। মুখ দেখলেই বোঝা যায় মেয়েটি মহিলার কন্যা। ওর সামনে এসে কুলি বলে উঠল, 'খাড়াইয়ে মেমসাব। থুরু গাড়ি ইহাই লাগে গা।'

মহিলা সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়ে ভদ্রলোককে ডাকলেন, 'আঃ, একটু তাড়াতাড়ি এসো না, ওকে হেল্প কর।' কিন্তু ততক্ষণে কুলি নিজেই মালপত্র নামিয়ে নিয়েছে। ভদ্রলোক কাছে এলে মহিলা বললেন, 'পই পই করে বললাম ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কাটো—চিরটাকাল কিপ্টেমি করে কাটালে। এখন এই পাহাড় নিয়ে গুঁতোগুঁতি

করে ছোটলোকের মত থার্ড ক্লাসে ওঠ, নিজে তো এখানে ফুর্তি লুটবেন।'

ভদ্রলোক চাপা গলায় বলে উঠলেন, 'আঃ, কি হচ্ছে কি, এটা স্টেশন! আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয় তুমি জান। আর মেয়েরা একা থার্ড ক্লাসেই সেফ।'

'সেফ আর সেফ। সারাজীবন পুতুপুতু করে কাটালে। ট্রেন এলে তুমি লাফিয়ে উঠে জায়গা করবে—এই আমি বলে দিলাম।' চট করে গলার স্বরে হুকুমের ঝাঁঝ আনলেন মহিলা।

এই সময় মেয়েটি কথা বলল, থমথমে গলার স্বর, শুনলে শরীর কেমন করে, 'গোবিন্দদারা আসবে বলেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে মহিলা ঝাঁকুনি দিয়ে শরীর ওর দিকে ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওমা তাই নাকি। তোকে বলেছে আসবে?' মেয়েটি ঘাড় নাড়ল।

'তুমি আবার ওই সব লোফারগুলোর সঙ্গে কথা বলেছ?' বিরক্তি-মেশানো গলায় ভদ্রলোক মেয়েকে ধমকালেন।

মাথা নিচু করল মেয়েটি কিন্তু তার মা জবাব দিল, 'মেলা বকবক করবে না তো। একটু-আধটু কথা বললে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না। তার বদলে ওরা প্রাণ দিয়ে যে উপকার করবে পয়সা ফেললে তা পাবে না। একটুও যদি বুদ্ধিসুদ্ধি থাকত।'

অনেকক্ষণ থেকেই অনিমেষ সোজা হয়ে বসেছিল। ওরা যখন প্রথম এদিকে এগিয়ে এসেছিল তখন ও বুঝতে পারেনি, কিন্তু মহিলাকে খুব পরিচিত বলে মনে হচ্ছিল। কোথায় ওঁকে দেখেছে এটাই মনে করতে পারছিল না সে। কিন্তু যেই উনি কথা বলতে শুরু করলেন তখনিই তিস্তার চরের সেই সকালবেলার ট্যাক্সিটা ওর চোখের সামনে এসে দাঁড়াল। সেই কাবুলিওয়ালাদের গান, তার শরীরে ভার রেখে বসা এই মহিলা, সেই গুড-বয়-মার্কা ছেলেটি আর সর্বদা ঠুকে কথা বলা ভদ্রলোক—ও স্পষ্ট দেখতে পেল। অনিমেষ তখনই এই ভদ্রলোকের দিকে লক্ষ্য করল, কোন মানুষের চেহারা এত পাল্টে যায়? কি রোগা এবং কালো হয়ে গেছেন ইনি, পরনে প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট। এঁকে একা দেখলে সে কখনই চিনতে পারত না। অথচ মহিলাটি একই রকম আছেন, তেমনি স্লিভলেস ব্লাউজ, কড়া প্রসাধন আর মেজাজী কথাবার্তা। তুলনায় ভদ্রলোক অনেক নিষ্প্রভ, ওঁকে দেখলেই মনে হয় ইদানীং খুব অর্থকষ্টে রয়েছেন। ওঁরা ওকে চিনতে পারেননি, কয়েক বছর আগে সামান্য এক ঘণ্টার সঙ্গীকে মনে রাখার কথাও নয়। অনিমেষের সেই কুষ্ঠ রোগীটার কথা মনে পড়ল। ওকে হাত দিয়ে জল থেকে টেনে তুলেছিল বলে ভদ্রলোক কার্বলিক সাবান ব্যবহার করতে বলেছিলেন।

হাসি পেল অনিমেষের, সে-সব না করেও তো ও অক্ষত আছে'। সেদিন ভদ্রমহিলা ওর ছোঁয়াচ বাঁচাতে ভদ্রলোকের সঙ্গে ঝগড়া মিটিয়ে নিয়েছিলেন।

সরিৎশেখর ফিরে এসে বেঞ্চিতে বসে বললেন, 'বেশ ভিড় হচ্ছে, হরতাল বলে লোকে আজকাল ভয় পায় না।' এই সময় মহিলার বোধ হয় বেঞ্চিটা নজরে পড়ল। তিনি মেয়েকে নিয়ে বাকি বেঞ্চিটা দখল করলেন। কাছাকাছি হতেই অনিমেষ সেই মিষ্টি গন্ধটা টের পেল, ট্যাক্সিতে বসে যেটাকে ফুলের বাগান বলে মনে হয়েছিল। কি আশ্চর্য, এতগুলো বছরেও তিনি গন্ধটাকে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখে এসেছেন। সরিৎশেখরের মুখের পাশটা দেখতে পাচ্ছিল অনিমেষ, তিনি অস্বস্তি বোধ করছেন।

এই সময় ভদ্রলোক কিছু করতে হবে বলেই যেন যেচে কথা বললেন, 'আপনারা কলকাতায় যাচ্ছেন?'

সরিৎশেখর তাঁর দিকে একটু লক্ষ্য করে ঘাড় নাড়লেন, 'না, আমার নাতি একাই যাচ্ছে।'

ভদ্রলোক অনিমেষকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি বুঝি কলকাতায় পড়?'

সরিৎশেখরই জবাবটা দিলেন, 'ও এবার ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করেছে, কলকাতায় কলেজে ভরতি হতে যাচ্ছে।'

'বাঃ, গুড। আমার মেয়েও বেরিয়েছে এবার, তবে ও শান্তিনিকেতনে পড়বে। ওর মা আর ও যাচ্ছে—বোলপুরে নামবে।'

ভদ্রলোক কথা শেষ করা মাত্রই মহিলা বলে উঠলেন, 'বোলপুরে আমার ভাই থাকে, খুব বড় প্রফেসর। তা তুমি ভাই বোলপুর অবধি আমাদের একটু হেল্প কর়ো, কি করবে তো?'

অনিমেষ মাথা নাড়ল। সে দেখল দাদু সামনের দিকে মুখ করে বসে আছেন আর মহিলার হাসি-হাসি মুখের পেছনে ওর মেয়ে ভ্রূ কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। 'কি নাম তোমার, ভাই?' মহিলা আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

'অনিমেষ।' নাম বলে অনিমেষ একটু আশা করল ওঁরা হয়তো চিনতে পারবেন।

এবার কিন্তু কিছুই হল না। বরং মেয়েটি আকস্মিকভাবে উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, 'ওই দেখ মা, গোবিন্দদারা আসছে।'

অনিমেষ দেখল তিনটি ওর চেয়ে বড় ছেলে হাসতে হাসতে এসে সামনে দাঁড়াল, 'কি বউদি, না বলে কখন বেরিয়ে এলেন, বাড়ি গিয়ে আমরা ফলস খেয়ে গেলাম।'

মহিলা খুব আদুরে ভঙ্গীতে বললেন, 'ওমা, কতক্ষণ অপেক্ষা করব? ট্রেন এসে

যাবে না ? এখন এই ভিড় দেখে ভাবছি কি করে গাড়িতে জায়গা পাব !'

রঙিন শার্ট পরা ছেলেটি হাত নাড়ল, 'এসে গেছি যখন তখন আর চিন্তা করবেন না। ট্রেন এলেই বডি ফেলে দেব—দুটো শোওয়ার জায়গা কব্জা করতে না পারলে আমার নাম গোবিন্দ না।'

ছেলেগুলো কথা বলছিল আর বার বার মেয়েটির দিকে তাকাচ্ছিল। মেয়েটির চোখে মুখে নানা রকম ঢং পর পর ঘোরাফেরা করছে। অনিমেষ দেখল ওরা এবার ওকেও লক্ষ্য করছে এবং দৃষ্টিটা ভাল নয়। সে মুখ ফিরিয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। তিনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন, যেন এই ছেলেগুলোর উপস্থিতি ওঁর কাছে কিছু নয়। ছেলেরা যে ওঁর সঙ্গে একটাও কথা বলেনি সেটা অনিমেষ লক্ষ্য করেছিল। ও এদের সম্পর্কটা ঠিক বুঝতে পারছিল না—এদের কাউকেই ও আগে দেখেনি।

এক সময় প্ল্যাটফর্মটা চঞ্চল হয়ে উঠল। দূরে আশ্রমপাড়া ছাড়িয়ে কোথাও ইঞ্জিন হুইসিল দিয়ে এগিয়ে আসছে। ওদিকের আকাশে কালো ধোঁয়া পাক খাচ্ছে। সরিৎশেখর এতক্ষণে কথা বললেন, 'তোমার ট্রেন এসে গেছে।'

হইহই চেঁচামেচির মধ্যে ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম জুড়ে দাঁড়াল। গাড়িটা কিন্তু আজ একদম খালি, এমন কি থ-কোচেও ভিড় নেই। তবু গোবিন্দরা লাফিয়ে কম্পার্টমেন্টে উঠে অনাবশ্যক চিৎকার করে জায়গা দখল ক'রল। অনিমেষ নিশ্চিন্তে জানলার পাশে একটা জায়গা পেয়ে জিনিষপত্র রেখে নিচে নামতে যাবে এই সময় ভদ্রমহিলা কন্যাসমেত ওপরে উঠে এলেন। অনিমেষকে দেখে বললেন, 'জায়গা পেয়েছ ?' ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল সে। 'বাথরুমটা কোথায় ? জল-টল আছে কিনা কে জানে !' কথাটা যেন শুনতে পায়নি এমন ভঙ্গীতে অনিমেষ নিচে নেমে এল। ওর মনে হচ্ছিল যাওয়াটা খুব সুখকর হবে না, এই মহিলা ওকে আচ্ছা করে খাটাবেন।

প্ল্যাটফর্মে দাদু দাঁড়িয়েছিলেন। ওকে দেখে বললেন, 'টিকিটটা তোমাকে দিয়েছি তো ?'

অনিমেষ বলল, 'হ্যাঁ।'

'তুমি গিয়েই চিঠি দেবে।'

'আচ্ছা।'

'আর বাইরের লোকের সঙ্গে বেশী আত্মীয়তা করার কোন প্রয়োজন নেই। সবার সঙ্গে মানসিকতায় নাও মিলতে পারে।' কথাটা শেষ করে তিনি ট্রেনের জানলার দিকে তাকালেন, সেখানে গোবিন্দরা খুব হইচই করছে। অনিমেষ দাদুর দিকে তাকাল। ও চলে যাচ্ছে অথচ দাদুর মুখ দেখে মনে হচ্ছে না তিনি একটুও দুঃখিত। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর সরিৎশেখর বললেন, 'এবার তুমি উঠে পড়,

এখনই ট্রেন ছেড়ে দেবে। জিনিসপত্র নজরে রাখবে—পথে চুরি-টুরি খুব হয়।'

এবার অনিমেষ নিচু হয়ে সরিৎশেখরকে প্রণাম করল। ওর হাত তাঁর শুকনো পায়ের চামড়া যেটুকু কাপড়ের জুতোর বাইরে ছিল সেখানে রাখতেই ও মাথায় স্পর্শ পেল। সরিৎশেখর দু'হাত দিয়ে তার মাথা ধরে বিড়বিড় করে কিছু কথা উচ্চারণ করছেন। অনিমেষ শেষ বাক্যটি শুনতে পেল, 'বিদ্যা দাও, বুদ্ধি দাও, হৃদয় দাও।' ও ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াতেই, সমস্ত শরীর সিরসির করে বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল, অনিমেষ আর নিজেকে সামলাতে পারল না, ঝরঝর করে জল দু'চোখ থেকে গালে নেমে এল। সরিৎশেখর সেদিকে তাকিয়ে খুব নিচু গলায় বললেন, 'চোখ মোছ অনিমেষ, পুরুষমানুষের কান্না শোভা পায় না।'

নিজেকে সামলাতে কষ্ট হচ্ছিল ওর, ঠোঁট বেঁকে যাচ্ছিল। এই মানুষটির সঙ্গে আজন্মকাল তার কেটেছে, তার সব কিছু শিক্ষা এঁর কাছে, অথচ আজ অবধি সে এঁকে ঠিক চিনতে পারল না। সরিৎশেখর ধীরে ধীরে একটা হাত তুলে অনিমেষের কাঁধে রাখলেন, 'অনিমেষ, আমি অশিক্ষিত এবং খুব গরীব। কিন্তু আমার পিতাঠাকুর আমাকে বলেছিলেন মানুষ হতে। আমি চেষ্টা করেছি, তোমাকেও সেই চেষ্টা করতে হবে। তুমি কলকাতায় গিয়ে শিক্ষিত হও, তোমার স্থিতি হোক সেটাই আমার আনন্দ। আমি যা পারিনি আমার ছেলেরা যা করেনি তুমি তাই কর। মানুষের জন্ম পূর্ণতার জন্যে, তোমার মধ্যেই সেটা আমি পেতে পারি। আমার জন্যে ভেবো না, যতদিন তুমি মাথা উঁচু করে না ফিরে আসছ ততদিন আমি বেঁচে থাকব। আই উইল ওয়েট ফর ইউ। যাও, তোমার গাড়ি হুইসল দিয়েছে।'

'দাদু, আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।'

'হয় ভাই, সহ্য করে নিলেই আনন্দ। যে-কোন সৃষ্টির সময় যন্ত্রণা যদি না আসে তাহলে সে সৃষ্টি বৃথা হয়ে যায়। তোমার আজ নতুন জন্ম হতে যাচ্ছে—কষ্ট তো হবেই।' সরিৎশেখর বললেন।

এই মুহূর্তে অনিমেষের অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করছিল, এই মানুষটিকে জড়িয়ে ধরে ছেলেবেলায় সে যেমন ঘুমোত তেমনি কিছু করতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু সে কিছুক্ষণ পাথরের মত মুখটার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে ফিরে দাঁড়াল। ও দেখল সেই ভদ্রলোক ট্রেন থেকে নেমে আসছেন। উনি কখন উঠেছিলেন তা সে লক্ষ্য করেনি। ভদ্রলোক নেমে বললেন, 'উঠে পড় ভাই, গাড়ি এখনিই ছাড়বে।'

একটা একটা করে সিঁড়ি ভেঙে অনিমেষ দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। সরিৎশেখর

এগিয়ে এলেন, 'চিঠি দেবে। আর হ্যাঁ, মহীকেও লিখবে।'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল। এই সময়ে ট্রেনটা হুইসল বাজিয়ে দুলে উঠতেই গোবিন্দরা ওর পাশ দিয়ে লাফিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে জানলার কাছে চলে গেল। খুব আস্তে ট্রেনটা চলছে। সরিৎশেখর লাঠি হাতে ওর সামনে হাঁটছেন। অনিমেষ কান্না গিলতে গিলতে বলল, 'দাদু!'

সরিৎশেখর বললেন, 'এসো ভাই। আমি অপেক্ষা করব।'

এক সময় আর তাল রাখতে পারলেন না সরিৎশেখর। ট্রেনটা গতি নিয়েছে। খানিক এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে এসেছে পৃথিবীতে। অনিমেষ ঝুঁকে পড়ে দাদুকে দেখতে লাগল। অনেক লোকের ভিড়ে নিঃসঙ্গ মানুষটা একা দাঁড়িয়ে আছেন। ও হাত নাড়তে গিয়ে থমকে গেল, সরিৎশেখর ডান হাতের পাঞ্জাবিতে নিজের চোখ মুছে পেছন দিকে হাঁটতে আরম্ভ করেছেন। অনিমেষ আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। হঠাৎ সমস্ত চরাচর যেন অস্পষ্ট, একটা সাদা পর্দার আড়ালে চলে গেল। স্টেশনের আলো, মানুষ সব মিলেমিশে একটা পিণ্ড হয়ে ছিটকে সরে গিয়েছে কখন, জলপাইগুড়ি শহরের বাড়ি-ঘর-দোর কেমন ছায়া-ছায়া, পাণ্ডাপাড়ার রেলক্রসিং বোধ হয় হুস করে বেরিয়ে গেল। যে কালো রাতটা চুপচাপ জলপাইগুড়ির ওপর নেমে এসেছে, এই ছুটন্ত ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে অনিমেষ তাকে দেখতে পাচ্ছিল না। দৃষ্টি যখন অগম্য হয় তখন কল্পনা স্রষ্টা হয়ে যায়। কিন্তু চেথের জলের আড়াল চোখের এত কাছে যে অনিমেষ দাদুর মুখকেই ভাল করে তৈরী করে নিতে পারছিল না। সন্ধ্যে পার হওয়ায় বাতাস এসে ওর ভেজা গালে শুধুই শীতলতা এনে দিচ্ছিল। অনিমেষ চোখ মোছার চেষ্টা করল না।

নিয়মিত শব্দের আয়োজন রেখে ট্রেনটা যখন প্রায় ফাটাপুকুরের কাছবরাবর চলে এসেছে ঠিক তখন অনিমেষ পেছনে কারো আসার শব্দ পেল। 'আরে তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ, আর আমি খুঁজে মরছি, কোথায় গেল ছেলেটা!' ও পেছন ফিরে ভদ্রমহিলাকে দেখতে পেল, বেসিনে হাত ধুতে ধুতে বলছেন। বাঁ হাতের কনুই-এ ঝোলানো তোয়ালেটা হাতে নিয়ে মহিলা কয়েক পা এগিয়ে এলেন, 'ওমা, তুমি কাঁদছিলে নাকি, একদম বাচ্চা ছেলে, মন-কেমন করছে বুঝি?'

চোখের জলের কথা খেয়াল ছিল না, অনিমেষ অপ্রস্তুত হয়ে গালে হাত দিল। দরজাটা বন্ধ করে সে এবার মহিলার পেছন পেছন ভেতরে চলে এল। পুরো কামরায় দশ-বারোজনের বেশী লোক নেই, ফলে যে যার শোওয়ার জায়গা পেয়ে

গেছে। মহিলারা একেবারে কোণায় জায়গা দখল করেছেন, অনিমেষ তার আগের খোপের সামনে দাঁড়াল। মহিলা ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি এখানে কেন, আমার ওখানে প্রচুর জায়গা আছে, চলে এসো, আবার কোন উটকো লোক এসে জুটবে হয়তো।' অনিমেষ মহিলার দিকে তাকাল, ট্রেনের দুলুনিতে ওঁর সমস্ত শরীরটা পুতুলের মত কাঁপছে। ওকে ইতস্তত করতে দেখে কপট রাগ করলেন মহিলা, 'কি হবে কি, শুনতে পাচ্ছ না? চলে এস।'

এখন কোন কথা বলতে ইচ্ছে করছে না, চুপচাপ জানলায় বসে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকলে ভাল লাগবে। অথচ মহিলা যেভাবে কথা বলছেন তাতে মুখের ওপর না বলা যায় না। ও তবু বলল, 'আপনি বসুন, আমি আসছি।'

নিজের খোপে এল অনিমেষ। ওর ছোট্ট ব্যাগ আর বেডিং কোণার দিকে রাখা আছে। সেগুলোকে সরিয়ে জানলার পাশে বসল ও। উল্টোদিকের বেঞ্চিতে একজন বুড়ো মতন মানুষ দুটো বাচ্চাকে নিয়ে বসে বিড়ি খাচ্ছে। চোখাচোখি হতে বলল, 'শিলিগুড়ি আর কটা স্টেশন বাবু?'

অনিমেষ বলল, 'তিন-চারটে হবে।' লোকটা বিড়ি জানলা দিয়ে ফেলে চোখ বন্ধ করল। হু-হু করে গাড়ি ছুটছে। বাইরের অন্ধকারে চোখ রাখল অনিমেষ। কিছুই দেখা যাচ্ছে না অথচ কালকে আকাশে চাঁদ ছিল। হঠাৎ চটপটি জ্বালার মত আকাশটাকে চিরে একটা আলো ঝলসে উঠতেই মাঠ গাছ পুকুর সামনে পলকের জন্য পরিষ্কার হয়ে মিলিয়ে গেল। আকাশ মেঘে ছেয়ে গেছে, আজ চাঁদ উঠবে না।

জলপাইগুড়ি শহর এখন অনেক পেছনে, ট্রেনের চাকার প্রত্যেকটা আবর্তনে কলকাতা এগিয়ে আসছে। আজ সারা বাংলা দেশে হরতাল হয়ে গেল। কিন্তু এ কেমন হরতাল? জলপাইগুড়িতে এর কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। তাহলে কি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কেউ কিছু করলে দেশের মানুষ তা সমর্থন করে না? কলকাতা শহরে আজ কি হয়েছে কে জানে। সেখানকার মানুষ আর জলপাইগুড়ির মানুষ কি আলাদা? অনিমেষ অন্ধকারের দিকে অলস ভাবে তাকিয়ে বিদ্যুতের খেলা দেখছিল। জলো হাওয়া দিচ্ছে, বোধ হয় বৃষ্টি নামবে। কলকাতায় বৃষ্টি হলে জল জমে যায়, খবরের কাগজে ছবি দেখেছে সে।

সামান্য পায়ের শব্দ সেই সঙ্গে মিষ্টি একটা গন্ধে অনিমেষ মুখ ফেরাল। ফেরাতেই ঝটপট সোজা হয়ে বসল সে। মেয়েটি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়ির দুলুনি সামলাতে এক হাতে বাঙ্কটা ধরায় ওকে বেশ বড়সড় দেখাচ্ছে।

'কি ব্যাপার, আপনার বুঝি আমাদের কাছে আসতে ইচ্ছে করছে না?' কথা

বলার ভঙ্গী এমন আদুরে যে বয়সের সঙ্গে মানায় না। শরীর বেশী রকম স্ফীত, স্কার্টের কাপড়ে টান পড়েছে। ওর হাত এবং হাঁটুর ওপর মুক্ত পা থেকে চোখ সরিয়ে নিল অনিমেষ। মেয়েটির মুখে নেপালী-নেপালী ছাপ আছে, চোখ দিয়ে হাসছে সে। 'কি হল, কথা বলছেন না কেন?'

'যাচ্ছি।' অনিমেষ ওঠার চেষ্টা করল।

'যাচ্ছি না, আমার সঙ্গে চলুন, মা আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছে।' একটুও নড়ছে না মেয়েটি, 'ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করলেই গুড বয় হতে হয়?'

'আমি মোটেই গুড বয় নই।' অগত্যা অনিমেষ ওর জিনিসপত্র দু'হাতে তুলে উঠে দাঁড়াল।

মেয়েটি সামান্য সরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনার নাম তো অনিমেষ, আমার নাম জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছে না?'

অনিমেষ কোনরকমে হুলুনি সামলে বলল, 'নাম কি?'

মুখে আঙুল চাপা দিয়ে খিলখিল করে হাসতে গিয়েই গিলে ফেলে বুড়োর দিকে চেয়ে চোখ বড় বড় করল, 'সুরমা। একদম সেকেলে নাম, না?'

অনিমেষ হেসে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। মেয়েটির পাশ দিয়ে আসবার সময় ওর খুব অস্বস্তি হচ্ছিল কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া হল না সুরমার। অনিমেষ মেয়েটিকে যত দেখছিল তত অবাক হচ্ছিল। এ মেয়ে সীতার মত নয়, এমন কি রম্ভা বা উর্বশীর সঙ্গে এর কোন মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মেয়েরা বোধ হয় এক একজন এক এক রকম হয়, কেউ বোধ হয় কারো মতন হয় না।

ওদের খোপে এসে অবাক হয়ে গেল অনিমেষ। মুখোমুখি দুটো বেঞ্চিতে লম্বা করে বিছানা পাতা হয়ে গেছে। জিনিসপত্র ওপরের বাঙ্কে তোলা। মহিলা বালিশে হেলান দিয়ে একটা রঙিন পত্রিকা পড়ছেন। অবাক হবার পালা অনিমেষের চলছেই, কারণ মহিলার পরনে সেই শাড়িটা নেই। এখন পা-ঝুল একটা আলখাল্লা পরে রয়েছেন উনি। ওকে দেখে পত্রিকা থেকে মুখ তুলে একগাল হাসলেন, 'এসো, সু না গেলে বোধ হয় আসতেই না। আচ্ছা ওই জিনিসপত্র ওপরের বাঙ্কে তুলে দাও।'

বাধ্য ছেলের মত অনিমেষ হুকুম তামিল করল। ততক্ষণে সুরমা অন্য বেঞ্চির জানলার ধারে বসে পড়েছে। মহিলা বললেন, 'বসে পড়, এখানেই বসো।' হাত দিয়ে নিজের সামনে থেকে চাদর সরিয়ে দিলেন মহিলা। অনিমেষ বসে মহিলার দিকে তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল। ওর চট করে মুভিং ক্যাসেলের মুখটা মনে পড়ল। ঠিক সেই একই দৃশ্য, মহিলার আলখাল্লার ওপরে অনেকখানি খোলা এবং

সেখানে রাজহাঁসের ডিমের মত দুটো মাংসপিণ্ড উঁচু হয়ে রয়েছে।

'তুমি কি খাবার এনেছ?'

'হ্যাঁ।'

'আমার সঙ্গেও আছে। তোমারটা আর খেতে হবে না। আমি ভাবছি এই সুখ আর কতক্ষণ কপালে সইবে। শিলিগুড়িতে গিয়ে দেখব হুড়মুড় করে হাজার লোক উঠে বসেছে। আমি আবার শাড়ি পরে রাত্রে ঘুমুতে পারি না।' মহিলা আবার পত্রিকার পাতায় চোখ রাখলেন।

অনিমেষ দেখল সুরমা ওর দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসছে। চোখাচোখি হতে বলল, 'শুনলাম আপনি কাঁদছিলেন, মায়ের জন্য মন-কেমন করছে বুঝি?'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, 'না।'

সঙ্গে সঙ্গে মহিলা পত্রিকা সরিয়ে চোখ বড় বড় করলেন, 'ওমা, তবে কার জন্যে?' কথা বলার ভঙ্গী এমন ছিল যে সুরমা খিলখিল করে হেসে উঠল। মহিলা কপট রাগের ভঙ্গী করে মেয়ের দিকে মুখ ফেরালেন, 'এই, তোকে বলেছি না এমন করে হাসবি না। মেয়েদের এরকম হাসি ভাল নয়।'

অনিমেষের অস্বস্তি বেড়ে গেল। এরা যেভাবে কথা বলছে তাতে তার সঙ্গে তাল রাখা ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি জেলা স্কুলের ছাত্র ছিলে?'

মাথা নাড়ল অনিমেষ, 'হ্যাঁ।'

'ওমা, তুমি আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলছ না কেন? অসুবিধে হচ্ছে?'

ঘাড় নেড়ে তাকাল অনিমেষ, সেই একই দৃশ্য। অনিমেষ হজম করার চেষ্টা করতে লাগল।

সুরমা বলল, 'জেলা স্কুল! উর্বশীদের আপনি চেনেন?'

থতমত হয়ে গেল অনিমেষ। তারপর ঘাড় নাড়ল, 'দেখেছি।'

'বাব্বা, জেলা স্কুলের সব ছেলে তো ওদের বাড়িতে সারাক্ষণ পড়ে থাকে।' ঠোঁট বেঁকিয়ে সুরমা কথা বলল, 'ওরা তো এখন কলকাতায়। আপনার সঙ্গে আলাপ নেই?'

অনিমেষ বলল, 'সামান্য।'

মহিলা ঘাড় নেড়ে বললেন, 'ওদের মা আমার বন্ধু। ভদ্রলোক তো সারা জীবন কংগ্রেস করে কাটালেন, মিসেস কর না থাকলে যে কি হত! তবু দ্যাখো, লোকে বদনাম দিতে ছাড়ে না। আমাদের এই দেশটাই এরকম। কেউ যদি

একটু সাজগোজ করল কি আধুনিক পোশাক পরল, ব্যাস চারধারে খই ফুটতে আরম্ভ হল। এই আমিই কি কম শুনেছি।'

শিলিগুড়িতে এসে ওদের গাড়িটা নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। এর আগে মহিলা জোর করে ওকে পরোটা আর শুকনো মাংস খাইয়েছেন। দারুণ রান্না। একটু ঝাল, বোধ হয় এঁরা অরিজিনালি বাঙাল। নিজের খাবারের কৌটোটা আর খোলা হয়নি। শিলিগুড়িতে গাড়ি থামলে ও ওঁদের ওয়াটার বটলটা নিয়ে জল আনতে প্ল্যাটফর্মে নামল। অল্প লোক স্টেশনে। এত বড় প্ল্যাটফর্ম এর আগে ছাখেনি অনিমেষ। চারধার নিওন আলোয় ঝকঝক করছে। এখনও বৃষ্টি নামেনি। কুলিরা কি সব কথা বলাবলি করছে। যদিও এর আগে কোনদিন সে এই স্টেশনে আসেনি, তবু ওর যেন মনে হল এই আবহাওয়া স্বাভাবিক নয়। বেশির ভাগ গাড়িই খালি। জল ভরে নিয়ে ওর হঠাৎ একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে করল। এর আগে কখনো একা একা সিগারেট খায়নি অনিমেষ। একটা স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে ও সিগারেট কিনে ধরাতে গিয়ে শুনল একজন লোক খুব উত্তেজিত গলায় বলছে, 'একটু আগে রেডিওতে বলল দুজন খুন হয়েছে। কলকাতায় গুলি চালালে মাত্র দুজন মরবে? অসম্ভব। শালারা খবর চাপছে।'

আর একজন বলল, 'তা হলে তো কাল কলকাতায় আগুন জ্বলবে। পাব্লিক ছেড়ে দেবে নাকি এরকম হলে?'

'আরে মশাই, আজ নাকি বাস পুড়িয়েছে তিনটে, রেডিওর খবর—বুঝে দেখুন।'

'হয়ে গেল, এই ট্রেন শেষ পর্যন্ত পৌছাবে কিনা দেখুন।'

আরো খবরের আশায় খানিক দাঁড়িয়ে থাকল অনিমেষ। কিন্তু ওরা আর কিছু বলছে না দেখে সে মুখ তুলে তাকাল। লোক দুটো কথা বন্ধ করে ওর দিকে চেয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই মুখ সরিয়ে নিয়ে দুজনে হাঁটতে লাগল। সে স্পষ্ট শুনতে পেল ওদের একজন চাপা গলায় বলছে, 'এসব জায়গায় কথা বলা ঠিক নয়, দিনকাল খারাপ, কে যে কি ধান্দায় ঘুরছে বলা মুশকিল।'

লোকগুলো কি ওকে সন্দেহ করল? কেন, সন্দেহ কেন? অনিমেষ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। ওর চেহারার মধ্যে কি এমন কোন চিহ্ন আছে যে অত বড় দুটো মানুষ ভয় পেয়ে যাবে? কিছুই বুঝতে না পেরে ও আস্তে আস্তে ফিরে আসছিল নিজের কামরার দিকে। কলকাতায় আজ পুলিস

গুলি চালাল কেন ? লোকেরা বাসই বা পোড়াতে গেল কেন খামকা, এই ট্রেন শেষ পর্যন্ত কলকাতায় যাবে না কেন ?

কামরায় উঠে ও চমৎকৃত হল। কখন যে একটু একটু করে গাড়িটা ভরে গিয়েছে বাইরে থেকে টের পায়নি সে। এবং শুধু মানুষই নয়, চিৎকার করে কথাবার্তা শুরু হয়ে গেছে এরই মধ্যে। একজন টাকমাথা মানুষ প্রথম খোপের বেঞ্চিতে বসে গলা তুলে বললেন, 'আরে মশাই, আমি নিজের কানে বাংলা খবর শুনেছি, লেফটিস্টরা স্ট্রাইক বানচাল হয়ে যাচ্ছে দেখে গুণ্ডামি করে ট্রামবাস পুড়িয়ে দিতে পুলিস বাধ্য হয়ে দু-এক রাউণ্ড ফায়ারিং করেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'দাদা কি স্পটে ছিলেন ? '

'আচ্ছা বুদ্ধি আপনার, দেখছেন এখানে বসে আছি, রেডিওতে বলল'— টাকমাথা খিঁচিয়ে উঠলেন।

'আমাদের পাড়ার এক ভদ্রলোক আজকের প্লেনে কলকাতা থেকে এসেছেন। তিনি বললেন কমপ্লিট স্ট্রাইক হয়েছে কলকাতায়। গবমেণ্ট জোর করে ট্রামবাস চালাতে চেষ্টা করে ফেল করেছে। কোন্ খবর বিশ্বাস করব বলুন ?' আর একটি কণ্ঠ বলে উঠল।

'আরে মশাই, আমি ভাবছি কাল শেষ পর্যন্ত কলকাতায় পৌঁছাতে পারব কিনা কে জানে। যদি পথে ট্রেন আটকে দেয়, অনেক টাকার টেণ্ডার হাতছাড়া হয়ে যাবে।'

'প্লেনে গেলে পারতেন।'

'সে চেষ্টা কি করিনি, টিকিট সব হাওয়া এই মওকায়।'

ওয়াটার বটল নিয়ে অনিমেষ কামরার শেষপ্রান্তে চলে এল। একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক ছাড়া সুরমাদের এখানে কেউ ভিড় করেনি। ওরা দুটো বেঞ্চি বেশ মেজাজেই দখল করে আছে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক মহিলার বেঞ্চির একটা কোণায় বসে আছেন। ওকে দেখে সুরমা বলে উঠল, 'এই, আমরা ভাবলাম যে অপনি নিশ্চয়ই পথ ভুলে গিয়েছেন।'

মহিলা বললেন, 'খুব কাজের ছেলে দেখছি, এত ভাবাও কেন ?'

অনিমেষ উত্তেজিত গলায় বলল, 'আজ কলকাতায় খুব গোলমাল হয়েছে স্ট্রাইক নিয়ে, বাস পুড়েছে, গুলিতে লোক মারা গিয়েছে।'

মহিলা আঁতকে উঠলেন, 'সে কি! তাহলে কি হবে ?'

এই সময় ট্রেনটা দুলে উঠে চলতে শুরু করল। সুরমা জানলা দিয়ে সরে যাওয়া স্টেশনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কলকাতায় হয়েছে তো আমাদের কি,

আমরা তো শান্তিনিকেতনে যাচ্ছি।'

এতক্ষণ বৃদ্ধ ভদ্রলোক চুপচাপ ওদের লক্ষ্য করছিলেন, এবার উদাস গলায় বললেন, 'নগর পুড়লে কি দেবালয় এড়ায়? পথে যখন নেমেছি তখন আর ভেবে কি লাভ, যা হবার তা হবে।'

কথাটা অনিমেষের ভাল লাগল। ওকে সুরমা বসার জায়গা দিয়েছিল। বৃদ্ধের মুখোমুখি বসে ও জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কোথায় যাবেন?'

'কলকাতায়। তুমিও বোলপুরে?'

'না, আমি কলকাতায় যাব।'

'কলকাতায় কোথায়?'

ঠিকানাটা স্যুটকেসে থাকলেও রাস্তার নাম ওর মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। অনিমেষ বলল, 'সাত নম্বর হরেন মল্লিক লেন, কলকাতা বারো।'

বৃদ্ধ হেসে ফেললেন, 'তুমি কলকাতায় এর আগে যাওনি, না?'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, 'না। বাবার এক বন্ধু স্টেশনে আসবেন।'

'তোমার ঠিকানা থেকে আমার বাড়ি পাঁচ মিনিটের রাস্তা, স্টেশনের কাছেই বউবাজারে। কলকাতায় পড়তে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'অন্য দিন হলে ট্রেনে জায়গা পাওয়া যেত না, আজ গড়ের মাঠ। প্যানিক একেই বলে। এবার একটু শোয়ার ব্যবস্থা করা যাক। আমি বরং ওপরের বাঙ্কে উঠে পড়ি, একদম কাল সকালে মনিহারিঘাট না এলে উঠছি না।' উপযাচক হয়েই অনিমেষ বৃদ্ধকে সাহায্য করল। সমস্ত মালপত্র একটা বাঙ্কে জমা করে বৃদ্ধের জায়গা অন্যটায় করে দিল। ওর নির্দিষ্ট ঠিকানার কাছাকাছি একটা মানুষকে পেয়ে বুকে এখন বেশ সাহস এসেছে। যদি বাবার বন্ধুকে স্টেশনে চিনতে না পারে তা হলে আর জলে পড়তে হবে না।

রাত বাড়লে ছুটন্ত কামরায় একট অদ্ভুত নির্জনতা সৃষ্টি হয়। ফাঁকা মাঠ অথবা নদীর ওপর দিয়ে যেতে যেতে রাতের রেলগাড়ি গম্ভীর শব্দে চরাচর কাঁপিয়ে যায়, তখন চুপচাপ বসে থাকা বড় মুশকিল। এখন কামরা ভরতি ঘুম, কেউ কোন কথা বলছে না। মাঝে মাঝে অজানা অচেনা স্টেশনে গাড়ি থামছে, কখনও ফেরিওয়ালার চিৎকার, কখনো তাও নেই। এই কামরায় যাত্রীরা সম্ভাব্য ভয়ের হাত থেকে নিশ্চিন্ত হবার জন্য দরজা লক করে রাখায় কাটিহার স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম থেকে কেউ কেউ ধাক্কা দিয়ে খোলার চেষ্টা করেছিল। নিশ্চয়ই তখন অবধি দরজার নিকটবর্তীরা জেগে ছিলেন কিন্তু দরজা খোলা হয়নি। এখন ট্রেনের

ঢুলুনিতে চাকার শব্দে আর বাইরে আকাশভাঙা বৃষ্টির শীতলতায় সমস্ত কামরা গভীর ঘুমে অচেতন।

ওর শোয়ার ব্যবস্থা করার জন্য মহিলা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ওপরের একটা বাঙ্ক থেকে মালপত্র নামিয়ে শোয়া যেত কিন্তু অনিমেষের আর পরিশ্রম করতে ইচ্ছে করছিল না। ওর আজকের রাত্রে ঘুমাতে একটুও ইচ্ছে করছিল না। শেষ পর্যন্ত মহিলা তাকে পায়ের কাছে অনেকটা জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন, ইচ্ছে করলে আধশোয়া হয়ে গড়িয়ে নিতে পারে। ওপরের বাঙ্কে বৃদ্ধের নাক ট্রেনের চাকার শব্দের সঙ্গে তাল রেখে চমৎকার ডেকে যাচ্ছে। প্রথম দিকে অসুবিধে হচ্ছিল, এখন এই নির্জনতায় সেটা খাপ খেয়ে গেছে। মহিলা দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরে চাদর মুড়ি দিয়ে গুটিসুটি হয়ে ঘুমোচ্ছেন। এখন ওঁকে একদম অন্যরকম লাগছে। মানুষের ঘুমই বোধ হয় তাকে সরলতা এনে দিতে পারে। অন্য বেঞ্চিতে সুরমা চিত হয়ে শুয়ে আছে। চাদর গলা অবধি টানা।

বৃষ্টি সমস্ত শরীরে মেখে ছুটন্ত রেলগাড়িতে এখন শীতল বাতাস ঢুকছে। যদিও জানলার কাঁচ নামানো তবু কোথাও বোধ হয় ছিদ্র আছে। অনিমেষ অলস ভঙ্গীতে সামনের বেঞ্চিতে পা তুলে দিয়ে জানলায় চোখ রাখল। পুরু জলের ধারা কাঁচটাকে ঘোলাটে করে দিয়েছে। এখন দাদু নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছেন। পিসীমা? অত বড় বাড়িতে দুজন বৃদ্ধ মানুষ বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত এই রাত্রে—শুধু এই রাত কেন, বাকি জীবন কি ভাবে কাটাবেন! আই উইল ওয়েট ফর ইউ! অনিমেষের এই কথাটা মনে আসতেই কেমন কান্না পেয়ে গেল।

হঠাৎ ও টের পেল পায়ের ওপর কিসের স্পর্শ, মৃদু চাপ দিচ্ছে। ও ত্রস্তে পা সরিয়ে নিয়ে চোখ খুলতেই কিছু বুঝতে পারল না। সামনে সুরমা ঘুমুচ্ছে। ঘুমের ঘোরে কি ওর পায়ের সঙ্গে পা লেগেছে? সেই সময় সুরমা চোখ খুলল, তারপর খুব চাপা গলায় বলল, 'ঘুম আসছে না?'

অনিমেষ হেসে মাথা নাড়ল।

'কার জন্যে মন-কেমন করছে?'

'কারো জন্য নয়।'

'ধ্যেৎ, মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে। আমার যে তাই হচ্ছে, একদম ঘুম আসছে না।'

'কেন?'

লজ্জা-লজ্জা মুখ করল সুরমা, তারপর বলল, 'সব ছেড়ে যেতে কারো ভাল লাগে?'

'শান্তিনিকেতনে গেলে ভাল লাগবে।'

'মা ঘুমুচ্ছে ?'

'হ্যাঁ।' অনিমেষ মহিলার দিকে তাকাল।

'গোবিন্দদাকে কেমন লাগল ?' ফিসফিস করে বলল সুরমা।

'ভাল, কেন ?'

'বাবা বলে, গুণ্ডা বদমাস।' তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'মা বলে, মেয়েরা নাকি কচুরিপানার মত, যে-কোন জায়গায় ঠিক জায়গা করে নেয়।'

অনিমেষ কি বলবে বুঝে উঠতে পারল না। ওর হঠাৎ সীতার কথা মনে পড়ল। সীতা এখন কি করছে ? বুকের মধ্যে হুড়মুড় করে যেন সমস্ত ট্রেনটা ঢুকে পড়ল। ও প্রচণ্ড অস্বস্তিতে উঠে দাঁড়াল। ভাল লাগছে না, কিচ্ছু ভাল লাগছে না। পাশ ফিরতেই ও সোজা হয়ে দাঁড়াল। চাদরের তলায় সুরমার সমস্ত শরীরটা কাঁপছে। ও চট করে সুরমার মুখের দিকে তাকাল। একটা হাত ভাঁজ করে চোখের ওপর চাপা দেওয়া আর ছুটো গাল ভিজিয়ে টিপে রাখা ঠোঁটের দিকে জল গড়িয়ে আসছে। অনিমেষ হতভম্ব হয়ে গেল।

এই সময় কোন বিরাট নদীর ওপর ট্রেন উঠে এল। চারধারে গমগম আওয়াজ কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছিল। কারো কান্না দেখলেই চোখে জল এসে যায় কেন ? অনেক দিন বাদে হঠাৎ সেই লাইনগুলো মাথার মধ্যে ছুটে এল, 'আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ঘর নাই, বাড়ি নাই—আমাদের আছে কেবল সুজলা সুফলা মলয়জসমীরণশীতলা—।' জোরে গলা খুলে এই লাইনগুলো উচ্চারণ করলেও পুলের ওপর ছুটে যাওয়া রেলগাড়ির শব্দে কেউ শুনতে পাবে না। কিন্তু মনে মনে লাইনটা মনে করতে গিয়েই থমকে দাঁড়াল অনিমেষ। এখন আর এই লাইনগুলো একদম সান্ত্বনা এনে দেয় না, বুকে জোর পাওয়া যাচ্ছে না একটুকুও। কেন ? কেন এরকম হল ? হঠাৎই যেন অনিমেষ আবিষ্কার করল তার কিছু একটা খোয়া যেতে বসেছে।

মনিহারিঘাট স্টেশনে যখন ট্রেন থামল তখন সূর্য উঠব-উঠব করছে, আকাশ পরিষ্কার। মহিলা খুব চটপটে, খানিক আগেই মেয়েকে নিয়ে বাথরুমে গিয়ে ছিমছাম হয়ে এসেছেন। বিছানাপত্র গুছিয়ে অনিমেষকে ভাই সোনা বলে সেগুলোকে বাঁধিয়ে জানলার পাশে বসে আকাশ দেখছিলেন। আজ সকালে পরা চমৎকার কমলারঙের শাড়ির ওপর কচি কলাপাতা রোদ এসে পড়ায় ওঁকে খুব সুন্দরী মনে হচ্ছে। সুরমা পোশাক পাল্টায়নি, রুক্ষ চুল কপালের ওপর থেকে

সরিয়ে বলল, 'কি নাইস বালির চর, না?'

অনিমেষের কাল নির্ঘুম রাত কেটেছে এখন ভোরের হাওয়ায় ভাল লাগছিল। বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে এসে ও দেখল দু ধারে গাছপালা ঘরবাড়ি কিছুই নেই, যেন মরুভূমির ওপর দিয়ে ট্রেনটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। এই সময় ওপর থেকে বৃদ্ধ ভদ্রলোক নেমে এলেন, 'ঘাট এসে গেছে? আঃ, ফার্স্ট ক্লাস ঘুম হল।' তারপর নিচু হয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েই সোজা হয়ে বাথরুমের দিকে ছুটে গেলেন।

সুরমার কথাটা কানে গিয়েছিল। তাই ও বলল, 'এখন নদী পার হতে হবে।'

মহিলা মুখ বিকৃত করলেন, 'বদারেশন। এখানকার কুলিরা খুব ডেঞ্জারাস।'

মহিলা যখন এ ধরনের কথা বলেন তখন তাঁকে মোটেই সুন্দর দেখায় না, বরং খুব কুটিল মনে হয়। কথাটা বলে এই যে উনি উদাস হয়ে সূর্যের দিকে তাকালেন তখন ওঁকে খুব সুন্দরী লাগছে, বিশেষ করে সকালবেলায় এই শাড়িটা পরায় সুরমার মা বলে ভাবতে ইচ্ছে করছে না। সুরমার দিকে তাকাল অনিমেষ, কাল রাত্রে ও চুপচাপ অনেকক্ষণ মেয়েটাকে কাঁদতে দেখেছে। অবাক কাণ্ড। খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে উঠে হঠাৎ ওইসব কথা বলে কাঁদতে লাগল আবার কাঁদতে কাঁদতেই ঘুমিয়ে পড়ল। এখন এই সকালে ওকে দেখলে সে-সব কেউ বিশ্বাসই করবে না।

গাড়ি মনিহারিঘাটে থামতেই চারধারে হইচই শুরু হয়ে গেল। গোলমালটা স্বাভাবিক নয়, অনিমেষ জানলা দিয়ে মুখ বের করে দেখল অসংখ্য স্বাস্থ্যবান কুলি সবাইকে ঠেলেঠুলে গাড়িতে ওঠার চেষ্টা করছে। যাত্রীরা যাঁরা নামতে চাইছেন ওদের বিক্রমের কাছে নাজেহাল হয়ে পড়ছেন। চট করে মনে হয় বুঝি কিছু লোক ক্ষেপে গিয়ে ট্রেন আক্রমণ করেছে। এই সময় বৃদ্ধ ভদ্রলোক ফিরে এসে বললেন, 'যে যার জায়গায় বসে থাকুন, ভিড় কমে গেলে নামবেন, নইলে কুলিদের সামলাতে পারবেন না।' ওঁর কথা শেষ না হতেই চার-পাঁচজন কুলি এসে পড়ল ওদের মধ্যে; প্রত্যেকেই হাত বাড়িয়ে মালপত্রের দখল নেবার চেষ্টা করছে। মহিলা বোধ হয় ভয় পেয়ে অথবা রেগে গিয়ে চিৎকার করতে লাগলেন। সুরমা মুখে হাত চাপা দিয়ে বসে। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ ভদ্রলোক ওদের সামলালেন। একটা কুলির মালপত্র দুজনে বয়ে নিয়ে যাবে বলে আবদার করছে। অনিমেষের জিনিসপত্র সে নিজেই বইতে পারে কিন্তু কুলি যখন দুজন করতেই হবে তখন মহিলা ওকে আলাদা নিতে দিলেন না। বৃদ্ধ বললেন, 'আগে দর ঠিক করে তবে মাল তুলতে দেবেন।'

কথাটা বলতেই ওরা বিনয়ে গলে গেল, যা দেবে অনিমেষরা তাই ওরা নেবে।

বাকী কুলিরা অন্যত্র চলে গেলে শেষ পর্যন্ত ওরা বলল, কুলি পিছু দশ টাকা চাই। প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে দরকষাকষি করার পর সেটা অর্ধেকে নামিয়ে ওরা ট্রেন থেকে নামল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, 'শিলিগুড়িতে এই মালপত্র আট আনায় বওয়ানো যেত। এখানে টেন টাইমস বেশী। ভারতবর্ষের ইকোনমি কোন দিন সমান হবে না।' অনিমেষ কুলিদের দেখল, বেশ সহজভাবে ওরা হাঁটছে। এরকম চার-পাঁচবার মাল বইলেই ওরা মাসে ছয়-সাতশ' টাকা রোজগার করতে পারে। এম-এ পাস করেও এত মাইনে সকলে পায় না। এখানে কোনদিন হরতাল হয় না বোধ হয়।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকের পাশাপাশি হাঁটছিল অনিমেষ। এখানে কোন স্টেশন নেই। বোঝাই যায় অস্থায়ী রেললাইন বসানো হয়েছে। বৃদ্ধ বললেন, প্রায়ই ঘাট বদলায় তাই স্টেশন করার মানে হয় না। এমন কি এই যে দু পাশের চাটাই-এর দোকানগুলো, এরাও ঘাট বুঝে সরে সরে যায়। ওদের দেখে দোকানদাররা চিৎকার করে ডাকাডাকি করছে চা-সিঙ্গাড়ার লোভ দেখিয়ে। বর্ষাকালে ইলিশ মাছ আর ভাত নাকি এসব দোকানের মত আর কোথাও পাওয়া যায় না।

পিঁপড়ের সারির মত যাত্রীরা বালির চরে হেঁটে যাচ্ছিল। এদিকে বোধ হয় বৃষ্টি হয়নি। শুকনো বালি বাতাসে উড়ছে। দুটো কুলিকে অনেকটা এগিয়ে যেতে দেখে অনিমেষ ওদের ধরার জন্য দৌড়াল। মহিলা আর সুরমা পাশাপাশি দ্রুত হাঁটছেন। ট্রেনটাকে কাল খালি বলে মনে হয়েছিল কিন্তু এখন যাত্রীদের সংখ্যা খুব নগণ্য মনে হচ্ছে না। এখনও ঘাট চোখে পড়ছে না।

কুলিদের ধরে ফেলল অনিমেষ। একজন মহিলা বোধ হয় বালিতে ভাল হাঁটতে পারছিলেন না, তাঁর স্বামী কোনরকমে তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। একজন বিশালবপু মাড়োয়ারী ইজিচেয়ারে শুয়ে চারজন কুলির ওপর ভর করে চলেছেন। তাঁর দুই হাত বুকের ওপর জোড় করা চোখ বন্ধ। অনিমেষ সামনে তাকিয়ে সূর্যদেবকে লক্ষ্য করল। বিরাট সোনার থালার মত দিগন্তরেখার ওপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে। চট করে দেখলে অবিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে। দু পাশে ধু-ধু বালির চরে এই যাত্রীরা ছাড়া কোন মানুষ নেই। নির্জন এই প্রান্তরে চুপচাপ আকাশে উঠে বসে সূর্য আলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে। হঠাৎ সেই ছেলেবেলায় দাদুর সঙ্গে তিস্তার তীর ধরে হেঁটে গিয়ে সূর্যোদয়ের দর্শক হবার স্মৃতিটা মনে পড়ল অনিমেষের। মনটা এত চট করে খারাপ হয়ে যায়! কেন যে কোন ভাল জিনিস দেখলেই ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায়! সূর্য আস্তে আস্তে রঙ পাল্টাচ্ছে, সেই ছেলেবেলার মত ওর শরীরে যেন জলুনি শুরু হয়ে গেছে। হঠাৎ অনিমেষের মনে

হল এই সময়ের মধ্যে সে কত বড় হয়ে গিয়েছে, দাদু আরো বৃদ্ধ হয়েছেন কিন্তু সেই সময়ের সকালবেলাগুলো, সূর্য ওঠার ভঙ্গীটা ঠিক একই রকম রয়েছে। ওদের বোধ হয় কখনও বয়স বাড়ে না, মানুষের হার এখানেই।

যেন ওদের দেখেই তাড়াতাড়ি আসার জন্য স্টিমারটা হুইস্‌ল বাজাচ্ছিল। বেশ গম্ভীর, জেঠামশাই টাইপের গলা। এর আগে কখনও স্টিমার দেখেনি অনিমেষ, তিস্তায় একবার একটা বোট এসেছিল। তার ইঞ্জিনের ঘড়ঘড় শব্দটা মনে আছে। এখন এই স্টিমারটাকে দেখতে ওর বেশ ভাল লাগল। অনেকটা লম্বা, লালে হলুদে সূর্যের আলো পড়ায় খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। পিলপিল করে মানুষেরা পাটাতনের ওপর দিয়ে ওর বুকে ঢুকে যাচ্ছে। এখানে কোন ঘর-বাড়ি নেই, দূরে কিছু খড়ো জঙ্গল। যাত্রীদের কেউ কেউ ঝটপট জলে নেমে দু-একটা ডুব দিয়ে নিল গঙ্গায়, কুলিদের পেছন পেছন অনিমেষ ডেকে উঠে এল। চারধারে দড়ি লোহার বিম ছড়ানো, এর মধ্যেই সবাই জায়গা করে নিয়েছে। কুলি দুটো এক জায়গায় মালপত্র নামিয়ে পয়সার জন্য তাগাদা দিচ্ছিল, অনিমেষ ওদের অপেক্ষা করতে বলল। সুরমারা এখনও আসছে না কেন? ক্রমশ ভিড়টা বাড়ছে। ও দেখল কিছু সুবেশী মানুষ ভিড় বাঁচিয়ে দোতলায় চলে গেল। সেখানে সবাই উঠছে না। সুন্দর লোহার সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে ও অনুমান করে নিল, ওপরটা নিশ্চয়ই প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত। নিচের তলায় হইচই হচ্ছে খুব। ওপাশে দুটো চায়ের স্টলের সামনে প্রচণ্ড ভিড়। অনিমেষ লক্ষ্য করল, যেন পুরো ভারতবর্ষটাই উঠে এসেছে এখানে, বাঙালী, বিহারী, মাদ্রাজী থেকে ভুটিয়ারা পর্যন্ত সবাই গায়ে গা লাগিয়ে বসে আছে।

শেষ পর্যন্ত সুরমারা এল। তখন স্টিমার ঘন ঘন হুইস্‌ল দিচ্ছে। ভিড় সরিয়ে মহিলা যখন চারদিকে ওকে খুঁজছিলেন তখন অনেকের চোখ ওঁর ওপর এঁটে ছিল। অনিমেষকে দেখতে পেয়ে কাছে এসে ছেলেমানুষের মত হেসে বললেন, 'হিমালয় থেকে একজন সাধু এসেছেন, দেখেই মনে হয় খুব খাঁটি মানুষ।'

সুরমা বলল, 'সাধুরা খাঁটি হলে মানুষ থাকে না, মহামানব হয়ে যায়।'

মহিলা ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়ের দিকে একবার তাকিয়ে যেন মনে পড়ে গেছে এরকম ভঙ্গীতে বললেন, 'আরে, এখানে মালপত্র নামিয়েছ কেন? ওপরে চল। এই বাজারের মধ্যে দু ঘণ্টা থাকলে আমি মরে যাব।'

কুলিদের তাগাদা দিয়ে মালপত্র তুলিয়ে তিনিই প্রথমে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চললেন। অনিমেষ সুরমার সঙ্গে ওঁর পেছনে যেতে যেতে বলল, 'ওপরটা বোধ হয় ফার্স্ট ক্লাস। আমাদের উঠতে দেবে?'

সুরমা মুখ টিপে হেসে বলল, 'মা ঠিক ম্যানেজ করে নেবে।'

দোতলায় সিঁড়ির মুখে স্টিমার কোম্পানির একজন হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। মহিলা তাঁর সামনে গিয়ে ঘাড়টাকে সামান্য বেঁকিয়ে বললেন, 'ও, নিচে দমবন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। ওপরে জায়গা নেই?'

ভদ্রলোক থতমত হয়ে কোনরকমে বললেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আজকে ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জার কম। ওপাশটা একদম খালি আছে।'

সঙ্গে সঙ্গে মহিলা হাত বাড়িয়ে কুলিদের নির্দেশ দিলেন রেলিং-এর ধার ঘেঁষে একটা খালি সোফার সামনে জিনিসপত্র রাখতে। কুলিরা বিনা বাক্যব্যয়ে হুকুম তামিল করতেই অনিমেষ আর সুরমা ওদের সঙ্গে এসে সোফায় বসল। অনিমেষ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল মহিলা ভদ্রলোকের সঙ্গে মিষ্টি করে কি সব কথা বলতেই ভদ্রলোক হেসে ঘাড নাডলেন। যেন এইমাত্র পলাশীর যুদ্ধটা জিতে গেছেন এই রকম ভঙ্গিতে ওদের কাছে ফিরে এসে মহিলা বললেন, 'চিরকাল ফার্স্ট ক্লাসে যাওয়া-আসা করেছি, এরা সবাই আমাকে চেনে। নিচে নরককুণ্ড।'

এবার একজন কুলি অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠল, 'রুপিয়া দিজিয়ে, মেমসাব।'

যেন মনে পড়ে গিয়েছে এই রকম একটা ভঙ্গি করে ব্যাগ খুললেন মহিলা, তারপর একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে সামনে ধরলেন। কুলি দুটো বেজায় খেপে উঠল; তারা বলতে লাগল দশ টাকা দেবার কথা হয়েছে এবং ওরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করায় আর মাল বইতে পারেনি আর এখন পাঁচ টাকা বাডিয়ে দেবার কারণটা কি? মহিলা পুতুলের মত মাথা নেড়ে বললেন যে, নোটিস বোর্ডে লেখা আছে কুলিদের রেট কি! এই মাল সেই মত ওজন করে যা পডবে তিনি তাই দেবেন। অনেকক্ষণ ঝগডা চলতে লাগল। অনিমেষ দেখল দোতলায় মুষ্টিমেয় যাত্রীরা ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। খুব অস্বস্তি হচ্ছিল অনিমেষের। যদিও কুলিরা বেশী নিচ্ছে তবু যখন একবার কথা হয়েই গিয়েছে তখন আর এমন করার কোন অর্থ হয় না। ও ওদের ঝগড়ার মধ্যে কোন কথা বলছিল না। শেষ পর্যন্ত সুরমাকে বলতে শুনল, 'মা, টাকাটা দিয়েই দাও।'

কিন্তু ভদ্রমহিলার অসম্ভব ধৈর্য, শেষ পর্যন্ত কুলিদের ছয় টাকায় রাজী হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। যাওয়ার সময় অনিমেষ শুনল, ওরা চাপা গলায় বোধ হয় গালাগালি দিতে দিতে চলে গেল। এবার মহিলা ধপ করে ওর পাশে এসে বসলেন, 'কি পুরুষমানুষ বাবা, আমি এতক্ষণ একা ঝগড়া করে গেলাম, একটাও কথা বলল না।'

অনিমেষ প্রথমে বুঝতে পারেনি, মহিলা এবার ওর গায়ে খোঁচা দিলেন, 'এই

যে, তোমাকে বলছি।'

অনিমেষ সোজা হয়ে বসে বলল, 'না মানে, আপনি তো কথা বলছিলেন তাই—।' এই প্রথম কোন মহিলা তাকে পুরুষমানুষ বলল। ও চট করে একবার সুরমাকে দেখে নিল। ডানদিকে রেলিং ধরে একদম খাটো প্যান্ট আর লাল গেঞ্জি পরা একটা ছোকরা সাহেব প্যান্ট পরা এক মেমসাহেবের সঙ্গে গল্প করছে—সুরমার চোখ সেদিক থেকে সরছে না। মহিলা সমস্ত শরীর সোফায় এলিয়ে দিয়ে সামনে তাকালেন। ওরা গঙ্গার দিকে মুখ করে বসে, ঘাট দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। চট করে বোঝা যায় না এই নদীর অপর পাড় আছে কিনা। ঘোলা জলের ঢেউগুলো নাচতে নাচতে চলে যাচ্ছে। এ পাড় মনিহারি, অন্য পাড় সকরিকলি। অনিমেষের মনে হল সমুদ্র বোধ হয় এই রকম। ওর হাতে নাকি বিদেশ যাত্রার রেখা আছে। বেশ হতো যদি এই স্টিমার গঙ্গা নদী দিয়ে সমুদ্রে সেখান থেকে ভারত মহাসাগর, অতলান্তিক বেয়ে ইংলণ্ড আমেরিকা চলে যেত। ও দেখল একটা লম্বাটে ধরনের পাখি ছোঁ মেরে জল থেকে মাছ তুলে নিয়ে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে পাড়ের দিকে উড়ে গেল।

মহিলা বললেন, 'এবার চা না খেলে মাথা ধরবে। অনিমেষ, বেয়ারাকে বলে এসো তো।' চায়ের কথায় অনিমেষের খেয়াল হল সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। এখানে জিনিসপত্রের দাম কি রকম? যদি খুব বেশী হয় তাহলে নিচ থেকে খেয়ে এলেই হতো। ওকে উঠতে দেখে মহিলা বললেন, 'ঠিক আছে চলো, রেস্তোরাঁতেই খেয়ে আসি। জাহাজটা ঘুরে দেখা যাবে। হ্যাঁরে, তুই চা খাবি?'

সুরমা সাহেবদের দিকে মুখ রেখেই বলল, 'নাঃ। আমার জন্য একটা কেক এনো। আমার উঠতে ভাল লাগছে না।'

'সকালবেলায় চা না খেয়ে কি ভাবে থাকিস বাবা, কে জানে! যাক, মালপত্র-গুলো দেখিস তাহলে, আমরা আসছি।'

অনিমেষ উঠতেই কান ফাটিয়ে হুইস্‌ল বেজে উঠল। স্টিমার এবার ছাড়ছে। চিৎকার চেঁচামেচির মধ্যে ওরা পায়ের তলায় দুলুনি অনুভব করল। ঘড় ঘড় শব্দে কোথাও ইঞ্জিন চলছে, রোদে সমস্ত গঙ্গা এখন উজ্জ্বল। অনিমেষ দেখল ওপরের ডেকে যাঁরা বসে আছেন তাঁদের মধ্যে কোন উত্তেজনা নেই। এঁরা কথা বলেন চাপা গলায়। একজন বিরাট চেহারার মাড়োয়ারীকে ও শুধু নিঃশব্দে ঘুমুতে দেখল। এখানে কেউ কাউকে দেখছে না, যেন প্রত্যেকে প্রত্যেকের অস্তিত্ব ভুলে বসে আছে। বেয়ারারা চায়ের ট্রে নিয়ে ঘোরাফেরা করছে। খুব অস্বস্তি হচ্ছিল অনিমেষের। এই পরিবেশ ওর কাছে একেবারে নতুন।

রেস্তোরাঁয় ভিড় নেই। মাত্র দুজন মানুষ বসে আছেন জানলায়। খুব চাপা গলায় ওঁরা কিছু আলোচনা করছিলেন, অনিমেষদের ঢুকতে দেখে কথা বন্ধ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। ওঁদের ভঙ্গিটা অনিমেষের ভাল লাগল না। রেস্তোরাঁর জানলায় বসলে বাইরেটা পরিষ্কার দেখা যায়। মহিলা আর ও পাশাপাশি বসতেই বয় ছুটে এল। দুটো ওমলেট টোস্ট আর চা বললেন তিনি, 'জানো অনিমেষ, সকালবেলায় আমার একটা করে ডিম চাই। এমনিতে আমি খুব লাইট খাবার খাই। ওজন বেড়ে যাচ্ছে খুব। আমি বাবা মিসেস কর হতে চাই না।'

এই প্রথম এরকম সাহেবী রেস্তোরাঁতে অনিমেষ এল। পরীক্ষার পর মন্টুর সঙ্গে রূপশ্রীর পাশে একটা দোকানে ওরা কাঁটাচামচ দিয়ে খাওয়ার অভ্যেস করেছিল। খাবার এলে ও সেটাকে কাজে লাগাল। মহিলা বললেন, 'তোমাকে যেন আমি এর আগে কোথায় দেখেছি, কিছুতেই মনে করতে পারছি না।'

চট করে হাত কেঁপে উঠল অনিমেষের। ও মন দিয়ে খাওয়া শুরু করল। এখনও চোখ বন্ধ করলে সে কুষ্ঠরোগীটাকে দেখতে পায়। এই মহিলা যদি সেই ঘটনার কথা মনে করতে পারেন তাহলে নিশ্চয়ই আর এখানে বসে থাকবেন না। নাকি এতদিন পরেও অনিমেষ সুস্থ আছে দেখে নিজের ব্যবহারের জন্য লজ্জিত হবেন। তবু অনিমেষ ঠিক করল সে চেনা দেবে না। মহিলা নিজের মনে বললেন, 'জলপাইগুড়ির ছেলেরা যা হয়েছে না, আমি অবাক হয়ে যাই। আমাদের সময় এরকম ছিল না। তাই তো আমি সুরমার ভাইকে কার্শিয়াং-এ পাঠিয়ে দিয়েছি পড়তে।'

অনিমেষ সেই গোলালুর সন্ধান পেয়ে মাথা নাড়ল। তখনই তো সে ওর সমান ছিল, এখনও স্কুলে পড়ছে? অবশ্য মিশনারি স্কুলের নিয়মকানুন ও জানে না।

'এই ছেলে, একদম মুখ নিচু করে খাচ্ছ যে, কথা বলবে না?'

মুখ তুলল অনিমেষ, আবার সেই দৃশ্য। মহিলা যেভাবে বসে আছেন তাতে তাঁর বুকের কাপড় জায়গায় থাকছে না। অতখানি সাদা উঁচু জায়গা এমন চট করে লজ্জা এনে দেয় কেন? তিস্তার পাড়ে অথবা স্বর্গছেঁড়ায় অনেক দেহাতী মেয়ে অথবা ভিখিরীদের নগ্ন বুক দেখেছে ও, তখন তো এরকম হতো না। হঠাৎ মহিলা হাসলেন, 'আমার বয়স কত বল তো?'

ওমলেট খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, চায়ের কাপ টেনে নিয়ে অনিমেষ বলল, 'বলতে পারব না।'

এমন ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন তিনি যেন অনিমেষকে নিয়ে কি করবেন বুঝতে

পারছেন না, 'থার্টিফাইভ। আমাকে অতটা দেখায় ?'

'না।' অনিমেষ হাসল।

'সুরমাটা একদম বাপের মত হচ্ছে, চেহারার দিকে যত্ন না নিলে বেঁচে থেকে লাভ কি ? কলকাতায় গিয়ে কোথায় উঠছ ?'

'আমার বাবার এক বন্ধুর বাড়িতে। তারপর হোস্টেলে চলে যাব।'

'গুড। এর মধ্যে তুমি কলকাতাটা ভাল করে ঘুরে দেখে নাও। আমি ভাবছি সুরমাকে শান্তিনিকেতনে ভরতি করে মাসখানেক পরে কলকাতায় যাব। তখন তুমি আমাকে কলকাতা ঘুরিয়ে দেখাবে। কি, দেখাবে না !'

ঘাড় নাড়ল অনিমেষ। বিল মিটিয়ে দিয়ে উনি রেস্তোরাঁ থেকে দুটো কেক কিনলেন, 'কলকাতার মত কেক আর কোথাও পাওয়া যায় না।'

ওরা বাইরে বেরিয়ে এলে মহিলা সুরমা যেখানে বসে ছিল সেখানে না গিয়ে ওকে নিয়ে উল্টোদিকের ডেকটা ধরে হাঁটতে লাগলেন। খুব বাতাস দিচ্ছে এখন। নদীর দিকে চোখ রেখে মহিলা বললেন, 'ওঃ, কতদিন পরে আজ একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। জলপাইগুড়িতে মানুষ থাকতে পারে ! সেই সংসার আর সংসার। নিজের বলে আর কিছু থাকে না।' অনিমেষ কিছু বলল না। ও ক্রমশ টের পাচ্ছিল এই মহিলার এত সাজগোজ, এত কথার আড়ালে একটা দুঃখী মন আছে। কেন কিসের জন্য দুঃখ তা সে জানে না। দূরে জলের মধ্যে কিছু ভেসে ভেসে উঠছিল। অনিমেষ সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতেই লক্ষ্য করল একটা জলচর প্রাণীর কালো পিঠ দেখা যাচ্ছে। ও উত্তেজিত হয়ে মহিলাকে সেটা দেখাতেই তিনি সেদিকে তাকিয়ে ভীষণ নার্ভাস হয়ে অনিমেষকে শক্ত হাতে ধরলেন, 'ওটা কি ? কুমীর ?'

ততক্ষণে প্রাণীটার বোধ হয় সাহস বেড়েছে। গোল হয়ে ডিগবাজি খেতে খেতে জল থেকে লাফিয়ে উঠছিল। নিচের ডেকে সবাই বোধ হয় দেখেছে। খুব হইচই করে সবাই স্টিমারের এদিকে আসতে এপাশটা একটু কাত হয়ে গেল। একজন কুলি মতন লোক ডেকের এদিকে আসছিল, অনিমেষদের দেখে একগাল হেসে বলল, 'শুশুক।'

আর এই সময় ইঞ্জিন প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠল। ঘন ঘন হুইসল বাজছে। ওরা এখন নদীর প্রায় মাঝখানে। গঙ্গার বড় বড় ঢেউগুলো স্টিমার ছুঁয়ে যাচ্ছে। কিন্তু স্টিমার আর এক পাও নড়ছে না, একটা দিক এখনও সেইরকম কাত হয়ে আছে। ওরা প্রথমে বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা, নিচের চিৎকারে অবাক হয়ে মহিলা বললেন, 'কি হয়েছে নিচে ?'

স্টিমারের লোকজন তখন ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে। ওরা সুরমার কাছে ফিরে আসতে শুনতে পেল জল কম থাকায় স্টিমার চরায় আটকে গেছে। অন্যান্য যাত্রীদের মুখে এখন বিরক্তি, এভাবে স্টিমার চালানো হয় কেন? কেন জল মেপে আগে থাকতে গভীরতা বোঝা যায় না? ওদের ওপরে রেখে অনিমেষ ব্যাপারটা দেখবার জন্য নিচে নেমে এল। ওপরের বিরক্তিটা এখানে অন্যরকম চেহারা নিয়েছে। লোকে কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। সারেং মাল্লারা প্রাণপণে চেষ্টা করে যাচ্ছে স্টিমারটাকে উদ্ধার করার জন্য। যেভাবে হেলে রয়েছে এটা একদিকে, বেশী নড়াচড়া করলে অন্যরকম বিপদ যে হতে পারে সেটাও সবাই বুঝে গিয়েছে।

অনিমেষ বুঝতে পারছিল না নদীতে যখন এত ঢেউ তখন চরায় ঠেকে যায় কি করে স্টিমার? একজন বলল, জল অল্প বলেই ঢেউ বেশী, খালি পাত্রে বেশী শব্দ হয়। সেই শুশুকটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। যদি স্টিমার ডুবে যায় তাহলে কি হবে? ওর নাকি জলে ডোবার ফাঁড়া আছে। সাঁতার না জানার জন্যে এখন আফসোস হচ্ছিল অনিমেষের।

একটু একটু করে পরবর্তী সমস্যাগুলো সবাই জানতে পারছিল। নদী পার হবার জন্য দুটো স্টিমার ছিল, অন্যটাকে জরুরী প্রয়োজনে রাজমহলের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এইটেই এখন পারাপার করছে। ট্রেনের যা সময় তাতে কোন অসুবিধে হচ্ছিল না যাত্রীদের। ফলে জল বাড়া অথবা অন্য স্টিমারটিকে রাজমহল থেকে ফিরিয়ে যাত্রীদের উদ্ধার না করা পর্যন্ত ওদের এইখানেই আটক থাকতে হবে। এইভাবে বন্দী থাকার কথাটা যতই মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ছিল যাত্রীরা ততই নার্ভাস হয়ে উঠছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্টলের খাবারগুলো শেষ হয়ে গেল। অনেক দূরে জলের সীমার শেষে সকরিকলি ঘাট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেটা অনেক দূর। এখানে দাঁড়িয়ে স্বপ্নের মত দেখাচ্ছে।

অনিমেষ ওপরে উঠে এল। মহিলা ওকে দেখেই ছুটে এল, 'কি হবে, অনিমেষ?'

'বিকেল নাগাদ জোয়ার আসবে বলছে সবাই।' অনিমেষ বিব্রত হয়ে বলল।

'বিকেল অবধি এখানে থাকলে আমরা কখন বোলপুরে পৌঁছাব?' ওঁর মুখ কেমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে, কি করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। অনিমেষের এই ব্যাপারটা একদম খেয়াল ছিল না। ওপারে গিয়ে ট্রেনে উঠলে সেটা দশটায় ছাড়তো, খুব আস্তে গেলেও বিকেল নাগাদ শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছাত। এখন যা অবস্থা তাতে কখন ওপারে পৌঁছাবে কখন ট্রেন ছাড়বে আর কখন সেটা

কলকাতায় গিয়ে পৌঁছাবে কেউ বলতে পারবে না। তাহলে বাবার বন্ধুর দেখা সে পাবে কি করে? হঠাৎ যেন সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হতে বসেছে। অবশ্য ওঁর ঠিকানা অনিমেষের কাছে আছে, অসুবিধে আর কতটুকু হবে?

কিন্তু এই স্টিমারের অনেকেরই প্রচণ্ড সমস্যা দেখা দিল। কেউ যাবে রাতের প্লেন ধরতে, কাল ভোরেই অন্যত্র ট্রেন ধরার কথা, কারো ইণ্টারভিউ, কেউ বা আগামীকাল হাইকোর্টে কেস করতে যাচ্ছে। যদি ট্রেন আগামীকাল সকালের মধ্যেও না পৌঁছায়? বেলা বাড়তে লাগল। জল বাড়ার কোন লক্ষণ নেই, নিচের হইচই এখন অনেকটা কম। সবাই বুঝে গিয়েছে কিছুই করার নেই। এবং এই স্টিমারে আর খাবার বলতে কিছু অবশিষ্ট নেই। অনিমেষের একবার মনে পড়ল ওর ব্যাগে পিসীমার দেওয়া খাবার এখনও পুরোটাই রয়েছে। কাল রাত্রে মহিলা ওকে নিজের খাবার খেতে দেননি। কিন্তু এখনও ওর একটুও খিদে পায়নি। মহিলা কয়েকবার খাবার খাবার করছিলেন। অনিমেষ ভাবল একবার বলে ওরা ঘণ্টা দুয়েক আগে মাত্র জলখাবার খেয়েছে। এখনই খিদে লাগার কোন কথা নয়। কিন্তু ও কিছু বলল না। খাবার নেই জানলেই বোধ হয় মানুষের খিদে বোধটা চট করে বেড়ে যায়।

অনিমেষ আবার নিচে এল। দু-একটা মাছধরা নৌকো এখন ওদের স্টিমারের কাছাকাছি এসেছে। ওদেরই একটায় স্টিমারের একজন লোক পাড়ে চলে গেল। সে গিয়ে খবরাখবর দেবে। এই নৌকোয় এত বড় নদী পার হবার সাহস কারো হল না। সবাই অসহায়ের মত মুখ করে বসে। ভিড় বাঁচিয়ে কোনরকমে হাঁটতে গিয়ে অনিমেষ থমকে দাঁড়াল। একটা জায়গায় কিছু মানুষ গোল হয়ে বসে, মধ্যিখানে সর্বাঙ্গে ছাইমাখা জটাধারী একজন সাধু। মুখ চোখ দেখলে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে করে। স্নিগ্ধ মুখে হাসি, মাথা নেড়ে শ্রোতাদের কথা শুনছেন। কেউ একজন বলল, 'বাবা ইচ্ছে করলে স্টিমার চালু করতে পারেন।' 'কে জানে হয়তো এটা বাবারই খেলা, নইলে রোজ স্টিমার চলছে, আজ হঠাৎ আটকে যাবে কেন?' কথাটা যে অনেকের মনে লেগেছে সেটা একটু বাদেই বোঝা গেল। ভক্তদের সংখ্যা বাড়ছে। কিছু বিহারী ভক্ত ধ্বনি দিয়ে উঠল, 'গঙ্গা মাঈকি জয়, সাধু বাবাকি জয়।'

খানিক বাদেই স্টিমারের সব মানুষ মাঝখানে জড়ো হয়ে গেল। অনিমেষ শুনল বাবা নাকি রাজী হচ্ছিলেন না কোন পুজোআচ্চা করতে, কারণ তিনি ম্যাজিক দেখাতে ভালবাসেন না, কিন্তু ভক্তদের চাপে তাঁকে শেষ পর্যন্ত রাজী হতে হয়েছে। অনিমেষ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে এখন আর বাবাকে দেখা

যাচ্ছে না। ও কোনরকমে দোতলায় উঠবার সিঁড়িতে এল, এখান থেকে মানুষের মাথা ডিঙ্গিয়ে বাবাকে দেখা যাচ্ছে। কিছু ভক্ত সবাইকে সামলাচ্ছে, এক সময় সমস্ত দর্শক পাটাতনের ওপর বসে গেল। মুহুর্মুহু বাবার নামে জয়ধ্বনি উঠছে। এর মধ্যে কোথা থেকে কিছু ফুল বেলপাতা যোগাড় হয়ে গিয়েছে। এগুলো নিয়ে যে মানুষ ট্রেনযাত্রা করতে পারে অনিমেষ বিস্মিত হয়ে আজ আবিষ্কার করল। বাবার নির্দেশে একটা পাত্রে টাটকা গঙ্গাজল তুলে আনা হল। নিজের ঝোলা থেকে কিছু কাঠ বের করে বাবা শেষ পর্যন্ত পুজোয় বসলেন।

অনিমেষ মহিলাকে ব্যাপারটা বলতে ওপরে উঠে এসে দেখল খবরটা আগেই এখানে পৌঁছে গেছে। ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রীরা এখন আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে নেই, সবাই প্রায় এক জায়গায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে সমস্যার সমাধানের উপায় ভাবছিলেন। সেই বৃহৎ মাড়োয়ারী তখন কথা বলছিলেন, 'আরে নেহি নেহি, সাধুবাবালোগ সব কুছ কর সেকতা।'

একজন স্যুট টাই পরা প্রৌঢ় পাইপ খেতে খেতে বললেন, 'আই ডোণ্ট থিংক সো, তবে কোন কোন সময় মিরাক্যল তো হয়েও যেতে পারে।'

সেই ছোট প্যাণ্ট পরা সাহেবটি বলল, 'ডু ইউ থিং হি ইজ এ রিয়েল সাধু?'

সুরমার মা সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়লেন, 'আমার মনে একটুও সন্দেহ নেই, প্রথম দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম একদম খাঁটি মানুষ।'

প্রৌঢ় বললেন, 'আমাকে আজ রাত্রের প্লেন ধরতেই হবে পারহ্যাপস দিস ম্যান ক্যান হেল্প মি।'

মাড়োয়ারী বললেন, 'আরে ভাই, আজ কলকাতা নেহি যানেসে মেরা দো লাখ রূপয়া লোকসান হো যায়েগা।'

কথাবার্তাগুলো আর সেইরকম চাপা গলায় নয়, নিচের তলার মত গলা খুলে এঁরা কথা বলছিলেন। অনিমেষকে দেখতে পেয়ে সুরমা বলে উঠল, 'ওই যে মা, এসে গেছে।'

মহিলা ওকে দেখতে পেয়ে উৎসুখ মুখ করে কয়েক পা এগিয়ে বলেন, 'নিচে শুনলাম সেই সাধুবাবা পুজো করছেন?'

অনিমেষ হাসল, 'হ্যাঁ, খুব ভিড় হয়েছে।'

মহিলা বলল, 'চল, আমি যাব।'

সঙ্গে সঙ্গে সুরমা বলে উঠল, 'আমিও যাব মা।'

মহিলা একটু ইতস্তত করলো, 'যাবি? কিন্তু মালপত্র সব পড়ে রইল যে! আচ্ছা ভাই অনিমেষ, তুমি এখানে একটু থাকবে? তোমার তো দেখা হয়ে গেছে।'

অগত্যা অনিমেষ ঘাড় নাড়ল, যদিও ওর এখানে একটুও থাকতে ইচ্ছে করছিল না। ওকে রাজী হতে দেখে অন্যান্য সবাই যেন চাঁদ হাতে পেয়ে গেল। সবার মালপত্র পাহারা দেবার ভার নিতে হল ওকে। অনিমেষ দেখল মহিলার পেছন পেছন দোতলার মানুষগুলো একতলায় নেমে গেল। বিস্ময় বাড়ছিল ওর, কি তাড়াতাড়ি মানুষগুলোর চেহারা বদলে গেল। কিছুক্ষণ ও দোতলার রেলিং ধরে চেয়ে রইল জলের দিকে। ঘোলা জল নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছে। আকাশ বেশ মেঘলা, রোদের জৌলুস নেই একটুও যদিও সূর্য আছে সামান্য ওপরে। ও মালপত্রগুলোর দিকে তাকাল। বেশির ভাগ ব্যাগের ওপর নামধাম লেখা। ওঁরা কি বিশ্বাসে সব কিছুর দায়িত্ব ওর ওপর ছেড়ে দিয়ে গেলেন। যদি ও এগুলো নিয়ে কেটে পড়ে! ভাবতেই হাসি পেল ওর, কারণ এইরকম মাঝগঙ্গায় আটক থেকে কেউ জিনিসপত্র নিয়ে পালাতে পারবে না, তাছাড়া নামবার সিঁড়ি তো মোটে একটা।

নিচে কি হচ্ছে দেখার কৌতূহলটা আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছিল। অনিমেষ সিঁড়ির কয়েক ধাপ নেমে এল, এখান থেকে দেখতে অসুবিধে হচ্ছে না। কালো মাথাগুলোর ওপর থেকে চোখ সরিয়ে সরিয়ে ও সাধুবাবার দিকে তাকাল। আর তাকাতেই চমকে উঠল অনিমেষ, পদ্মাসনে বসে চোখ বন্ধ করে বোধ হয় মন্ত্র পড়ছেন সাধুবাবা আর তাঁর সামনে সাষ্টাঙ্গে পড়ে আছেন সুরমার মা। তাঁর দামী শাড়ী ডেকের ধুলো জলে লুটোপুটি খাচ্ছে, সুরমা পাশে হাঁটু গেড়ে দুহাত জোড় করে বসে। ওঁদের পেছনে ফার্স্ট ক্লাসের অন্যান্য যাত্রীরা গদগদ হয়ে বসে আছেন। মাড়োয়ারী ভদ্রলোক তো বাবার পায়ের কাছে মাথা নিয়ে গিয়েছেন। চারধার থেকে বাবার নামে জয়ধ্বনি উঠছে। এখন আর ওপর আর নিচতলার যাত্রীদের মধ্যে কোন ফারাক নেই, সবাই গায়ে গা লাগিয়ে বসে আছেন। হঠাৎ অনিমেষের সামনে সুনীলদার মুখটা ভেসে উঠল। সুনীলদারা কি এইরকম ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেন?

আকাশে মেঘ বাড়ছে, একটু একটু করে বাতাসের দাপট বাড়ছে। সুনীলদার কথা মনে হতেই ওর মনে হল গতকাল কলকাতায় বাস পুড়েছে, পুলিসের গুলিতে কয়েকজন মারা গিয়েছে। ব্যাপারটা তার মনেই ছিল না সকাল থেকে। দেশের কিছু মানুষ খাবার দাবী করে ধর্মঘট করছে, কিছু লোক সেটাকে সমর্থন করছে না। এই দু'দল যতক্ষণ না এক হবে—অনিমেষের মনে হল খুব বড়, এই স্টিমারে যেমন হয়েছে সেরকম সমস্যা না এলে দু দল কখনো এক হতে পারে না। যাঁরা দেশের কথা চিন্তা করেন তাঁরা এটা কি জানেন না?

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে এখন। ঝড়ো বাতাস জাহাজটাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে মাঝে মাঝে। হঠাৎ স্টিমারটা সামান্য দুলে উঠতেই সবাই চিৎকার করে উঠল।

এতক্ষণ ইঞ্জিন বন্ধ ছিল, এবার সেটা শব্দ করে জেগে উঠল। ইঞ্জিন-চালক বোধ হয় এই দুলুনিকে অবলম্বন করে স্টিমারটাকে নড়াবার চেষ্টা করছেন। এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদের মত একসময় স্টিমার সত্যিই নড়ে উঠল। তারপর শব্দটাকে গানের মত বাজিয়ে এগিয়ে চলল জল কেটে। ঝড়ের বেগ খুব বাড়ছে। বৃষ্টির জল এসে দোতলার ডেক ভিজিয়ে দিচ্ছে। অনিমেষ দৌড়ে এসে জিনিসপত্রগুলো সরিয়ে রাখতে লাগল। এখন নদীর ওপর বৃষ্টি যেন অজস্র দেওয়াল তৈরি করে ফেলেছে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

কিছুক্ষণ পরে ওঁরা ওপরে উঠে এলেন। মহিলা এখন ভক্তিতে আপ্লুত, অনিমেষকে সামনে পেয়ে দু হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'দেখলে বাবার কি লীলা, তখনই বলেছিলাম কি জাগ্রত সাধু।'

প্রৌঢ় ভদ্রলোক পাইপ ধরাতে ধরাতে বললেন, 'ইটস এ মির‍্যাকল। যাক মাত্র তিন ঘণ্টা লেট হয়েছে। নিশ্চয়ই মেক আপ হয়ে যাবে।'

কে একজন বলল, 'বৃষ্টি শুরু হল—।'

'দূর মশায়, ট্রেনে উঠলে বৃষ্টি কোন প্রব্লেম নাকি!'

অনিমেষ কোনরকমে মহিলার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে বলল, 'ঝড় এসেছিল বলে স্টিমারটা নড়ল।

সুরমা চোখ ঘুরিয়ে জবাব দিল, 'দেখেছ মা, কি নাস্তিক!'

মহিলা হাসলেন, 'উনি না থাকলে ঝড় আসত? আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন '

খানিক বাদে আবার সব আগের মত হয়ে গেল। ওপরতলার যাত্রীরা যে যার জায়গায় বসে চুপচাপ হয়ে গেলেন। যাঁরা কথা বলছিলেন তাঁরা খুব চাপা গলায় বলছিলেন। খানিক আগের সেই উত্তেজনা আর নেই। মহিলা এর মধ্যেই ব্যাগ থেকে আয়না বের করে মুখের মেকআপ ঠিক করে নিয়েছেন। সকরিকলিঘাট এসে গিয়েছে।

অনিমেষ সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল। সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক কোথায়? নিচের ভিড়ে এতক্ষণ তাঁকে দেখেনি সে। সাধুবাবা সেই জায়গায় বসে আছেন। তাঁর সম্পত্তিতে আর একটা গামছার পুঁটুলি যোগ হয়েছে। ভক্তরা তাদের প্রণামী দিয়েছে। বেশ কিছু মানুষ এখনও তাঁকে ঘিরে রয়েছে। কথা বলছেন না তিনি, মুখে প্রশান্তি। ঘাট যত এগিয়ে আসতে লাগল তত উত্তেজনা বাড়তে লাগল। কে আগে ঘাটে নামতে পারবে তার জন্য ঠেলাঠেলি চলছে নামবার মুখটাতে। এখান থেকে বৃষ্টিতে ভেজা ট্রেনটাকে দেখা যাচ্ছে। স্টিমার আসছে দেখে ড্রাইভার

বোধ হয় খুশীতে দুবার হুইস্‌ল বাজিয়ে দিল।

স্টিমার ঘাটে লাগতেই একটা কাঠের পাটাতন নামিয়ে দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে জলরাশির মত মানুষ বেরিয়ে যেতে লাগল সেই ছোট্ট রাস্তা দিয়ে। নিচের তলায় সব মানুষ এখন মুখটাতে জড়ো হয়েছেন। স্টিমারের লোকজন বারণ করছে এভাবে দাঁড়াতে কিন্তু কে শোনে কার কথা। সাধুবাবাও এঁদের মধ্যে আছেন। অনিমেষ দেখল বাইরে মাটিতে পা রাখার উত্তেজনায় কেউ আর তাঁকে খেয়াল করছে না। এই সময় সে বৃদ্ধ ভদ্রলোককে দেখতে পেল। চোখাচোখি হতেই তিনি হাত নেড়ে চেঁচিয়ে ওকে আসতে বললেন। ওপারে গিয়ে ট্রেনে ভাল জায়গা পেতে আগে যাওয়া দরকার। বৃষ্টিতে ভিজতে হবেই, কোন উপায় নেই। মানুষেরা ধাক্কাধাক্কি করতে করতে যাচ্ছে। একজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়ে পিছনের মানুষের পায়ের তলায় যেতে যেতে বেঁচে গেল।

অনিমেষ দৌড়ে ওপরে উঠে এল। নিজের একটা ব্যাগ হাতে নিয়ে সে মহিলাকে বলল, 'আমি আগে যাচ্ছি জায়গা রাখতে, আপনারা কুলির সঙ্গে আসুন।'

মহিলা বললেন, 'বৃষ্টিতে যাবো কি করে?'

অনিমেষ বলল, 'উপায় নেই।' ও আর দাঁড়াল না। দৌড়ে নিচে এসে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল। প্রচণ্ড ঠেলাঠেলি, কনুইয়ের গুঁতো সামলে সে পাটাতনটার ওপর এসে দেখল দুধারের দড়ির রেলিংএর ওপর মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, বেটাল হলেই জলের তলায় চলে যাবে। নিজের ব্যাগ সামলাতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল ও, চারধারে মানুষের আড়াল। সামনে বৃষ্টি হয়ে পথ পিছল থাকায় খুব সন্তর্পণে লোক এগুচ্ছে। একসময় হইহই গেল গেল শব্দ উঠল উপস্থিত যাত্রীদের মধ্যে। ততক্ষণে অনিমেষ বৃষ্টিতে নেমে পড়েছে, থেমে দাঁড়ালে পায়ের তলায় পড়তে হবে বলে ও দৌড়াতে শুরু করল। পেছনে কি হচ্ছে বোঝার আগেই ও সামনে ট্রেনটাকে দেখতে পেল। বৃষ্টির ফোঁটায় সমস্ত শরীর ভিজে একসা। ও অবাক হয়ে দেখল অত বড় ট্রেনটা একদম খালি। যে যাত্রীরা আগে এসেছিল তারা হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে। সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক ওকে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডাকলেন। ওপরে উঠে সে দেখল গাড়িতে জায়গার অভাব নেই। স্টিমারের যাত্রীরা আজকের ট্রেনের পক্ষে নিতান্তই সামান্য। অথচ কি ভয়েই সবাই এখনও ছুটে আসছে। এই সময় একজন কুলি চিৎকার করতে করতে ছুটে গেল, 'সাধু বাবা গির গিয়া, জাহাজকা অন্দর ঘুঁস গিয়া।'

হতভম্ব হয়ে গেল অনিমেষ। যে মানুষটাকে বিপদের সময় সবাই আশ্রয়

করেছিল তাঁকেই জনতার চাপে জলে পড়তে হল ! সেই প্রশান্ত মুখটাকে মনে করে অনিমেষ ছুটন্ত যাত্রীদের দিকে তাকাল। কারো কোন প্রতিক্রিয়া নেই। প্রয়োজন ছাড়া মানুষের অন্য কোন আকর্ষণ বোধ হয় থাকে না। অনিমেষ সামনে বসা বৃদ্ধ ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। তিনি হেসে বললেন, 'আড়াই ঘণ্টা লেট। তা আমরা নটার মধ্যে শিয়ালদায় পৌঁছে যাব, বুঝলে !'

যতদূর চোখ যায় মাঠ আর মাঠ, মাঝে মাঝে দল বাঁধা তালগাছগুলো গলাগলি করে দাঁড়িয়ে রোদে পুড়ছে, এইরকম চিত্র ট্রেনের জানলার বাইরে অনেকক্ষণ স্থির ছিল। জলপাইগুড়ি শহরের বাইরের যে বাংলাদেশ তার চেহারা এত আলাদা একথা কোন ভূগোল বইতে অনিমেষ পড়েনি। সূর্য-ঢালা বিকেলে নর্থ বেঙ্গল একসপ্রেস রোলপুরে এসে জিরলো।

বৃষ্টি শেষ হয়েছিল সাহেবগঞ্জে। চারধারে রুক্ষ মাটি, মাটির ঘরের ওপর ধুলোর চাদর, ঠাণ্ডা মেজাজ কোথাও নেই। কলকাতায় আসার পথে অন্য একটা প্রদেশের ওপর দিয়ে খানিকটা আসতে হল বলে ভাল লাগছিল অনিমেষের। সেই প্রকৃতির চেহারাটা একটু একটু করে বদলালো বীরভূমে ঢুকে, বদলে অন্য চেহারা নিল। ট্রেন গতি বাড়িয়ে বিলম্ব সঙ্কোচনের চেষ্টা করে যাচ্ছে, মুখে গরম বাতাসের ঝাপটানি। অনেক যাত্রী ওঠা-নামা করল রামপুরহাটে। ওখানকার ডাইনিং রুমে ভাল খাবারের আশায় ঢুঁ মেরে এল অনেকে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক, যাঁকে অনিমেষ এখনও কোন সম্বোধন করছে না, অনিমেষকে খাওয়ার কথা বলেছিলেন। কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজে ট্রেনে উঠে অথবা সেই সাধুবাবার মৃত্যুসংবাদ শুনে কিংবা তিনপাহাড় স্টেশনে মহিলার অনুরোধে চা খেয়ে অনিমেষের ক্ষুধা-বোধটাই একদম উধাও হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া এখনও সঙ্গে পিসীমার তৈরী খাবার অটুট আছে কিন্তু খাওয়ার ইচ্ছেটাই নেই। এরকম এর আগে কখনও হয়নি, ট্রেনে উঠলে কি সব নিয়মকানুন বদলে যায় ? সুরমারা সারাটা পথ আধ-শোয়া হয়ে এল। মহিলা এখন রীতিমত ক্লান্ত, বৃষ্টিতে ভেজার পর ওঁর চেহারা এখন একাদশীর প্রতিমার মত। কাল রাত অথবা সকালের জেল্লা চটে গিয়ে আসল চেহারা বেরিয়ে পড়েছে। ওঁদেরও নাকি খিদে নেই। দুপুরে শান্তিনিকেতনে ভাত তৈরী থাকবে, যখন হোক পৌঁছে সেটাই খাবেন ইচ্ছে হলে। মানুষের ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না মহিলা, যে সাধুবাবার জন্য স্টিমার প্রাণ পেল তাঁকেই ওরা অসাবধানে জলে ফেলে দিল। মহিলা সত্যি সত্যি ব্যথা পেয়েছেন। বৃষ্টিতে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে তিনি সাধুবাবাকে তুলে আনার দৃশ্য দেখেছেন। ফলে

এখন মাঝে মাঝে নাক টানছেন, মেয়েদের সর্দি হলে মোটেই ভাল দেখায় না। সুরমা চুপচাপ গুটিসুটি মেরে শুয়ে সিনেমার পত্রিকা পড়ে যাচ্ছে। মেয়েটা অদ্ভুত। যখন কথা বলে তখন বাচাল বলে মনে হয়, আবার চুপ করলে ওর গাম্ভীর্য দেখার মতন। কাল রাত্রের সেই মেয়েটাকে এখন মোটেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মেয়েরা খুব তাড়াতাড়ি চেহারা বদল করতে পারে। হঠাৎ সীতার মুখটা মনে পড়ে গেল ওর। সীতা ওর বদলে যাওয়া জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু ওর মুখ মনে এলেই বুকের ভেতর এমন অসাড় হয়ে যায় কেন?

বোলপুর স্টেশনে সুরমারা নেমে গেল। অনিমেষ কুলির সঙ্গে ধরাধরি করে জিনিসপত্র নামিয়ে দিল। গিলে করা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক এসেছিলেন ওদের নিতে। মহিলা অনিমেষের হাত ধরে বললেন, 'আমাদের কথা মনে থাকবে তো?'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল। 'তোমার খবর কি করে পাব?' মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন।

অনিমেষ বিপদে পড়ল। কলকাতায় সে কোন্ হোস্টেলে থাকবে এখন কিছুই জানা নেই। কলেজও ঠিক হয়নি। মহিলাই উদ্ধার করলেন, 'ঠিক আছে, তোমার ঠিকানা ঠিক হলে আমায় চিঠি দিও। সুধাময়, ফরটিফাইভ ব্লক, শান্তিনিকেতন।' ঠিকানাটা চটপট মুখস্থ করে নিয়ে অনিমেষ ঘাড় নাড়ল। ট্রেন ছাড়ার মুহূর্তে সুরমা বলল, 'আসবেন তো?' কোন কথা না বলে অনিমেষ সম্মতির হাসি হেসে দরজায় দাঁড়িয়ে চলন্ত গাড়ি থেকে ওদের দূরে চলে যেতে দেখল। হঠাৎ ওর খেয়াল হল মহিলার নাম সে জানে না, কি নামে চিঠি দেবে? সুরমার নামটুকুই সম্বল থাকল। মহিলার অনেক রকম উগ্রতা সত্ত্বেও এই মুহূর্তে অনিমেষের খারাপ লাগছিল ওঁদের ছেড়ে যেতে। অথচ কতটুকুই বা পরিচয়, কতক্ষণের?

ভেতরে এসে শুনল বেশ হইচই পড়ে গেছে। এক ভদ্রলোক বোলপুর থেকে খবরের কাগজ নিয়ে উঠেছেন, তাঁকে ঘিরে যাত্রীরা ভিড় করেছে। অনিমেষ একটা বেঞ্চির কোণায় পা রেখে উঁচু হয়ে হেডলাইনটা পড়ল, 'গুলি বোমা মৃত্যু—ধর্মঘটে কলকাতা উত্তাল।' তার নিচেই একটা জলন্ত বাসের ছবি। নিজের জায়গায় আসতেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, 'অবস্থা খুব ঘোরালো হয়েছে মনে হচ্ছে।'

অনিমেষ বলল, 'কি হয়েছে?'

'শুনলাম আজ কলকাতায় কারফিউ ডিক্লেয়ার করেছে। তার মানে রাস্তায়

হাঁটা-চলা যাবে না। তাহলে এত সব যাত্রীরা বাড়ি যাবে কি করে?'

কারফিউ শব্দটার মানে অনুমান করে নিয়ে অনিমেষ বলল, 'হঠাৎ কারফিউ ডিক্লেয়ার করেছে কেন? হরতাল তো গতকাল শেষ হয়ে গিয়েছে?'

'তার জের চলছে। কলকাতায় তো কোনদিন যাওনি, ওখানকার ব্যাপারই আলাদা। মানুষ যখন খেপে যায় তখন তাদের সামলানো মুশকিল, আবার খুব মারাত্মক ব্যাপার অত্যন্ত সহজে ভুলে যায় ওখানকার লোক। এরকম চরিত্র আর কোথায়ও পাবে না।' বৃদ্ধের কথা শেষ হওয়া মাত্র আর একজন মাঝবয়সী লোক ফোঁস করে উঠলেন, 'এইজন্যেই তো দেশটার কিছু হল না।'

আর একজন বৃদ্ধ, তাঁর কণ্ঠস্বর অদ্ভুত সরু, গলা কাঁপিয়ে বলে চললেন, 'আহা, এইজন্যেই আমরা স্বাধীনতা এনেছি। ভাগ্যিস সুভাষ বোস মহাত্মা গান্ধী নেই তাহলে নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করতেন। ঝ্যাঁটা মার ঝ্যাঁটা মার। যেন ভাগাড়ে শকুন পড়েছে, লুটেপুটে খেল সব।'

'কংগ্রেস এইরকম ভুল করছে কি করে? এই দেশ স্বাধীন করার পেছনে কংগ্রেসেরই তো সব চেয়ে বড় ভূমিকা। কম্যুনিস্ট পার্টি তখন কোথায় ছিল? তা এত বছর আন্দোলন করে যখন স্বাধীনতা পাওয়া গেল, কংগ্রেস তার নীতি থেকে সরে যাচ্ছে কেন? কেন দেশের মানুষের বুকে গুলি চালাচ্ছে?'

উত্তেজিত কণ্ঠস্বরকে থামিয়ে আর একজন বলে উঠল, 'বাঃ বাঃ, আপনারা বাস পোড়াবেন, সম্পত্তির ক্ষতি করবেন আর সরকার আপনাদের দুধকলা খাওয়াবে? ফাণ্ডামেণ্টাল রাইট মানে দেশের ক্ষতি করার অধিকার নিশ্চয়ই নয়!'

'গলা চড়াবেন না মশাই। যে সরকার দেশের মানুষকে খেতে দিতে পারে না তার চোখ রাঙাবার কোন রাইট নেই। স্বাধীনতা মানে অনাহার নয়।'

'আপনার বাপ কম রোজগার করলে ডালভাত খাবেন, তাই বলে কি বাপের জামাকাপড় পুড়িয়ে আন্দোলন করবেন?'

'খবরদার বলছি, বাপ তুলে কথা বলবেন না! কংগ্রেস সরকার আমাদের বাপ? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! দালাল কোথাকার!'

হঠাৎ প্রসঙ্গটা চিৎকার চেঁচামেচিতে পৌঁছে গিয়ে হাতাহাতি লাগবার উপক্রম হল। অনিমেষ বৃদ্ধ ভদ্রলোকের পাশে এসে বাইরের দিকে তাকাল। এই ভর-বিকেলে মাঠের ওপর অদ্ভুত শান্ত ছায়া নেমেছে। এখন প্রকৃতির রঙ গাঢ় সবুজ। কোথাও কোথাও ছোট বড় পুকুরে জল টলমল করছে। ছবিতে দেখা বাংলার গ্রামের মত বউ-ঝিরা কলসী কাঁখে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। বীরভূমের পর বর্ধমান। কলকাতা লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসছে। এখন বাইরে তাকিয়ে চলন্ত ট্রেন

থেকে যতটুকু দেখা যায়, ক্ষণিক থেমে থাকা স্টেশনে যতটুকু বোঝা যায় কোথাও কোন বিক্ষোভ নেই, ব্যস্ততা নেই। কলকাতা শহরে মানুষের খাবার নিয়ে যে আন্দোলন চলছে এই ফসলের মাঠ আর মাঠের মানুষের দিকে তাকালে তার কোন প্রতিক্রিয়া চোখে পড়বে না।

বর্ধমান স্টেশনে সন্ধ্যে পেরিয়ে গাড়ি ঢুকতেই সমস্ত পরিবেশটা চট করে পালটে গেল। প্ল্যাটফর্মে ঢোকার আগে খানিকক্ষণ গাড়ি কানফাটানো হুইস্‌ল বাজালো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, তারপর বাধ্য ছেলের মত হাঁটি হাঁটি করে এগিয়ে গিয়ে বুড়ি ছুঁলো। সঙ্গে সঙ্গে ওরা আওয়াজটা শুনতে পেল। যাঁরা এই স্টেশনে নামবেন তাঁরা অবাক হয়ে দেখলেন প্ল্যাটফর্ম প্রায় ফাঁকা। এমন কি কুলিরা রোজকার মত ছুটে এল না। কিছু খাঁকি পুলিস লাঠি হাতে ইঞ্জিনের দিকে ছুটে গেল। আওয়াজটাকে ওরা ততক্ষণে বুঝতে পারল। অনেকগুলো কণ্ঠ এক হয়ে এক শব্দ উচ্চারণ করায় সেটা জড়িয়ে গিয়ে অমন হচ্ছে। কান পাতলে বোঝা যায় আলাদা করা যায়—'খাদ্য চাই, বস্ত্র চাই, গুলি করে দমিয়ে রাখা যায় না যায় না।'

ওরা শুনল, গতকাল এবং আজ কলকাতায় গুলি চলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ-কারীরা ট্রেন লাইনের ওপর বসে পড়ে অবরোধ সৃষ্টি করেছে। এই অবরোধ না তুললে গাড়ি এখানেই থেমে থাকবে। বর্ধমান শহরেও আজ গোলমাল হয়েছে, তাই প্ল্যাটফর্মে হকার নেই। শুধু একজন বুড়ো মাথায় করে কাঁচের বাক্সে সীতাভোগ-মিহিদানা বিক্রি করতে করতে খবরগুলো দিয়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যে ট্রেনে গুঞ্জন উঠল। অনিমেষ দেখল যাঁরা এতক্ষণ কংগ্রেস সরকারের সমালোচনা করছিলেন তাঁরাই ব্যাপারটাকে মানতে পারছেন না। এইভাবে ট্রেন আটকে মানুষের ক্ষতি করে কি লাভ—মোটামুটি এই রকম আলোচনা ছড়িয়ে পড়ল কামরায়। আন্দোলন যখন মানুষের জন্য তখন মানুষের সহানুভূতি আগে দরকার। এই ট্রেনের যাত্রীদের কথা কেন বিক্ষোভকারীরা ভাবছে না? বৃদ্ধ ভদ্রলোক নিচু গলায় অনিমেষকে বললেন, 'স্বার্থে আঘাত লাগলে মানুষের রাজনৈতিক তত্ত্ব আর আলাদা থাকে না, বুঝলে?'

অনিমেষ কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারছিল না। এই মুহূর্তে যেটা ঠিক, পরের মুহূর্তে সেটা বেঠিক হয়ে যায় কি করে? কংগ্রেস সরকারকে অভিযুক্ত করে যাঁরা কথা বলছিলেন, এই মুহূর্তে ট্রেন আটক হয়ে তাঁরা খুশী হচ্ছেন না অথচ এই আন্দোলনকে ওঁরা সমর্থন করেন। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অনিমেষ সামনে তাকাল। লম্বা কামরার সারি ছাড়িয়ে ইঞ্জিনের ওপাশে অনেক লোক এবং প্রচুর

পুলিস। ক্রমাগত ধ্বনি দেওয়া চলছে। একবার প্ল্যাটফর্মে নেমে এগিয়ে গিয়ে দেখে এলে হয়। ও সেকথা বলতে বৃদ্ধ ভদ্রলোক নিষেধ করলেন, 'কি দরকার ঝামেলায় জড়িয়ে, কখন কি হয় বলা যায় না। অনাবশ্যক কৌতূহল মানুষের সর্বনাশ ডেকে আনে।'

কথা বলার ধরন এমন নিরাসক্ত যে অনিমেষ খুব অস্বস্তিতে পড়ল। ওই যে ওখানে এরকম হইচই হচ্ছে, ট্রেনের অন্যান্য যাত্রীরাও বিলম্বের জন্যে আর এক ধরনের উত্তেজনায় রয়েছে, অথচ বৃদ্ধ ভদ্রলোক নির্বিকার মুখে বসে আছেন। অনিমেষ শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করে বসল, 'আপনার দেখতে ইচ্ছে করছে না?'

'না।'

'দেরি করে পৌছালে অসুবিধে হবে না?'

'হবে। তবে আমি এখানে বসে চেঁচিয়ে সেকথা বলে তাড়াতাড়ি যাবার ব্যবস্থা করতে পারব না। ট্রেন যখন ছাড়ার তখন ছাড়বে—আমার তো কোন হাত নেই।'

সাহস করে অনিমেষ ঠাট্টা করার চেষ্টা করল, 'কিন্তু আর সবাই তো চেঁচামেচি করছে।'

একটুও রাগলেন না বৃদ্ধ ভদ্রলোক, 'এই কামরায় বসে ওসব করা যায়। কিন্তু ত্যাখো তো, কেউ ইঞ্জিনের সামনে গিয়ে প্রতিবাদ করছে কিনা। সে বেলায় কেউ যাবে না। আমরা সব নিরাপদে থেকে আগুনে হাত সেঁকতে ভালবাসি।'

কথাগুলো এমন চাঁচাছোলা যে অনিমেষ অবাক গলায় বলল, 'আপনি অনেক দেখছেন, না?'

'আমার বয়স কত, অনুমান কর তো?'

ফাঁপরে পড়ল অনিমেষ, তবু অনুমান করার চেষ্টা করল, 'ষাট!'

'আটষট্টি। অর্থাৎ আমার আটান্ন বছর বয়সে ভারত স্বাধীন হয়েছে। অথচ আমি বাল্যকাল যৌবন এবং প্রৌঢ় অবস্থায় কখনো ইংরেজ তাড়ানো আন্দোলনে যোগ দিইনি। আমার মত লক্ষ লক্ষ লোক দেয়নি। কিন্তু তাতে কি দেশের স্বাধীন হওয়া আটকেছে? মোটেই না। এখন বুঝতে পারি, খুব বড়লোক আর অত্যন্ত গরীব মানুষই প্রকৃত কাজ করতে পারে। আমি কিছুই দেখিনি, কিন্তু নিজেকে দিয়ে অন্য মানুষের স্বভাব বুঝতে পারি।'

এই সময় আরো একঝাঁক পুলিস প্ল্যাটফর্মে শব্দ তুলে সামনের দিকে ছুটে গেল। বৃদ্ধ বললেন, 'এবার জানলাটা বন্ধ করে দাও।'

'কেন?'

'নিরাপদে থাকা যাবে তাহলে।' কথাটার মানে বুঝতে না বুঝতে গোলমাল বেড়ে গেল বাইরে। খুব ঘন ঘন হুইস্‌ল বাজাচ্ছে ড্রাইভার। কতগুলো ছেলেকে তাড়া করে ওদের সামনে দিয়ে লাঠি উঁচিয়ে পুলিসরা ছুটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দড়াম দড়াম করে জানলাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হল ওদের কামরায়। দরজা আগেই বন্ধ করা ছিল, একজন উঠে গিয়ে লক করে দিয়ে এলেন। কামরায় এখন কেউ কোন কথা বলছে না, যে যার জায়গায় চুপচাপ বসে। মাথার ওপর টিমটিমে আলো; একটুও বাতাস নেই পাখাগুলোয়। জানলা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এখন গুমোট গরম লাগছে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক ফিসফিস করে বললেন, 'দেখলে তো! নিজেকে দিয়ে আমি কেমন বুঝতে পারি। সব ক'টা জানলা বন্ধ হয়ে গেল।'

মিনিট পনের বাদে ওদের চমকে দিয়ে ট্রেনটা দুলে উঠল। এটা যেন প্রত্যাশাই করেনি কেউ, হাঁফ ছেড়ে কেউ একজন বলে উঠল, 'যাক বাঁচা গেল।' এতক্ষণ মানুষগুলো নিজেরাই নিজেদের বন্দী করে বসেছিলেন, কথাটা শুনেই বোধ হয় সাড় এল। প্ল্যাটফর্মে ছোটাছুটি, মাঝে মাঝে আহত মানুষের চিৎকার তাঁদের একটুও বিচলিত করে নি। বৃদ্ধ ভদ্রলোক চাপা গলায় ওকে বুঝিয়ে দিলেন এটা হল এক ধরনের সাধনালব্ধ নিরাসক্তি। মধ্যবিত্ত মানুষ অনেককালের চেষ্টায় তা আয়ত্ত করেছে। অত্যন্ত খারাপ লাগছিল অনিমেষের। ও একবার উঠে দাঁড়াতে অন্য যাত্রীরা যেভাবে নীরবে চোখ তুলে ওর দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তাতে আর এগোতে সাহস পায়নি সে। পুলিসগুলো কি আন্দোলনকারীদের মারছে? দৃশ্যটা কল্পনা ক'রে সে চুপচাপ বসে রইল বন্ধ কামরায়। হঠাৎ ওর খেয়াল হল কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে এই যে এত আন্দোলন হচ্ছে শুধু খাবারের দাবীতে তার বিরুদ্ধে কংগ্রেস দল থেকে কোন প্রতিবাদের মিছিল বা আন্দোলন হচ্ছে না তো! এখন পুলিস না এসে যদি কংগ্রেসীরা মিছিল করে আসত তাহলে ব্যাপারটা কেমন হতো? সেটাই তো স্বাভাবিক বলে মনে হতো না কি! অথচ সেরকম ব্যাপার হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না, তাহলে পুলিস আসবে কেন? ট্রেন আচম্বিতে দুলে ওঠার সামান্য আগে ওদের দরজায় কেউ বা কারা বাইরে থেকে দুম দুম করে শব্দ করতে লাগল। কেউ একজন চিৎকার করে ওদের দরজা খুলতে বলছে। শেষ পর্যন্ত অনুনয় করতে লাগল সে, অথচ যাত্রীরা নির্বিকার। কেউ যেন অত জোরে আওয়াজ এবং আর্তকণ্ঠ শুনতে পাচ্ছেন না। অনিমেষ দেখল কেউ কারো দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছেন না পর্যন্ত, যে-ন পৃথিবীর কোন শব্দ তাঁদের স্পর্শ করে না। অনিমেষ আর পারল না চুপ করে থাকতে, যে-ই শব্দ করুক দরজায় নিশ্চয়ই সে খুব বিপদগ্রস্ত এবং এই কামরায় এখনো প্রচুর বসার জায়গা

খালি পড়ে আছে। ও উঠে এগিয়ে যাচ্ছিল দরজাটা খুলতে, সঙ্গে সঙ্গে সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে আরে, করছ কি? খবরদার দরজা খুলবে না। কি মতলব কে জানে, হয়তো পুলিসের তাড়া খেয়ে এখানে ঢুকতে চাইছে, শেষে আমাদের সবাইকে হাজতে পুরুক!' কেউ একজন মন্তব্য করল, 'এঁচোড়ে পক্ক।'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক হাতছানি দিয়ে ওকে ডাকতে অনিমেষ ফিরে এল। তিনি ফিসফিস করে বললেন, 'মনখারাপ করো না, অভিজ্ঞতা মানুষকে সম্পদ এনে দেয়। ভবিষ্যতে কাজে লাগিও।'

অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর লোকটা চলে গেল। এত বড় গাড়িতে অনেক জায়গা আছে, তাহলে শুধু এখানেই লোকটা ঢুকতে চাইছিল কেন? হঠাৎ ওর খেয়াল হল, সমস্ত ট্রেনের মানুষ জানালা দরজা বন্ধ করে বসে নেই তো এই কামরার মানুষের মত? তাহলে লোকটা উঠবে কোথায়?

ট্রেনটা দুলে উঠতেই গাড়ির চেহারা আমচকা বদলে গেল। একজন ঘড়ি দেখে বলল, 'ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে শিয়ালদায় পৌঁছে যাব।'

'দেখুন আবার পথে গাড়ি আটকায় কিনা!'

আর একজন খুব আশা করতে পারছিল না। প্রথমজন তাকে ভরসা দিল, 'নন-স্টপ ট্রেন মশাই, সামনে দাঁড়ালে পিষে যাবে। একদম দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে দাঁড়াবে। ওখানে যদি ট্রেন আটকায় ক্ষতি নেই। নেমে গিয়ে বাস ধরব।'

গাড়ি একটু একটু করে স্পীড নিচ্ছে। বর্ধমান স্টেশন ছাড়িয়ে গেলে তবেই জানলাগুলো খোলা হল। এখন বাইরে কালো রাত। এখন তো আকাশে চাঁদ থাকার কথা, তবে কি মেঘ করেছে? বাতাস নেই বড় একটা। অনেক দূরে কোন গ্রামের টিমটিমে আলো কাঁপছে। কিছুক্ষণ কথা বলে সামান্য স্বস্তিতে থেকে যাত্রীরা আবার চুপচাপ হয়ে গেল। ট্রেনটা আরো গতি বাড়াক, চট করে কলকাতা এসে যাক এইরকমটাই সবাই চাইছিল।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক ঘড়ি দেখে বললেন, 'এইরকম যদি যায় তবে সাড়ে দশটার মধ্যেই পৌঁছে যাব মনে হচ্ছে।'

একথা শুনে অনিমেষের সামনে বসা একজন রোগামতন মানুষ বললেন, 'এত স্পীড বাড়ানো ঠিক নয়। কে জানে যদি কোথাও ফিসপ্লেট খোলা থাকে—কিছুই বলা যায় না।'

কথাটা মুহূর্তে কামরার সবার কানে বাজল। এরকম একটা ব্যাপার হবার সম্ভাবনা কেউ উড়িয়ে দিতে পারছিল না। কিন্তু কথা শুনে রোগা ভদ্রলোকের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠল সবাই। হ্যাঁ, সামনে দাঁড়িয়ে ট্রেন থামিয়ে দিতে না পেরে

এইভাবে সরকারের উপর প্রতিশোধ নিতে পারে বিক্ষোভকারীরা। যারা বাস পোড়াতে পারে তারা ট্রেন উড়িয়ে দেবে না কেন? যে ভদ্রলোক বোলপুর স্টেশন থেকে কংগ্রেসের সমালোচনা করছিলেন তিনি বললেন, 'নেতারা তো সব এখন আণ্ডারগ্রাউণ্ডে, তাই ক্যাডারদের সামলানো মুশকিল হয়ে পড়েছে।'

আর একজন খেঁকিয়ে উঠল, 'রাখুন মশাই, আর ক্যাডার ক্যাডার করবেন না। কমরেড, ক্যাডার—বুকনি আছে ষোল আনা। দেশের ঠাকুর ফেলে বিদেশের কুকুরকে মাথায় করে নাচতে নাচতে বলছে ত্যাখো,—আমি কি হনু। ট্রামবাস পুড়িয়ে বিপ্লব করবি, ট্রেন ওড়াবি, এদিকে যাদের জন্য করা সেই সাধারণ মানুষ জানল না কিছু, তারা রাজী কিনা না জেনেই বিপ্লব হয়ে গেল।'

'যাই বলুন এই দেশে কম্যুনিস্টরা কখনো ক্ষমতায় আসবে না। কংগ্রেসীদের আফটার অল একটা ঐতিহ্য আছে। জওহরলাল বিধান রায়ের মত পার্সোনালিটি ক'জনার আছে? হ্যাঁ, নেতাজী ফিরে এলে আলাদা ব্যাপার হত।'

'নেতাজী মরে ভূত হয়ে গেছে, তাকে নিয়ে আর টানাটানি কেন?'

'আপনি জানেন নেতাজী মরে গেছেন? এনি প্রুফ? ফটাফট আজেবাজে কথা বলা আমাদের জাতীয় অভ্যেস।'

আবার সবাই চুপ করে গেল। এঁদের কথাবার্তা যেমন ভুম করে শুরু হয়, তেমনি চট করেই থেমে যায়। আর কখনোই একটা বিষয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে না। বেশ মজা লাগছিল এইসব কথা শুনতে। অনিমেষ দেখল বৃদ্ধ ভদ্রলোক গাড়ির দুলুনির তালে তালে ঢুলছেন। মুখচোখ কেমন কড়কড়ে লাগছে অনিমেষের, জিভ শুকিয়ে উঠেছে। অনিমেষ অনুভব করল ওর পেটের ভেতরটা চিনচিন করছে। সারাদিন খাওয়া হয়নি, মুখের ভেতরটা বিস্বাদ হয়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণ চিন্তা করে নিয়ে অনিমেষ উঠে দাঁড়াল। ব্যাগটা ওপরের বাঙ্কে আছে। অনিমেষ চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে দু'হাতের ভর দিয়ে উঠে পড়ল বাঙ্কে। কেউ কেউ ওর এই উঠে আসা অলস চোখে একবার তাকিয়ে দেখল শুধু। ভাল করে বাবু হয়ে বসে পকেট থেকে চাবি বের করে অনিমেষ ব্যাগটা খুলল। জামাকাপড় অনেকক্ষণ ব্যাগে থাকলে কেমন মিষ্টি গন্ধ বের হয়। বাঁদিকের কোণা থেকে সে পলিথিনের ছোট্ট পুঁটলিটা টেনে বের করল। বাঁধন খুলে খাবারগুলো বের করল অনিমেষ। অনেকগুলো লুচি কিছু আলুভাজা সামান্য তরকারি আর ক্ষীর। জিভে জল এসে গেল অনিমেষের, খিদেটা যেন এতক্ষণ চুপিসাড়ে বসেছিল, খাবার দেখেই আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল। অনিমেষ লুচি ছিঁড়ে তরকারি নিয়ে মুখে দিতেই টকটক গন্ধ পেল। নষ্ট হয়ে গিয়েছে খাবারটা। বিশ্রী স্বাদ লাগছে। তাড়াতড়ি

মুখ থেকে খাবারটা বের করে ও পুঁটলিটাকে মুখের কাছে নিয়ে অন্যগুলোর গন্ধ শুঁকলো। কোনটাই ভাল নেই। গতকালের তৈরী খাবার কাল সারারাত আজ সারাদিন ব্যাগে বন্দী থাকায় এই গরমে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অনিমেষ কিছুক্ষণ হতভম্বের মত বসে থাকল। পিসীমা এত যত্ন করে এসব তৈরী করলেন আর সে নষ্ট করে ফেলল! এগুলোকে ফেলে দিতে ওর খুব খারাপ লাগছে, কিন্তু খাওয়া উচিত নয়। শুধু লুচিগুলো এখনও টকে যায়নি, খিদে মেটাতে অনিমেষ সেগুলোকেই ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল। কয়েকটা খাওয়ার পর অনিমেষ শুনল নিচে কেউ বলছেন, 'বাস-ট্রাম পাব কিনা জানি না।'

'বাস পাবেন কি মশাই, শুনছেন কারফিউ জারি হয়েছে! দিনে দিনে গেলে একরকম হতো, কিন্তু এত রাত্রে কি হবে কে জানে!'

'দূর কলকাতায় কখনো কারফিউ মানানো যায়! অত লোককে সামলাবে কে? দ্যাখেন না, একশ চুয়াল্লিশ ধারা জারি হল কিন্তু লোকজন যেমনকে তেমন চলাফেরা করছে। না বলে দিলে বোঝা যায় না।'

'আরে কারফিউ হল কারফিউ, ভয়েই লোক বাড়ির বাইরে যাবে না। যুদ্ধের সময় দেখেছি তো। অনিমেষ নিচে নেমে এল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক একবার চোখ খুলে আবার বন্ধ করে ফেললেন। প্যাসেজ দিয়ে অনিমেষ দরজার কাছে চলে এল। ভীষণ জলতেষ্টা পাচ্ছে। দরজার জানলা দিয়ে পুঁটলিটা বাইরে ফেলে দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল সে। এতখানি খাবার ফেলে দেবে? আজকে যখন খাবার নিয়ে এত আন্দোলন হরতাল হচ্ছে তখন এটা অপচয় নয়? না-হয় সামান্য নষ্ট হয়েছে খাবারগুলো কিন্তু কোন ভিখিরীকে দিলে সে খুশী হয়ে খেয়ে নেবে। কিছুক্ষণ চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত সে জানলা দিয়ে পুঁটলিটা বাইরে ফেলে দিল। একজন ভিখিরীকে এই খাবার খাইয়ে অসুস্থ করে দেওয়ার কোন মানে হয় না। বেসিনে হাত ধুয়ে অনেকখানি ঘোলা গরম জল খেতে পেট ভরে গেল অনিমেষের। তবু কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছে।

নিজের আসনে ফিরে এসে অনিমেষ দেখল, বাইরে আর অন্ধকার নেই। তিরতিরে জ্যোৎস্না ক্রমশঃ জোরালো হচ্ছে। দূরের বাড়িগুলো এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পাকা একতলা দোতলা বাড়িতে আলো জ্বলছে। হু-হু করে ট্রেন ছুটে যাচ্ছিল এতক্ষণ, এবার হঠাৎ গুমগুম শব্দ উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ ভদ্রলোক তড়াক করে উঠে বসলেন। তারপর বাঁদিকের জানলার দিকে ঝুঁকে দুটো হাত কপালে ঠেকিয়ে ঘন ঘন প্রণাম করতে লাগলেন। অনিমেষ অবাক হয়ে দেখল কামরার অন্যান্য যাত্রীরাও সবাই হুড়মুড় করে বাঁদিকের জানলায় চলে গিয়ে নমস্কার করতে

লাগলেন, 'মা, একটু দেখো মা।'

অনিমেষ দেখল খুব বিরাট এক নদীর ওপর দিয়ে ট্রেনটা যাচ্ছে। ঘোলা জলে জ্যোৎস্না পড়ে চকচকে ঢেউগুলোকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। এপাশে কি কোন মন্দির আছে? বৃদ্ধ ভদ্রলোক মাথা ঘুরিয়ে বললেন, 'আরে দেখছ কি, প্রণাম কর—মায়ের মন্দির দেখতে পাচ্ছ না?'

'মা?' অনিমেষ বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল।

'দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী। রামকৃষ্ণদেবের নাম শোননি? তিনি এখানে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে গেছেন। আর ওপাশে—' হাত বাড়িয়ে বিপরীত দিকের তীর দেখিয়ে তিনি বললেন, 'বেলুড়। বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠা করেছেন।'

সামনে এত মাথা আড়াল করে রেখেছে যে, অনিমেষ চেষ্টা করে শুধু মন্দিরের চুড়ো দেখতে পেল। দাদুর কাছে কথামৃত আছে, অনিমেষ পড়েছিল। রামকৃষ্ণদেব নাকি কালীঠাকুরের সঙ্গে কথা বলতেন। কিছু দেখার আগেই মন্দিরটা ছাড়িয়ে গেল। অনিমেষ যাত্রীদের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। এতক্ষণ যাঁরা রাজনীতি নিয়ে কথা বলছিলেন, তাঁরাই কি দারুণ ভক্ত-ভক্ত মুখ করে নিজের আসনে ফিরে আসছেন। গাড়ির গতি কমে আসছিল এবার। হঠাৎ যেন যাত্রীদের খেয়াল পড়ল, তিন-চারটে গলা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'জানলা বন্ধ করে দিন মশাই, জানলা বন্ধ করে দিন।'

একজন যাত্রী স্যুটকেস নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'আমি কিন্তু এখানে নামব।'

'দাঁড়ান দাদা, চট করে নেমে পড়বেন না। শেষে আপনারও বিপদ, আমাদেরও দফারফা হবে।'

'কিন্তু গাড়ি তো এখানে মোটে তিন মিনিট দাঁড়ায়।' যাত্রীটি প্রতিবাদ করলো।

'পাঁচ মিনিট।'

'কক্ষনো নয়। আমি এখানে থাকি আর আমি জানি না!' ভদ্রলোক লক খুলে দরজার হাতল ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিন-চারজন যাত্রী উঠে ওঁর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। উনি নামলেই এঁরা দরজা বন্ধ করে দেবেন। আস্তে আস্তে ট্রেনটা প্লাটফর্মে ঢুকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দুম্‌দাম করে কানফাটানো শব্দ হল। কেউ একজন চাপা গলায় বলে উঠল, 'বোম পড়ছে!'

অনিমেষ দেখল, নামবার জন্য যিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন তিনি খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। কি করবেন বুঝতে পারছেন না। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত নেবার আগেই দরজা বন্ধ করতে যাওয়া যাত্রীরা চটপট আবার লক তুলে দিল, 'আপনাকে আর

নামতে হবে না।'

'কিন্তু—।' ভদ্রলোক বিড়বিড় করলেন।

জানলার ফুটো দিয়ে বাইরে তাকিয়ে একজন বলে উঠল, প্ল্যাটফর্মটা দেখেছেন? ঘুটঘুটে অন্ধকার। স্টেশনের বাইরে বোম পড়ছে—বাপের দেওয়া প্রাণটা হারাবেন মশাই?'

হতাশ গলায় একজন বলে উঠল, 'অবস্থা খুব ঘোরালো দেখছি।'

'কিন্তু আমি শিয়ালদায় গেলে ফিরব কি করে? না না, যা হয় হবে আমাকে নামতে দিন।' কথা বলতে বলতে ভদ্রলোক লক খুলে দরজার হাতল ঘুরিয়ে যেন গায়ের জোরে নিচে নেমে গেলেন। অনিমেষ শুনল ভদ্রলোক চিৎকার করে কুলিকে ডাকছেন। কিন্তু কোন সাড়া এল না কোথাও থেকে। যাত্রীরা দরজা বন্ধ করে ফিরে আসতেই ট্রেনটা আবার চলতে শুরু করল। এখন প্রায়ই বোমের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ভদ্রলোক কি করে বাড়ি যাবেন কে জানে।

দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে গেল মানে কলকাতা এসে গেছে। এতক্ষণ অনিমেষ যেটা খুব আমল দেয়নি সেই চিন্তাটা মাথায় ঢুকে পড়ল। যে সময়ে ট্রেনটা যাচ্ছে তা নির্ধারিত সময়ের সাড়ে তিন ঘণ্টা পার করে। বাবার বন্ধু, যাঁকে সে কোনদিন দেখেনি, যদি এতক্ষণ তার জন্য স্টেশনে অপেক্ষা না করেন? তাছাড়া কারফিউ যখন জারি হয়েছে তখন তিনি রাস্তায় বের হবেন কি করে? যদি তিনি স্টেশনে না আসেন তাহলে সে কি করবে? ক্রমশ অনিমেষ নার্ভাস হয়ে পড়ল। এখন এখানে এত বোমা পড়ছে কেন? জনসাধারণের সঙ্গে কি পুলিসের যুদ্ধ হচ্ছে? সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হল, এটা অসম্ভব। কারণ জনসাধারণ মানে তো এই কামরার মানুষেরাই, এঁরা কখনো পুলিসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারেন না। সারা রাত কি তাহলে ওকে স্টেশনে কাটাতে হবে? অবশ্য বৃদ্ধ ভদ্রলোক ঠিকানাটা শুনে বলেছেন যে স্টেশন থেকে বেশী দূরে নয় এবং তিনি ওই অঞ্চলেই থাকেন। তাহলে ওঁর সঙ্গে থাকাই ভাল। তবু অনিমেষ হঠাৎ অনেকদিন পরে চটপট আঙুল দিয়ে কপালে '঱' শব্দটা লিখে মা বলে দুই হাতে মুখটা ধরে মনে মনে প্রণাম করে নিল। এরকম করে ওর মনে হল ব্যাপারটা নিশ্চয়ই সমাধান হয়ে যাবে। ও শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছে নিশ্চয়ই বাবার বন্ধুকে দেখতে পাবে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁর জিনিসপত্র ঠিকঠাক করে নিচে বেঞ্চির ওপর নামিয়ে রাখলেন। যাত্রীরা সবাই প্রস্তুত হচ্ছে। অনিমেষ চুপচাপ বসেছিল। এই মানুষ-গুলোর সঙ্গে অনেকক্ষণ কাটিয়ে ও নতুন রকমের অভিজ্ঞতা পেল, হয়তো জীবনে আর দেখা হবে না। অনেক কিছুর মধ্যে একটা ব্যাপার শুধু ওর মনে খচখচ

করছে, সেই ভদ্রলোকের আর্ত চিৎকার সত্বেও সে দরজাটা এঁদের জন্য খুলে দিতে পারেনি। এখন নিজেকে খুব ছোট মনে হতে লাগল অনিমেষের। দেশকে যারা ভালবাসে তারা কখনও কাপুরুষ হতে পারে না, তাহলে কি সে কাপুরুষ? দেশ মানে তো এইসব মানুষ, এরাই কি অদ্ভুত শামুকের মত ভয়ে ভয়ে এতটা পথ কাটিয়ে এলেন, এখনও কামরার জানলা বন্ধ। কিন্তু এদের মুখ দেখে মনে হচ্ছে না, সেই ভদ্রলোককে উঠতে না দিয়ে এঁদের মনে কোন আফসোস আছে। সকলেই যে যার বাড়িতে যাবার জন্য জিনিসপত্র গুছিয়ে তৈরী, শুধু ট্রেন থামার অপেক্ষা।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, 'তোমার তো শুধু ওই ব্যাগ আর ওই বেডিং, কুলির প্রয়োজন হবে না, কি বল?'

অনিমেষ ঘাড় নাড়ল। গতরাত্রে উনি অনিমেষকে আপনি করে কথা বলেছিলেন, আজ সকাল থেকে সেটা ঘুচে গেলে অনিমেষের স্বস্তি হয়েছে। সে বলল, 'আপনি একটু দাঁড়িয়ে যাবেন?'

'মানে?'

'আমার বাবার বন্ধুকে খুঁজে দেখব!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। উনি না এলে আমি তোমায় পৌঁছে দেব। আরে ও তো আমারই পাড়া। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।'

কলকাতা আসছে। অনিমেষের বুকের মধ্যে আজন্ম প্রতিপালিত ইচ্ছেটা পূর্ণ হতে যাওয়ার মুখে একটা উত্তেজনা ছটফট করছিল। সেই কোন্ ছেলেবেলায় সরিৎশেখর বলেছিলেন, কলকাতায় যখন সে আসবে মাথা উঁচু করে আসবে, কারো হাত ধরে নয়। আজ তো তাই হচ্ছে। বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষ বোসের কলকাতায় সে একটু বাদে পা দেবে। কলকাতা মানে বাংলা দেশের প্রাণ। সেই প্রাণকে সে স্পর্শ করতে যাচ্ছে।

এক সময় ট্রেন গতি কমিয়ে আনল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক জানলা খুলে দিতে দূরে আলোঝলমল প্ল্যাটফর্ম চোখে পড়ল অনিমেষের। ট্রেনটা যত নিকটবর্তী হচ্ছে তত মানুষের মাথা চোখে আসছে। কে যেন বলল, 'যাক, শ্যালদা এসে গেল!'

উত্তেজনায় অনিমেষ উঠে দাঁড়াল। আর সঙ্গে সঙ্গে তার দু চোখ জ্বলতে লাগল। পরমুহূর্তেই হু-হু করে সেই জ্বলুনি একরাশ জলে চোখ ভাসিয়ে দিল। কামরার সব মানুষের চোখে হাত। কলকাতায় পৌঁছেই অনিমেষ দু হাতে চোখ চেপে ধরল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'টিয়ার গ্যাস!'

ট্রেনটা থামতেই হুড়মুড় করে নেমে গেল সবাই। অনিমেষ কিছুতেই নিজের চোখ দুটোকে সামলাতে পারছিল না। বাতাসে অদ্ভুত একটা গন্ধ, আর সেই সঙ্গে চোখে জ্বলুনি। রুমালে চোখ চেপে ধরলে কিছুটা স্বস্তি পাওয়া যায়। চোখের জল ফেলতে ফেলতে সে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের পেছন পেছন কলকাতার মাটিতে পা দিল। দিনের আলোর মত নিয়নবাতিতে সমস্ত প্ল্যাটফর্ম পরিষ্কার। সেখানে তিল ফেলার জায়গা নেই যেন, অজস্র মানুষ স্যুটকেস প্যাঁটরা নিয়ে বসে বসে কাঁদছে। এর মধ্যে কেউ জল যোগাড় করে বাচ্চাদের চোখে ঝাপটা দিচ্ছে। ওদের ট্রেনের যাত্রীরা নামতে প্ল্যাটফর্ম দিয়ে হাঁটা মুশকিল হয়ে দাঁড়াল। এত বড় প্ল্যাটফর্ম কলকাতা শহরেই মানায়, অনিমেষ চোখ সামলে চারধার দেখছিল। ওপাশে পর পর অনেকগুলো এরকম প্ল্যাটফর্ম রয়েছে। সেখানেও মানুষেরা বসে আছে। এত মানুষ অথচ তেমন চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছে না। অনিমেষ শুনল মাইকে যাত্রীদের শান্ত হয়ে থাকার উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। একটা কুলিমতন লোক সামনে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছিল। মালপত্র তোলার বিন্দুমাত্র আগ্রহ তার নেই। দু'-একজন তাকে ডাকতে সে ঘাড় নেড়ে বলল, 'কারফু হো গয়া, নেহি যায়েগা।'

বৃদ্ধ ভদ্রলোকেরও সেই দশা, চোখে রুমাল চেপে বললেন, 'বেশী রগড়িও না, তাহলে কষ্টটা কমে যাবে।' কলকাতায় পা দিয়ে এরকম একটা অভিজ্ঞতা পেয়ে অনিমেষ খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল। টিয়ার গ্যাসের নাম কাগজে সে পড়েছে, জিনিসটা কিরকম সে জানে না তবে তার প্রতিক্রিয়া যে মারাত্মক তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই স্টেশনের মানুষগুলোকে টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ে কাঁদানো হচ্ছে কেন? এরা তো সবাই শান্ত হয়ে বসে আছে। কিছুক্ষণ ওরা চুপচাপ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকার পর বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, 'চল, একটু এগিয়ে দেখা যাক।'

এর মধ্যে অনেকেই বিছানাপত্র বিছিয়ে প্ল্যাটফর্মে শুয়ে পড়েছে। অনিমেষরা অনেক সাবধানে ওদের পাশ কাটিয়ে গেটের কাছে চলে এল। সেখানে অনেক মানুষের ভিড়, সবাই উঁকি মেরে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করছে। বৃদ্ধ বললেন, 'আজ দেখছি চেকার-টেকার কেউ গেটে দাঁড়িয়ে নেই।' একজন ফিরিওয়ালা সেকথা শুনে বলল, 'কলকাতা শহরে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে এখন, আর কে টিকিট চাইবে! দেখছেন না কেউ বাইরেই বেরুচ্ছে না!'

অনিমেষ বলল, 'কেন, বাইরে বেরুলে কি হবে?'

'দুমদাম ফটাস।' মুখ দিয়ে একটি অদ্ভুত আওয়াজ বের করল লোকটা, "মিলিটারী নেমে গেছে, ভোরের আগে রাস্তায় কাউকে দেখলে সোজা মর্গে চালান করে দেবে।'

বাবার বন্ধুর খোঁজ নেবার কথাটা এতক্ষণ অনিমেষ এইসব ঝামেলায় খেয়াল করেনি, ভোর শব্দটা শুনে চট করে মনে পড়ে যেতে ও চঞ্চল হয়ে উঠল। বৃদ্ধকে সেকথা বলতে তিনি বললেন, 'তাহলে গেটের বাইরে যেতে হয়। কিন্তু তিনি কি আসতে পেরেছেন? মনে হয় না।' অনিমেষ যে ভয়টা সারাটা পথ এড়িয়ে যাচ্ছিল এখন সেটা তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল। সত্যি যদি তিনি না আসতে পারেন, তাহলে কি হবে? দু চোখ আড়াল করলে যেন জ্বালাটা সামান্য কমে যায়, অনিমেষ বৃদ্ধের সঙ্গে সেইভাবে ভিড়ের সামনের সারিতে এসে দাঁড়াল। কয়েক হাত খালি প্ল্যাটফর্মের পর কোলাপসিবল গেট হাঁ করে খোলা, তার বাইরে বিশাল বারান্দা বা চাতাল খাঁ-খাঁ করছে। যাত্রীরা সবাই একটা নিরাপদ দূরত্ব রেখে বাইরের দিকে তাকিয়ে, কেউ এগোতে সাহস করছে না। মাঝে মাঝে দূরদূরান্ত থেকে বোমা পড়ার শব্দ ভেসে আসছে, কাছেপিঠে কিছু হচ্ছে না।

টেলিফোন বুথগুলোকে দেখলেই চেনা যায়, ওপরে ছবি টাঙানো আছে। তার সামনেই এনক্যয়ারি লেখা কাউন্টার, কিন্তু সেখানে কেউ নেই। কোন মানুষকে প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল না। যদি সারাদিন এইরকম কারফু থাকে শহরে তাহলে তিনি বের হবেন কি করে? এখন কিছুই করার নেই, শুধু এই প্ল্যাটফর্মে এত মানুষের সঙ্গে চুপচাপ ভোরের অপেক্ষা করা ছাড়া। অনিমেষের মনে পড়ল দাদু অনেক ভেবেচিন্তে ওর যাত্রার যে দিন ঠিক করেছিলেন, সেটা এ রকম গোলমেলে হয়ে গেল? স্টেশনের ভেতরে একটা বড ঘড়িতে সময় দেখল সে, এগারটা বেজে গিয়েছে।

আজ শিয়ালদা থেকে কোন ট্রেন ছাডছে না। শুধু দূরপাল্লা মেল ট্রেনগুলো এসে যাত্রী নামিয়ে চুপচাপ শেডে ফিরে গিয়েছে। টিয়ার গ্যাসের জ্বলুনি কমলে আটক যাত্রীদের গুঞ্জন মিলিয়ে গেল। কেউ বেশী কথা বলছে না। জিনিসপত্র নিচে নামিয়ে অনিমেষ বসে পডেছিল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক খুব অস্থির হয়ে পডেছেন। এখান থেকে তাঁর বাড়ি হেঁটে গেলে মাত্র দশ মিনিটের পথ, অথচ সারারাত এই প্ল্যাটফর্মে আটকে থাকতে হবে—এটা যেন তিনি কিছুতেই মানতে পারছিলেন না। অনিমেষের কাছে জিনিসপত্র রেখে তিনি খবরাখবর নেবার জন্য অন্য প্ল্যাটফর্মে চলে গেলেন।

শুরুতেই এই ধরনের ব্যাপার হয়ে গেল, অনিমেষের ভাল লাগছিল না। কলকাতা শহরকে দেখবার জন্য ওর মন ছটফট করছিল, এখন এই পরিবেশে নিজেকে খুব ক্লান্ত লাগছে। কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে বামপন্থীদের যুদ্ধ হচ্ছে এখানে?

কিসের যুদ্ধ ? খাবার যদি কারণ হয়, তাহলে সে যুদ্ধ তো ও যে বাংলা দেশকে এতটা পথ দেখে এল, বর্ধমান ছাড়া কেউ তাতে যোগ দেয়নি। শুধু কলকাতা মানেই তো বাংলা দেশ নয়। তাহলে বামপন্থীদের এই যুদ্ধ কতটা সাফল্য লাভ করবে ? কংগ্রেস সরকারের হাতে মিলিটারি আছে, তাদের অস্ত্র আছে—এভাবে কি খাবার আদায় করা যায় ? একে কি গৃহযুদ্ধ বলে ?

আর কংগ্রেস সরকারই বা নিজের দেশের মানুষের ওপর গুলি চালাচ্ছে কেন ? তারা খাবার চেয়েছে অল্প দামে, সরকার সেটা দিয়ে দিলেই তো পারে। তাহলে দেশের মানুষেই কংগ্রেসের ওপর খুশী হবে—আরো বেশী ভোট পাবে নির্বাচনে। সেটা নিশ্চয়ই কংগ্রেস সরকার জানে এবং জেনেশুনেই এইরকম উপায়ে মোকাবিলা করছে। অনিমেষ অনেক ভেবে শেষ পর্যন্ত এইরকম একটা সিদ্ধান্তে এল যে, আজ যে ঘটনাটা কলকাতা শহরে ঘটছে তা খুব সরল নয়। নিশ্চয়ই তার পেছনে অন্য কোন কারণ আছে যা ও বুঝতে পারছে না। এখন আর টিয়ার গ্যাসের সেই জ্বলুনিটা নেই, পরিষ্কার চোখে চারধারে অনেক সিনেমার বিজ্ঞাপন দেখতে পেল। এখন আলোগুলো কেমন হলুদ-হলুদ দেখাচ্ছে। রাত যত বাড়ে তত কি আলোগুলোর চেহারা পালটে যায় ? অনিমেষ দেখল একটা কালো মতন মাঝবয়সী মেয়েছেলে সামনে সতরঞ্চি পেতে শুয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হতে সে ফিক করে দোক্তা-খাওয়া হাসি হাসল। চোখ ফিরিয়ে নিল অনিমেষ, কে না জানে কলকাতায় খারাপ মেয়ে এবং পুরুষ সব সময় শিকার ধরতে ঘুরে বেড়ায়। এদের থেকে সতর্ক না থাকলে এই শহরে একদিনও বাস করতে পারা যাবে না। ও অলসভাবে নিজের কোমরে হাত বুলিয়ে দেখে নিল, টাকাগুলো ঠিকই আছে।

খুব জলতেষ্টা পাচ্ছে। এখানে কাছেপিঠে জলের কল কোথায় আছে ? অনিমেষ উঠে দাঁড়াতে গিয়ে হাল ছেড়ে দিল। এত জিনিসপত্র এখানে রেখে সে জল খেতে যাবে কি করে ? নিজেরটা হলে বয়ে নিয়ে যাওয়া যেত কিন্তু বৃদ্ধ ভদ্রলোকের ব্যাগও রয়েছে। উনি যে কোথায় গেলেন ! মাঝবয়সী মেয়েছেলেটার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল আবার, এক হাত কনুই থেকে ভাঁজ করে মুখের ওপর আড়াল দিয়েছে। কালো দাঁত বের করে বলল, 'শুয়ে পড় খোকা, ঘুমিয়ে গেলে সকাল হয়ে যাবে'খন।' অনিমেষ বলতে চাইল, আমি এইরকম পায়ে চলা জায়গায় জীবনে শুইনি, অতএব আজ বসেই রাত কাটাবো, কিন্তু বলতে গিয়েও থমকে গেল সে। তার এই ষোল-সতের বছরের জীবনে অনেক কিছু সে করেনি, এখন তো করছে। যেমন কোনদিন সে কলকাতায় আসেনি, এর আগে কখনো দাদু

পিসীমাকে ছেড়ে একা একা থাকেনি, এইভাবে টিয়ার গ্যাসে কখনো তার চোখ জ্বলেনি—এগুলো সব এখন ঘটছে। তাই কোনদিন করিনি বলে করব না বলা বোধ হয় ঠিক নয়। সে ঘাড় নেড়ে বলল, 'না, ঘুম আসছে না।'

'কোত্থেকে আসা হল ?' কথা বলল মেয়েছেলেটা।

'জলপাইগুড়ি।'

'সে কোথায়—আসামে ?'

'না, তবে ওই দিকেই।'

'সেখানে পাহাড় আছে ?'

হেসে ফেলল অনিমেষ। জলপাইগুড়ি শহরে বা জেলায় পাহাড় বলতে তেমন কিছু নেই। জঙ্গল আছে, পাহাড়ী আবহাওয়া আছে। সে বলল, 'নেই।'

যেন হতাশ হল মেয়েছেলেটা, 'আসামে পাহাড় আছে, সেখানে আমার দেওর কাজ করে। তবে লোক ভাল নয়, মাতাল।'

অনিমেষ মুখ ফিরিয়ে নিল। কি মতলব কে জানে, নাহলে যেচে যেচে নিজের পরিবারের খবর ওকে দিতে যাবে কেন ? মেয়েছেলেটা অবশ্য একা নেই, ওর পাশে একটা ফ্রকপরা মেয়ে উল্টোদিকে মুখ করে শুয়ে আছে। তাকে ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না অনিমেষ। এই সময় মাইকে আবার ঘোষণা করা হল, 'যাত্রীসাধারণের কাছে আবেদন, সমগ্র কলকাতা শহরে শান্তি বিঘ্নের আশংকায় কারফু জারি হওয়ায় আগামীকাল ভোর ছটার আগে কেউ স্টেশন চত্বরের বাইরে যাবেন না। এতে আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিন্ত হবে।' বেশ কয়েকবার এই কথাগুলো আওড়ে মাইকটা থেমে গেল। এই সময় বৃদ্ধ ভদ্রলোককে হন্তদন্ত হয়ে ফিরতে দেখল অনিমেষ। এক হাতে বাদামের ঠোঙা একটা, কাছে এসে বললেন, 'খিদে পায়নি ?' অনিমেষ ঘাড় নাড়তে তিনি বললেন, 'একটু আগে ট্রেনেই তো খেয়ে নিলে তুমি।'

ওঁর বাদাম চিবোনো মুখটার দিকে তাকিয়ে অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল, 'কি দেখলেন ?'

'বুঝতে পারছি না। কোনরকমে এই সার্কুলার রোডটা পেরিয়ে যেতে পারলেই বাড়ি পৌঁছে যাওয়া যায়। কি যে করি !' বৃদ্ধের চোয়াল নাচছিল। তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়ে গিয়েছে এমন ভঙ্গীতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আচ্ছা চল তো, এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে যাই।'

'কেন ?' অনিমেষ উঠে দাঁড়াল।

'ওখান থেকে সার্কুলার রোড পাঁচ পা রাস্তা। কিন্তু বাইরে দিয়ে যাওয়া ঠিক

হবে না। শুভ, চলে এস এদিকে।' নিজের জিনিস হাতে নিয়ে বৃদ্ধ আগে আগে চললেন, পেছনে অনিমেষ। ওরা যাত্রীদের মধ্যে দিয়ে প্ল্যাটফর্মের পেছনদিকে ফিরে যাচ্ছিল। এদিক দিয়ে কিভাবে বের হওয়া যাবে অনিমেষ বুঝতে পারছিল না। প্ল্যাটফর্মের শেষপ্রান্তে জায়গাটা ঢালু হয়ে মাটিতে মিশে গিয়েছে। শেষ আলোটা ছাড়িয়ে ওরা নিচে নামল। তারপর কয়েক পা হেঁটে বাঁদিকে ঘুরে অনেকগুলো রেললাইন পেরিয়ে একদম শেষপ্রান্তে চলে এল। এখন কোন ট্রেন আসা-যাওয়া করছে না। মাথার ওপর ঘুড়ির মত কোণাটে চাঁদ ঝুলে রয়েছে। তার আলোয় রেললাইনগুলো চকচকে সাপের মত জড়াজড়ি করছে।

বৃদ্ধ কোন কথা বলছিলেন না এতক্ষণ, এবার আবার ফিরতে শুরু করে বললেন, 'যাই .বলো বাবা, এভাবে প্ল্যাটফর্মে বসে সারারাত কাটাবো আমি ভাবতেই পারি না। হাজার হোক আমরা কলকাতার ছেলে, বাড়ির দু-পা দূরে বসে থাকব অথচ বাড়িতে যেতে পারব না—এ হতেই পারে না। আঃ, কোন রকমে রাস্তাটুকু পার হতে পারলেই গলিতে ঢুকে পড়ব, ব্যাস, সামান্য হাঁটলেই বাড়ি। বাড়ি মানে নিজের বিছানা—আঃ!'

কথাগুলো শুনতে শুনতে অনিমেষের মনে হল জলপাইগুড়িতে ওর নিজের বিছানাটা এখন খালি পড়ে আছে। অথচ আজ রাত্রে ওর জন্য কোন বিছানা তৈরি নেই। এত রাত্রে যদি বাবার বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে সে উপস্থিত হয় তিনি নিশ্চয়ই বিব্রত হবেন। আবার এও হতে পারে তিনি নিজে স্টেশনে আসতে পারলেন না, অনিমেষ একা কি করছে—এই ভেবে বোধ হয় তিনি ঘুমুতেই পারছেন না। তাই সে যদি এখন বাড়িতে যায় তিনি নিশ্চিন্ত হবেন। কিন্তু রাস্তা যদি জনশূন্য হয় তাহলে কে তাকে ঠিকানা চিনিয়ে দেবে? কলকাতার রাস্তায় নাকি বাড়ির নম্বর পর পর থাকে না। তার চেয়ে কাল ভোরে আলো ফুটলে রাস্তায় লোক বের হলে জিজ্ঞাসা করেটরে গেলেই বোধ হয় ভাল হবে। মোটামুটি এই রকম সিদ্ধান্ত নিয়ে অনিমেষ বৃদ্ধের পেছন পেছন হাঁটতে লাগল। দূর থেকে প্ল্যাটফর্মটাকে ছবিতে দেখা জাহাজের মত মনে হচ্ছে, আলো নিয়ে দুলতে দুলতে কাছে এগিয়ে আসছে।

এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে লোকজন তেমন নেই। কিছু ভিখিরী আর ছন্নছাড়া টাইপের মানুষ শুয়ে রয়েছে। ওরা ওদের পাশ দিয়ে মূল গেটে চলে এল। এদিকে মেইন প্ল্যাটফর্মের মত জোরালো আলো নেই। কোলাপসিবল গেটের সামনে এসে ওরা থমকে দাঁড়াল। সামনে অনেকখানি খোলা জায়গা, ডানদিকে স্টেশনে ঢোকার গেট, গেট ছাড়িয়ে রাস্তা দেখা যাচ্ছে। ওপাশটা অন্ধকার অন্ধকার।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক অনেকক্ষণ সেদিকে নজর রেখে ফিসফিস করে বললেন, 'কোন মানুষজন তো দেখতে পাচ্ছি না। পুলিস‌ও নেই।'

'ওটা কি রাস্তা?' অনিমেষ জিজ্ঞাসা করল।

'সার্কুলার রোড। ওটা পেরোলেই হয়ে গেল, পায়ে পায়ে বাড়ি পৌঁছে যাব।' অন্ধকার রাস্তার দিকে তাকিয়ে অনিমেষ প্রথম কলকাতাকে দেখল। বৃদ্ধের অস্থিরতা বেড়ে যাচ্ছিল। তিনি শেষ পর্যন্ত বললেন, 'চল আড়ালে আড়ালে পথটুকু পেরিয়েই যাই।'

'কিন্তু আমি এখন ঠিকানাটা কি খুঁজে বের করতে পারব?' অনিমেষ কি করবে বুঝতে পারছিল না। এই প্ল্যাটফর্মে রাতটা কাটানোই নিরাপদ বলে মনে হচ্ছিল ওর। বৃদ্ধ বললেন, 'আঃ, কলকাতা শহরে ঠিকানা থাকলে বাড়ি খুঁজে পাওয়া খুব সোজা। বলছি তো, ওটা আমারই পাড়া।'

'আমি তো পথঘাট কিছু চিনি না।' অনিমেষ বিড়বিড় করল।

'সে তো ট্রেনে উঠেই শুনেছি। আমার ওপর ভরসা নেই? যদি আজ তোমার সেই ঠিকানা না-ও পাওয়া যায় তুমি তো জলে পড়বে না। আমার বাড়িতে তোফা রাতটুকু কাটিয়ে যেতে পার।' বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, 'সেটা নিশ্চয়ই এই প্ল্যাটফর্মের চেয়ে নিরাপদ।'

অনিমেষ অবাক হয়ে বলল, 'এখানে কি হতে পারে?'

'তুমি এখনও নাবালক।' বৃদ্ধ ঠোঁট ওল্টালেন, 'গুণ্ডাদের খুঁজতে পুলিস এখানে এসে হামলা করলে তুমি কি করবে? তোমার বয়সের ছেলেদেরই তখন বিপদ হবে। আমার কি বল, এতটা পথ একসঙ্গে এলাম, কেমন মায়া পড়ে গেছে বলে এত কথা বলা। একা একা যেতে ঠিক মানে—বুঝলে, সঙ্গী থাকলে সাহস পাওয়া যায়।'

বৃদ্ধ চলে গেলে একা এই এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে থাকার কথা ভেবে অনিমেষ ঘাবড়ে গেল। মেইন প্ল্যাটফর্মে অত লোকের সঙ্গে থাকলে এক কথা ছিল, পুলিস খামোকো নাজেহাল করতে আসতই বা কেন! কিন্তু এই ভিখিরীদের সঙ্গে সারাটা রাত থাকা অসম্ভব। এরা যদি হঠাৎ দল বেঁধে তার জিনিসপত্র টাকাপয়সা ছিনিয়ে নেয় ও কিছুই করতে পারবে না। তাছাড়া পুলিস এলে আর কেউ তা দেখার থাকবে না। এক হয়, আবার যে পথ দিয়ে ওরা মেইন স্টেশন থেকে এখানে এসেছিল সেই পথে ফিরে যাওয়া। অনিমেষ একা একা সাহস পাচ্ছিল না ফিরে যেতে। তার চেয়ে যা ইনি বলছেন তাই শোনাই ভাল। অন্তত ওঁর বাড়িতেও রাতটা নিশ্চিন্তে কাটানো যাবে।

ওকে রাজী হতে দেখে বৃদ্ধ খুশী হলেন, 'কিছু চিন্তা করতে হবে না তোমাকে, শুধু আমার পেছন পেছন চলে এস।'

কোথাও কোন শব্দ নেই, ওরা শেডের অন্ধকারে পা টিপে টিপে মেইন গেটের কাছে চলে এল। বৃদ্ধ সামনে, অনিমেষ পেছনে। সমুখেই বিরাট রাস্তা, মাঝখানে লোহার লাইন পোঁতা। নিশ্চয়ই ওটা ট্রামলাইন। রাস্তার ওপাশের যেটুকু চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছিল তাতে বোঝা যায় যে এখন কোন দোকানপাট খোলা নেই। বৃদ্ধ মুখ বের করে রাস্তাটা দাঁড়িয়ে দেখে নিলেন, 'না, কেউ নেই, ধুধু করছে। এস।'

অনিমেষ আড়ালে আড়ালে ওঁর সঙ্গে নিঃশব্দ পায়ে বাইরে চলে এল। এতক্ষণ দুহাতে বয়ে আনা ব্যাগ বেডিং-এর ওজন সম্পর্কে ওর কোন খেয়ালই ছিল না, এই বিরাট শহরের চওড়া রাস্তার ধারে নিজের দুটো হাতের টনটনানি হঠাৎই সে অনুভব করতে লাগল। সামনে আর একটা বড রাস্তা এসে এই রাস্তায় মিশেছে। বৃদ্ধ ফিসফিস করে বললেন, 'এখানে না, ধার দিয়ে আরো একটু এগিয়ে গিয়ে আমরা রাস্তাটা পার হব, বুঝলে ?'

'ওটা কি রাস্তা ?'

'হ্যারিসন রোড। লোকজন কি প্যানিকি হয়ে গেছে আজকাল, মিছিমিছি ভয় পায়—দেখছ তো পথে একটাও পুলিস নেই।' ওরা যখন ফুটপাথের গা ঘেঁষে অনেকটা সামনে এগিয়েছে তখন হঠাৎ দূরে কিছু শব্দ বেজে উঠল। অনিমেষ দেখল কি যেন কালোমতন এগিয়ে আসছ। বৃদ্ধ বললেন, 'আলো নেই—ট্রাম চলছে, ডিপোয় যাচ্ছে বোধ হয়।' এপাশটায় সরে এস, কেউ দেখতে পাবে না তাহলে।'

দেওয়ালের গায়ে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে অনিমেষ অনেক দূরে থাকা ট্রামটাকে দেখছিল। এর আগে কখনো ট্রাম ছাখেনি, বিস্ময় নিয়ে এই বিচিত্র পরিবেশে সে অপেক্ষা করছিল। ওদের সামনে রাস্তার উল্টোদিকে একটা বিরাট ব্যানারে সিনেমার বিজ্ঞাপন। এত বড় বিজ্ঞাপন সে এর আগে কখনো ছাখেনি। অনিল চট্টোপাধ্যায়ের মুখটা কি দারুণ জীবন্ত দেখাচ্ছে চাঁদের আলোয় মাথামাখি হয়ে। পাশেই একটা বীভৎস মুখ, কি ছবি ওটা ?

হঠাৎ বৃদ্ধ খপ করে হাত শক্ত করে ধরতেই অনিমেষ চমকে সামনের দিকে তাকাল। চার-পাঁচজন মানুষ খুব দ্রুত এগিয়ে এসে ট্রামের সামনে দাঁড়িয়ে কি যেন করছে। ওদের পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না অনিমেষরা। ট্রামটা আর চলছে না।' বৃদ্ধ খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। অনিমেষ অনুভব করল, ওঁর হাত কাঁপছে।

কোন রকমে কথা বললেন তিনি, 'এখানেই দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। চল রাস্তা পেরিয়ে যাই এইবেলা।' কথাটা শেষ করেই তিনি উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে রাস্তাটা পার হয়ে গেলেন। অনিমেষ তেমন দ্রুত দৌড়ে যেতে পারল না হাতে বোঝা থাকায়। সে যখন পার হয়ে গিয়ে বৃদ্ধের কাছে দাঁড়িয়েছে ঠিক তখন দাউ দাউ করে ট্রামটায় আগুন জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সেই ছায়া-ছায়া শরীরগুলো দৌড়ে রাস্তা পেরিয়ে কোথায় উধাও হয়ে গেল। বৃদ্ধ ফ্যাসফেসে গলায় বললেন, 'ইস, ওরা ট্রামে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে! এখনই পুলিস আসবে—পালাও।'

অনিমেষ ওঁর পেছন পেছন ছুটতে চেষ্টা করে বলল, 'আর কত দূরে?' বৃদ্ধ কি বলতে মুখ ফেরাতে দড়াম করে আছাড় খেয়ে পড়লেন। 'উঃ, বাবা গো!' চিৎকারটা আচমকা অনিমেষকে পাথর করে দিল। ফুটপাথের একদিকে বেঞ্চি মত পাতা, বোধ হয় হকাররা এখানে কেনাবেচা করে, তারই এক পায়ার সঙ্গে দড়ি বাঁধা ছিল, বৃদ্ধ তাতেই হোঁচট খেয়েছেন। অনিমেষ তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে ওঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'খুব লেগেছে?'

বৃদ্ধ ঘাড় নাড়লেন, ওঁর খুব যন্ত্রণা হচ্ছে বোঝা যাচ্ছিল। সামনে দাউ দাউ করে ট্রাম জ্বলছে। কলকাতায় পা দিয়ে অনিমেষ প্রথম যে ট্রামটাকে পেল তার সর্বাঙ্গে আগুন। বৃদ্ধকে নিয়ে কি করা যায় বুঝতে পারছিল না অনিমেষ। ও জিনিসপত্র মাটিতে রেখে ওঁকে তুলে ধরতে চেষ্টা করল, 'উঠতে পারবেন?'

বৃদ্ধ ঘাড় নাড়লেন, 'বড় কষ্ট হচ্ছে। তুমি বরং সামনে গলিতে ঢুকে বাঁ-হাতি পাঁচ নম্বর বাড়িতে খবর দাও। আমার ছেলের নাম সুজিত।' সেই ভাল। বৃদ্ধের বাড়ি তাহলে খুব কাছে। অনিমেষ উঠে মালপত্র নিয়ে কয়েক পা এগোতেই থমকে দাঁড়াল। খুব দ্রুত একটা কালো রঙের ভ্যান ছুটে আসছে এদিকে। পাশাপাশি একটা জিপগাড়ি। পেছনে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজিয়ে বোধ হয় একটা দমকলের গাড়ি আসছে। শব্দ করে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িগুলো। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো পুলিস লাফিয়ে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে, নেমে ট্রামের দিকে ছুটে গেল। ওদের হাতের রাইফেল সামনের দিকে তাগ করা। জিপের লোকগুলো বোধ হয় অফিসার, হাত নেড়ে ওদের কি সব উপদেশ দিচ্ছে। ওরা যদি এদিকে তাকায় তাহলে অনিমেষদের দেখতে পেয়ে যাবে। দেখতে পেলে ওরা মনে করবে সে ট্রামগাড়িতে আগুন দিয়েছে! অন্তত তাকে ওরা প্রশ্ন নিশ্চয়ই করবে, আর তাহলেই জানতে পারবে সে এই প্রথম মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে কলকাতায় এসেছে, এখনও টিকিট পকেটে আছে আর হাতের স্যুটকেসগুলো তো জলজ্যান্ত প্রমাণ। কিন্তু উঁচানো বন্দুকের দিকে তাকিয়ে বুকের মধ্যে কেমন ঢিপঢিপ করতে লাগল

অনিমেষের। যে ট্রামটা জ্বলছে এখন সেটার আগুন নেবানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে কতকগুলো লোক। আশেপাশে কোন মানুষ নেই, কেউ কৌতূহলী হয়ে দেখছে না এখানে কি হচ্ছে। কলকাতা শহরে নাকি লোক সব সময় গিজগিজ করে, তারা এই মুহূর্তে কোথায় গেল!

অনিমেষ পেছন ফিরে বৃদ্ধ ভদ্রলোককে দেখল। তিনি বোধ হয় পুলিসদের লক্ষ্য করেছেন, কারণ তাঁর শরীর এখন হকারদের বেঞ্চির তলায় অনেকখানি ঢোকানো। চট করে রাস্তা থেকে বোঝা যাবে না কেউ ওখানে আছে। অনিমেষ পাথরের মত দাঁড়িয়েছিল। ও বুঝতে পারছিল, সামান্য নড়াচড়া করলেই পুলিসের নজরে পড়ে যাবে। ওই পাথরের মত মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে স্পষ্টই বোঝা যায় ধরা পড়লে তা কখনোই সুখের হবে না। লোকগুলো থামোকা এই ট্রামটা পোড়াতেই বা গেল কেন? ট্রাম তো জনসাধারণের উপকারেই আসে। খাদ্য চাওয়ার সঙ্গে ট্রাম পোড়ানোর কি সম্পর্ক আছে? নাকি ওরা এইভাবেই সরকারকে জব্দ করতে চায়!

কিন্তু যাই হোক, একটা লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে কলকাতা শহরে। সেই লড়াই-এর এক পক্ষ কংগ্রেস সরকার আর তার পুলিসবাহিনী, কিন্তু অন্য পক্ষ কে? অনিমেষ নিজের শরীরের ভার এক পা থেকে অন্য পায়ে আনার জন্য সামান্য নড়ে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা কড়া আলো ওর মুখের ওপর এসে পড়ল আচমকা। তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিতে গিয়ে সে শুনতে পেল, 'কে ওখানে, হু আর ইউ?'

টর্চের আলো ওর মুখ থেকে সরছে না, কিন্তু কেউ একজন এদিকে এগিয়ে আসছে। অনিমেষের সর্বাঙ্গে একটা কাঁপুনি এসে গেল। কি করবে ও? চিৎকার করে নিজের নাম বলে ওদের দিকে এগিয়ে যাবে? ঠিক সেই সময় ও কয়েকটি ছুটন্ত শরীরকে সামনের গলি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল। কিছু বোঝার আগেই দুম্ দুম্ আওয়াজে সমস্ত কলকাতা যেন কাঁপতে লাগল। যারা ছুটে এসেছিল তারা শব্দটার সঙ্গে সঙ্গেই আবার গলির মধ্যে তড়িৎগতিতে ফিরে গেছে। অনিমেষ তাকিয়ে দেখল যে পুলিস অফিসার টর্চ হাতে ওর দিকে এগিয়ে আসছিল তার শরীর মাটিতে পড়ে আছে। সামনের ভ্যানটা ধোঁয়ায় ভরতি। ওরা বোমা ছুঁড়ে গেল। অনিমেষ আর কোন চিন্তা করতে পারল না। এইরকম একটা আকস্মিক ব্যাপার ওর সমস্ত চেতনাকে নাড়া দিয়ে গেল। কোন দিকে না তাকিয়ে শরীরে যত জোর আছে সব একত্রিত করে ও ছুটতে লাগল পাশের গলিটার দিকে। এক দুই তিন চার পাঁচ নম্বর বাড়িটার সামনে পৌঁছে গেলেই

বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

হঠাৎ একটা তীব্র ব্যথা এবং কানফাটানো কিছু গর্জন অনিমেষের সমস্ত শরীর অসাড় করে দিল। কিছু বোঝার আগেই ওর ছুটন্ত শরীরটা হুমড়ি খেয়ে গলির মধ্যে পড়ে গেল, ব্যাগ আর বেডিং ছিটকে চলে গেল দু'দিকে। পড়ে যাওয়ার পরও আওয়াজ বন্ধ হয়নি। একটা হাঁটু ভাঁজ করে অনিমেষ গলির রাস্তায় শুয়ে ছটফট করতে করতে আবিষ্কার করল, উষ্ণ স্রোত নেমে আসছে হাঁটুর ওপর থেকে। চটচটে হয়ে যাচ্ছে হাতের চেটো। সেখান থেকে উঠে ব্যথাটা এখন সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। প্রাণপণে চিৎকার করে উঠতে গিয়ে সে আবিষ্কার করল সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গিয়েছে—সে কথা বলতে পারছে না। ক্রমশ চোখ ঘোলাটে হয়ে গিয়ে সমস্ত কলকাতা শহর অন্ধকার হয়ে গেল অনিমেষের সামনে।

কোনদিন ঘোড়ায় অথবা পালকিতে চড়েনি অনিমেষ। হঠাৎ যেন ওর মনে হল সেরকম কিছুতে সে চেপে যাচ্ছে। বেশ দ্রুত। যন্ত্রণা হচ্ছে কেন এত পায়ে? চোখ খুলে কিছু দেখতে পাচ্ছে না কেন? স্বর্গছেঁড়ায় আঙরাভাসা নদীর হাঁটুজলে চেষ্টা করে ডুব দিয়ে চোখ খুলে যেরকম ঘোলাটে জগৎটাকে দেখা যেত এখন কেন সেরকম দেখাচ্ছে! কেউ কি ওকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে ছুটে যাচ্ছে? কে? যে বা যারা নিয়ে যাচ্ছে তারা ওর হাত পা ধরে আছে, ওর বুক পেট নিচের দিকে ঝুলছে। কারা নিয়ে যাচ্ছে? পুলিস? অনিমেষ মোচড় দিয়ে উঠতে গিয়ে আবার চোখের সামনে অন্ধকারটাকে নেমে আসতে দেখল।

আর এই সময় একটা অদ্ভুত বাঁশির সুর বাজছে কোথাও এরকম বোধ হল। মাথার ওপর কালী গাই-এর আদুরে চোখ দুটোর মত আদর করতে চাওয়া আকাশ আর ওরা তার নিচে দাঁড়িয়ে আছে। ওর সঙ্গীদের সে কখনো ছাখেনি কিন্তু তাদের মুখচোখ অদ্ভুত উজ্জ্বল। একটা নীলচে ধোঁয়া ওদের পাকে পাকে কোমর অবধি ঘিরে রেখেছে। স্বর্গছেঁড়ার মাঠে যে কাঁঠালিচাঁপা ফুটতো সেইরকম একটা গন্ধে নাক ভরে যাচ্ছে। কেউ একজন বলল, এখন তুমি এমন সুন্দর গান শুনতে পাবে যা কোনদিন শোননি। কোনদিন শুনবেও না। ওদের সামনে একটু ওপরে আরো কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে, তাদের শরীর নীল ধোঁয়ায় ছেয়ে আছে, কারোর মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না কিন্তু অপূর্ব জ্যোতি বের হচ্ছে সেখান থেকে। এই নীলাভ আলোয় অনিমেষ অবাক হয়ে দেখল একটি মুখ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে হাসছেন। প্রচণ্ড নাড়া খেয়ে সে দু হাত বাড়িয়ে কয়েক পা এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল, কিন্তু তার পা নড়ছে না কেন? যেন তাকে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে। ও দেখল, মাধুরীর হাসির মধ্যে যেন তিরস্কার না কি অনুযোগ অথবা অভিমান!

ও মনে মনে বলে উঠল, মাগো মা, আমাকে আসতে দাও। কিন্তু সেই মূর্তি ধীরে ধীরে ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানালেন। আর সঙ্গে সঙ্গে এক অপূর্ব সুর উঠল বাতাসে। একে কি গান বলে? অনিমেষ এরকম গান এর আগে শোনেনি কখনো। তার সামনে থেকে সব কিছু সরে যাচ্ছে, আর এই যাওয়ার জন্য এখন একটুও আসসোস হচ্ছে না তার।

হঠাৎ কেউ কথা বলল, চাপা গলায়, 'খোকাকে স্যাট করেছে দাদা।' 'খোকাকে?' একটি ভারী গলা এগিয়ে আসতেই অনিমেষ অনুভব করল তাকে শক্ত মত কিছুর ওপর নামিয়ে রাখা হল। যেন কোন গভীর কুয়োর তলা থেকে তীব্রবেগে সে ওপরে উঠে আসছে—এইরকম একটা বোধে দুলতে দুলতে অনিমেষ চোখ খুলল। কিন্তু এত অন্ধকার কেন? ঘরটাই কি অন্ধকার? ও শুনতে পেল ভারী গলা বলছে, 'সেন্স আছে, না ডেড্?' আর একজন খুব কাছ থেকে জবাব দিল, 'না, অজ্ঞান হয়ে আছে বোধ হয়—খুব ব্লিডিং হচ্ছে। ওকে পড়ে যেতে দেখে বোম চার্জ করে পুলিসটাকে হটিয়ে দিয়ে তুলে নিয়ে এসেছি।'

'ওদিকের অবস্থা কেমন?'

'গলির ভেতর পুলিস ঢুকবে না মনে হয়।'

'কিন্তু খোকা ওখানে কি করতে গেল? ওর তো এখানে থাকার কথা নয়।' ভারী গলাকে খুব চিন্তিত দেখাল।

একটু একটু করে অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে, কিন্তু তক্ষুণি মনে হল কে যেন ওর ডান উরুতে পেরেক পুঁতে দিয়েছে—যন্ত্রণাটা তুবড়ির মত সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। নিজের দুটো হাত সেখানে রাখতেই চটচটে হয়ে গেল। শুয়ে শুয়ে শরীরটা দুমড়ে মুচড়ে ও যন্ত্রণার সঙ্গে লড়তে লাগল। দাঁতের বাঁধন ছিটকে বেরিয়ে এল, 'মা মাগো।'

সঙ্গে সঙ্গে কেউ বলল, 'সেন্স এসেছে।'

ভারী গলা কাউকে বলল, 'গুলি যদি পেটে লেগে থাকে কিছু করার নেই, তুমি জলদি শিবু ডাক্তারের কাছে যাও, আমার নাম বলে নিয়ে আসবে।'

দু হাতে মুখ চাপা দিয়ে অনিমেষ স্থির হয়ে থাকতে চাইছিল। এইটুকু একটা বোধ ওর কাজ করছিল যে ও পুলিসের হাতে পড়েনি। এরা কারা? একটা ক্ষীণ আলো আস্তে আস্তে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। ও হাতদুটো মুখের ওপর তুলতেই সেই স্বল্প আলোয় টকটকে লাল রক্তমাখা আঙুলগুলো দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে একটা দৃশ্য ওর সামনে চলে এল। মাধুরী চিৎকার করে ওকে বলে ন, 'ওরে মুছে ফেল, তোর হাত থেকে রক্ত মুছে ফেল।' চোখের সামনে

জল। দাউ দাউ চিতার আগুন ওকে যেন ঠেলে আবার সেই কুয়োটার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। অনিমেষ প্রাণপণে চেষ্টা করছিল জ্ঞানটাকে আঁকড়ে ধরার। আলোটা এখন ওর ওপরে। ভারী গলা হাত দিয়ে ওর পা ছুঁয়ে বলল, 'থাইতে গুলি লেগেছে। যাক, বেঁচে যাবে।' তারপর আলোটা ওর মুখের কাছে এল, 'আরে, এ কে? কাকে আনলে তোমরা? এ তো খোকা নয়!'

'খোকা নয়? খোকার মত ফিগার—হ্যাঁ, তাই তো। এ তো অন্য লোক।'

ক্রমশ অস্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছে আলোটা। যন্ত্রণাটা এখন সারা শরীরে নিজের ইচ্ছে মতন খেলা করে যাচ্ছে। অনিমেষ কিছুতেই চোখ খোলা রাখতে পারছিল না। ভারী গলা ওর, মুখের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এই, তোমার নাম কি?'

প্রাণপণে ঠোঁট নাড়তে চাইল অনিমেষ। ওর সমস্ত শরীর কথা বলতে চাইছে অথচ কোন শব্দ হচ্ছে না কেন?

ওর দু কাঁধ ধরে কেউ ঝাঁকুনি দিয়ে যাচ্ছে সমানে। মুখের ওপর অস্পষ্ট একটা মুখ। ক্রমশ কুয়োর গভীরে যেতে যেতে অনিমেষ দুটো শব্দ শুনতে পেল, 'তুমি কে?'

ঠোঁট নাড়ল অনিমেষ। চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা শরীরটার ওপরে মাথাটাকে সোজা রাখতে চেষ্টা করছিল সে। প্রাণপণে।

সমাপ্ত